জহির রায়হান রচনাবলী

প্রথম খন্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহির রায়হান রচনাবলী

[প্রথম খণ্ড]

ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী
সম্পাদিত

আহমদ পাবলিশিং হাউস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম সংস্করণ | মে ১৯৮০
বৈশাখ ১৩৮৭

ষষ্ঠ মুদ্রণ | ফেব্রুয়ারি ২০০৯
ফাল্গুন ১৪১৫

প্রচ্ছদ | রফিকুল ইসলাম

কম্পিউটার কম্পোজ | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি কে রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | তিনশত টাকা মাত্র

ZAHIR RAIHAN RACHANABALI *[1st Part] Edited by Dr. Ashraf Siddiqui, Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. 1st Edition : May 1980 & 6th Print : February 2009*
Price : Tk. 300.00 only.
ISBN 984 11 0376 5
দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

কখন প্রথম দেখা হল অমর কথাশিল্পী জহির রায়হানের (শহীদ) সঙ্গে? হ্যাঁ, –তিনি তখনও অমর হন নি, সাহিত্যের আসরে গতায়াৎ শুরু হয়েছে মাত্র– দেখা হল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শহীদ মিনারের দিকের তখনকার অস্থায়ী বাঁশের বেড়া দেওয়া শেডে, যেখানে থাকতেন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক শহীদ আলিম চৌধুরী, তখন অবশ্য মেডিক্যালের উপরের শ্রেণীর সিনিয়র ছাত্র, যিনি জহির রায়হানেরই আত্মীয়, মেডিক্যাল কলেজের সতীর্থ এম. এ. কবীরের সঙ্গে বের করতেন, 'খাপছাড়া', 'যাত্রিক', প্রভৃতি পত্রিকা। সে-সব পত্রিকায় আমিও লিখেছি নিয়মিত। জহির সেখানে আসতেন পরিধানে পাজামা-সার্ট, বেটেখাটো মানুষটি গল্প করতেন, বেশ কিছুটা লাজুক, পড়তেন সম্ভবত জগন্নাথ কলেজে আই. এস-সি। জহিরের প্রথম গল্প 'হারানো বলয়' প্রকাশিত হয়। যতদূর জানতে পেরেছি, ঐ 'খাপছাড়া' অথবা 'যাত্রিক' পত্রিকায়। জহির এই পত্রিকা দু'টির ব্যাপারে, যতদূর মনে পড়ে পরিশ্রমও করতেন, কারণ মেডিক্যালের উপরের শ্রেণীর দু'জন সিনিয়র ছাত্রের কারো পক্ষেই প্রেসে দৌড়-ঝাঁপ, লেখা জোগাড় বা প্রুফ দেখা সম্ভবত সম্ভব ছিল না। মরহুম ড. চৌধুরী ছিলেন যদিও সম্বন্ধে আমার চাচা-শ্বশুর, তবু তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, বন্ধুর মতই ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে, প্রায় সময়ই থাকতেন আমার শ্বশুরালয়ে, ৩৭ নাজিমুদ্দিন রোডে যেখানে হন্তদন্তভাবে প্রুফ বা লেখাসহ কখনও দেখা যেত জহিরকে। পরিচয় হয়েছিল আমার স্ত্রীর ছোট ভাই লতিফ চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি ভাষা আন্দোলনের সময় সম্ভবত ছিলেন কারা-সঙ্গী। জহিরকে তখনই মনে হ'ত খুব ব্যস্ত, হাতে যেন কত কাজ, এতটুকু যেন সময় নেই। এরপর দেখা হয়েছে সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজের (মরহুম) জনসন রোডের 'চিত্রালী' অফিসে, '৫৮ বা '৬০-এ, তখনও খুব ব্যস্ত, পাজামার বদলে তখন পেন্ট হাওয়াই শার্ট –। তবে পোশাক পরিচ্ছদের দিকে, যতদূর মনে পড়ে, খুব সজাগ মনে হত না। এরপর ১৯৬৯-৭০ এর শেষের দিকে, সেই উত্তাল গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে হঠাৎ করেই এলেন, চিরাচরিত ব্যস্তসমস্ত, ১০নং গ্রিন রোডের বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে, কয়েক বছর পূর্বের দৈনিক বাংলা পত্রিকা এবং একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে প্রাচীন তথ্যপঞ্জি ঘাটতে। আমি বোর্ডের পরিচালক। গবেষণা বিভাগের শ্রদ্ধেয় আলী আহমদ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল- কতদিন এসেছিলেন, কখন আসতেন খবর রাখা সম্ভব হয় নি। সম্ভবত– কোন ফিল্মের কাহিনীর ব্যাপারে তথ্য প্রয়োজন ছিলো, কি সে প্রয়োজন– কাল মিলিয়ে ভবিষ্যতের কোন গবেষক নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আই.এস-সি পাশ করে জহির মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন শুনেছি, হয়তো '৫৭-৫৮-তে ডাক্তার হয়ে বের হতেও পারতেন কিন্তু তা হবার নয়। ১৯৫৮-৫৯-এ তাকে দেখা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ক্লাসে। এ সম্বন্ধে তার একজন সতীর্থ বলেছেন :

'ছাত্র হিসেবে সিরিয়াস ছিলেন না। হপ্তায় একদিন কিংবা বড় জোড় দু'দিন ক্লাসে আসতেন। দু-একটা ক্লাস করেই হুট করে চলে যেতেন। ক্লাসে আসতেনও এমন সময় যখন ঘণ্টা পড়ে গেছে, ক্লাসে রুলকলও প্রায় শেষ। চুপটি মেরে পেছনের বেঞ্চিতে বসতেন। হাতে খাতাপত্র থাকত না, টিওটোরিয়েলও জমা দিতে দেখিনি কোনদিন। আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার বা সেমিনারে বসে বই পড়ার অছিলায় আড্ডা মারার সময় ছিল না তার। ভীষণ ব্যস্ত মনে হত তাকে; যেন ব্যবসায়ী কেউ, সখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে এসেছেন [শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে, ১৯৭৩, মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক, পৃ ২৬৮] তখনই সম্ভবত চলচ্চিত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, হয়তো নতুন স্বপ্নে রোমাঞ্চিত, পরে আর তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করতে দেখা যায় নি। কিন্তু দেখা গেল বাংলাদেশের উন্মুক্ত প্রান্তরে, যেখানে হাজার বছরের বাংলাদেশ তার ক্যানভাস আর সেখানে ছবি আঁকছেন তিনি কলম আর ক্যামেরার মাধ্যমে। সেখানেও ছিল সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে, ছলনা, বঞ্চনা ও কপটতার বিরুদ্ধে।

জহিরের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ, আরেক শহীদ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের অনুজ। নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার মজুপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কিন্তু ধর্মপরায়ণ ও রক্ষণশীল পরিবারে ৫ই আগস্ট ১৯৩৩ সালে তাঁর জন্ম। বাবা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব ছিলেন আলিয়া মাদ্রাসার মুদাররেস– স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ এবং কিছুটা রক্ষণশীল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জহির পড়াশোনা করেন কলকাতার বিখ্যাত মিত্র ইন্সটিটিউশনে– পরে আলিয়া মাদ্রাসার অ্যাংলো-পার্শিয়ান বিভাগে। বাবার হয়তো ইচ্ছা ছিল পুত্র কালে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর বাবা কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। জহির নোয়াখালী গ্রামের বাড়ি চলে যান। সেখানে আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে ১৯৫০ সনে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক এবং ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫৩ সনে আই.এস-সি পাশ করেন। এরপর কিছুদিন মেডিক্যালে পড়ে ১৯৫৬-৫৮-এর সেসনে, ১৯৫৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ. অনার্স পাশ করেন। কিছুদিন এম.এ. পড়াশোনা করলেও শেষ পর্যন্ত, পূর্বেই উক্ত হয়েছে, পরীক্ষা দেয়া তাঁর হয় নি।

অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার শুধু একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন না, ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত। অগ্রজের প্রভাবেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, জহিরও এসব আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার জন্য তাঁকে কারাগারে আটক থাকতে হয়। মুক্তিলাভের পর চলচ্চিত্রের দিকে একাগ্রতার জন্য সম্ভবত তিনি কলকাতার প্রমথেশ মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফী স্কুলে ফটোগ্রাফী শেখার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু যতদূর শোনা যায়, বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানে অর্থ আদান-প্রদানের অসুবিধার জন্য তিনি খরচ চালাতে অসমর্থ হন এবং ঢাকায় ফিরে আবার আই.এস-সি ক্লাসের পড়ায় মগ্ন হন। ছাত্রজীবনে ছেদ পড়ার আগেই ১৯৫৬-এর শেষের দিকে উর্দু ছবি 'জাগো হুয়া সাবেরার' পরিচালক লাহোরের স্বনামপ্রসিদ্ধ কারদার সাহেবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি তাকে তার সহকারী মনোনীত করেন। এরপর চিত্র পরিচালক সালাউদ্দিন ও এহতেশামের সহকারী হিসেবেও তাঁর কাজ করার সুযোগ ঘটে। 'যে নদী মরু পথে' ও 'এ দেশ তোমার আমার' ছবি দু'টিতে জহির ছিলেন তাদের নির্ভরযোগ্য সহকারী। ১৯৫৬-এ ঢাকায় ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা জহিরের জন্য রূপালি সোনালি দিগন্তের হাতছানি নিয়ে এলো। নিজেই হলেন এরপর পরিচালক। ১৯৬১-এ মুক্তি পেল 'কখনো আসেনি'। এরপর বাংলা উর্দু ও ইংরেজি ছবি-'সোনার কাজল' 'কাচের দেয়াল' 'বেহুলা', 'জীবন থেকে নেয়া', 'আনোয়ারা', 'সঙ্গম', 'বাহানা', 'জ্বলতে সুরুজ কে নীচে', 'লেট দেয়ার বি লাইট', (অসমাপ্ত) ইত্যাদির বিস্ময়কর আবির্ভাব। এছাড়াও আরও প্রযোজনার সঙ্গেও ছিলেন যুক্ত। ইংরেজি ছবি 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছিল তার বাংলা উপন্যাস 'আর কতদিন'-এর উপর ভিত্তি করে রচিত। এ ছবি শেষ না হতেই এলো পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াবহ কালো কুটিল রাত্রি। জহির গেলেন মুজিবনগর, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ নিয়ে তৈরি করলেন প্রামাণ্য চিত্র 'স্টপ জেনোসাইড'। তারই তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠলো বাবুল চৌধুরীর 'ইনোসেন্ট মিলিয়ন' এবং আলমগীর কবিরের 'লিবারেশন ফাইটার্স'। ১৯৬১–১৯৭১, মাত্র এই কয় বছরে চলচ্চিত্র শিল্পে যে অবদান রাখেন তা সত্যি বিস্ময়কর। উপযুক্ত ট্রাডিশন বা ট্রেনিং না থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশে যে কিরূপ প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে এবং প্রতিভাশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিত্র শিল্পে যে কি নতুন নতুন টেকনিক বা দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে পারে তার প্রমাণ– দুর্লভ প্রমাণ– জহির রায়হান। তাঁর বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন পুরস্কারেও সম্মানিত হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ভুবনে তাঁর কি অবদান এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

কথা সাহিত্যিক জহির রায়হানের পরিচয়– সে আর এক ভুবনের কথা। স্কুল জীবনে বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকায় কোথায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সে পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনো গবেষণার অপেক্ষায়। তবে যতদূর জানা যায়, দশম শ্রেণীতে পাঠকালে ১৯৪৯-এ বামপন্থী পত্রিকার কলকাতার 'নতুন সাহিত্যে' তাঁর 'ওদের জানিয়ে দাও' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। জহিরের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয়টি; একটি গল্প সংকলন, অন্য পাঁচটি উপন্যাস। 'সূর্যগ্রহণ' (১৩৬২ গল্প-সংকলন),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। উপন্যাস ঃ 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৩৬৭), 'হাজার বছর ধরে', (১৩৭১), 'আরেক ফাল্গুন' (১৩৭৫) 'বরফ গলা নদী' (১৩৭৬) এবং 'আর কত দিন' (১৩৭৭)। 'হাজার বছর ধরে' ১৯৬৪-তে আদমজি পুরস্কার লাভে ধন্য হয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী তাঁকে ১৯৭২-এ মরণোত্তর একুশে ফেব্রুয়ারি পুরস্কার দানে সম্মানিত করে। আবহমান বাংলার শাশ্বত রূপ, খেটে খাওয়া মানুষ, বাংলার মমতাময়ী মা ও নারী ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। তাঁর সাহিত্যের চরিত্র ও মটিফ-মটিফিম্ বিচিত্র– নিতান্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে এসব চরিত্র চিত্রণ সম্ভব নয়। পরিচিত প্রকৃতি পাঠশালা থেকেই এসব মটিফ-মটিফিম্ সংগৃহীত– সন্দেহমাত্র নেই।

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১, ঢাকা এসে শুনলেন অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার নিখোঁজ ১৪ই ডিসেম্বর থেকে। উন্মাদের মত খুঁজতে লাগলেন ভাইকে সর্বত্র– এমন কি রেডক্রসের সাহায্যে পাকিস্তান পর্যন্ত– যদি বন্দি হয়ে নীত হয়ে থাকেন। '৭২ এর ৩০শে জানুয়ারি মিরপুরে কারফিউ জারি করে সার্চ পার্টি পাঠান হল, কোন এক গোপন সংবাদ পেয়ে হাবিলদার হানিফের সঙ্গে নিজেই গেলেন মিরপুরে ভয়াবহ ১২ নং সেকসনে। সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া। চক্রান্ত জাল ছিন্ন করতে গিয়ে নিজেই হলেন পৃথিবীর জঘন্যতম এক দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ চক্রান্তের শিকার। জহির রায়হান রচনাবলী প্রকাশনার পর পাঠক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য ধারণার যোগসূত্র হবে আরও গভীরতর, নতুন যুগের সমালোচকগণ লিখবেন তার গ্রন্থের উপর আরও বিস্তৃত আলোচনা। প্রয়োজন হবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনারও। বাংলা একাডেমীর শহীদ বুদ্ধিজীবী রচনাবলী প্রকল্পের এই খণ্ডগুলি আহমদ পাবলিশিং হাউস প্রকাশ করার মহান দায়িত্ব নিয়ে সকলেরই ধন্যবাদার্হ হবেন– এ বিশ্বাস আমাদের আছে। গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের তথ্য সংকেত ও টীকা-টিপ্পনী অংশে আরও বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হবে। ইতিমধ্যে অন্যান্য কোন্ কোন্ পত্র-পত্রিকায় এবং কবে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয় সে সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকবে। জহির রায়হান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এখনও অপ্রতুল। এই অবস্থায় কোথাও ভুলত্রুটি থেকে গেলে তা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে অবশ্যই তা পরিশোধিত হবে– এ আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। এ রচনাবলীর বহুল প্রচার কাম্য।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

মে ১৯৮০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

শেষ বিকেলের মেয়ে ❑ ১১–৮৪

হাজার বছর ধরে ❑ ৮৫–১৫০

আরেক ফাল্গুন ❑ ১৫১–২১৬

বরফ-গলা নদী ❑ ২১৭–৩০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ জহির রায়হান

জন্ম : ৫ আগস্ট ১৯৩২, মৃত্যু : ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশের রঙ্ বুঝি বারবার বদলায়। কখনো নীল। কখনো হলুদ। কখনো আবার টক্‌টকে লাল। মাঝে মাঝে যখন সাদা কালো মেঘগুলো ইতি-উতি ছড়িয়ে থাকে আর সোনালি সুর্যের আভা ঈষৎ বাঁকা হয়ে সহস্র মেঘের গায়ে লুটিয়ে পড়ে তখন মনে হয়, এর রঙ্ একটি নয়, অনেক।

এখন আকাশের কোন রঙ্ নেই।

আছে বৃষ্টি।

একটানা বর্ষণ।

সেই সকাল থেকে শুরু হয়েছে তবু থামবার কোন লক্ষণ নেই। রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে গেছে। অতি সাবধানে হাঁটতে গিয়েও ডুবন্ত পাথর-নুড়ির সঙ্গে বারকয়েক ধাক্কা খেয়েছে কাসেদ। আরেকটু হলে একটা সরু নর্দমায় পিছলে পড়তো সে। গায়ের কাপড়টা ভিজে চুপসে গেছে। মাথার চুলগুলো বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন বাসায় এসে পৌঁছলো কাসেদ, তখন জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছে।

বোধ হয় ঝড় উঠবে আজ।

প্রচণ্ড ঝড়।

ভেজান দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে কাসেদ দেখলো, ছোট্ট একখানা পিঁড়ির ওপরে বসে চুলোয় আঁচ দিচ্ছে নাহার, মা তসবিহ হাতে পাশে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন আলাপ করছেন ওর সঙ্গে।

ভেতরে আসতে অনুযোগভরা কণ্ঠে মা বললেন, দেখো, ভিজে কি অবস্থা হয়েছে দেখো। কি দরকার ছিলো এই বৃষ্টিতে বেরুবার?

কাসেদ কোন উত্তর দেবার আগেই মা আবার বললেন, ঠাণ্ডা লেগে তুমি একদিন মারা যাবে। এই বলে দিলাম দেখো, তুমি একদিন বৃষ্টিতে ভিজেই মারা যাবে।

কেন মিছেমিছি চিন্তা করছো মা। ভেজাটা আমার গা স'য়া হয়ে গেছে। দেখো কিছু হবে না।

না হবে না। যেদিন অসুখ করবে সেদিন টের পাবে। সহসা কি মনে পড়তে খানিকক্ষণ চুপ থেকে মা শুধোলেন, ছাতাটা করেছো কি শুনি? তাইতো মা, ছাতাটা! কাসেদ ইতস্ততঃ গলায় জবাব দিল, ওটা সেদিন অফিস থেকে এক ভদ্রলোক নিয়ে গেছেন, তার কাছ থেকে আর আনা হয় নি।

যা ভেবেছিলাম, নাহারের দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে মা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, তোর দিন যাবে কি করে আমায় বলতো? আজ এটা, কাল সেটা তুই শুধু মানুষকে বিলোতে থাকবি। রাজত্বি থাকতো না হয় বুঝতাম। টানাটানির সংসার।

নিজের ঘরে এসে ভেজা কাপড়গুলো দড়ির ওপর ঝুঁলিয়ে রাখলো কাসেদ। আলনা থেকে একটা গেঞ্জি টেনে নিয়ে পরলো। তারপর উনুনের পাশে এসে বললো, বিলোচ্ছি কে বললো মা, ছাতাটা ভদ্রলোক কিছুক্ষণের জন্য চাইলেন তাই দিলাম। ওটা তো চিরকালের জন্য দেই নি, কাল আবার চেয়ে নিয়ে আসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা এই অবসরে তসবিহ গুণছিলেন আর মনে মনে কি যেন পড়ছিলেন তিনি। থেমে বললেন, আনবি যে তা আমি জানি। ক'দিন ক'টা জিনিসি দিয়ে তুই ফেরত এনেছিস শুনি? এইতো, গেলো শীতে তোর বাবার কম্বলটা যে নিয়ে কোন্ এক বন্ধুকে দিলি, আর কি হলো?

কি আর হবে মা। একদিন সে নিজেই এসে ফেরত দিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, দিয়ে যেতে ওর বয়ে গেছে। অমন জিনিস কেউ পেলে আর হাতছাড়া করে? লোকটাকে তুমি শুধু শুধু সন্দেহ করছো মা। ও বড় ভালো লোক। হাতজোড়া উনুনের উপর ছড়িয়ে দিলো কাসেদ। একটু গরম হয়ে নিতে চায় সে। মা বললেন, তুই তো দুনিয়া শুদ্ধ লোককে ভালো বলিস। আজ পর্যন্ত একটা লোককে খারাপ বলতে শুনলাম না। সেদিন মুদী এসে যাচ্ছে-তা' গালাগাল দিয়ে গেলো, তাকে একটা কথা বলেছিলি তুই?

মা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ছেলের দিকে।

কাসেদ নীরবে আগুন পোহাতে লাগলো।

নাহার এতক্ষণে একটা কথাও বলে নি। চুপচাপ মা-ছেলের ঝগড়া দেখছিলো। সহসা উনুন থেকে মুখখানা তুলে আস্তে করে বললো, তোমার নামাজের সময় হয়ে গেলো মা। মা বললেন, তাই তো! বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন তিনি। চুলোর ওপরে চালগুলো ততক্ষণে ফুটতে শুরু করেছে। ঢাকনিটা তুলে পানির পরিমাণটা দেখে নিলো নাহার।

কাসেদ তখনও চুপ করে আছে।

নীরবে কি যেন ভাবছে সে।

নাহার এক সময় বললো, জাহানারা এসে আজ অনেকক্ষণ বসেছিলেন।

কখন এসেছিল সে? গলাটা যেন সহসা কেঁপে উঠলো তার। নাহার মৃদু গলায় বললো, সকাল বেলা।

কিছু কি বলে গেছে তোমায়? কাসেদের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

নাহার বললো, না, একখানা চিঠি রেখে গেছে।

চিঠিটা কোথায়?

আপনার টেবিলের ওপর রাখা আছে। ঘাড় নিচু করে আবার আপন কাজে মন দিল নাহার। চোখ জোড়া তুলে এক নজর কাসেদের দিকে তাকালে সে হয়তো দেখতে পেতো সারা মুখ তার লাল হয়ে গেছে।

উনুনের উপর থেকে হাতখানা সরিয়ে এনে পরক্ষণে উঠে দাঁড়ালো কাসেদ। দ্রুতপায়ে নিজের কামরায় এসে টেবিলের দিকে তাকালো সে। চিঠিখানা একাটা বইয়ের নিচে চাপা দিয়ে রাখা। মুহূর্তে অনেকগুলো প্রশ্ন এসে ভিড় জমালো। চিঠিতে কি লিখেছে জাহানারা? আর কেনই বা এসে এতক্ষণ বসেছিলো সে? কাল বিকেলে নবাবপুরে দেখা হয়েছিলো ওর সঙ্গে। অনেকক্ষণ কথাও বলেছিলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভোর না হতে আবার সে বাসায় আসলো কেন? বাসায় অবশ্য প্রায় আসে জাহানারা? কাসেদ না থাকলে মায়ের সাথে বসে বসে গল্প করে। কথা বলে। খামের ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে পড়লো কাসেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা লিখেছে–

অনেকক্ষণ বসেও আপনাকে না পেয়ে অবশেষে চলে যাচ্ছি। বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।

সময় করে একবার বাসায় আসবেন কিন্তু। আপনাকে আমার বড় দরকার।

চিঠিটা বারকয়েক পড়লো কাসেদ। বিশেষ করে শেষের লাইনটা। সেখানে যেন একটু অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া রয়েছে। আন্তরিকতার স্পর্শ। কাগজটা আবার ভাঁজ করে বইয়ের মধ্যে রেখে দিল সে। তারপর নীরবে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

বাইরে এখনো ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে।

সরু গলিটায় একটা মানুষও নেই।

সবাই ঘরে খিল এঁটে ঘুমোবার আয়োজন করছে এখন। কিম্বা, বিছানায় বসে বসে গল্প করছে, রূপকথার গল্প।

কাসেদ ভাবলো আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেলে এখনই সে জাহানারাদের ওখানে যেতে পারতো। প্রয়োজনটা জেনে নেয়া যেতো ওর কাছ থেকে। নইলে রাতটা বড় উৎকণ্ঠায় কাটবে।

কেন যেতে লিখেছে জাহানারা?

জানালার পাশ থেকে সরে এসে বিছানায় বসলো কাসেদ।

ওর মনে এখন রঙের ছোঁয়া লেগেছে। দু'চোখে স্বপ্নের আবির ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

একদিন জাহানারাকে বিয়ে করবে কাসেদ।

অর্থের প্রতি তার লোভ নেই। একগাদা টাকা আর অনেকগুলো দাসীবাঁদীর স্বপ্নও সে দেখে না।

ছোট্ট একটা বাড়ি থাকবে তার, শহর নয়, শহরতলীতে, যেখানে লাল কাঁকরের রাস্তা আছে আর আছে নীল সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে দু'পায়ে কাঁকর মাড়িয়ে বেড়াতে বেরুবে ওরা।

সকাল কিম্বা সন্ধ্যায়। রাস্তায় লোকজনের ভিড় থাকবে না। নিরালা পথে মন খুলে গল্প করবে ওরা, কথা বলবে।

আজকের বিকালটা বড় সুন্দর, তাই না?

কালও এমনটি ছিলো।

চিরকাল যদি এমনটি থাকে?

তাহলে বড় একঘেয়ে লাগবে। সহসা শব্দ করে হেসে উঠবে জাহানারা। হয়তো বলবে, একটানা সুখ আমি চাই না, মাঝে মাঝে দুঃখেরও প্রয়োজন আছে; নইলে সুখের মূল্য বুঝবো কেমন করে?

ওরা কথা বলবে।

আরো অনেক কথা।

কখনো কানে কানে, কখনো মনে মনে, কখনো নীরবে।

তারপর রাত নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরে আসবে ওরা।

সামনের বাঁকানো বারান্দায় বেতের টেবিলের ওপর দু'কাপ চা রাখা। গরম চায়ের উত্তাপ যেন বার বার দেহকে স্পর্শ করছে এসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেবে ওরা।

কি ভাবছো?

কিছু না।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

কি?

তোমার কপালে যদি একটা তারার টিপ পরিয়ে দিতে পারতাম।

কাসেদ লক্ষ্যও করেনি কখন নাহার এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছে।

ওর হাতের চুড়ির শব্দে সহসা যেন সম্বিত ফিরে পেলো সে।

নাহার বললো, উঠুন চাদরটা ভালো করে বিছিয়ে দিই।

ও। সরে এসে টেবিলের সামনে বসলো কাসেদ।

এলোমেলো চাদরটা তুলে নিয়ে ভালো করে বিছিয়ে দিচ্ছে নাহার। ছিপছিপে দেহ ময়লা রঙ্ আর মিষ্টি চেহারার নাতিদীর্ঘ মেয়েটি বড় কম কথা বলে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও কোন সময় মুখ দিয়ে বেরুবে না তার। আচ্ছা নাহার, ও এখানে কতক্ষণ বসেছিল?

কে? নাহার অবাক চোখে তাকালো।

কাসেদ অপ্রস্তুত স্বরে বললো, জাহানারার কথা বলছি।

নাহার অস্পষ্ট গলায় বললো, অনেকক্ষণ!

অনেকক্ষণ! কাসেদ চুপ করে গেলো।

পাশের ঘর থেকে মায়ের কোরান শরীফ পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। টেনে টেনে সুর করে পড়ছেন তিনি। রোজ পড়েন। সকালে, দুপুরে আর রাতে। মাসে একবার করে কোরান শরীফ খতম করা চাই, নাইলে উনি শান্তি পান না। রাতে ভাল করে ঘুমও হয় না তাঁর।

মাঝে মাঝে কাসেদ বলে, মা, এত পুণ্য দিয়ে তুমি করবে কি শুনি?

মা হেসে জবাব দেন, একি শুধু আমার নিজের জন্যে-রে, তোদের জন্যে নয়? বলতে গিয়ে সহসা মায়ের মুখখানা ম্লান হয়ে আসে। হয়তো মৃত স্বামীর কথা সে মুহূর্তে মনে পড়ে তাঁর। বাবা ছিলেন একেবারে উল্টো মেরুর মানুষ। ভুলেও কোনদিন ধর্ম-কর্মের ধার ধারতেন না তিনি। একবেলা নামাজ কিম্বা একটা রোজাও কখনো রাখেন নি।

মা কিছু বলতে গেলে উল্টো ধমকে উঠতেন, বলতেন ওসব বাজে কাজে সময় ব্যয় করার ধৈর্য আমার নেই।

মা আহত হতেন। কিন্তু সাহস করে আর কিছু বলতেন না।

বাবা মারা গেছেন, আজ কতদিন। আজও রাত জেগে মা বাবার জন্যে প্রার্থনা করেন। কান্নাকাটি করেন খোদার কাছে। বলেন, ওকে তুমি মাফ করে দিও খোদা, ওর সব অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দিও।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, বিছানাটা সুন্দর করে বিছিয়ে দিয়ে নাহার ইতিমধ্যে সরে পড়েছে। রান্নাঘরে বোধ হয় খাওয়ার আয়োজন করছে সে এখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইটা খুলে জাহানারার চিঠিখানা আবার বের করলো কাসেদ।

হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার আর ঝকঝকে।

জাহানারা, আমি তোমাকে ভালবাসি জাহানারা!

জাহানারা নীরব।

চোখজোড়া মাটিতে নামিয়ে নিয়ে কি যেন গভীরভাবে ভাবছে সে।

সারা মুখে ঈষৎ বিস্ময়।

সারা দেহ উৎকণ্ঠায় কাঁপছে তার। সন্দেহ আর সম্ভাবনার দোলায় দুলছে তার মন!

কাসেদ ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি আমায় ভালবাস না জাহানারা?

জাহানারার ঠোঁটের কোণে এতক্ষণে এক টুকরো হাসি জেগে উঠলো।

ধীরে ধীরে সে হাসি চোখে আর চিবুকে ছড়িয়ে পড়লো তার। লজ্জায় মাথাটা নত হয়ে এলো। মুখখানা অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে সে বললো, তুমি কি কিছুই বোঝ না?

কাসেদ নীরব।

মুহূর্তের আনন্দে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। দীর্ঘ সময় ধরে সে দিনে রাতে যাকে নিয়ে অশেষ কল্পনার আলপনা বুনতো, সে আজ তার কাছে ধরা দিয়েছে।

জাহানারা! মিষ্টি করে সে ডাকলো।

বলো। চোখ তুলে তাকাতে সঙ্কোচ বোধ করছে মেয়েটি।

কাসেদ বললো, তুমি আমাকে আজ বড় অবাক করলে।

কেন?

আমি ভাবতেও পারি নি তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো।

অমন করে ভাবতে গেলে কেন?

জানি না। শুধু জানি এ প্রশ্ন বার বার আমাকে যন্ত্রণা দিতো। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো সে। জাহানারা কাছে সরে এসে একখানা হাত রাখলো ওর নরোম তুলতুলে চুলের অরণ্যে। তারপর ধীরে ধীরে সিঁথি কাটতে কাটতে মৃদু গলায় সে বললো, থাক। ওসব কথা এখন থাক, অন্য কিছু বলো।

কাসেদ ওর চোখে চোখ রেখে আস্তে করে শুধালো, কি বলবো?

কিরে বিড়বিড় করে কি-সব বকছিস তুই? মায়ের কণ্ঠস্বর তীরের ফলার মত কানে এসে বিঁধলো তার। কাসেদ চম্‌কে উঠে বসলো।

মা ওর মাথার ওপর একখানা হাত রেখে আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আজকাল অমন করে তুই কি ভাবিস বলতো?

কাসেদ ইতস্ততঃ করে বললো, ও কিছু না মা, চলো ভাত দেবে এখন, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

মা ভর্ৎসনা করে বললেন, ক্ষিধে পেয়েছে এতক্ষণ বলিস নি কেন, চল, খাবি চল। ওঠ, মুখহাত ধুয়ে নে। বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রান্না ঘরে নাহার এখন খাবার সাজাচ্ছে।

বাইরে বৃষ্টি এখনো থামে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাস বেড়েছে আরো।

পরদিন বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পথে জাহানারাদের বাসায় গেলো কাসেদ।

বাসাটা ওদের পুরানা পল্টনে। একতলা বাড়ি সদ্য চুনকাম দে'য়া।

সামনে বাগান। বসে বিকেলে ওরা চা খায়, গল্প করে।

পথে যেতে যেতে কাসেদ ভাবলো, জাহানারা হয়তো তার অপেক্ষায় এতক্ষণে অধীর হয়ে আছে। ঘর ছেড়ে বারবার বারান্দায় বেরিয়ে আসছে সে। চেয়ে চেয়ে দেখছে লোকটা আসছে কিনা। সে কি আসবে না আজ? পাতলা কপালে সরু সরু রেখা এঁকে শোবার ঘরে সরে গেলো জাহানারা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখানা দেখলো সে। বড় ম্লান মনে হচ্ছে আজ। কিছুই ভাল লাগছে না। মন বসতে চাইছে না কোন কাজে। বিকেল হয়ে গেলো, কাসেদ এখনো আসছে না। কেন? ভাবতে বড় ভালো লাগলো ওর। মনটা খুশীতে ভরে গেলো। জাহানারা কি সত্যি ওকে ভালবাসে?

বাসার কাছে এসে কাসেদ দেখলো সামনের বাগানে অনেক লোকের ভিড়। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে। দেখে অবাক হলো সে। সবার পরনে সদ্য ধোয়ান কাপড়। হাসছে। কথা বলছে। মাঝে মাঝে চানাচুর আর ডারমুট খাচ্ছে। একখানা পিরিচ হাতে অনেকগুলো মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জাহানারা। আজ সুন্দর করে সেজেছে সে। পরনে হালকা নীল রঙের শাড়ি। চুলগুলো খোঁপায় বাঁধা। চারপাশে তার সাদা ফুলের মালা জড়ানো। কপালে কুমকুমের টিপ। কাসেদকে দেখতে পেয়ে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো জাহানারা।

আপনি এলেন তাহলে?

একমুখ হেসে বললো সে।

হাসলে ওকে আরো সুন্দর দেখায়।

সরু সরু দাঁতগুলো মুক্তোর মত চিক্‌চিক করে ওঠে।

কাসেদ শুধালো, না আসার কোন হেতু ছিলো কি? যাক্‌গে, বাড়িতে এত অতিথির ভিড় কেন?

জাহানারা জিভ কেটে বললো, ওমা আপনি জানেন না বুঝি, আজ আমার জন্মদিন।

জানবো কি করে বলুন। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো কাসেদ।

জাহানারা পরক্ষণে বললো, তাইতো আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। কিছু মনে করেন নি তো?

না. এতে মনে করার কি আছে? নিজেই যেন লজ্জা পেলো কাসেদ।

জাহানারা বললো, আসুন কিছু মুখে দিন, চা খাবেন, না কোল্ড ড্রিঙ্ক? কথাগুলো কাসেদের কানে পৌঁছালো কি-না, বোঝা গেলো না। মুহূর্তে সে বিব্রত বোধ করলো।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, অনেকগুলো চোখের দৃষ্টির মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে।

জাহানারা আবার বললো, দাঁড়িয়ে কেন, আসুন।

কাসেদ ইতস্ততঃ করে শুধালো, আমায় ডেকেছেন কেন বললেন না তো? ভ্রূজোড়া তুলে জাহানারা বললো, ও হ্যাঁ, সে পরে আলাপ করা যাবে। আগে কিছু খেয়ে নিন। অফিস থেকে এসেছেন, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে পথে কিছু খান নি, তাই না?

কাসেদের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো, কিছু বলতে চেষ্টা করলো সে, পারলো না। দু'টি মেয়ে দলছাড়া হয়ে জাহানারার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো আর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলো তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা মৃদু হেসে বললো, আসুন এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আপনার। মিলি চৌধুরী। আমার অনেক কালের বান্ধবী, ইডেনে পড়ে। আর এর নাম শিউলি, আমার কাজিন।

আর ইনি হলেন কাসেদ আহমেদ। নাম হয়তো শুনে থাকবে তোমরা, কবিতা লেখেন।

মিলি আর শিউলি হাত তুলে আদাব জানালো। পরিমিত হাসলো দু'জনে। মিলি জানতে চাইলো, আপনি কি ধরনের কবিতা লেখেন?

কাসেদ বললো, লিখি না, লিখতাম এককালে।

ইতিমধ্যে জাহানারা সরে গেছে সেখান থেকে। অদূরে কয়েকটি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে সে।

শিউলি শুধালো, আপনার কোন বই বেরিয়েছে?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, না।

মিলি বললো, আসুন বসা যাক।

বাগানের এক কোণে তিনখানা বেতের চেয়ার টেনে গোল হয়ে বসলো ওরা।

কাসেদ নীরব।

মিলি আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

শিউলি মিটিমিটি হাসছে।

দোহারা গড়ন। ময়লা রঙ। লম্বা মুখের উপর নাকটা বড় ছোট হলেও বেমানান মনে হয় না। চোখের নিচে সরু একটা কাটা দাগ। ভুরুতে সুরমা টানা। কাসেদের মুখের ওপরে চঞ্চল চোখজোড়া মেলে ধরে হাসছে সে। অস্বস্তিতে মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিলো কাসেদ।

আড়চোখে মেয়েটিকে আরেকবার দেখলো সে।

এখনো তাকিয়ে মেয়েটি।

এখনো।

সহসা মিলি শুধালো, আপনি কোথায় থাকেন, কাসেদ সাহেব?

কাসেদ মৃদু গলায় বললো, কল্‌তাবাজারে।

বাসায় কে আছেন আপনার?

মা আছেন আর এক দূরসম্পর্কীয়া বোন।

শিউলি হাসছে, হাসুক।

জাহানারা এখনো এলো না। একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলছে সে। ওদের কথা যেন ফুরোবে না কোনদিন।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো কাসেদ।

এ কি বলছেন আপনি? জাহানারা অবাক চোখে তাকালো ওর দিকে।

মৃদু গলায় বললো, আপনাকে ভালবাসার কথা কোনদিন ভুলেও ভাবিনি আমি।

কোনদিনও না জাহানারা? কাতর কণ্ঠে শুধালো সে।

কিন্তু কেন, কেন বলতে পার? সহসা তার কণ্ঠস্বর দৃঢ় শোনালো। সামনে ঝুঁকে পড়ে কাসেদ বললো, যাকে এত কাছে ঠাঁই দিয়েছো, তাকে আরো কাছে টেনে নিতে এত ভয় কিসের?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়? আমি তো ভয়ের কথা বলিনি।

তবে কেন তুমি ভালবাসবে না আমায়?

ভালো লাগে না বলে।

সহসা সুরেলা কণ্ঠে হেসে উঠল জাহানারা।

না জাহানারা নয়, শিউলি। শিউলি হাসছে এখনো, আপনি মনে মনে এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলছিলেন কাসেদ সাহেব? শিউলি শুধালো।

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো, কই, নাতো। আপনি কি করে বুঝলেন কথা বলছি।

আমি সব বুঝি। আস্তে করে বললো সে। বলে অন্য একটা টেবিলে সরে গেল সে।

মিলি তার ব্যাগ থেকে কাঁটা আর উল বের করে আপন মনে মোজা বুনছে। কাসেদের চোখে চোখ পড়তে মৃদু গলায় বললো, মেয়ের জন্য।

আপনার মেয়ে আছে বুঝি? বোকার মত প্রশ্ন করে বসলো কাসেদ।

মিলির মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো, হ্যাঁ বড্ড দুষ্টু। খালি পায়ে হেঁটে কেবল ঠাণ্ডা লাগায়।

আবার মোজা বোনায় মন দিলো মিলি।

কাসেদ নীরব।

এই একা বসে থাকতে বড় বিরক্তি লাগছে ওর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কাসেদ।

ওর দিকে চোখ পড়তে জাহানারা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো সামনে।

একি, আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?

বসে বসে আর কি করবো বলুন। জাহানারাকে চুপ থাকতে দেখে কাসেদ আবার বললো, কেন ডেকেছিলেন বললেন না তো?

ও হ্যাঁ, জাহানারা মৃদু হেসে বললো, আমি সেতার শিখবো ঠিক করেছি। একজন মাস্টার দেখে দিতে পারেন?

কাসেদ বোকার মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

এই বুঝি জাহানারার একান্ত প্রয়োজনীয় কথা? এরই জন্যে বাসায় যাওয়া আর অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকা।

কাসেদ হতাশ হলো।

জাহানারা বললো, চুপ করে রইলেন যে।

কাসেদ বললো, না ভাবছিলাম আপনার হঠাৎ সেতার শেখার সখ হলো কেন?

জাহানারা বললো, এমনি।

কাসেদ বললো, বেশ মাষ্টার না হয় আপনাকে ঠিক করে দেবো, কিন্তু– কিন্তু কি?

কিছুদিন পরে আবার ছেড়ে দেবেন না তো?

দেখুন, সারা দেহে দৃঢ়তা এনে জাহানারা বললো, আমি এক কথার মেয়ে।

কাসেদ মৃদু হেসে বললো, বেশ শুনে সুখী হলাম। এখন চলি তা'হলে। আবার দেখা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা বললো, যাবেন? আচ্ছা বলে আবার সেই ছেলেমেয়েদের জটলার দিকে এগিয়ে গেল সে।

কাসেদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, জন্মদিনের আসরে আগত ছেলেদের, মেয়েদের, বুড়ো বুড়ীদের। তারপর যখন সে বাইরে বেরুতে যাবে এমনি শিউলি পেছন থেকে ডাকলো। চলে যাচ্ছেন বুঝি?

কাসেদ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, হ্যাঁ।

শিউলে ঠোঁট কেটে বললো, যাবার আগে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া উচিত ছিলো তাই নয় কি?

কাসেদ লজ্জা পেলো। ইতস্ততঃ করে বললো, বড় ভুল হয়ে গেছে, আর আপনারাও সবাই কথা বলছিলেন কিনা, তাই। আচ্ছা এখন চলি।

দাঁড়ান। কাসেদকে অবাক করে দিয়ে শিউলি পরক্ষণে বললো, আমিও বাসায় ফিরবো ভাবছি। চলুন এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। দু'হাতে পরনের শাড়িটা আলতো করে গুটিয়ে নিলো শিউলি। খোঁপাটা দেখলো ঠিক আছে কিনা, তারপর কাসেদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো সে। কিছুদূর পথ ওরা নীরবে হেঁটে এলো পাশাপাশি। শিউলি কোথায় যাবে কাসেদ জানে না। কোথায় বাসা ওদের সে প্রশ্নও করে নি সে। শুধু জানে, জাহানারার কাজিন শিউলি।

শিউলি আজ বিকেলে ওর সঙ্গে পথ হাঁটছে।

আরো অনেক পথ পেরিয়ে এসে সহসা কাসেদ শুধালো, আপনি কোন দিকে যাবেন?

কেন, যেদিকে আপনি যাচ্ছেন। শিউলি নির্লিপ্ত।

কাসেদ ঢোক গিলে বললো, আমি এখন বাসায় যাবো।

বেশ তো চলুন না। দু'চোখে হাসি ছড়িয়ে শিউলি বললো, আমাকেও বাসায় ফিরতে হবে। একটুকাল থেমে সে আবার যোগ করলো, আপনাদের খুব কাছাকাছি থাকি।

কাসেদ অবাক হলো, তাই নাকি? কই, বলেন নি তো?

এইতো পরিচয় হলো, বলবার সুযোগ দিলেন কোথায়? শিউলে মুখ তুলে তাকালো ওর দিকে।

কাসেদ কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেলো।

ওরা তখন স্টেডিয়ামের কাছাকাছি এসে গেছে।

রাত নামছে ধীরে ধীরে।

বিজলী বাতিগুলো জ্বলছে মিটিমিটি।

চারপাশের দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে। খেলার মাঠের সামনেকার গোল চত্বরটিতে লোকজন বসে বসে গল্প করছে। খেলার গল্প। সিনেমার গল্প। আর মাঝে মাঝে চিনেবাদাম কিনে খাচ্ছে ওরা।

সহসা হেসে বললো শিউলি, আচ্ছা আমরা এভাবে হাঁটছি কেন বলুন তো?

একটা রিক্সা নিয়ে চলে গেলেই তো পারি।

একটু পরে একখানা রিক্সায় চড়ে বসলো ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে রিক্সায় চড়ার অভিজ্ঞতা ওর এই প্রথম। তাই বারবার অস্বস্তি বোধ করছিলো কাসেদ। কপালে মৃদু ঘাম জমছিলো এসে; বারবার ওর কাছ থেকে সরে বসার চেষ্টা করছিলো সে। ওর অবস্থা লক্ষ্য করে শিউলি ঠোঁট টিপে হাসলো, আপনি ভয় পাচ্ছেন বুঝি?

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো, কই, নাতো?

তাহলে অমন করছেন কেন?

না, এমনি। লজ্জা কাটিয়ে ওর সঙ্গে সহজ হবার চেষ্টা করলো কাসেদ।

আপনার বাবা বেঁচে আছেন?

আছেন।

মা?

আছেন।

বাবা কি করেন?

সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো শিউলি। অতসব জানতে চাইছেন কেন বলুন তো?

বিয়ের সম্বন্ধ পাঠাবার চিন্তা করছেন বুঝি?

শিউলি ঝুঁকে তাকালো ওর মুখের দিকে।

ওর কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হলো কাসেদ।

হঠাৎ সে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলো।

শিউলি আস্তে করে বললো, রাগ করলেন তো? করুন। এমনি সবাই আমার ওপর রাগ করে। আপনি অবশ্য ওদের সবার মত কিনা জানি না। ক্ষণকাল থেমে শিউলি আবার বললো, জানেন, আমি অনেক লোকের সঙ্গে মিশেছি। ওরা অনেকেই আপনার বয়েসি। কেউবা ছোট। কেউ আরো বড়ো। ওদের সঙ্গে বন্ধু হিসেবেই মিশতাম আমি। আপনি হয়তো বলবেন, এ দেশে পুরুষে মেয়েতে বন্ধুত্ব চলতে পারে না। আমি বলবো, ওটা ভুল। ওটা আপনাদের মনের সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এই যে আমরা দু'জন এক রিক্সায় চড়ে বাসায় ফিরছি। লোকে দেখে কত কিছুই না ভাবতে পারে। কিন্তু আমি জানি, আমাদের মনে কোন দুর্বলতা নেই।

কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

শান্ত শিশুর মত নীরবে শিউলির কথাগুলো শুনছে সে। গাল বেয়ে মৃদু ঘাম ঝরছে তার।

বড় রাস্তা পেরিয়ে রিক্সাটা গলির মধ্যে ঢুকলো।

শিউলি বললো, জানেন? ওরা কেউ আমার বন্ধুত্বের মূল্য দিতে পারে নি। কিছুদিন মেলামেশার পরেই ওদের ব্যবহার যেন কেমন পাল্টে যেতো। আমার চোখেমুখে চেহারায় কি যেন খুঁজে বেড়াতো ওরা। আমি দেখে ঠিক বুঝতে পারতাম না। তারপর– । বলতে গিয়ে আবার হেসে উঠলো শিউলি। তারপর যা আশঙ্কা করতাম তাই হতো। ওরা প্রেম নিবেদন করে বসতো আমায়। কি বিশ্রী ব্যাপার দেখুন তো। কাসেদের মুখের দিকে তাকালো শিউলি। ওর চেহারায় কি প্রতিক্রিয়া হলো তাই হয়তো লক্ষ্য করছিলো সে।

কাসেদ নীরব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, আপনার বয়স কত?

মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই। ওরা বিব্রত বোধ করে। কিন্তু শিউলির চোখেমুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেলো না। যেন এমনি প্রশ্নের সঙ্গে সে বহুদিন থেকে পরিচিত। বহুবার তাকে এর জবাব দিতে হয়েছে। তাই পরক্ষণে শিউলি বললো, অত্যন্ত সহজভাবেই বললো, বয়স জানতে চাইছেন কেন, ভাবছেন বুঝি আমি অল্প বয়সে পেকে গেছি?

কাসেদ বললো না, ঠিক তার উল্টো। বয়স হলে কি হবে আপনি আসলে এখনও বাচ্চা রয়ে গেছেন।

শিউলি মুহূর্ত কয়েক স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। যেন এর আগে এমনি উত্তর সে শোনে নি কোনদিন।

ওকে চুপ থাকতে দেখে কাসেদ জিজ্ঞেস করলো, চুপ করে গেলেন যে? কি ব্যাপার, রাগ করেন নি তো?

রাগ? অপূর্ব ভঙ্গি করে শিউলি জবাব দিলো, আপনি আমার কে যে আপনার উপর রাগ করবো?

কাসেদ বেশ বুঝতে পারলো, এ মেয়ের সঙ্গে কথা বলায় সে পেরে উঠবে না। তবু শিউলিকে ভাল ভাগলো ওর।

বেশ মেয়ে।

বড় সরল মেয়ে শিউলি।

কিছুক্ষণের পরিচয়ে বড় সহজ হয়ে এসেছে সে। যে কথাগুলো সকলকে বলা যায় না, তাও সে বলেছে ওকে।

জাহানারা যদি শিউলির মত হতো? কাসেদ ভাবলো নীরবে।

শিউলি বললো, আমার আর সব বন্ধুরা যদি আপনার মতো হতো তাহলে বড় ভালো হতো, তাই না কাসেদ সাহেব?

কাসেদ বললো, আমি আপনার বন্ধুদের কোনদিন দেখিনি সুতরাং তাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে পারছিনে। তবে, আমাকে কেন যে আপনি আদর্শ বন্ধু বলে ভাবছেন তাও ঠিক বুঝতে পারলাম না। একি আপনার উচিত হচ্ছে।

নিশ্চয়ই হচ্ছে। অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জবাব দিলো শিউলি। আজকাল আর মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। আপনাদের মত পুরুষের চোখের দিকে তাকালেই মনের ভাষা পড়ে নিতে পারি আমি। বুঝতে পারি, লোকটা কেমন।

শিউলি থামলো।

কাসেদ মৃদু হেসে বললো, অল্প বয়সে দেখছি অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার।

অভিজ্ঞতা কম বেশি সবারই হয়। শিউলি গম্ভীর গলায় জবাব দিলো। তবে কেউ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়, কেউ নেয় না।

আপনি কোন দলে?

শিউলি বলল, প্রথমোক্ত।

কাসেদ বলল, তাহলে নতুন কোন পুরুষের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব না করাই উচিত।

আস্তে ঠিক হলো না, শিউলি পরক্ষণেই বললো, বলুন, পুরুষটিকে যাচাই করে নিয়ে তারপর বন্ধু বানানো উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে যাচাই করেছেন কি?

অবশ্যই।

কখন করলেন?

আপনার অজান্তে। মুখ টিপে হাসল শিউলি। আমার বাসা এসে গেছে এখানে নামতে হবে আমায়।

রিক্সাটা থামিয়ে ছাই রঙের একটা দোতলা বাড়ির সামনে নেমে পড়লো শিউলি। বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালো সে। বললো, আবার দেখা হবে। সময় করে একবার আসুন আমাদের বাসায়। কাল কিম্বা পরশু।

কাসেদ সংক্ষেপে বলল, আসবো।

রিক্সা থেকে মুখ বের করে ওদের বাসাটা ভালো করে দেখে নিলো সে। দেখলো একটা বুড়ো দোতলার বারান্দায় নীরবে দেখছে ওদের।

বাসায় এসে একবার জাহানারা ও শিউলির কথা ভাবলো কাসেদ। দু'টি মেয়েতে কি আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

জাহানারাকে সে আজ অনেক দিন ধরে চেনে।

কতদিন সে গেছে ওদের বাসায়।

সেও এসেছে এখানে।

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছে ওরা, তর্ক করেছে ইকবালের দর্শন নিয়ে। রবি ঠাকুরের কবিতা নিয়ে।

মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত আলোচনার আশেপাশে এলেও গভীরে যায়নি কোনদিন। ইচ্ছে করেই যেন এড়িয়ে গেছে জাহানারা।

হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে টেবিলের উপর থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে বসলো কাসেদ। কবিতা লিখবে। বহুদিন কিছু লেখা হয় নি।

পাশের ঘরে ছোট খালুর সঙ্গে কথা বলছেন মা।

তাদের কথাগুলো এখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কাসেদ।

মা বললেন, ওদের দু'জনকে নিয়েই তো আমার যত দুশ্চিন্তা। নিজের জন্যে ভাবিনে। বুড়ো হয়ে গেছি। কাল বাদে পরশু একদিন কবরে যেতে হবে।

খালু বললেন, 'সব বুড়ো-বুড়িদেরই ওই এক চিন্তা বড়বু', ছেলেমেয়েদের একটা কিছু হিল্লে হোক। দু'পয়সা রুজি-রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াক ওরা। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি।

মা কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে হঠাৎ বললেন, নাহারের জন্যে একটা ছেলে দেখে দাও না। বয়স তো ওর কম হলো না।

খালু বললেন, 'আজকাল ছেলে পাওয়া বড় ঝকমারি বড়বু'। ম্যাট্রিক পাশ করা ছেলে, সেও আবার ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে চায়, বুঝলেন না?

মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অস্পষ্ট গলায় বললেন, মেয়ে আমার ম্যাট্রিক পাশ নয় সত্যি, কিন্তু ঘরকন্নায় ওকে কেই হার মানাতে পারবে না। ক্ষণকাল নীরব থেকে মা আবার বললেন, কি যে হয়েছে আজকাল কিছু বুঝিনে, আমাদের জামানায় লোকে দেখতো মেয়ে কেমন রান্নাবান্না করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে জামানা পুরোনো হয়ে গেছে বড়বু'। এখন লোকে লেখাপড়া না জানা বউ-এর কথা চিন্তাও করতে পারে না।

খালু থামলেন।

অনেকক্ষণ ওদের কোন কথাবার্তা শোনা গেল না।

হয়তো এখনো মনে মনে নাহারের কথা চিন্তা করছেন মা।

কাসেদের আপন বোন নয় নাহার।

মায়ের দূর সম্পর্কীয় এক খালাতো বোনের মেয়ে। ছোটবেলায় ওর মা মারা যান। ওর বাবা তখন কি একটা কোম্পানীতে চাকরি করতেন।

স্ত্রীকে হয়তো বড় ভালবাসতেন তিনি, তবুও কিছুদিন পরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মিলিটারীতে চলে যান। নাহারকে রেখে যান মায়ের কাছে। মাঝে মাঝে চিঠি আসতো।

কখনো মাদ্রাজ থেকে। কখনো পেশোয়ার থেকে। কখনো কানপুর।

শেষ চিঠি এসেছিলো আরাকান থেকে।

তারপর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

কেউ বলেছে যুদ্ধে মারা গেছে।

কেউ বলেছে, জাপানীরা ধরে নিয়ে গেছে টোকিওতে।

লড়াই শেষ হলো।

সন্ধি হলো শত্রু-মিত্রে।

তারপর আরো কত বছর গেলো নাহারের বাবা আর ফিরে এলেন না।

মা বলতেন, আমার কোন মেয়ে নেই, তুই আমার মেয়ে। তোকে মানুষ করে বড় ঘরে বিয়ে দেবো আমি। তোর ঘরের নাতি-পুতি দেখবো, তবে মরবো।

বাবা বলতেন, বেশ হলো, এতদিনে মেয়ের সখ মিটলো তোমার।

মা বলতেন, মিটবে না। খোদার কাছে কত কেঁদেছি, কত বলেছি আমায় একটা মেয়ে দাও। দেখলেতো, খোদার কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। তবু তুমি এক বেলা নামাজ পড় না। কেন পড় না বলতো? তোমার কি পরকালের একটুও ভয় হয় না?

আবার ইহকাল পরকাল নিয়ে এলে কেন বলতো? বাবা ক্ষেপে উঠতেন, বেশ তো কথা হচ্ছিলো।

মা ম্লান হেসে বলতেন, নামাজের নাম নিলেই তোমার গায়ে জ্বর আসে কেন বলতে পারো?

বাবা কিছু বলতেন না, শুধু সরোষ দৃষ্টিতে এক পলক তাকাতেন মায়ের দিকে। মা আফসোস করে বলতেন, তুমি আমাকে দোজখে না নিয়ে ছাড়বে না। বাবা নির্বিকার গলায় জবাব দিতেন, বেহেস্তের প্রতি অমার লোভ নেই। তোমার যদি থেকে থাকে তুমি যেও, আমি তোমার পথ আগলে দাঁড়াবো না। এরপর মা থেমে যেতেন, অবুঝ স্বামীর সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক তা তিনি ভালো করেই জানতেন।

সামনে খোলা খাতাটার দিকে চোখ পড়তেই কাসেদ বিব্রত বোধ করলো। কবিতা লিখতে বসে খাতার মধ্যে এতক্ষণ সব কি লিখছে সে? ইকবাল, জাহানারা, বিয়ে, নাহার, মিলিটারী, কানপুর, নামাজ, শিউলি। একটার পর একটা হিজিবিজি লেখা। সাদা কাগজটা আরো অনেক শব্দের ভারে ভরে উঠছে। খাতা থেকে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিলো কাসেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজার দিকে চোখ পড়তে দেখলো, নাহার দাঁড়িয়ে।

কি ব্যাপার কিছু বলবে?

নাহার বললো, মা ডাকছেন। বলে চলে গেল সে।

মা তখনো গল্প করছিলেন খালুর সঙ্গে। খালু একটা মোড়ার ওপর বসে। মা চৌকির ওপর পা ছড়িয়ে খালুর পান বানাচ্ছেন, আর কি যেন আলাপ করছেন।

নাহার একপাশে দাঁড়িয়ে।

কাসেদ আসতে মা বললেন, বস।

খালু বললেন, তুমি কি সেই কেরানীগিরির চাকরিটা এখনো আঁকড়ে রেখেছো নাকি?

কাসেদ সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ।

খালু বললেন, অন্য কোথায় ভালো দেখে একটা কিছু পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা-চরিত্র করো। এ দিয়ে কতদিন চলবে।

খালু নিজে এককালে কেরানী ছিলেন; তাই কেরানীগিরির বেদনা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

কাসেদকে চুপ থাকতে দেখে তিনি আবার বললেন, ধোপার গাধা আর কোম্পানীর অফিসের কেরানীর মধ্যে পার্থক্য নেই বুঝলে? এতে না আছে কোন রোজগার, না আছে সম্মান।

কাসেদ বললো, তিনজন মানুষ আমরা, এ রোজগারেই চলে যাবে।

টাকা টাকা করে, টাকা দিয়ে করবো কি?

মা বললেন, শোন, ছেলের কথা শোনো যেন সংসার এই থাকবে। ঘরে আর বউ ছেলে আসবে না। বলি তুই এমন হলি কি করে বলতো, তোর বাবা তো এমনটি ছিলেন না। কাসেদ কোন উত্তর দেবার আগেই খালু বললেন, 'এ নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না বড়বু'। মাথায় বোঝা চাপলে আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বলে পান খাওয়া দাঁতগুলো বের করে একগাল হাসলেন তিনি। নাহার হঠাৎ বললো, মা ভাত দেবো?

মা ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, তাইতো, কথায় কথায় দেখছি অনেক রাত হয়ে গেছে। যাও ভাত বেড়ে না ও, তোমার খালুও এখানে খাবেন।

খালু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না বড়বু, আমি বাসায় গিয়ে খাবো। ওরা সবাই বসে থাকবে।

মা হেসে বললেন, মেয়ে আসছে বেড়াতে, বাসায় নিশ্চয়ই খুব ভালো পাক-শাক হচ্ছে। আমাদের এখানে ডাল-ভাত কি আর মুখে রুচবে?

কি যে বলেন বড়বু, খালু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, বাসায় কি আর আমরাও কোর্মা পোলাও খাই, ডাল ভাত সব জায়গায়। এখন চলি, আরেক দিন এসে খেয়ে যাবো। যাবার উদ্যোগ করতে করতে আবার থেমে গেলেন খালু। কাসেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সালমা এসেছে ঢাকায়। বড়বু'কে বলে গেলাম রোববার দিন ওকে নিয়ে বাসায় এসো। কাসেদ অবাক হয়ে বললো, রোববার দিন কেন?

মা বললেন, তোমাদের দাওয়াত করে গেলেন উনি। নাতিনের আকিকা হবে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারলো না কাসেদ। যখন বুঝতে পারলো তখন আরো চিন্তিত হলো সে, সালমার মেয়ে হয়েছে নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা পরক্ষণে বললেন, ওমা তুই জানিসনে? বলতে গিয়ে কথাটা গলার মধ্যে আটকে গেলো তার। ঢোক গিলে আবার বললেন, আজ তিন মাস হতে চললো, তা তুই জানবি কোত্থেকে, আত্মীয়-স্বজন কারো খোঁজ কি তুই রাখিস। কি যে হলি বাবা।

খালু হেসে বললেন, ও কিছু না বড়বু। এ হলো কেরানী রোগ।

নিজে তো এককালে করেছি, বুঝি। ফাইল, কলম, আর বড় সাহেব ছাড়া দুনিয়াতে আর কারো কথা মনে থাকে না, সব ভুলে যেতে হয়।

আরেকটা পান মুখে পুরে দিয়ে একটু পরে বিদায় নিলেন খালু।

পাকঘরে বসে খাওয়ার আয়োজন করছে নাহার।

মা কলতলায় বসে বসে অজু করছেন। এশার নামাজ না পড়ে ভাত মুখে দেন না তিনি।

কাসেদ তখনো মায়ের বিছানায় বসে।

নীরব।

নীরবে ভাবছে সে।

কি আশ্চর্য, সালমা মা হয়েছে।

সেই সালমা–

পরনে কালো ডোরাকাটা ফ্রক। মাথায় সাপের মত সরু একজোড়া বিনুনী। পায়ে স্লিপার।

অপরিসর বারান্দায় রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে ওর চোখজোড়া দু'হাতে চেপে ধরলো কাসেদ।

এই কি হচ্ছে, হাতজোড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সালমা। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সে সহসা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, সেই কখন থেকে বসে আছি আর উনি এতক্ষণে এলেন।

ওর একটা বিনুনীতে টান মেরে কাসেদ বললো, এই তোকে একশো বার নিষেধ করে দিয়েছি না মিথ্যে কথা বলিসনে।

সালমা অবাক হয়ে বললো, বা-রে মিথ্যে কথা কই বললাম।

এই তো বললি।

কই, কখন?

এইতো একটু আগে।

ইস, উনি বললেই হলো, ঠোঁট উল্টে মুখ ভেংচালো সালমা।

ওর বেণী জোড়া ধরে আবার টান দিলো কাসেদ, বসে আছি বললি কেন, তুই তো আসলে দাঁড়িয়েছিলি।

চুলে টান পড়ায় যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো সালমা। তারপর চিৎকার করে উঠে বললো, বলবো, একশোবার মিথ্যে কথা বলবো আমি। তাতে তোর কি শুনি।

কাসেদ ক্ষেপে গিয়ে ওর মাথাটা রেলিঙের সঙ্গে ঠুকে দিয়ে বললো, তুই করে বললি কেন রে, আমি কি তোর ছোট না বড়?

সালমা ততক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে কাঁদতে দেখে কাসেদ বিব্রতবোধ করলো। বার কয়েক হাফপ্যান্টে হাত মুছলো সে। তারপর কাছে এসে দাঁড়িয়ে কোমল গলায় বললো, লেগেছে না-রে?

সালমা কোনো জবাব দিলো না।

একটু পরে ওর পিঠের উপর ভয়ে ভয়ে একখানা হাত রেখে কাসেদ শুধালো, পার্কে যাবি না?

এক ঝটকায় ওর হাতখানা দূরে সরিয়ে দিলো সালমা।

কাসেদ আবার রেগে গিয়ে বললো, এই এক দুই করে আমি দশ পর্যন্ত গুনবো; এর মধ্যে যদি তুই না যাস তাহলে আমি চললাম। বলে জোরে জোরে এক দুই গুনতে শুরু করলো সে। ন'য়ে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো কাসেদ। সালমা তখনো কাঁদছে।

কাসেদকে চুপ করে থাকতে দেখে একবার শুধু আড়চোখে তাকালো সালমা।

কাসেদ অতি কষ্টে দশ উচ্চারণ করলো; কিন্তু সঙ্গে বললো; দেখ তোকে পনেরো পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দিলাম। এবার কিন্তু একটুও নড়চড় হবে না। বলে আবার গুনতে শুরু করলো সে।

পনেরো বলার পূর্ব মুহূর্তে সালমা চিৎকার করে উঠলো, তুই আমাকে মেরেছিস কেন?

কাসেদ হেসে দিয়ে বললো, আর মারবো না, চল।

ডান হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো সালমা। তারপর ফিক্ করে হেসে দিয়ে বললো, আজ কিন্তু আমাকে দোলনায় চড়াতে হবে।

আর একদিন।

তখন ফ্রক ছেড়ে সালওয়ার পায়জামা ধরেছে সালমা।

বয়স বেড়েছে। হয়তো পনেরো কিম্বা ষোল।

ঘুটঘুটে সন্ধ্যা। আকাশে অসংখ্য মেঘের ভিড়। এই বুঝি বৃষ্টি এলো। কাঠের সিঁড়িগুলো বেয়ে উপরে উঠে এসে কাসেদ দেখলো, বাসায় কেউ নেই। শুধু সালমা ড্রয়িং রুমে একখানা চৌকির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে কি একটা পত্রিকা পড়ছে।

কে কাসেদ ভাই, এই সন্ধ্যাবেলা কোত্থেকে?

মহাবিদ্যালয় মানে কলেজ থেকে, বাসায় কি কেউ নেই?

না, ওরা সবাই সিনেমায় গেছে।

তুমি যাওনি?

যাইনি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। পত্রিকাটা বন্ধ করে উঠে বসে সালমা বললো, শরীরটা সেই সকাল থেকে ভালো নেই।

কেন, কি হয়েছে? ওর সামনে চৌকিতে এসে বসলো কাসেদ।

সালমা বললো, অসুখ করেছে।

কি অসুখ?

সালমা ফিক্ করে হেসে দিলো এবার যান, অতো কথার জবাব দিতে পারবো না। একটা কিছু পেলেই হলো, অমনি সেটা নিয়ে প্রশ্ন আর প্রশ্ন। কি বিশ্রী স্বভাব আপনার। কাসেদ গম্ভীর হয়ে গেলো। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বিশ্রী স্বভাব দিয়ে তোমায় আর ব্যতিব্যস্ত করবো না, চলি এবার।

মুহূর্তে ওর পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো সালমা। যাবেন কি করে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক, তাতে তোমার কি?

সালমা মুখ টিপে হাসলো একটুখানি। তারপর বললো, ইস, এত রাগ নিয়ে আপনি চলেন কি করে।

সহসা ওর খোলা চুলের গোছা ধরে একটা জোরে টান মারলো কাসেদ। রাগে ফেটে পড়ে বললো, ফাজিল মেয়ে কোথাকার। ইয়ার্কির আর জায়গা পাও না, তাই না?

সালমার মুখখানা ম্লান হয়ে গেলো। দেখতে না দেখতে চোখজোড়া পানিতে টলমল করে উঠলো ওর। সামনে থেকে সরে গিয়ে নিঃশব্দে আবার কৌচের উপরে বসলো সে। পরক্ষণে ডুকরে কেঁদে উঠলো সালমা, আমি এমন কি করেছি যে, আপনি সব সময় আমার সঙ্গে অমন দুর্ব্যবহার করেন?

চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ালো কাসেদ।

সালমা কাঁদছে।

কৌচের ওপর উপুড় হয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে সে।

খোলা জানালা দিয়ে আসা বাতাসে নয়, কান্নার আবেগে দেহটা কাঁপছে তার।

খোলা চুলগুলো পিঠময় ছড়ানো।

ধীরে ধীরে ওর পাশে এসে বসলো কাসেদ।

সালমা, সে ডাকলো ভয়ে ভয়ে।

সালমা কোনো উত্তর দিলো না।

ওর মাথার উপর আস্তে করে একখানা হাত রাখলো সে। সালমা। সহসা উঠে বসলো সালমা। তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো এক পলক ওর দিকে। তারপর তীব্র বেগে ছুটে পাশের ঘরে চলে গেল সে।

কাসেদ ডাকলো, সালমা।

সালমা সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

তারপর আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না তার।

সেদিন অনেকক্ষণ একা ঘরে বসেছিলো কাসেদ। ভেবেছিলো হয়তো এক সময় রাগ পড়ে গেলে বাইরে আসবে সালমা।

সালমা আসেনি।

অন্যদিন।

খালুজী তখন বরিশালে বদলী হয়ে গেছেন।

সালমা কলেজে পড়ে।

অফিসের কি একটা কাজে বরিশাল যেতে হলো তাকে।

তিন দিন ছিলো।

যেদিন রাতে সে চলে আসবে সেদিন সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়া হলো, কিন্তু সালমাকে আশেপাশে কোথাও খুঁজে পেল না।

খালাম্মাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, কি জানি কোথায় গেলো। বোধ হয় ছাদে, বলে বার কয়েক ওর নাম ধরে ডাকলেন তিনি।

কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ পরে ছাদে এসে কাসেদ দেখলো, সালমা দাঁড়িয়ে। ছাদের এক কোণে, চুপচাপ।

পরনের কালো শাড়িটা গাঢ় অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে তার। চুলগুলো এলো খোঁপা করা।

দূরে, স্টিমার ঘাটের দিকে তাকিয়ে কি যেন গুনগুন্ করছে সে।

হয়তো কোনো গানের কলি কিম্বা কোনো অপরিচিত সুর।

কাসেদ ডাকলো, সালমা।

সালমা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালো ওর দিকে। কিছু বললো না।

কাসেদ বললো, আমি যাচ্ছি সালমা।

সালমা পরক্ষণে বললো, যাবেন বৈ-কি, আপনাকে তো কেউ ধরে রাখে নি।

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো, না, তা নয়, তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম।

সালমা মৃদু গলায় বললো, বেশ বিদায় দিলাম।

কাসেদ চলে যাচ্ছিলো, সালমা পেছন থেকে ডাকলো তাকে, শুনুন, এখুনি কি যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

এত সকাল সকাল গিয়ে কি হবে।

সকাল কোথায়, স্টিমারের সময় হয়ে গেছে।

কে বললো, এখনো দু'ঘণ্টা বাকি।

বাজে কথা।

চলুন, ঘড়ি দেখবেন।

কাসেদের সঙ্গে নিচে নেমে এলো সালমা।

ড্রয়ার থেকে খালুজীর ঘড়িটা বের করে এনে দেখালো তাকে। বললো, আমার কথা বিশ্বাস করেন নি তো, এই দেখুন, এখন মাত্র ন'টা বাজে। স্টিমার ছাড়বে এগারোটার সময়।

ঘড়ি দেখে অবাক হলো কাসেদ। সেই কখন সন্ধ্যা হয়েছে; এতক্ষণে ন'টা। সালমা কোনো জবাব দিল না। ঘড়িটা আবার ড্রয়ারে রেখে দিলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপাটা খুলে চুলে চিরুনি বুলোতে লাগলো সে। সহসা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে শুধালো, যাবার জন্যে অমন হন্যে হয়ে উঠছেন কেন শুনি।

কাসেদ বললো, চিরকাল থাকবো বলে আসিনি নিশ্চয়। কাজে এসেছিলাম, সারা হলো, চলে যাচ্ছি।

চোখজোড়া বড় বড় করে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সালমা।

তারপর মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে মৃদু গলায় বললো, আপনাকে চিরকাল এখানে থাকতে বলছেই বা কে।

বললেও হয়তো আমি থাকতাম না।

নিজেকে আপনি কি ভাবেন বলুন তো? হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে উঠলো সালমা।

কাসেদ শান্ত স্বরে বললো, একজন অধম কেরানী।

কেরানীর অত দেমাক কেন?

কবি বলে।

সালমা চুপ করে গেলো। চিরুনিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। চুলগুলো আবার খোঁপায় বাঁধলো। বন্ধ জানালাটা খুলে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইলো সে। বাইরে আজ বৃষ্টি নেই। মেঘ নেই। আছে শুধু অন্ধকার। সীমাহীন অন্ধকারে ঢাকা দূরের দিগন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালা থেকে মুখখানা সরিয়ে নিয়ে এলো সালমা। চুপ করে বসে আছেন কেন, আপনার স্টিমারের সময় হয়ে গেছে। একটু পরে গিয়ে দেখবেন, ওটা আর ঘাটে নেই।

তা নিয়ে তোমার আর মাথা ঘামাতে হবে না। কাসেদ আস্তে করে বললো, স্টিমার ছাড়ার এখনো অনেক দেরি।

সালমা ম্লান হাসলো। তারপর ড্রয়ার থেকে ঘড়িটা বের করে এনে মৃদু গলায় বললো, ওটা আমি এক ঘণ্টা স্লো করে দিয়েছিলাম।

কেন?

আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাই। বলে সামনে থেকে সরে গেল সালমা।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আর এলো না।

মা, নামাজ পড়া শেষ করে এসে ছেলের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

হাতের তালুতে মুখ রেখে ওপাশের দেয়ালের কি যেন দেখছে সে।

চোখের মণিজোড়া স্থির নিষ্পলক।

কি রে ভাত খাবি না?

মায়ের ডাকে চোখের পলক নড়ে উঠলো তার। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তোমরা বসে পড় আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি।

একখানা মাদুরের ওপর পাশাপাশি দুটো থালা সাজানো। সামনে একটা বড় পেয়ালার মধ্যে তরকারি আর অন্য একটি থালায় বাড়তি ভাত ঢালা। নাহার এখন খাবে না।

ওদের দু'জনের খাওয়া হয়ে গেলে তারপর সে বসবে খেতে।

আজকে নয়। বহুদিন থেকে এই রীতি চলে আসছে তার।

যেদিন রাতে কাসেদের ফিরতে দেরি হয় সেদিন মা ঘুমিয়ে পড়লেও সে ঘুমোয় না। উঠে দরজাটা খুলে দেয়। সাবান, তোয়ালে আর পানির বদনাটা নিয়ে রেখে আসে কলতলায়। খাবারগুলো সাজিয়ে দেয় টেবিলের ওপর। তারপর যতক্ষণ কাসেদ খায় নাহার নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। মাঝে শুধু একবার জিজ্ঞেস করে, আর কিছু দেবো?

না।

সে চুপ।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে থালাবাসনগুলো নিয়ে কলতলায় চলে যায় সে।

কলতলায় পানি পড়ার শব্দ শোনা যায় অনেকক্ষণ ধরে।

আজ খেতে বসে মা শুধোলেন, কাল জাহানারা কেন এসেছিলো রে?

আবার জাহানারা!

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, এমনি।

মা বললেন, মেয়েটা বড় ভালো, লেখাপড়া শিখেছে তাই বলে নাক উঁচু নয়।

আস্তে আস্তে কথা বলে। চেহারাটাও বেশ মিষ্টি। ওর বাবা করে কিরে?

কাসেদ মুখ না তুলেই বললো, উকিল।

মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। নীরবে খাচ্ছেন তিনি। হয়তো কিছু ভাবছেন। এ মুহূর্তে তাঁর মনে কিসের ভাবনা রয়েছে তা ঠিক বলে দিতে পারে কাসেদ। ভাবছেন জাহানারার মত একটি মেয়েকে যদি বউ সাজিয়ে ঘরে আনা যেতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসে থাকাকালীন সময়টা মন্দ কাটে না কাসেদের।

কাজের চাপে তখন বাইরের দুনিয়ার কথা মনে থাকে না। এটা হলো ফাইল, টাইপ রাইটার, চিঠিপত্র আর কাগজ কলমের পৃথিবী। এখানে জাহানারা, শিউলি, সালমা, সেতার কিম্বা কবিতার প্রবেশ নিষেধ।

এখানকার প্রথম কথা হলো কাজ।

দ্বিতীয় কথা হলো তোয়াজ।

তৃতীয় কথা হলো ফাঁকি।

এ তিনের অপূর্ব মিশ্রণে অফিসের সময়টুকু বেশ কাটে ওর।

কর্মচারীর সংখ্যা নেহায়েৎ নগণ্য নয়।

বড় সাহেব আছেন একজন। সবার বড়। বয়স তাঁর ত্রিশের কোঠায়। সুন্দরী বউ আছে বাড়িতে আর একটি ফুটফুটে ছেলে। বড় সাহেব ভীষণ পরিশ্রমী। কাজ করে কখনো ক্লান্ত হন না তিনি। কাউকে অলসভাবে বসে থাকেত দেখলে ধমকে উঠেন, বলেন, এই জন্যে আমাদের জীবনে কিছু হলো না, হবেও না। এই যে দেখছেন অফিসের বড় কর্তা হয়ে বসেছি, গাড়ি, বাড়ি করেছি, এগুলি নিশ্চয় খোদা আকাশ থেকে ফেলে দেননি, এর জন্যে অসুরের মত খাটতে হয়েছে আমায়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে না বলে থেমে যান সাহেব। পরিমিত হাসেন। সে হাসির অর্থ ধরে বাকি কথাটা বুঝে নিতে হয়।

বড় সাহেবের পরে যার স্থান তিনি পঞ্চাশোর্ধ বৃদ্ধ। সামনের কয়েকটা দাঁত ঝরে গেছে বহু আগে। যত কাজ করেন তার দিগুণ পান খান, আর তার চেয়েও অনেক বেশি কথা বলেন। কথা না বললে নাকি তার কাজের মুড় আসে না। গৃহী মানুষ। এই বৃদ্ধ বয়সেও বিরাট পরিবারের ভার বহন করে চলেছেন। ছেলেমেয়েদের সংখ্যা নেহায়েৎ নগণ্য নয়, তার ওপর নাতিনাতনী আছে অনেক।

বুড়ো মকবুল সাহেবের পাশে যার আসন তিনি টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত। একাউন্‌টেন্ট নওশের আলী এখনো বিয়ে করেন নি। করবেন বলে ভাবছেন। রোজ ভাবেন। কিন্তু টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেবও মিলছে না আর তাঁর বিয়ে করাও হয়ে উঠছে না। এরপর, কাসেদকে বাদ দিলে আরো চারটে প্রাণী আছে অফিসে। প্রথম দু'জন কেরানী, কাসেদের সমগোত্রীয়। এক গোয়ালের গরু নাকি এক সঙ্গে ঘাস খায় না। এক গোত্রীয় মানুষগুলোর পক্ষেও একতালে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই, তিন কেরানীর মধ্যে কথাবার্তা খুব কম হয়। মেলামেশা তার চেয়েও কম।

একটি দারোয়ান। খোদাবক্স তার নাম। পশ্চিমে বাড়ি ছিল তার, বিহার কিম্বা উড়িষ্যায়। দেশ বিভাগের পর পূর্ব দেশে হিজরত করেছে। সঙ্গে এসেছে দু'টি বউ আর একটা রামপুরী ছাগল। অফিসের পাশেই ওরা থাকে। সারাদিন কলহ করে ডাল-রুটি আর স্বামী সোহাগ নিয়ে। খোদা বক্স নির্লিপ্ত পুরুষ। নীরবে বসে বসে গোঁফের ডগা জোড়া মসৃণ করে আর খইনি খায়।

আজ অফিসে ঢুকবার পথে খোদাবক্স টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সালাম ঠুকলো তাকে। কাসেদ বুঝতে পারলো ও কিছু বলতে চায়। কেমন আছো খোদাবক্স, কিছু বলবে?

খোদাবক্স বিনয়ের সঙ্গে শুধালো, মেরা দরখাস্ত কা কুচ হুয়া সাহেব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুদিন আগে বেতন বাড়াবার জন্যে বড় সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলো সে। দু'টি বউ আর এক ছাগলের সংসার পঞ্চাশ টাকায় চলে না তাই লিখে জানিয়েছিলো।

কাসেদ মৃদু হেসে বললো, হবে হবে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো খোদা বক্স।

বড় সাহেব নিশ্চয় এবার তোমার বেতন বাড়িয়ে দেবেন। খোদা বক্স খুশি হয়ে আর একটা সালাম ঠুকলো। বললো, আপকা মেহেরবানী হুজুর।

কাসেদ ওকে শুধরে দিলে বললো, আমায় নয়, বড় সাহেবেরে বলো। বলে ভেতরে চলে এলো সে।

বড় সাহেব ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন। রুমে বসে দু'নম্বর কেরানীর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি।

নওশের আলী ফাইলে মুখ ঢুকিয়ে হিসেব নিয়ে ব্যস্ত।

মকবুল সাহেব মুখের মধ্যে একজোড়া পান গুঁজে দিয়ে বললেন, এই যে, তিন নম্বর কেরানী আপনি তিন মিনিট লেট করে এসেছেন, ঘড়ি দেখুন।

কারো ওপর রাগ করলে তার নাম নিতে ভুলে যান তিনি, মনগড়া কতগুলো নম্বর ধরে সম্বোধন করেন। এতে রাগ করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও কেউ কিছু মনে করে না, বলে–লোকটার মাথায় ছিট আছে। কাসেদ ঘড়ি দেখলো সত্যি সে তিন মিনিট লেট।

কিছু না বলে চুপচাপ তার চেয়ারটায় গিয়ে বসলো কাসেদ। ফাইলগুলো টেনে নিলো সামনে। ওপরের ফাইলটার এককোণে টানা হাতে লেখা একটা নাম–'জাহানারা'।

কোন অসতর্ক মুহূর্তে হয়তো লিখে রেখেছিলো সে।

কলমটা তুলে নিয়ে সাবধানে নামটা কালি দিয়ে ঢেকে দিলো সে।

চারপাশে তাকালো এক পলক।

মকবুল সাহেব এখনো তার তিন মিনিট লেট হওয়া নিয়ে চাপা স্বরে রাগ প্রকাশ করছেন। হঠাৎ ছাতার কথা মনে পড়ে গেল কাসেদের। নিজের টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে বললো, মকবুল সাহেব, আমার ছাতাটা?

প্রথমে ওর দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন মকবুল সাহেব, সহসা লজ্জা পেয়ে বললেন, এই দেখুন আপনার ছাতাটা আনতে গিয়ে রোজ ভুলে যাই। আপনি এক অদ্ভুত লোক তো সাহেব, অফিস থেকে যাবার সময় আমায় একটু মনে করিয়ে দিলে পারেন।

কাসেদ আস্তে করে বললো, কি করব বলুন, আমিও ভুলে যাই।

মকবুল সাহেব তাঁর পান-খাওয়া দাঁতগুলো বের করে হাসলেন। বললেন, বেশ লোক তো আপনি, বলে একটুখানি থামলেন তিনি, থেমে বললেন, আজ বিকেলে মনে করিয়ে দেবেন ; কাল নিশ্চয় নিয়ে আসবো।

ফাইলগুলো খুলে কাজে মন দিলো কাসেদ। অনেকগুলো চিঠি টাইপ করতে হবে আজ।

তারপর বড় সাহেবের স্বাক্ষর নিয়ে সেগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে বিভিন্ন কোম্পানীর অফিসে। পিয়ন-বইতে নাম, ঠিকানা সব তুলে রাখতে হবে।

কাসেদ সাহেব।

জী।

এক কাজ করুন না, আজ অফিস ছুটি হলে আমার সঙ্গে চলে আসুন বাসায়। ছাতাটা নিয়ে যাবেন। গোল কৌটোটা খুলে আর একটা পান বের করলেন মকবুল সাহেব।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাসেদ আস্তে করে বললো, আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে।

আজ নতুন নয়। এর আগেও অনেকবার তাকে বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মকবুল সাহেব। আজ যাবো কাল যাবো করে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। লোকে বলে, বাসায় নেমন্তন্ন করার পেছনে নাকি কন্যাদায় মুক্ত হওয়ার একটা গোপন আকুতি রয়েছে।

কথাটা সত্য কি মিথ্যে কাসেদ জানে না।

শুধু এই জানে, বিবাহযোগ্য তিনটি মেয়ে রয়েছে তাঁর। তাদের বিয়ে দিতে হবে। বিত্তশালী পাত্রের কল্পনা নেই, চলনসই হলেই হলো। ওদের কথা মাঝে মাঝে আলোচনা করেন মকবুল সাহেব। তখন তাকিয়ে দেখলে হঠাৎ করে মনে হয় ভদ্রলোকের বয়স আরো বেড়ে গেছে।

চোয়ালের হাড়জোড়া আরো উঁচু। দু'চোখ আরো কোটরাগত। বৃদ্ধ কেরানী সহসা মুমূর্ষু রোগীর মত হয়ে যায়।

একবার এই অফিসের একটি ছেলেকে নাকি জামাতা বানাবার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন তিনি।

বড় মেয়েটির সঙ্গে বিশেষ ভাবও জন্মে গিয়েছিলো ছেলেটির।

কিন্তু বিয়ে হলো না।

ছেলেটি রাজী হলো না বিয়ে করতে।

কেন?

কেউ জানে না।

শুধু জানে, ছেলেটি নাকি মকবুল সাহেবের কাছ থেকে কিছু নগদ কড়ি দাবি করেছিলো।

মকবুল সাহেব রাজী হন নি বরং ক্ষেপে গিয়ে বড় সাহেবকে ধরে কনিষ্ঠ কেরানীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

তারই জায়গায় পরে কাসেদকে নেয়া হয়েছে।

মেশিনটা টেনে নিয়ে দ্রুত টাইপ করে চলল কাসেদ। অফিসে এখন সবাই চুপ।

টাইট-রাইটারের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

বড় সাহেব বার কয়েক টহল দিয়ে গেছেন। প্রত্যেকের টেবিলে এসে নীরবে দেখে গেছেন, কে কি করছে।

এখন তিনি ফিরে গেছেন তাঁর চেম্বারে।

কপারে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। পকেট থেকে রুমালটা বের করে ঘামগুলো মুছলো কাসেদ।

স্যার।

কিরে?

সাহেব ডেকেছেন আপনাকে?

মুখ তুলে বেয়ারাটার দিকে তাকালো কাসেদ।

সজাগ সাহেব বুঝি কিছু লক্ষ্য করে গেছেন কে জানে। সবার সামনে তিনি কাউকে কিছু বলেন না। নিজের চেম্বারে ডেকে বলেন। হয়তো মানুষের আত্মসম্মান বোধের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে, তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ মাঝে মাঝে অনেক কিছু ভাবে। কখনো তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কখনো যায় না। তবু তার ভাবনার শেষ হয় না।

দু'নম্বর কেরানীর টেবিল থেকে বড় সাহেবের চেম্বারে আসতে হলে মাত্র উনিশটি পদক্ষেপের প্রয়োজন। কিন্তু, এর মধ্যে আকাশ-পাতাল কত কিছুই না চিন্তা করেছে কাসেদ। চাকরীর প্রমোশন থেকে বরখাস্ত কোন কিছুই বাদ যায় নি।

বড় সাহেব এইমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছেন।

সামনে রাখা একটা গোটা বইয়ের উপর নীরবে চোখ বুলোচ্ছেন তিনি।

মুখ না তুলেই আস্তে করে বললেন, আপনার ফোন।

টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখা রিসিভারটার দিকে তাকালো কাসেদ।

সহসা বুঝতে পারল না এ সময় কে ফোন করতে পারে তাকে।

হ্যালো।

হ্যালো– অন্য প্রান্ত থেকে মিহি কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো।

বিব্রত কাসেদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। আড়চোখে একবার এক পলক তাকালো বড় সাহেবের দিকে। তিনি নির্লিপ্ত।

হ্যালো, আপনি কে বলছেন? সাহস সঞ্চয় করে মহিলার নাম জানতে চাইলো সে।

অন্য পক্ষের হাসির শব্দ শোনা গেলো। আমাকে চিনতে পারছেন না বুঝি?

না, না-তো।

একটু চিন্তা করুন, ঠিক চিনতে পারবেন।

রিসিভারটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো কাসেদ।

চিন্তা করলো, কিন্তু চিন্তা করে সময় সময় সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না। পেলেও সকল ক্ষেত্রে তা সত্য হয় না।

হ্যালো, অন্য পক্ষ আবার ডাকলো।

কাসেদ এবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাকে চান?

আপনাকে। মহিলা আবার হেসে উঠলেন।

আপনাকে? বলতে গিয়ে বার কয়েক ঢোক গিললো কাসেদ। কিন্তু কেন বলুন তো?

একটা কবিতা শোনাবার জন্য। শোনাবেন কি?

রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে কাসেদ। এ কার পাল্লায় পড়লো সে?

কিন্তু পরক্ষণে ওর মনে হলো, জাহানারা নয়তো?

হ্যালো, হ্যালো।

না, জাহানারার গলার স্বরটা কোন মতেই এত মিহি নয়। দু'একবার ফোনে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো কাসেদের। কখনো এমন তো মনে হয় নি।

হ্যালো, চুপ রইলেন যে?

চুপ না থেকে কি করবো বলুন।

বললাম তো একটা কবিতা আবৃত্তি করুন।

কাসেদ আরেক বার তাকালো বড় সাহেবের দিকে। মনে হলো তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ, কাজের সময় কোন মেয়ের সঙ্গে খুনসুটি করাটা তাঁর কাছে ভাল ঠেকছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যালো।

হ্যালো।

বলুন।

আমি শিউলি বলছি।

শিউলি। যার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিলো জাহানারাদের বাসায়, জন্মদিনের আসর থেকে এক সঙ্গে বাসায় ফিরেছিলো ওরা।

আপনি কোত্থেকে বলছেন?

কলেজ থেকে।

ক্লাস নেই বুঝি।

না।

তাহলে বসে বসে একটা কবিতার বই পড়লেই পারেন। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো কাসেদ।

বড় সাহেব এতক্ষণে মুখ তুলে এক পলক তাকালেন ওর দিকে। তাঁর চোখে বিরক্তি নেই। আছে কৌতূহল। যেন আলাপটা নীরবে উপভোগ করছিলেন তিনি। কান পেতে শুনছিলেন সব।

ফোনের ওপর হাত রেখে তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে কাসেদ। শিউলির সঙ্গে অমন অভদ্র ব্যবহার না করলেও পারতো সে। কে জানে কি ভাবছে। জাহানারার সঙ্গে দেখা হলে হয়তো সব কিছু খুলে বলবে সে। বলবে, তোমার কেরানী বন্ধুটিকে ভদ্রতা শিখতে বলো।

জাহানারা কি মনে করবে কে জানে। হয়তো খুশি হবে। বলবে কাসেদকে তুমি চেনো না শিউলি, তাই অতবড় অপবাদ দিতে পারলে।

ওর মত মানুষ হয় না।

কিম্বা জাহানারা রেগে যাবে। ভ্রূজোড়া বাঁকিয়ে বলবে, কেরানী তো, ভদ্রতা শিখবে কোত্থেকে।

না, জাহানারা অমন কথা বলতে পারে না। সে তার মনের মানুষ। তার মুখ দিয়ে অমন একটা রূঢ় মন্তব্য কল্পনা করতেও পারে না কাসেদ। কিন্তু ওর জন্যে একটা সেতারের মাস্টার এখনো ঠিক করা গেলো না। আজ বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথম কাজ হবে যে কোন একজন ভালো সেতারীর সঙ্গে আলাপ করা। লোকটার কার্তিকের মত চেহারা হলে চলবে না, তাকে বুড়ো হতে হবে কিম্বা কুৎসিত। জাহানারা হাসবে, হেসে লুটিয়ে পড়বে বিছানায়। মুখখানা বিকৃত করে বলবে, লোকটা দেখতে কেমন বিচ্ছিরি, তাই না? তোমার মত সুপুরুষ আর একটিও দেখলাম না জীবনে। এত রূপ তুমি কোথায় পেলে বল না গো।

দুলিচাঁদের কাছে লেখা চিঠিটা কি টাইপ করা হয়ে গেছে? জাহানারা নয়– বড় সাহেব।

হ্যাঁ, স্যার। ওটা তৈরি আছে, নিয়ে আসবো কি?

আমার প্রয়োজন নেই, পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করুন, আর শুনুন, আজ অফিস শেষে চট করে চলে যাবেন না। অনেক কাজ পড়ে আছে, সেগুলো শেষ করতে হবে, আমিও থাকবো এখানে। বলে, ক্ষয়ে যাওয়া সিগারেটটা ছাইদানীতে রেখে দিলেন বড় সাহেব। সামনে খুলে রাখা বইটির প্রতি আবার মনোযোগ দিলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ বিশেষ কিছু নেই তা জানতো কাসেদ।

এমনি হয়। অতীতেও হয়েছে।

অফিস ছুটি হয়ে যাবার পরেও নিজের চেম্বারে চুপচাপ বসে থাকে বড় সাহেব। কখনো বই পড়েন। কখনো চিঠিপত্র লেখেন বসে বসে। সব সময় একা একা ভালো লাগে না বলে মাঝে মাঝে অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে কোন একজনকে রেখে দেন সঙ্গে। কথা বলেন, এটা, সেটা কাজ করান। গল্প করেন, নিজের জীবনের গল্প। বাবা বড় গরিব ছিলেন। প্রাইমারি স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার। বেতন পেতেন মাসে পনেরো টাকা। তাও নিয়মিত নয়। ছোটবেলা কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে তাঁকে।

দূর গাঁয়ে জায়গীর থাকতেন বড় সাহেব। তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতেন। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে যেতো। তখন দু'পায়ে ব্যথা করতো ভীষণ।

পরের বাড়িতে ঠিকমত খাওয়া জুটতো না। বই কেনার পয়সাও ছিলো না তাঁর। সহপাঠিদের কাছ থেকে চেয়ে এনে পড়তেন। রাত জেগে পড়বার উপায় ছিলো না। ওতে তেল খরচ হয়। তেল কেনার টাকা কোথায়?

তবু কোনদিন দমে যাননি বড় সাহেব। হতাশা আসতো মাঝে মাঝে, তখন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতেন তিনি। কান্না পেতো, কাঁদতেন, চোখের পানি ধীরে ধীরে চোখেই শুকিয়ে যেতো।

কিন্তু কান্নারও শেষ আছে বুঝলেন? সামনে ঝুঁকে পড়ে বড় সাহেব বললেন, জীবনে এত কষ্ট করেছি বলেই তো সুখের মুখ দেখতে পেয়েছি। এখন আমার মতো সুখে ক'টি লোক আছে বলুন?

বড় সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা কাসেদের মনে হলো, সত্যি কি লোকটা সুখে আছে?

অফিসের লোকজন বলে, সুখে যদি থাকবে তাহলে এই কাঁচা বয়সে চুলে পাক ধরেছে কেন বলতে পারো।

এক নম্বর কেরানী বলে, চিন্তায় পেকেছে। মানুষ যত বড় হয়, ওদের চিন্তা তত বড়।

একাউন্টেন্ট বলেন, চিন্তা নয় দুশ্চিন্তা। তা হবে না কেন, ঘরের বউ যদি পরপুরুষের সঙ্গে হল্লা করে বেড়ায় তাহলে কার মন-মেজাজ ঠিক থাকে বলো।

বড় সাহেবের গিন্নীকে অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলো কাসেদ। সারা মুখে কৃত্রিমতা মেখে অফিসে এসেছিলেন তিনি, স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। দৈহিক লাবণ্যের প্রদর্শনী দেখিয়ে মহিলা সেই যে গেলেন আর আসেননি কোনদিন।

দারওয়ানকে দিয়ে চা-নাশতা আনলেন বড় সাহেব।

ইতিমধ্যে দু'-একখানা ফাইলও নাড়াচাড়া হলো।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সহসা বড় সাহেব শুধোলেন, ঢাকায় ফুচকা পাওয়া যায়?

কাসেদ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললো, যায় বই কি।

আপনি ফুচকা খান?

না।

খেয়েছেন কোনদিন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

আমি খেয়েছি। অনেক খেতাম ছোটবেলায়। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে বড় ভালো লাগতো।

বড় সাহেব চুপ করে গেলেন। আজকের বিত্তবান দিনগুলোর চেয়ে হয়তো ছেলেবেলাকার অনটনে ভরা, ফুচকা-খাওয়া দিনগুলোকে আজও অনেক প্রিয় বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

আশ্চর্য মানুষের মন। সে যে কখন কি চায় তা নিজেও বলতে পারে না। কিসে তার সুখ আর কিসে তার অসুখ এর সত্যিকার জবাব সে নিজেও দিতে পারে না কোনদিন।

জাহানারা, যদি কোনদিন সময় মেলে, তোমার মনের অর্গল তুমি খুলে দিয়ো আমার কাছে। তোমার অনেক চাওয়ার পাশে আমার অনেক পাওয়ার স্বপ্নগুলোকে থরেথরে সাজিয়ে নেবো। গরমিল চাইনে জীবনে, দেখছো না, মিলের অভাবে মানুষগুলো কেমন মরোমরো হয়ে আছে। এ তোমার ভুল ধারণা কাসেদ। জাহানারা আস্তে করে বললো, অভাবটা মিলের নয়, রঙের। আমাদের জীবনে রঙ নেই।

রঙ। রঙ সে আবার কি?

ওর প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলো জাহানারা। মুখখানা ঈষৎ হেলিয়ে বললো, এর কোনো আকার নেই। থাকলে, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতাম। আসলে ওটা একটা অনুভূতি যা মানুষের চেহারায় আনে উজ্জ্বলতা, মনে যোগায় আনন্দ, দেহকে দেয় উষ্ণতা আর প্রাণকে করে সজীব।

জাহানারার দু'চোখে তখন স্বপ্ন।

কি এক তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে।

চলুন, এবার ওঠা যাক। বড় সাহেব আস্তে করে বললেন।

কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ালো কাসেদ।

হয়তো সে অনেক বদলে গেছে।

এখন দেখলে আর সেই পুরনো মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ঘরে উঠে যাবার পথে ভাবলো কাসেদ।

বারান্দার এককোণে একটা মোড়ার উপর বসেছিলো সালমা। চুলগুলো পিঠের ওপরে ফেলে দিয়েছে সে। পরনে একখানা কালো পাড়ের মিহি শাড়ি সাদা জমিনের ওপর হলুদ সুতোর ফুল আঁকা। কানে, গলায়, হাতে অলঙ্কারের বোঝা। সালমা চোখ তুলে কিছুক্ষণ এক পলকে তাকিয়ে রইলো। সহসা কিছু বলতে পারলো না সে, ওর ঠোঁটের কোণে ধীরে ধীরে এক টুকরো মিষ্টি হাসি জেগে উঠলো। পরক্ষণে সারা মুখে সে হাসি ছড়িয়ে পড়লো, কাসেদ ভাই।

কাসেদ বললো, তোমাকে দেখতে এলাম সালমা।

সালমার মুখখানা অকারণে রাঙা হলো। উঠে দাঁড়িয়ে মোড়াটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল সে, বসো।

কাসেদ বসলো।

বাড়িতে আজ অনেক অতিথি এসেছে। ঘরে, বারান্দায় ছাদে ছড়িয়ে আছে ওরা। কথা বলছে, হাসছে, আলাপ করছে এটা-সেটা নিয়ে।

ব্যাপার কি, অনেক শুকিয়ে গেছ যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালমার কথার জবাবে কাসেদ কি বললো স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

সালমা আবার শুধালো, প্রেমে পড়নি তো?

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো, তার মানে?

মাথার চুলগুলো দু'হাতে খোঁপাবদ্ধ করতে করতে সালমা বললো, শুনেছি প্রেমে পড়লে নাকি লোক শুকিয়ে যায়।

ওসব বাজে কথা। প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য হয়তো, কাসেদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তোমার মেয়ে হয়েছে জানাওনি তো, একটা চিঠি লিখলেও তো পারতে।

সালমা বললো, জানাতাম, কয়েকবার ইচ্ছেও হয়েছিল লিখি, কিন্তু কি জানো, আজকাল বড় আলসে হয়ে গেছি। একখানি চিঠি লিখবো তাও লিখি লিখি করে হয়ে ওঠে না।

কাসেদ বললো, কুড়িতেই বুড়ি হয়ে গেলে মনে হচ্ছে।

সালমা বললো, বুড়ি হয়নি তো কি, ক'বছর পরে মেয়ে বিয়ে দেবো।

বলতে গিয়ে নিজেই হেসে দিলো সালমা, তুমি বস, আমি পলিকে নিয়ে আসি।

আলসে মেয়েটি চপল ভঙ্গি করে ঘরে চলে গেলো, একটু পরে আবার যখন সে সামনে এসে দাঁড়ালো তখন তার কোলে একটা ফুটফুটে মেয়ে।

সালমা বললো, দেখতে ঠিক ওর বাবার মত হয়েছে।

কাসেদ বললো, গায়ের রঙটাও।

সালমা বললো, চোখজোড়া কিন্তু আমার।

হবেও-বা। কাসেদ মৃদু গলায় বললো, নাম কি রেখেছো?

সালমা জবাব দিলো, পলি। ওর বাবার দেয়া নাম। তোমার নিশ্চয় পছন্দ হয় নি?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, না।

ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকা করে সালমা অপূর্ব কণ্ঠে শুধালো, তুমি হলে কি নাম রাখতে?

এসব বাতুল প্রশ্নের কোন মানে হয় না। কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

সালমা বললো, তবু বল না শুনি।

কাসেদ ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, তারপর বললো, কি নাম রাখতাম জানি না, তবে এ মুহূর্তে একটা নাম মনে পড়ছে আমার, বিপাশা, হয়তো তাই রাখতাম।

বিপাশা। বারকয়েক নামটা উচ্চারণ করলো সালমা। কি যে ভাবলো, ভেবে পরক্ষণে বললো, আমি ওকে বিপাশা নামেই ডাকবো।

এতে আমার আপত্তি আছে; ওর কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কাসেদ বললো, ওর বাবা যে নাম দিয়েছে সেই নামে তোমাকেও ডাকতে হবে। কাসেদের কণ্ঠে যেন ধমকের সুর। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো কাসেদ। পরিচিত একজন মহিলাকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেলো।

কাসেদের মনে হল যেন এর আগে কোথাও দেখেছে তাকে। মহিলার চাউনি দেখে মনে হলো, তিনিও যেন তাকে চিনতে পেরেছেন। সালমা বললো, ইনি মিসেস চৌধুরী। ওর স্বামী বিপাশার বাবার সঙ্গে এক সাথে কাজ করতো কুড়িগ্রামে। আর ইনি হলেন-

ওকে আমি চিনি। সালমাকে থামিয়ে দিয়ে মিসেস চৌধুরী অর্থপূর্ণ হাসি ছড়ালেন।

কাসেদ তখন স্মৃতির খাতায় মহিলার ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। সহসা শুধালো, আপনাকে এর আগে কোথায় যেন দেখেছি?

জী হ্যাঁ। মহিলা মৃদু হেসে বললেন, জাহানারাদের ওখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি ভাবতে হলো না মিসেস চৌধুরীর জন্যে। জাহানারাদের বাসায় আলাপ হওয়া মিলি চৌধুরীকে একটু পরেই খুঁজে পাওয়া গেলো।

মিলি চৌধুরী একটু শুধোলেন, ভালো আছেন তো?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, ভালো।

হঠাৎ কেন যেন সালমাকে গম্ভীর দেখালো। কাসেদের মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন আবিষ্কার করার চেষ্টায় মেতে উঠেছে সে।

মিলি বললেন, নতুন কিছু লিখলেন?

কাসেদ বললো, না।

আলাপ জমলো না। একটু পরে বারান্দা ছেড়ে ঘরে চলে গেলেন মিলি চৌধুরী। এখানে দু'জন নীরব।

নীরবতা গুঁড়িয়ে কাসেদ শুধালো, হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে যে?

না, এমনি। সালমা সহজ হতে চেষ্টা করলো, পলির চোখেমুখে আদর করলো সে। দু'হাতে দোলনার মত করে বার কয়েক দোলাল তাকে।

তারপর যতদূর সম্ভব সহজ গলায় শুধালো, জাহানারাটা কে?

জাহানারা? সহসা কিছু বলতে পারলো না কাসেদ। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিতে কিছুক্ষণ সময় লাগলো তার। একটু পরে বললো, জাহানারা আমার একজন বান্ধবীর নাম।

বান্ধবী না আর কিছু? কাসেদের চোখেমুখে কি যেন খুঁজছে সালমা।

ওর চোখের মণিজোড়া সহসা বড় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। সে হাসির কোন অর্থ আছে হয়তো, কিম্বা নেই।

কাসেদ শুধালো, বান্ধবীর অন্য কোন মানে আছে নাকি?

সালমা বললো, আগে ছিলো না। এখন আছে। আগের দিনে ছেলের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব হতো। মেয়েদের সঙ্গে মেয়ের। আজকাল ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্বের পালাটা বড় জোড়েশোরে শুরু হয়েছে।

তাতে কি এর অর্থগত রূপটা পাল্টেছে?

পাল্টেছে বই কি? সালমা দৃঢ় গলায় বললো, এখন তার অর্থ এক নয়, অনেক। বন্ধুর স্ত্রীকেও বলি বান্ধবী, নিজের স্ত্রীকেও বলি বান্ধবী। বন্ধুর প্রেমিকা, তাকেও ডাকি বান্ধবী বলে, আবার নিজের প্রেয়সী তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলি, বান্ধবী। সব বান্ধবী এক হলো নাকি?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সালমা।

কাসেদ নীরব।

ওকে চুপ থাকতে দেখে সালমা আবার শুধালো, তোমার বান্ধবীটি কোন্ শ্রেণীর জানতে পারি কি? বলতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে এলো সালমা। কয়েকগুচ্ছ চুল মাথার উপর থেকে গড়িয়ে এসে কপালে ঢলে পড়লো, চুলগুলো এখন বাতাসে দুলছে।

কাসেদ তখনো নীরব।

খানিকক্ষণ পরে নীরবতা ভেঙে সে বললো, তুমি যে কয়েকটি শ্রেণীর কথা বললে তার কোনটিতেই সে পড়ে না।

সামান্য জবাবটা দিতে এত দেরি হলো কেন? ভ্রূজোড়া বিস্তৃত করে আবার শুধালো সালমা।

সহসা রেগে উঠলো কাসেদ। তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করতে আমি আসিনি সালমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব আমার ভাল লাগে না। বলে উঠে দাঁড়ালো সে।

সে আমি জানি।। ম্লান গলায় আস্তে করে বললো সালমা। বলে মুখখানা কেন যেন অন্যদিকে সরিয়ে নিলো, সে হয়তো আড়াল করে নিলো কাসেদের কাছ থেকে। কাসেদ শুধু একবার ফিরে তাকাল, কিছু বললো না।

ঘরের ভেতর যেখানে ফরাস পেতে বুড়ো-বুড়িরা গল্পে মেতে উঠেছে সেখানে যাবার জন্যে পা বাড়ালো কাসেদ।

বুড়ো-বুড়িদের আলোচনার ধারা ভিন্ন রকমের।

এখানকার আলাপের প্রসঙ্গ অতি জাগতিক।

সোনা রুপোর দর কমলো কি বাড়লো।

কোন্ বাজারে ভালো তরি-তরকারি পাওয়া যায়।

কোন্ দোকানে সস্তায় জিনিসপত্র বিক্রি হয়।

কোথায় গেলে মেয়ের জন্য একটা ভালো পাত্র জোটার সম্ভাবনা আছে- এমনি সব আলোচনা।

কাসেদকে আসতে দেখে খালু বললেন, এসো বাবা, বোসো।

মা সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে।

খালা পান চিবোচ্ছিলেন বসে বসে। আঙ্গুলের ডগা থেকে একটুখানি চুন চুষে নিয়ে বললেন, তুমি এলে ভালই হলো, শোনো বাবা, তোমার খালুজী নাহারের জন্য একটা ভালো প্রস্তাব এনেছেন।

মা বললেন, ওকে খুলে বলো না সব। ওই তো এখন বিয়ে দেবার মালিক। খালু বললেন, শোনো বাবা, ছেলে তেমন কেউকেটা একটা কিছু নয়। আই-কম পর্যন্ত পড়ে, পরীক্ষা দিয়েছিলো, পাশ করেনি। এখন ইডেন বিল্ডিং-এ চাকরি করে। সোয়া শ' টাকা বেতন।

কাসেদ আবার জিজ্ঞেস করলো, পরীক্ষাটা আবার দেয়নি ক্যান?

দেয়নি নয়, দেবে, আবার দেবে। খালু জবাব দিলেন, ছেলে ভালো এতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘরের কোণে পানের পিক ফেলে এসে বললেন, এক মায়ের এক ছেলে, বাবা মারা গেছে ছেলেবেলায়। একা ঘর।

মা বললেন, কোন ঝামেলা নেই, নাহার সুখেই থাকবে।

কাসেদ কোন মন্তব্য করলো না।

কথার ফাঁকে সালমা এসে বসেছে একপাশে। একটু গম্ভীর। একটু যেন অন্যমনস্ক।

খালু বললেন, আজকাল মেয়ে বিয়ে দেবার মত ঝকমারী আর নেই বড়বু। যাদের টাকা আছে তারা টাকা-পয়সা নিয়ে ভালো ভালো ছেলে বেছে নেয়।

খালা বললেন, শুধু মেয়ে কেন, ছেলে বিয়ে দিতেও কি কম ঝামেলা! একটা ভালো মেয়ে পাওয়া যায় না, আমাদের নজরুলের জন্য মেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম, যা-ও পাওয়া গেলো, ও খোদা মেয়ের বাবা সি. এস. পি., সি. এস. পি. করে পাগল। সি. এস. পি. ছাড়া মেয়ে বিয়ে দিবেন না।

মা বললেন, আগের দিনে লোকে বংশ দেখতো। এখন সি. এস. পি. ছাড়া দেখে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু বললেন, ও কিছু না বড়বু, যুগের হাওয়া। যেমন আদি যুগ, মধ্যযুগ, আর কলিযুগ আছে, তেমনি বিয়ের ব্যাপারেও কতগুলো যুগ রয়েছে। ডাক্তার যুগ, ইঞ্জিনিয়ার যুগ, সি. এস. পি. যুগ। এখন সি. এস. পি. যুগ চলছে। বলে শব্দ করে হেসে উঠলেন তিনি। অন্যমনস্ক সালমাও না হেসে পারলো না।

হাসলো সবাই।

খাওয়ার ডাক পড়ায় বৈবাহিক আলোচনা আর এগুলো না। আসর ছেড়ে সকলে উঠে পড়ল।

সালমা সামনে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললো, খাওয়ার টেবিলে তোমার পাশের চেয়ারটিতে আমি ছাড়া আর কাউকে বসতে দিয়ো না যেন, তুমি যাও, আমি বিপাশাকে বিছানায় রেখে আসি।

কাসেদ কিছু বলার আগেই সামনে থেকে সরে গেলো সালমা। সে শুধু বোকার মত তাকিয়ে রইলো ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

দিন কয়েক পরে অফিসে এসে শিউলির কাছ থেকে আরেকখানা টেলিফোন পেলো কাসেদ।

শিউলি বললো, আহ গলাটা চিনতে পারছেন তো?

কাসেদ জবাব দিলো, অবশ্যই পারছি।

শিউলি বললো, তাহলে শুনুন, আপনাকে কয়েকটা খবর দেবার আছে।

বাবা কুমিল্লায় বদলী হয়ে গেলেন।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখন বাসা ছাড়া পাখি।

তার মানে?

মানে এখন হোস্টেলে আছি।

হোস্টেলে?

জ্বী।

ওটা কি মুক্ত বিচরণ ভূমি নাকি?

কেন বলুন তো?

নিজেকে এইমাত্র বাসা ছাড়া পাখির সঙ্গে তুলনা করলেন কিনা, তাই।

ওই যা, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আপনি কবি মানুষ। টেলিফোনে মিহি হাসির শব্দ শোনা গেলো ওর। শিউলি হাসছে।

কাসেদ শুধালো, আপনার খবর বলা শেষ হলো?

শিউলি বললো, না আছে। হ্যালো, শুনুন, প্রত্যেক শুক্রবার আর রোববার আমাদের বাইরে বেরুতে দে'য়া হয়।

ভালো কথা, তারপর?

সামনের শুক্রবার আপনার কোন কাজ আছে কি?

আছে কি-না এখনো বলতে পারি নে।

না থাকলে আসুন না বিকেলের দিকে একটু বেড়ানো যাক।

কাসেদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, হঠাৎ বেড়াবার সাথী হিসেবে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিউলি পরক্ষণে জবাব দিলো, আপনাকে ভাল লাগে বলে। সেই পরিচিত শব্দে হেসে উঠলো সে।

কাসেদ বিব্রত বোধ করলো। রিসিভারটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে সরিয়ে নিয়ে আস্তে করে বললো, এবার রেখে দিই?

কেন, কথা বলতে বিরক্তিবোধ করছেন বুঝি?

না, তা নয়। কাসেদ ইতস্ততঃ করে বললো, অনেকক্ষণ ধরে ফোনটা আটকে রেখেছি কিনা।

বুঝলাম। শিউলি মৃদু গলায় বললো, ফোনটা কষ্ট পাচ্ছে, রেখে দিন। বলে আর দেরি করলো না সে। রিসিভারটা রাখার শব্দ শুনতে পেল সে।

দু'টার পর থেকে অফিসে আর কারো মন বসতে চায় না।

কখন চারটা বাজবে আর কখন তারা এই চেয়ার-টেবিল আর ফাইলের অরণ্য থেকে বেরিয়ে বাইরে মুক্ত আকাশের নিচে গিয়ে দাঁড়াবে সে চিন্তায় সবার মন উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে।

দুটো থেকে চারটের মাঝখানকার সময়টা তাই কাজের চেয়ে আলাপ-আলোচনা আর গল্প করেই কাটে বেশির ভাগ সময়।

এ সময় হেড ক্লার্কের পানের ডিবে দ্রুত ফুরিয়ে আসতে থাকে। হয়তো তাই কথা বলার মাত্রা বেড়ে যায়। মেজাজ রুক্ষ থাকলে সকলকে গাল দেয়। প্রসন্ন থাকলে সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে। সকলের কুশল জিজ্ঞেস করে। আজ বিকেলে অফিস থেকে বেরুবার আগে হেড ক্লার্ক বললেন, আজ আপনি আমার বাসায় যাবেন কাসেদ সাহেব, আপনার ছাতাটা নিয়ে আসবেন। শুনছেন?

কাসেদ বললো, আমি তো আপনার বাসা চিনি না।

চেনেন না, চিনে নেবেন। পান চিবুতে চিবুতে হেড ক্লার্ক আবার বললেন, চলুন না আমার সঙ্গে আজ যাবেন বাসায়। বিকেলে বিশেষ কারো সঙ্গে কোন এনগেজমেন্ট নেই তো? শেষের কথাটার ওপর যেন তিনি বিশেষ জোর দিলেন।

কাসেদ মুখ তুলে তাকালেন ওর দিকে। হেড ক্লার্কের কথা বলার ভঙ্গীটা ভালো লাগলো না ওর। ভেবেছিলো চুপ করে যাবে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু বাড়াতে হলো, আমার বিশেষ কেউ আছে সেটা আপনি জানলেন কোত্থেকে?

আহা, রেগে গেলেন নাকি? হেড ক্লার্ক পরক্ষণে বললেন, কথাটা যদি বলেই থাকি এমন কি অন্যায় করেছি বলুন? এ বয়সে সবার বিশেষ কেউ একজন থেকে থাকে, আমাদেরও ছিলো। ক্ষণকাল থেমে আবার শুধোলেন তিনি, আপনার বুঝি কেউ নেই?

থাকলেই-বা আপনাকে বলতে যাবে কে? কাসেদের হয়ে জবাবটা দিলেন এক নম্বর কেরানী।

হেড ক্লার্ক সরোষ দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। তারপর বললেন, আপনাকে যে কাজটা করতে দিয়েছি ওটা হয়েছে?

এক নম্বর কেরানীর মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেলো।

হেড ক্লার্ক মুখে একটা পান তুলে দিয়ে বললেন, আগে কাজ শেষ করুন, তারপর কথা বলবেন।

ঘাড় নিচু করে কাজে মন দিলো এক নম্বর কেরানী।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেড ক্লার্ক চুপ।

কাসেদ নীরব।

দেয়ালে ঝুলান বড় ঘড়িটা শুধু আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে তার নির্দিষ্ট গতিতে।

আর কোন শব্দ নেই।

অফিস থেকে দু'জনে এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো ওরা।

দু'জন গম্ভীর।

রাস্তায় নেমে এসে কাসেদ প্রথমে কথা বললো, আপনি কি এখন সোজা বাসায় যাবেন?

গুমোট অবস্থাটা কেটে যাওয়ায় যেন খুশি হলেন ভদ্রলোক, অফিস থেকে বেরিয়ে আমি অন্য কোথাও যাইনে।

কাসেদ বললো, বেশ তাহলে চলুন আপনার বাসায় যাওয়া যাক।

বলে হেড ক্লার্কের মুখের দিকে তাকালো কাসেদ। তাঁর কোন ভাবান্তর হয়েছে কিনা লক্ষ্য করলো, কিন্তু কিছু বুঝা গেল না।

হেড ক্লার্ক মৃদু গলায় বললেন, বেশ তো চলুন। আপনার ছাতাটা- বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি, কথাটা শেষ করলেন না।

অফিস থেকে মকবুল সাহেবের বাসাটা বেশ দূরে নয়, তবু অনেক দূর। পল্টন থেকে লালবাগ।

মাসের শুরুতে বাসে চড়ে অফিসে আসেন তিনি। বাসে চড়ে বাসায় ফেরেন। মাসের শেষে বাস ছেড়ে পদাতিক হন। হেঁটে আসেন, হেঁটে যান। কিছুদূর এসে মকবুল সাহেব বললেন, আমি পারতপক্ষে বাসে চড়িনে বুঝলেন। ওতে বড় ভিড়, আমার মাথা ঘুরোয়। আগে রিক্সায় করে আসতাম যেতাম, কিন্তু ব্যাটারা এমন হুড়মুড় করে চালায়, দু'বার ট্রাকের নিচে পড়তে পড়তে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। সেই থেকে আর রিক্সায় চড়িনে। আজকাল শ্রীচরণ ভরসা করেছি। এতে কোরে বিকেল বেলায় বেড়ানোটাও হয়ে যায়।

কি বলেন?

তাকে সমর্থন জানাতে গিয়ে শুধু একটুখানি হাসলো কাসেদ, কিছু বললো না। কারণ কিছু বলতে গেলে বিকেল বেলায় বেড়ানোর চেয়ে টাকাকড়ির সমস্যাটা এসে পড়ে সবার আগে।

লালবাগে একটা সরু গলির ভেতরে একখানা আস্তর উঠা একতলা দালান, আর একটা দোচালা টিনের ঘর নিয়ে থাকেন মকবুল সাহেব। বড় পরিবার। ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি।

বাইরের একখানা ঘর বৈঠকখানা এবং স্কুল পড়ুয়া দুই ছেলের শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের চেয়ে ধুলোবালি আর আবর্জনার আধিপত্য সবার আগে চোখে পড়ে। জানালা দু'খানায় পর্দা সেই কবে লাগানো হয়েছে কে জানে। নিচের দিক থেকে কিসে যেন খেয়ে অর্ধেকটা করে ফেলেছে। বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে সেগুলো। আর কিছু নয়, শুধু ওই পর্দাগুলোর দিকে তাকালেই গৃহকর্তার দীনতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভেতরে ঢুকে একখানা চেয়ারে ওকে বসতে বললেন মকবুল সাহেব। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে পঞ্চাশোত্তর বৃদ্ধ এখন ক্লান্ত। কাসেদকে বসতে বলে নিজে একখানা চৌকির উপর বসে পড়লেন। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, বাড়িটা বিশেষ ভাল না। তবু, সেই পার্টিশানের পর থেকে আছি, একটা মায়া বসে গেছে। ছাড়ি ছাড়ি করেও ছাড়া যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের ঘরে তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে ভেতরে থেকে কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে জুটলো এ-ঘরে। কারো পরনে ময়লা ফ্রক, কারো পরনে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, কেউ-বা ন্যাংটা।

বুড়ো মকবুল উঠে গিয়ে তাদের দু'জনকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর চোখমুখে চিবুকে চুমু দিয়ে একগাল হেসে বললেন, এরা সব আমার নাতি নাতনি। বিকেলটা এদের নিয়ে কাটে আমার। বুড়োর চোখে-মুখে কি এক প্রশান্তি। এ মুহূর্তে যেন নিজের সকল দীনতা ভুলে গেছেন তিনি। চেয়ে দেখতে বেশ ভালো লাগছিলো কাসেদের। কিছুক্ষণের জন্যে হয়তো সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ নজরে এলো, জানালায় ঝোলানো আধখানা পর্দার ওপাশে একটি মেয়ে এদিকে পিছন করে আছে। কালো ঘন চুলগুলো তার পিঠময় ছড়ানো। গায়ের রংটাও কালো। চিকন হাত জোড়া দিয়ে চুলের অরণ্যে উকুন খুঁজছে সে। চেহারাটা ভাল করে দেখবার উপায় নেই। পাশ থেকে যেটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল নাকটা বেশ তীক্ষ্ণ আর চোখজোড়া বড় বড়।

মকবুল সাহেব তার নাতি নাতনিদের নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। বলে গেলেন, আপনি বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।

কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

জানালার পাশ থেকে চোখজোড়া সরে এসেছিলো, আবার সেদিকে তাকালো কাসেদ। মেয়েটি এখনো বসে আছে। মকবুল সাহেবের মেয়ে? হয়তো সবার বড়। কিম্বা মেজো, কিম্বা সেজো। বিকেল বেলার ম্লান আলোয় ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে সে। একটু পরে তাকে আর দেখা যাবে না। কালো মেয়ে সন্ধ্যার আলোতে হারিয়ে যাবে।

কাসেদ নিজেও জানে না, কখন সে জানালার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছিলো, ঔৎসুক্যে আনত দেহ সহসা সচকিত হলো। মনে মনে লজ্জা পেলো কাসেদ। একটা অপরিচিত মেয়েকে দেখার জন্যে অমন করছে কেন সে? এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারবে না। সে জানে মেয়েটাকে দেখতে তার ইচ্ছা করছে, ভালো লাগছে, সুন্দর লাগছে। অন্তত বিকেলের এই বিশেষ মুহূর্তটিতে। এ যে কাসেদ সাহেব, আপনাকে অনেকক্ষণ একা বসিয়ে রেখেছি, কিছু মনে করেন নি তো? মকবুল সাহেব এসে ঢুকলেন ভেতরে। পানে মুখখানা ভরে এসেছেন তিনি। হাতে একখানা ছাতা। ছাতাটার দিকে চোখ পড়তে কাসেদ চিনলো। তার ছাতা। কিন্তু যেমনটি ছিলো তেমনটি নেই। উপরে, নিচে, মাঝখানে অনেকগুলো ক্ষত। মকবুল সাহেব একবার ছাতা আর একবার কাসেদের মুখের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বললেন, ছাতাটা আপনাকে দেয়া গেলো না কাসেদ সাহেব, ওটা মেরামত করতে হবে।

কাসেদ পরক্ষণে বললো, ঠিক আছে, আমি নিজেই মেরামত করে নেবো।

মকবুল সাহেব বললেন, না, না, তা কেমন করে হয়। বলতে গিয়ে মুখখানা বিরক্তিতে ভরে এলো তার। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এই ছেলে পিলেদের নিয়ে আর পারা গেলো না। একটা জিনিস এদের জন্যে ঠিক থাকে না, এত মারধোর করি– সহসা দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন তিনি।

দরজার ঝুলান ময়লা পর্দাটা ঈষৎ নড়ে উঠলো।

কে যেন পাশে দাঁড়িয়ে।

অন্ধকারে তাকে ঠিক দেখা গেলো না।

চুড়ির আওয়াজ শুনে মনে হলো একটি মেয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো সেই মেয়েটি, যে একটু আগে আঙ্গিনার পাশে বসে বসে মাথায় উকুন খুঁজছিলো।

কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

মকবুল সাহেব হাতের ছাতাখানা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

পর্দার ওপাশ থেকে একখানা শীর্ণ হাত বেরিয়ে এলো সামনে। এক পেয়ালা চা আর একটা পিরিচে কিছু মিষ্টি।

হাতজোড়া সরে গেলো।

পর্দাটি ঈষৎ নড়ে উঠলো আবার।

কাপ আর পিরিচখানা সামনে নামিয়ে রাখলেন মকবুল সাহেব। বললেন, গরিবের বাসায় এসেছেন– কথাটা শেষ করলেন না তিনি। এ ধরনের কথা সাধারণত শেষ করা হয় না।

চায়ের কাপটা নীরবে সামনে টেনে নিলো কাসেদ।

চা খেয়ে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এলো তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে।

জাহানারাদের ওখানে অনেকদিন যাওয়া হয় নি।

আজ রাতে, এমনি রাতে একবার গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু জাহানারা সেতার শেখবার জন্যে একটা মাস্টার রাখার কথা বলেছিলো। গেলেই হয়তো প্রশ্ন করবে, কই আমার মাস্টার ঠিক করেন নি?

জবাবে কোন রকমের অজুহাত দেখানো যাবে না। বলা যাবে না, কাজের চাপ ছিলো কিম্বা সময় করে উঠতে পারিনি। তাহলে হয়তো অভিমান করে বসবে সে। বলবে, আমার জন্যে না হয় কাজের একটু ক্ষতিই হতো।

মেয়েরা এমনি হয়। তারা যাকে ভালবাসে তাকে বড় স্বার্থপরের মত ভালবাসে।

লালবাগের চৌরাস্তায় এসে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো কাসেদ। যাবে কি যাবে না।

রাস্তার মোড়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে একখানা চলন্ত বাসে উঠে পড়লো সে। বসবার জায়গা নেই। রড ধরে এখানেও দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাকে।

জাহানারাদের বুড়ো চাকরানীটা বারান্দায় বসে বসে কি যেন সেলাই করছিলো।

কাসেদকে দেখে একগাল হেসে বললো, আপা মাস্টারের কাছে সেতার শিখছে।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো কাসেদ। তাহলে জাহানারা কাসেদের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই একজনকে খুঁজে নিয়েছে। নিজেকে এ মুহূর্তেও বড় অপরাধী মনে হলো তার। কাসেদের জন্যে অপেক্ষা করে হয়তো হতাশ হয়ে পড়েছিলো জাহানারা। অবশেষে নিজেই একজনকে খুঁজে নিয়েছে।

ওকে চুপ থাকতে দেখে বুড়ো চাকরানীটা কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, তারপর মৃদু হেসে সেলাইয়ে মনোযোগ দিলো আবার।

বুড়ির সামনে সহসা অস্বস্তি বোধ করলো কাসেদ।

জাহানারার ঘর থেকে সেতারের টুং টাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর মৃদু হাসির শব্দ।

সেতার শিখতে বসে হাসছে জাহানারা। কেন?

সেতারের সঙ্গে হাসির কোন সম্পর্ক নেই।

দোড়গোড়ায় একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকে পড়লো কাসেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঝের উপর একখানা ফরাস পেতেছে জাহানারা। একপাশে একটা সেতার হাতে সে বসে; অন্য পাশে ফর্সা রঙের রোগা পাতলা একটি ছেলে। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা।

কাসেদ ভেতরে ঢুকতেই সেতারের ওপর ধরা হাতখানা সহসা থেমে গেলো। কাসেদের চোখের দিকে এক পলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো জাহানারা। তারপর হেসে দিয়ে বললো, আপনি? এতদিন আসেন নি যে?

কাসেদ সহসা কোন জবাব দিতে পারলো না। কিছু বলতে গিয়েও পাশে বসা ছেলেটির দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল সে।

জাহানারা বললো, উনি আমাকে সেতার শেখাচ্ছেন।

দু'জনে হাত তুলে আদাব বিনিময় করলো ওরা।

কাসেদ বললো, ওনার কথা আগেই শুনেছি।

জাহানারা কৌতূহলভরা চোখে তাকালো ওর দিকে, কার কাছ থেকে শুনেছেন?

কাসেদ বললো, বুড়ির কাছ থেকে।

জাহানারার সেতারের মাস্টার বললেন, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, তাহলে আমি এখন যাই। আপনাদের গুরুছাত্রীর সাধনায় অকারণ ব্যাঘাত সৃষ্টি করা উচিত নয়। ওর গলার স্বরে অসতর্ক অভিমান ঝরে পড়লো।

পরক্ষণে নিজেই সেটা বুঝতে পারলো কাসেদ। লজ্জায় দু'জনের কারো দিকে তাকাতে পারলো না সে।

জাহানারা স্থিরচোখে ওর দিকে তাকিয়ে। একটু আগে মৃদু হাসছিল সে, এখন তার লেশমাত্র নেই। মাস্টার বললেন, একটু বসে গেলেই পারেন। আপনার উপস্থিতি আমাদের কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। বলে হেসে উঠলেন তিনি।

হাসি নয়। এ যেন কাসেদকে বিদ্রুপ করা হলো।

জাহানারা অত্যন্ত শান্ত গলায় বললো, জানেন তো সাধনার সময় আশ-পাশের কারো অস্তিত্বের কথা সাধকের মনে থাকে না। আমরাও আপনার উপস্থিতির কথা ভুলে যাবো।

কি বলেন? বলে নতুন মাস্টারের দিকে তাকালো জাহানারা। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসলো। যেন অনেকদিনের চেনাজানা। অনেক কালের আপনজন।

কাসেদ বসলো নীরবে।

আজকের এই রাতে না এলেই ভালো হতো। কেন আসতে গেলো সে?

স্নেহ-প্রেম ভালবাসা এর মূল্য নেই।

এর কোন অর্থ নেই কেরানী জীবনে।

জাহানারা। এ কি করলে তুমি জাহানারা। যে তার হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তোমাকে ভালবাসলো তার কথা তুমি একটুও ভাবলে না। একটিবার স্মরণ করলে না তাকে যে গোপনে তোমাকে নিয়ে অশেষ স্বপ্ন এঁকেছে মনে মনে। দু'দিনের পরিচয়ে যাকে পেলে, তাকেই ভালবেসে ফেললে তুমি?

ভালো বলেই ওকে আমি ভালবেসেছি। জাহানারার গলার স্বর তীব্র এবং তীক্ষ্ণ শোনালো কানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ও যে ভালো এ কথা কেমন করে বুঝলে? ক'দিন ওর সঙ্গে মিশেছো তুমি? ওর কতটুকু তুমি জানো? ও একটা ঠগ হতে পারে, জোচ্চোর হতে পারে। তোমার ফুলের মতো পবিত্র জীবন নিয়ে হয়তো ছিনিমিনি খেলতে পারে সে।

যদি খেলেই তাতে আপনার কিবা এলো গেলো।

হয়তো কিছুই এসে যাবে না। কিন্তু জাহানারা, তুমি বাচ্চা খুকী নও, বোঝার মত বয়স হয়েছে তোমার। যে চরম সিদ্ধান্ত তুমি নিতে চলেছো, তার আগে কি একটুও ভাববে না, চিন্তা করবে না?

চিন্তা আমি করিনি সেকথা কেমন করে বুঝলেন? জাহানারা হাসলো।

হাসলে ওকে আরো সুন্দর দেখায়।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা বলতে পারলো না কাসেদ।

হঠাৎ সুর কেটে গেলো।

জাহানারা বললো, একি, সাধনা না হয় আমরা করছি। কিন্তু আপনি তন্ময় হয়ে আছেন কেন?

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, একটা কবিতার বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম।

ও, তাহলে আপনি কবিতার ভাবে মগ্ন ছিলেন। আমি ভাবছিলাম বুঝি সেতারের সুর শুনে।

মাস্টার সবিনয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাহলে এখন চলি?

জাহানারা ঘাড় দুলিয়ে বললো, কাল আসছেন তো?

হ্যাঁ, আসবো।

দেখবেন, আবার ভুলে যাবেন না যেন।

না, ভুলবো না।

আপনি সব ভুলে যান কিনা, তাই বললাম। মাস্টারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলো জাহানারা।

ও ফিরে এলে কাসেদ বললো, আমি চলি।

যাবার জন্যে অমন উতলা হয়ে গেলেন কেন? আপনি এসেছেন বলেই তো মাস্টারকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিলাম। জাহানারা মৃদু গলায় বললো, এখানে চুপটি করে বসুন। আমি দু'কাপ চা করে নিয়ে আসি। আমি না আসা পর্যন্ত যাবেন না যেন। শাসনের ভঙ্গিতে ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল জাহানারা।

ওর শেষ কথাগুলো মুহূর্তে শান্ত করে দিয়ে গেলো তাকে। তাহলে এতক্ষণ যা নিয়ে এত চিন্তা করছিলো সে, তার কোনটাই সত্য নয়।

কাসেদের সঙ্গে কথা বলবে বলে মাস্টারকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিয়েছে জাহানারা।

জাহানারা তুমি বড় ভালো মেয়ে। বড় লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। তাইতো তোমাকে এত ভাল লাগে। ভালবাসি।

দু'কাপ চা হাতে ওর সামনে এসে বসলো জাহানারা।

চা আনতে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে এসেছে সে।

শাড়িটা পালটেছে।

চুলে চিরুনি বুলিয়েছে কয়েক পোঁচ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাসেদ বললো, তাহলে সেতারের মাস্টার ঠিক করেই ফেললেন আপনি? আপনার অপেক্ষায় আর কতকাল বসে থাকবো। চায়ের কাপটা টেনে নিতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠলো কাসেদের।

বাইরে রাত।

ভেতরে দু'জন নীরবে বসে।

আশেপাশে কারো কোন সাড়া শব্দ নেই।

সমস্ত পৃথিবী যেন চুপ করে আড়ি পেতে আছে ওরা কি বলে শুনবার জন্য। কাসেদ বললো, আপনার আঙ্গুলে একটা কালো দাগ পড়ে গেছে।

জাহানারা বললো, সেতার শিখতে গেলে প্রথম প্রথম অমন হয় শুনেছি।

কাসেদ বললো, হুঁ।

আবার দু'জনে চুপ করে গেলো ওরা।

বাইরে তারা জ্বলছে, ভেতরে বাতি।

কাসেদ ভাবলো, জাহানারাকে মন খুলে আজ সব কিছু বললে কেমন হয়।

এখানে কেউ নেই।

এইতো সময়।

কাপটা মুখের কাছে এনে নামিয়ে রাখলো কাসেদ।

জাহানারা নীরবে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

সেও কিছু বলতে চায় ওকে।

সে বলুক। প্রথম সেই বলুক। কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

জাহানারা বললো, আপনি যেন আগের চেয়েও শুকিয়ে গেছেন।

কাসেদ বললো, মা-ও তাই বলেন।

হ্যাঁ, মা কেমন আছেন?

ভালো।

নাহার?

সেও ভালো।

আপনার শরীর কেমন?

মোটামুটি যাচ্ছে।

আবার নীরবতা। শূন্য চায়ের কাপ দুটো সামনে নামিয়ে রেখেছে ওরা। ওরা এখন মুখোমুখি বসে। জাহানারা জানালার দিকে তাকিয়ে। হয়তো আকাশ দেখছে কিম্বা আঁধারের আলো। কাসেদ দেখছে জাহানারাকে। ওর চোখ, ওর মুখ, ওর চিবুক।

কি সুন্দর।

আমাকে কিছু বললেন, জানালা থেকে চোখ সরিয়ে এনে ওর দিকে তাকালো জাহানারা।

কাসেদ অপ্রস্তুত গলায় বললো কই না নাতো।

জাহানারা মৃদু হাসলো। কিছু বললো না।

জাহানারা। আস্তে করে ওকে ডাকলো কাসেদ।

বলুন। চাপা স্বরে জবাব দিলো জাহানারা।

AMARBOI.COM

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এখন চলি।

সেকি, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন? অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো জাহানারা। যেন এমন কিছু একটু আগেও সে ভাবতে পারে নি। যেন এ সময় চলে যাওয়াটা কোনমতে বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

কাসেদ বললো, অনেকক্ষণ বসা হলো। আর কত?

জাহানারা আরো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর অস্পষ্ট গলায় বললো, আচ্ছা।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো সে। এ মুহূর্তে ওকে বড় দুর্বল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে শরীরটা যেন ক্লান্তির ভারে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। বাইরে বারান্দা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিলো জাহানারা।

আবার আসছেন তো?

আসবো।

বাইরে মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে একটা জোর শ্বাস নিলো কাসেদ।

দিন কয়েক পরে নিউ মার্কেটের মোড়ে শিউলির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো ওর। শিউলির পরনে বাদামী রঙের একখানা শাড়ি। চুলগুলো খোঁপায় বাঁধা। হাতে একটা কাপড়ের থলে।

আপনি বেশ মানুষ তো, অনুযোগ ভরা কণ্ঠে শিউলি বললো, এত করে বললাম শুক্রবার দিন গেটের সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। কই আপনি এলেন না তো? সারাটা বিকেল শুধু ঘর-বার করেছি। শিশুসুলভ হাসিতে সারা মুখ ভরে এলো তার।

কাসেদ আস্তে করে বললো, ভুলে গিয়েছিলাম ।

ভুলে তো যাবেনই। আমি আপনার কে যে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা আপনার মনে থাকবে। গলাটা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠলো তার।

শিউলির সঙ্গে পরিচয়ের পর এই প্রথম চমকে উঠলো কাসেদ। ওর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো সে। কি বলতে চায় শিউলি।

কি বলতে চায় সে?

সেই পুরোনো সুরে সহসা হেসে উঠলো শিউলি। আমার দিকে অমন করে চেয়ে থাকবেন না কিন্তু। সুন্দর চোখের চাউনি আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। কে বললো আমার চোখ দু'টি সুন্দর। কাসেদ তখনো ওর দিকে তাকিয়ে। হাতের ব্যাগটা সজোরে দুলিয়ে শিউলি বললো, শুধু কি সুন্দর, অদ্ভুত মায়াময় চোখ দুটো আপনার, দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

তাই নাকি? বলতে গিয়ে ঢোক গিললো কাসেদ।

শিউলি হাসছে।

সেই পুরনো হাসি।

রাস্তার মোড়ে একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে দেখে আশপাশের লোকজন আড়চোখে লক্ষ্য করছিলো ওদের। ওদের দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয় না কাসেদের।

শিউলিকে সজাগ করে দিয়ে কাসেদ বললো, আপনি সত্যি একেবারে ছেলে মানুষ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে অত জোরে হাসছেন কেন?

শিউলি হাসি থামিয়ে বললো, আপনি বুঝি চাপা হাসি পছন্দ করেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর বেশিদূর এগুতে ইচ্ছে করলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললো, মার্কেটিং করতে এসেছিলেন বুঝি?

শিউলি হাতের থলেটি দেখিয়ে বললো, হ্যাঁ।

এখন কি হোস্টেলে ফিরবেন?

ইচ্ছে তাই ছিলো কিন্তু এখন আর ফিরছি নে।

তাহলে কি করবেন? একটু অবাক হয়ে শিউলির দিকে তাকালো কাসেদ। শিউলি নির্বিকার গলায় বললো, আপনার সঙ্গে ঘুরবো, বেড়াবো, গল্প করবো। কাসেদ বিব্রত বোধ করলো। ইতস্তত করে বললো, কিন্তু আমি এক বন্ধুর বাসায় যাব ভাবছিলাম।

ঠিক আছে, সঙ্গে আমিও যাবো। শিউলি পরক্ষণে বললো, আপনার বন্ধুটি নিশ্চয়ই আমাকে বের করে দেবেন না।

না, তা কেন করবে, কিন্তু–

আপনার আপত্তি আছে এই তো। শিউলি মুখ টিপে হেসে বললো, বন্ধুর ওখান থেকে কোথায় যাবেন শুনি?

বাসায় ফিরবো।

বাহ্ কি মজা। হঠাৎ যেন হাততালি দিতে ইচ্ছে করলো শিউলির , আনন্দে আটখানা হয়ে বললো, আপনাদের বাসায়ও যাওয়া যাবে আজ। একবার চিনে আসি তো, তারপর আপনার সঙ্গে দেখা হোক না হোক বাসায় গিয়ে হামলা করবো।

কাসেদ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললো, তারচে এক কাজ করুন, হোস্টেলে ফিরে যান আজ। অন্যদিন নিয়ে যাব বাসায়।

মুখখানা কালো করে ওর দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলো শিউলি। অদ্ভুত করে একটুখানি হাসলো সে। ধীরে ধীরে বললো, কোন কিছুতে অতিমাত্রায় আগ্রহ দেখানোটা বোকামো। যাকগে, আপনার বাসায় যাবার স্পৃহা আমার আর নেই। চলি। হোস্টেলের দিকে পা বাড়ালো শিউলি। প্রথমে রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে গেলো কাসেদ। পর মুহূর্তে কয়েক পা এগিয়ে ডাকলো, এই যে শুনুন। শিউলি ফিরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বললো, কিছু বলার থাকলে বলুন। আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে। হাতজোড়া কোথায় রাখবে ভেবে না পেয়ে, একটা হাত নিজের চুলের মধ্যে বুলোতে বুলোতে আর অন্যটা দিয়ে শিউলির ব্যাগটা টেনে ধরে কাসেদ আস্তে করে বললো, বলছিলাম কি চলুন।

কোথায়? একটু অবাক হলো শিউলি।

কাসেদ বললো, কেন আমাদের বাসায়।

ওর মুখের দিকে আবারো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো শিউলি। একটা সুন্দর হাসির তরঙ্গ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, হেসে দিয়ে শিউলি বললো, এতক্ষণ এত ঢং করছিলেন কেন শুনি?

কাসেদ নিরুত্তর রইলো।

বাসায় এসে ওর বইপত্র খাতাগুলো ছড়িয়ে একাকার করলো শিউলি।

এক একটা করে খুললো, পড়লো, বন্ধ করে আবার খুললো সে।

হঠাৎ তালাবদ্ধ সুটকেসটার দিকে চোখ পড়লে বললো, দেখি, চাবিটা দেখি আপনার?

কাসেদ বললো, কেন চাবি দিয়ে কি করবেন আপনি?

সুটকেসটা খুলবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন?

খুলে দেখবো ওর মধ্যে কি আছে। শিউলির কণ্ঠস্বর আশ্চর্য নির্লিপ্ত।

কাসেদ বললো, না, ওটার চাবি আমি কাউকে দিই না।

ও, ভ্রূজোড়া বিস্তারিত করে ঈষৎ হাসলো। সামনে এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বললো, ওর মধ্যে প্রেমপত্রগুলো সব লুকিয়ে রেখেছেন বুঝি? তাহলে থাক।

ওসব কাউকে না দেখানোই ভালো। হাসতে হাসতে আবার টেবিলটার দিকে সরে গেলো শিউলি।

ও চলে গেলে মা শুধোলেন, মেয়েটি কে রে?

কাসেদ বললো, জাহানারার চাচাত বোন।

মা বললেন, ও তাই, গলার স্বরটা অনেকটা জাহানারার মত।

মেয়েটি কি করে?

কলেজে পড়ে।

এখানে বুঝি বাসা আছে ওদের।

না। ও হোস্টেলে থাকে।

মা তবু এত কথা জিজ্ঞেস করলেন, নাহার একটি কথাও জিজ্ঞেস করলো না। ওরা যখন ভেতরের ঘরে বসে কথা বলছিলো তখন নিজ হাতে চা বানিয়ে ওদের দিয়ে গেছে নাহার। আর কিছু লাগবে কিনা, কথা না বলে ইশারায় কাসেদকে প্রশ্ন করেছে। তারপর কাসেদ যখন শিউলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ওর, তখনো উত্তরে একটা ছোট্ট আদাব জানিয়ে নিজের কাজে ফিরে গেছে নাহার। ওর ব্যবহারটা বড় অসামাজিক বলে মনে হলো কাসেদের।

শিউলি চলে গেলে নাহারকে ডাকলো সে, আচ্ছা, তোমার একি স্বভাব বলতো? একজন ভদ্রমহিলা বাসায় এসেছে, তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম, পরিচয় করিয়ে দিলাম, দু'চারটে কথা বলবে, একটু আলাপ করবে, তা নয়, একেবারে চুপ। তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হয় নাকি। বুড়ো-আঙ্গুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে নাহার জবাব দিলো, আলাপ করার কিছু থাকলে তো। বলে এলোমেলো করে রাখা বইগুলো গুছাবার কাজে লেগে গেলো নাহার। একটার পর একটা, বইগুলো আবার সুন্দর করে সাজিয়ে রাখছে সে। কাসেদ চুপ করে রইলো। আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

দুটো ঘটনাই পর পর ঘটলো।

আগের দিন পুরো অফিসটা একটা চাপা উত্তেজনায় ভুগেছে। কারণটা তেমন অভাবিত কিছু নয়। বড় সাহেবের সঙ্গে তার বউয়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বউ ডিভোর্স করেছে তাঁকে। হাজার হোক অফিসের বড় সাহেব, তাকে নিয়ে হাসির হুল্লোর ছড়ান যায় না। গলা কাটা যাওয়ার ভয় আছে। তবু কর্মচারীরা এ নিয়ে আলোচনা করতে ছাড়ে নি।

অবশেষে এমনি কিছু যে ঘটতে পারে তা সবাই আঁচ করছিলো। যেখানে স্বামী-স্ত্রীতে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, সেখানে সকল সম্পর্ক বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

তবু অনেকে সাহেবের জন্যে আফসোস করলো। বললো, বেচারা।

আবার কেউ কেউ বললো, ভালই হয়েছে, সাহেব বেঁচেছে। নইলে সারাটা জীবন ছারপোকা হয়ে থাকতে হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ বললো, বিয়ে করে বড় ঠকেছে সাহেব। কি লোক ছিলো কেমন হয়ে গেছে।

সাহেবকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ না হতেই পরবর্তী ঘটনাটা ঘটলো।

মকবুল সাহেব, যিনি সারাদিন পান খেতেন আর অফিসটাকে জমিয়ে রাখতেন, তিনি হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

সেদিন অফিসে এসেই দারোয়ানের কাছ থেকে খবরটা শুনলো কাসেদ। প্রথমে চমকে গিয়েছিলো, পরে সামলে নিয়ে শুধালো, কার কাছ থেকে শুনলে?

দারোয়ান জানালো, তাঁর ছেলের কাছ থেকে।

অফিসের সবাই জেনেছে একে একে।

দুঃখ করেছে, আহা লোকটা বড় ভালো ছিলো। তাদের শোক প্রকাশের ধরন দেখে মনে হলো, যেন বুড়ো মকবুলের মৃত্যু-সংবাদ শুনেছে তারা। তা পক্ষাঘাতে ভোগা আর মারা যাওয়া এক কথা। আফসোস জানাতে গিয়ে একাউন্টেন্ট বলেন, যতদিন বেঁচে থাকবে একটানা কষ্ট করতে হবে। কাসেদ শুধালো, এখন তিনি আছেন কোথায়?

কনিষ্ঠ কেরানী বললো, হাসপাতালে। সকালবেলা নাকি মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

একাউন্টেন্ট বললেন, মেডিক্যাল গেলে কি হবে, ও রোগ ভালো হবার নয়। কথাটা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন তিনি। গলাটা অস্বাভাবিক শোনালো। মনে হলো রোগটা না সারুক তাই যেন চান তিনি।

টাইপরাইটারের উপর হাত জোড়া ছড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ একাউন্টেন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কাসেদ।

মকবুল সাহেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর কাজের দায়িত্ব পড়বে একাউন্টেন্ট সাহেবের হাতে। প্রমোশন হবে তাঁর। আয় বাড়বে। পদমর্যাদা বাড়বে।

খোদা করুন তিনি ভালো হয়ে যান তাড়াতাড়ি। কাজের ফাঁকে এক সময় একাউন্টেন্ট বললেন, আল্লা তাঁকে আবার আমাদের মাঝখানে ফিরিয়ে আনুক। এটা কি তার মনের কথা? সত্যি কি তিনি মনেপ্রাণে তাই চাইছেন? কাসেদের কেন যেন বিশ্বাস হলো না। মানুষ মাত্র স্বার্থপর। স্বার্থের প্রশ্নের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। বাবাতে ছেলেতে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসায়।

একাউন্টেন্ট সাহেব ভালো করে জানেন, বুড়ো মকবুল যদি সুস্থ হয়ে আবার কাজে ফিরে আসে তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা শুভ হবে না। এসব জানা সত্ত্বেও কি তিনি পক্ষাঘাত আক্রান্ত ব্যক্তিটির রোগমুক্তি কামনা করছেন? নাকি, এ তাঁর বাইরের কথা। মনে মনে হয়তো ভাবছেন অন্য কিছু। ভাবছেন বুড়ো আর সুস্থ না হোক। হয় মারা যাক কিম্বা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকুক বিছানায়।

মানুষ তাই চায়। নিজের মঙ্গলের জন্যে অন্যের ক্ষতি চিন্তা করতে সে একটুও বিলম্ব করে না।

কাসেদ কাজে মন বসাতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু বুড়ো মকবুলের কথা বারবার করে মনে হতে লাগলো তার।

বিকেলে অফিস শেষ হবার কিছু আগে বড় সাহেব ডেকে পাঠালো তাকে। স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর এ ক'দিন কারো সামনে আসেন নি তিনি। কথা বলেন নি কারো সঙ্গে। অফিসে এসেছেন। থেকেছেন। কাজ করেছেন। কাসেদ যখন বড় সাহেবের রুমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে ঢুকলো, সাহেব তখন একগাদা ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজে আছেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে কয়েকবার কাশলো কাসেদ। তবু তিনি তাকাচ্ছেন না দেখে নীরবে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলাম দুলছে, দোলনার মত শব্দ হচ্ছে।

বড় সাহেব ফাইলটা বন্ধ করে রাখলেন। তারপর কাসেদের দিকে চোখ পড়তে একটু অবাক হয়ে শুধালেন, আপনি এখানে কেন?

কাসেদ বললো, আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সাহেব কি যেন ভাবলেন। কপালের আঁকাবাঁকা রেখাগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে আসছে তাঁর। দু'চোখে কি এক শূন্যতা।

হঠাৎ নড়েচড়ে বসলেন সাহেব। বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে ডেকেছিলাম। ডেকেছিলাম মকবুল সাহেবের খবর জানতে। ও'র কি খবর?

কাসেদ বললো, আমি ঠিক জানি নে। শুনেছি হাসপাতালে আছেন। মেডিক্যাল কলেজে।

হুঁ। টেবিলের উপর ছড়ানো কয়েকখানা কাগজ ফাইলের মধ্যে রেখে দিতে দিতে সাহেব শুধালেন, আপনার কি এখন কোন কাজ আছে?

না।

তাহলে চলুন একবার হাসপাতালে যাওয়া যাক। টেবিলের ড্রয়ারগুলো বন্ধ করে রেখে উঠে দাঁড়ালেন বড় সাহেব।

হাসপাতালে মকবুল সাহেবের বেডটা খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সতেরো নম্বর বেড

দূর থেকে কাসেদ দেখতে পেলো বিছানার চারপাশে মকবুল সাহেবের বউ এবং ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বড় সাহেব চাপা গলায় শুধোলেন, এখন কি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে?

কাসেদ কি বলবে ভাবছিলো, এমন সময় মকবুল সাহেবের স্ত্রীর চোখ পড়লো এদিকে।

এদের সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

বড় ছেলে সামনে এগিয়ে বিনীত স্বরে বললো, আসেন স্যার।

সাহেব যেতে যেতে শুধোলেন, এখন উনি কেমন আছেন?

আগের চেয়ে কিছুটা ভাল আছেন স্যার।

ওরা বেডের যে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তার অন্য পাশে পাশাপাশি তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তিনজনের মাথায় ঘোমটা টানা।

প্রথম জনের কোলে একটি বাচ্চা মেয়ে। হয়তো সে সবার বড়। বিবাহিতা। দ্বিতীয় জনের বয়স কুড়ি একুশের মতো হবে। মুখখানা ভালো করে দেখতে না পেলেও কাসেদের চিনতে ভুল হয় না।

এই সেই মেয়ে যাকে বিকেলে বাড়ির আঙ্গিনায় বসে থাকতে দেখেছিলো সে। তৃতীয় মেয়েটির গায়ের রঙ ওদের চেয়েও ফর্সা। বয়স অল্প।

সাহেব অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে মকবুল সাহেবের কপালে একখানা হাত রাখলেন। চোখ মেলে তাকালেন মকবুল সাহেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সাহেবের দিকে। চোখের পলক পড়ছে না। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে শুধু। যেন কিছু বলতে চান তিনি।

সাহেব মৃদু গলায় বললেন, চিন্তার কিছু নেই। ভালো হয়ে যাবেন।

মকবুল সাহেবের খোলা চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

ওপাশে দাঁড়ান তিনটি মেয়ে আর তাদের মা আঁচলে চোখ মুছলো।

ওরাও কাঁদছে।

কাঁদছে না শুধু ছেলেরা।

ওদের সারা মুখ ম্লান। চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ। কিন্তু চোখে অশ্রু নেই। সাহেব বললেন, চাকরীর জন্য চিন্তা করবেন না। ওটা আপনারই থাকবে, কিছুদিন পর ভালো হয়ে গেলে আবার জয়েন্ট করবেন।

মকবুল সাহেব আবার কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। বলতে পারলেন না, ওপাশে দাঁড়ান স্ত্রী-কন্যার ওপর চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে আবার বড় সাহেবের দিকে তাকালেন তিনি। পলক পড়ছে না চোখের।

শুধু পানি ঝরছে আর ঠোঁট জোড়া কাঁপছে।

সাহেব বললেন, টাকা-পয়সার কথা ভাবতে হবে না। আমি বন্দোবস্ত করে দেবো।

এবার, এতক্ষণে কান্না কমে এল তার। যেন অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করলেন তিনি।

কাসেদকে দেখলেন। দেখলেন চারপাশে।

কাসেদের দিকে মুখখানা এনে বড় সাহেব চাপা স্বরে বললেন, এদের দেখাশোনার দায়িত্বটা আপাততঃ আপনাকেই নিতে হবে।

কাসেদ সম্মতি জানিয়ে মাথা নত করলো।

সাহেব আবার বললেন, আমি অফিস থেকে কিছু টাকা স্যাঙ্কশন করিয়ে দেবো। প্রয়োজন মত খরচ করবেন।

কাসেদ আবার মাথা নোয়ালো।

একটা নার্স টেম্পারেচার নিয়ে গেলো। তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি যেন আলাপ করলেন বড় সাহেব।

মকবুল সাহেবের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এসে সেই মেয়েটিকে দেখতে চেষ্টা করলো কাসেদ।

দেখা গেলো না।

সন্ধ্যার মত আবছা-ই রয়ে গেলো সে।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ফলের দোকান থেকে কিছু ফল কিনে দিলেন সাহেব। বললেন, এগুলো হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আপনি বাসায় চলে যান।

ফলের ঠোঙ্গাটা হাতে নিয়ে চলে আসছিলো কাসেদ।

সাহেব পিছন থেকে আবার ডাকলেন, বললেন, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না। সাহেবের গলার স্বরটা কেমন যেন ক্লান্ত আর জড়ানো। কাসেদ অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে।

গাড়ি আছে। বাড়ি আছে। চাকরী আছে ভালো, টাকা-পয়সার অভাব নেই তবু সুখী হতে পারলো না লোকটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাসেদ নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওঁর দিকে। কিছু বললো না। পুরো অফিসটা চাপা কথার গুমোট হাওয়ায় ভরে আছে সেই সকাল থেকে।

মকবুল সাহেব। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত মকবুল সাহেব কি ভালো হবেন?

এ রোগ তো ভালো হবার নয়। আর তিনি যদি ভালো না হন তাহলে তার জায়গায় নিশ্চয় এই অফিসের একজনকেই নেয়া হবে। কাকে নেবে কিছু জানেন? এক নম্বর কেরানী চাপাস্বরে শুধোলেন দু'নম্বর কেরানীকে।

দু'নম্বর কি বললেন কিছু শোনা গেলো না।

দুপুরে বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন তাকে।

কিছু টাকা দিলেন।

খোঁজখবর নিলেন।

বললেন, আমি অবশ্য বিকেলের দিকে একবার যাবো।

কাসেদও ভাবছিলো বিকেলে একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসবে লোকটাকে।

লোকটাকে দেখতে যাওয়ার আগ্রহের আড়ালে আরেকটি বাসনা লুকিয়ে ছিলো। সেই মেয়েটিকে দেখবে। বিকেলের রঙে যার দেহ রাঙানো। কিন্তু অফিস ছুটি হবার একটু আগে সালমা এসে হাজির।

মুখখানা গম্ভীর। কালো। চুলগুলো এলোমেলো। চোখে চরম বিতৃষ্ণা। কাসেদ চমকে উঠলো। কি ব্যাপার, হঠাৎ অফিসে?

সালমা বললো, বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।

কাসেদ বললো, দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

সালমা বললো, এখানে একগাদা লোকের সামনে কিছু বলতে পারবো না আমি। তোমার কি বাইরে আসতে অসুবিধা হবে?

না, অসুবিধা কিসের। এইতো একটু পরেই অফিস ছুটি হবে, তারপর বাইরে বেরুনো যাবে খ'ন। কিন্তু অমন কি ঘটলো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। তোমাকে যেন একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

ক্লান্ত বইকি, সালমা চাপাস্বরে বললো, বড় ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। শেষের কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেলো না।

কাসেদ বুঝলো, কিছু একটা ঘটেছে। হয়তো স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে সে। কিম্বা মা-বাবার সঙ্গে।

অফিসে আর কোন আলাপ হলো না।

রাস্তায় নেমে কাসেদ বললো, কি দরকার বলো।

সালমা বললো, এই রাস্তায়? চলো না কোথাও গিয়ে বসা যাক।

কোথায় যাবে?

কেন, কোন রেস্টুরেন্টে?

খোলা রেস্তোরায় বসা ঠিক হবে না।

তাহলে কেবিনে বসবে।

কাসেদ ইতস্তত করলো কিন্তু সালমার অনুরোধ এড়াতে পারলো না সে।

চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো সালমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের ওপর হিজিবিজি কাটলো।

কাসেদ বললো, কি চুপ করে রইলে যে, কিছু বলবে না?

সালমা একবার আড়চোখে দেখে নিলো তাকে। তারপর বললো, আচ্ছা আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয় বলতো?

কাসেদ শুধালো, হঠাৎ এ প্রশ্ন?

সালমা বললো, না মানে বলছিলাম কি, আমাকে দেখে কি তোমার মনে হয় আমি খুব সুখী?

চায়ের পেয়ালাটা মুখের কাছ থেকে নামিয়ে এনে কাসেদ বললো, এ প্রশ্নের জবাব দেয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ সুখ জিনিসটা হচ্ছে মনের ব্যাপার, ওটা যদি বাইরের হতো, তা'হলে সাদা চোখে দেখা যেতো। তোমার মনকে তো আর আমি দেখতে পাচ্ছি নে।

দেখবার চেষ্টাই-বা করলে কবে। সালমার কণ্ঠস্বরে অভিমান ঝরছে, নিজেকে নিয়েই তো ব্যস্ত থাকলে চিরকাল, অন্যের কথা ভাববার অবকাশ কোথায়। কথা বলতে গিয়ে বারবার মুখখানা লাল হয়ে উঠছিলো ওর। কিন্তু কাসেদের দিকে একবারও দেখলো না সে।

চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো কাসেদ। বিব্রত গলায় বললো, আমার কথা বাদ দাও। তোমার নিজের কথা কি বলছিলে তাই বলো।

অল্পক্ষণের জন্যে চুপ করে গেলো সালমা।

কাসেদের জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারে নি সে।

এক চুমুক চা খেয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সালমা আবার বললো, সব মানুষই জীবনে সুখী হতে চায়। আমিও চেয়েছি। যাকে ভালবাসলাম তাকে পেলাম না। যাকে বিয়ে করতে হলো তাকে ঠিক মনের মতোটি করে পেতে চাইলাম। কিন্তু–

বলতে গিয়ে সহসা থেমে পড়লো সালমা।

মাথার ওপরে ফ্যানটা ঘুরছে জোরে।

এলোমেলো চুলগুলো উড়ছে বাতাসে।

মুখ খুলে কাসেদের দিকে তাকালো সালমা। আস্তে করে বললো, সে চাইলো আমি তার মতো হই। পাতলা সিফনের শাড়ি পরে ঠোঁটে আর মুখে রঙ মেখে ওর সঙ্গে ক্লাবে যাই। ওর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিই, গল্প-গুজব করি। দুই মন, দুই মেরুতে বসে। মিল যেখানে নেই সেখানে সুখের তালাশ করা পাগলামো, তাই না?

কাসেদ কি বলবে ভেবে পেলো না।

সালমা নীরব।

কাসেদের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষায় আছে সে।

কাসেদ বললো, এ নিয়ে চিন্তা করে কি হবে সালমা? এ চিন্তার কি কোন শেষ আছে?

সালমা উত্তরে বললো, বিপাশাকে যদি তোমার কাছে দিয়ে যাই তুমি রাখবে? কাসেদ অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে, কেন বলতো?

সালমা কি যেন ভাবলো। ভেবে বললো, ওকে তোমার কাছে রেখে আমি কোথাও চলে যাবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ পাগলামোর কোন মানে হয় না, কাসেদ হাসতে চেষ্টা করলো। বললো, জীবনের পথ যত কঠিন আর যত দুর্যোগময় হোক না কেন, তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। ওটা কাপুষতার লক্ষণ।

তাই নাকি? অপূর্ব হাসলো সালমা। টেনে টেনে বললো, কাপুরুষ আমি না তুমি?

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, তার মানে?

মানে, তুমি কি বলতে চাও, তুমি একজন বীর-পুরুষ?

কাসেদ হেসে দিয়ে বললো, বীর-পুরুষ হয়তো নই, তবে কাপুরুষও নই।

কাপুরুষ নও? সালমা শব্দ করে হাসলো, তাহলে একটা কথা বলি?

বলো।

সালমা নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু মৃদু হাসি। তারপর টেনে টেনে বললো, আজ এখান থেকে বেরিয়ে, তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে দূরে বহু দূরে কোথাও? কাসেদ চমকে উঠলো। সহসা সে বুঝতে পারলো না কি বলবে। কি বলা যেতে পারে। সালমা আবার লাল হলো। মুখখানা সরিয়ে নিলো অন্যদিকে।

কিছুক্ষণ দু'জনে একেবারে চুপ।

একটু পরে সালমা আবার বললো, কি, চুপ করে রইলে যে, বীর-পুরুষের সাহসে কুলোচ্ছে না বুঝি?

কাসেদ গম্ভীর গলায় বললো, একটা অসম্ভব প্রস্তাব করে বসলে তো আর চলে না। অসম্ভব? টেবিলের উপর ঝুঁকে এলো সালমা, তীক্ষ্ণ গলায় বললো, সাহসে কুলোচ্ছে না তাই বলো। কেন মিছামিছি বাজে অজুহাত দেখাচ্ছো! সালমা নড়েচড়ে বসলো। বেয়ারাকে ডাকো। বিলটা চুকিয়ে দিই।

কাসেদ বললো, কিন্তু কি দরকারী কথা আছে বলেছিলে, তাতো বললে না। সালমা বললো, থাক তার প্রয়োজন আর নেই। যে গাছে প্রাণ নেই তার গোড়ায় পানি ঢেলে কি হবে? খুব তো বড়াই করছিলে কাপুরষ নই, কাপুরুষ নই। সহসা কান্নায় গলাটা ধরে এলো তার।

কাসেদ বললো, অকারণে কেন একটা সহজ সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছো বলো তো? তুমি কি চাও আমার কাছ থেকে?

কিছু না। কিছু না। কিছু না। এতক্ষণে সত্যিকার কান্না নেমে এলো তার দু'চোখ বেয়ে। কাপড়ের আঁচলে অশ্রুবিন্দু মুছে নিতে নিতে সে আবার বললো, কিছুই চাই না, আমি। চাই শুধু ঝগড়া করতে। সারাটা জীবন তাইতো করে এসেছি।

এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কাসেদ। বললো, ওটা বোধ হয় আমাদের কপালে লেখা ছিলো সালমা। নইলে যখনই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আমরা ঝগড়া করেছি। করি। কেন করি?

তুমি আমাকে আঘাত দিয়ে আনন্দ পাও, তাই।

কাউকে আঘাত দিয়ে কেউ আনন্দ পায় না সালমা।

সালমা কোন জবাব দিলো না।

পরনের শাড়িটা গুছিয়ে নিতে নিতে উঠে দাঁড়ালো সে।

ওকি, চললে নাকি?

চিরকাল বসে থাকবো বলে এখানে আসি নি নিশ্চয়। সালমার গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেলো কাসেদ।

সালমা ততক্ষণে কেবিনের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবিন ছেড়ে কাসেদও বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

দিন কয়েক থেকে মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

মাঝে মাঝে জ্বর আসে। ছেড়ে যায়। আবার আসে।

এই জ্বরের মধ্যেও মা নামাজ পড়া বাদ দেন নি। পড়েন, বসে বসে।

আর সারাক্ষণ শব্দ করে দোওয়া দরুদ পাঠ করেন।

মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করেন নাহারের জন্যে আর কাসেদের জন্যে।

বলেন, আমি মরে গেলে তোদের যে কি হবে ভেবে পাই না।

আজ বিকেলে কাসেদ বাসায় ফিরে এলে মা কাছে ডাকলেন ওকে।

বললেন, এখানে এসে বসো, আমার মাথার কাছে।

কপালে হাত রেখে কাসেদ দেখলো জ্বর আছে কিনা। নেই।

নাহার বললো, এই একটু আগে জ্বর নেমে গেছে।

মা বললেন, আমাকে নিয়ে তোরা ভাবিস নে। বুড়ো হয়ে গেছি, আর ক'দিন বাঁচবো।

কাসেদ বললো, ওসব অলক্ষুণে কথা কেন বলছো মা।, তুমি এখন ঘুমোও। এইতো কাল সকালেই ভাল হয়ে যাবে।

মা চুপ করলেন না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো তাঁর। তবু বললেন, তোর খালু এসেছিলো, নাহারের বিয়ের সেই পুরানো প্রস্তাবটা নিয়ে।

শ্বাস নেবার জন্যে থামলেন মা।

নাহার বিছানার ওপাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো। বিয়ের কথা শুনে বারকয়েক ইতস্তত করে পাশের ঘরে সরে গেলো সে।

মা আবার বললেন, আমি এ বিয়েতে মত দিয়েছি। অসুখে যেমন ধরেছে কে জানে কখন মরে যাই। যাবার আগে ওকে স্বামীর ঘরে তুলে দিয়ে যেতে চাই। নইলে মরেও শান্তি পাবো না আমি। গলাটা ধরে এলো মায়ের। বার দু'য়েক ঢোক গিলে নিয়ে বললেন, তাছাড়া ছেলেটাও তো খারাপ না, ভালোই, এখন তুই মত দিলেই হয়ে যায়।

মায়ের কথায় মৃদু হাত বুলোতে বুলোতে কাসেদ আস্তে করে বললো, আমার মতামতের কি আছে, তোমরা যা ভালো মনে করো, করবে। অবশ্য নাহারকে একবার জিজ্ঞেস করে নিয়ো।

ওকে আবার জিজ্ঞেস করবো কি? মা চোখ তুলে তাকালেন ওর দিকে।

আমরা কি ওর খারাপ চাই? ছেলেটা শুনেছি, দেখতে শুনতে ভালো।

মা পাশ ফিরে শুলেন।

কাসেদ নীরবে ওঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

রাতে ওর ঘরে খাবার নিয়ে এলে নাহারকে বসতে বললো কাসেদ।

বললো তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

নাহার ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে তাকালো ওর দিকে। বসলো না। দরজার কপাট ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

কাসেদ ভাবলো কথাটা কিভাবে বলা যেতে পারে।

বিছানার ওপর থেকে উঠে টেবিলের পাশে গিয়ে বসলো সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাহার অপেক্ষা করছে দাঁড়িয়ে।

থালার মধ্যে ভাত ঢেলে নিতে নিতে কাসেদ বললো, তোমার বিয়ের জন্যে খালু একটা প্রস্তাব এনেছেন শুনেছো–

নাহার কোন জবাব দিলো না।

কাসেদ ভাতের থালা থেকে মুখ তুলে দেখলো তাকে।

তবু সে চুপ।

কাসেদ বললো, মা অবশ্য তাঁর মত দিয়েছেন। তুমি যদি মত দাও, তাহলে আমারও আপত্তির কিছু নেই।

নাহার নড়েচড়ে দাঁড়ালো।

ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো দরজায়।

কাসেদ এবার আর তাকালো না।

নিঃশব্দে ভাত খেতে লাগলো সে। খেতে খেতেই বললো, তোমার ইচ্ছা হলে ছেলেটিকে দেখতেও পারো। আর যদি মত না থাকে তাও বলতে পারো। সঙ্কোচের কিছু নেই।

তবু চুপ করে রইলো নাহার। মুখখানা নুইয়ে পায়ের পাতার দিকে চেয়ে রইলো সে।

কি ব্যাপার, কিছু বলছো না যে?

নাহার নীরব।

তোমার কি কোন মতামত নেই?

তবু চুপ সে।

তুমি কি কিছুই বলবে না? কাসেদ স্থির দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে।

আমি কি বলবো? এতক্ষণে কথা বললো নাহার। ওর গলার স্বরে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা, আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করবেন, আমার কোন মতামত নেই। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলো সে।

শেষের দিকে গলাটা জড়িয়ে এলো তার।

তখনো দাঁড়িয়ে সে।

হ্যারিকেনের আলোয় মুখখানা ভালো করে দেখা গেলো না।

পাশের ঘরে মা দরুদ পড়ছেন শুয়ে শুয়ে। এখান থেকে সব কিছু শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট।

ভাত খেয়ে উঠে দাঁড়াতে থালাবাসনগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেলো নাহার।

ও চলে যেতে খাতা-কলম নিয়ে বসলো কাসেদ।

লিখবে।

ভীষণ লিখতে ইচ্ছে করছে ওর।

অফিসের কানাগুষো ইদানীং অন্য রূপ নিয়েছে।

মকবুল সাহেবের প্রতি বড় সাহেবের পক্ষপাতিত্ব সবার মনে ঈর্ষার জন্ম দিয়েছে। আর তাই রোজ অফিসে এসে কাজের ফাঁকে তারা চাপা সুরে এই অর্থপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলছে। রোজ বিকেলে সাহেব হাসপাতালে যান অসুস্থ মকবুল সাহেবকে দেখতে, তাঁর খবরাখবর নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কেন, কিসের জন্য?

শহরে এমন আরেকটি অফিস কি কেউ দেখাতে পারবে যার একজন কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়লে বড় সাহেব রোজ তাকে দেখতে যান? শুধু কি দেখতে যাওয়া?

রোজ যাবার সময় বিস্কিট, হরলিক্স, ফলমূল কত কিছু নিয়ে যান তিনি। তাছাড়া ওঁর পেছনে টাকা খরচ করার ব্যাপারেও এতটুকু কার্পণ্য করছেন না তিনি। শোনা যাচ্ছে কোলকাতা থেকে একজন নামকরা ডাক্তার আনার কথাও ভাবছেন বড় সাহেব।

কিন্তু কেন?

কাসেদ বলে, যদি টাকা খরচ করেই থাকেন, আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন? শুনে বিশ্রীভাবে হাসে এক নম্বর কেরানী। বলে, মাথাব্যথা হতো না, যদি না এই টাকা খরচের পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকানো থাকতো।

বলে আবার হাসে লোকটা।

কাসেদ বুঝতে পারে না, ও কি বলতে চায়। ইতস্তত করে আবার প্রশ্ন করে, তার মানে?

মানে? মানে অত্যন্ত সহজ। চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে এক নম্বর বলে, মকবুল সাহেবের একটি বয়স্কা মেয়ে আছে সে খবর রাখেন?

কাসেদ বলে, হ্যাঁ রাখি। একটি নয় দু-তিনটি মেয়ে আছে তাঁর।

ব্যাস। মাথা দুলিয়ে এক নম্বর কেরানী আবার বলে, বাকিটুকু আপনি নিজেই বুঝে নিন।

কাসেদের বুঝতে বাকি থাকে না।

একাউন্‌টেন্ট তার টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে বলেন, পরশু দিন বিকেলে দেখলাম বড় সাহেব তাঁর গাড়ি করে ওদের হাসপাতাল থেকে বাসায় পৌঁছে দিচ্ছেন।

কাসেদ পরক্ষণে বলে, ওটা অন্যায় কিছু করেন নি তিনি।

আরে সাহেব আপনার এত গা জ্বলছে কেন শুনি? এক নম্বর কেরানী টেনে টেনে বলেন, আমরা তো আর আপনাকে বলছি না।

জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলো কাসেদ, বড় সাহেবকে এদিকে আসতে দেখে চুপ করে গেলো সে।

বড় সাহেব কেন যে এ ঘরে এলেন কিছু বুঝা গেল না।

লম্বা অফিস ঘরটায় বার কয়েক পায়চারী করলেন তিনি। মনে হলো কি যেন গভীরভাবে ভাবছেন, চিন্তা করছেন।

স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হবার আগে এবং পরে সব সময় তাঁকে কিছুটা চিন্তাক্লিষ্ট দেখাতো।

কিন্তু আজকের ভাবনার মধ্যে রয়েছে একটা অনিবার্য অস্থিরতা। কেরানীরা এখন আর কথা বলছে না।

কাজ করছে।

বিকেলে কাসেদের মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে গেলো।

বাড়িতে মায়ের অসুখ। তবু বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করলো না তার।

ইচ্ছে হলো জাহানারাদের ওখানে যেতে।

কি করছে জাহানারা?

হয়তো বাগানে বসে বসে গল্প করছে পাড়ার বান্ধবীদের সঙ্গে।

কিম্বা তার শোবার ঘরে জানালার পাশে বই পড়ছে, উপন্যাস, গল্প অথবা কবিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা, এভাবে আর কতদিন চলবে বলতে পারো? কতদিন আমি ভেবেছি আমার মনের একান্ত গোপন কথাটা ব্যক্ত করবো তোমার কাছে। বলবো সব। বলবো এসো আমরা ঘর বাঁধি। তুমি আর আমি। আমরা দু'জনা, আর কেউ থাকবে না সেখানে।

কেউ না।

রাস্তায় কত লোক। আসছে। যাচ্ছে। কথা বলছে। ওরাও হয়ত ভাবছে কারো কথা। কারো স্বপ্ন আঁকছে মনে মনে, কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করছে ভবিষ্যতের দিনগুলোকে, রোমাঞ্চকর অনাগত দিন।

আজকাল জাহানারাকে নিয়ে একটু বেশি করে ভাবছে কাসেদ।

মূলে রয়েছে মা। রোজ একবার করে তাড়া দিচ্ছেন তিনি। বিয়ে কর। আমি বেঁচে থাকতে একটা বউ নিয়ে আয় ঘরে।

আর বিয়ের কথা যখনি ভাবে কাসেদ জাহানারা ছাড়া অন্য কারো চিন্তা মনে আসে না তার।

একমাত্র জাহানারা স্ত্রী হিসেবে ঘরে আসতে পারে তার।

আর কেউ নয়।

বাইরে, বাসার সামনে কমলা রঙের শাড়ি পরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে, সে জাহানারা নয়, শিউলি।

শিউলির সঙ্গে সেই অনেকদিন আগে জাহানারার জন্মদিনে এই বাড়িতেই প্রথম আলাপ হয়েছিলো তার।

শিউলি হাসলো। জাহানারার কাছে এসেছেন বুঝি?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ।

শিউলি বললো, ও এখন সেতার শিখছে, ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না।

আসুন না, আমরা এখানে মাঠের ওপর বসি।

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, হ্যাঁ বসা যেতে পারে, আমার কোন আপত্তি নেই।

শিউলি ঠোঁট টিপে হাসলো। মনে হলো কিছু বলবে। বললো না।

মাঠের ওপরে যেখানে কয়েকটা ফুলের টবে লাল, সাদা ফুল ফুটে আছে সেখানে এসে বসলো ওরা।

কাসেদ বললো, কই আপনি এলেন না তো একদিনও?

শিউলি বললো, যেতাম কিন্তু, পরে ভাবলাম আসা-যাওয়ার উৎসাহ দেখে আপনি যদি শেষে ভুল বুঝে বসেন আমায়?

ভুল! ভুল কিসের? কাসেদ অবাক হলো।

শিউলি হেসে হেসে বললো, যদি ভাবেন আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি তাহলে? বলে শব্দ করে হেসে উঠলো সে। হাসির দমকে সরু দেহটা যেন নেতিয়ে পড়তে চাইলো ঘাসের ওপরে।

কাঁধের ওপর থেকে কোলে নেমে আসা আঁচলখানা আবার যথাস্থানে তুলে দিয়ে শিউলি বললো, আচ্ছা একটা কথার জবাব দিতে পারেন?

কি কথা?

মাঝে মাঝে আপনাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে, কেন বলুন তো?

শিউলি তার চোখের দিকে তাকালো।

পর পর কয়েকটা ঢোক গিললো কাসেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবাব দেবার মত কোন কথা খুঁজে পেলো না সে। আলোচনাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়ার জন্যেই হয়তো সে পরক্ষণে বললো, চলুন না, জাহানারার ঘরে গিয়ে বসা যাক। এতক্ষণে তার সেতার শেখা নিশ্চয় শেষ হয়েছে। এত শিগ্রী? শিউলি যেন চীৎকার করে উঠলো। তারপর ঠোঁটের কোণে অর্থপূর্ণ হাসির ঈষৎ তরঙ্গ তুলে ধীর গলায় বললো, আপনি কি ভাবেন সেতার শেখানটাই মুখ্য?

কাসেদ শুধালো, কেন বলুন তো?

শিউলি হাসলো, আপনি কিছুই জানেন না তাহলে?

কাসেদের বুকটা কেঁপে উঠলো সহসা। কিছু বলতে গিয়ে আবার বার কয়েক ঢোক গিললো, কই জানি না তো?

শিউলির চোখেমুখে কৌতুক। সামনে ঝুঁকে এসে আস্তে বললো, তারের সঙ্গে তারের জোর প্রেম চলছে।

তার মানে? হৃৎপিণ্ডতা গলার কাছে এসে আঘাত করছে যেন। সপ্রসন্ন দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো কাসেদ।

শিউলি বললো, এখনো বুঝলেন না? ঠোঁট টিপে আবার হাসলো সে। এই সহজ কথা বুঝতে এত দেরি হচ্ছে আপনার? চারপাশে এক পলক দেখে নিয়ে আরো কাছে সরে এলো শিউলি। মাস্টার আর ছাত্রীতে মন দেয়া নেয়ার পালা চলছে, বুঝলেন?

কাসেদের মনে হলো, ওর দেহটা যেন ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে আসতে চাইছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছে না সে।

কেন এমন হলো জাহানারা?

এ সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে কি ক্ষতি হয়ে যেতো তোমার? আমি নিশ্চয় বাধা দিতাম না। কেন দেবো?

পৃথিবীতে আমরা সবাই প্রথমে নিজের কথা ভাবি, পরে অন্যের। তুমি তোমার পথে চলবে, আমি আমার পথে। তোমারটা আমি কোনদিনও কেড়ে নিতাম না। তবে কেন তুমি সব কিছু লুকিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে?

ওকি আপনি একেবারে চুপ করে গেলেন যে? শিউলির কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসার সুর, কি ভাবছেন?

না, কিছু না তো? কাসেদ নিজেকে আড়াল করতে চাইলো শিউলির দৃষ্টি থেকে।

শিউলি আবার বললো, আপনি যেন কেমন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন মনে হচ্ছে?

তাই নাকি? না, এমনি। কাসেদ নড়েচড়ে বসলো।

শিউলি শুধালো, উঠবেন নাকি?

কাসেদ বললো, হ্যাঁ, না ভাবছি–।

কি ভাবছেন?

এখানে আর একটু বসা যাক, কি বলেন? অনেকটা সহজ হবার চেষ্টা করলো কাসেদ।

শিউলি বললো, জাহানারার সঙ্গে দেখা করবেন না?

করবো না কেন? দেখা করতেই তো এসেছি। বলতে গিয়ে গলার স্বরটা কাঁপলো ওর।

কি আশ্চর্য! আজ বিকেলে জাহানারাদের বাসার পথে আসতে আসতে অনেক কিছু ভেবেছে কাসেদ, অনেক কল্পনার জাল বুনেছে। কিন্তু ভুলেও ভাবে নি, মাস্টারের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক পাতিয়ে বসতে পারে জাহানারা। কেন এমন হলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিউলি শুধালো, আপনার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে?

কাসেদ উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, শিউলি তাকে বাধা দিয়ে আবার বললো, ওই যে জাহানারা।

মাঠ থেকে বারান্দার দিকে দেখলো কাসেদ।

এইমাত্র মাস্টারকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে জাহানারা।

মাস্টার বললো, এবার যাই তাহলে?

জাহানারা বললো যাই নয়, আসি। কাল ঠিক সময় আসবেন তো? আসবেন কিন্তু।

নইলে আরো বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখবো। একটু শাসন, একটু রাগ, একটু অভিমান।

এমন করে তো কাসেদের সঙ্গে কথা বলে নি জাহানারা।

শিউলি বিড়বিড় করে কি বললো কিছু বোঝা গেল না।

জাহানারা তার মাস্টারের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে।

দাঁতগুলো চিকচিক করছে বিকেলের রোদে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ওরা।

শিউলি ডাকলো, জাহানারা।

ওদের দেখে চোখ জোড়া বড়ো বড়ো করে তাকালো জাহানারা, তোমরা ওখানে করছো কি?

শিউলি হেসে দিয়ে বললো, প্রেমালাপ করছি, তাই না কাসেদ সাহেব?

ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকা চোখে কাসেদের দিকে তাকালো সে।

জাহানারা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে সামনে।

কাসেদ কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলো।

জাহানারা শুধালো, আপনি কখন এসেছেন?

কাসেদ কোন জবাব দেবার আগেই শিউলি বললো, অনেকক্ষণ হয় উনি এসেছেন, আমি আটকে রেখেছি এখানে।

জাহানারা বললো, ভিতরে গেলেই তো পারতেন।

না, ভাবলাম আপনার অসুবিধা হতে পারে। যতই লুকোতে ইচ্ছে করুক না কেন, গলার স্বর অস্বাভাবিক শুনালো জাহানারার কানে।

জাহানারা মিষ্টি হাসলো, কি যে বলেন, অসুবিধে কেন হবে! আসুন ভেতরে বসবেন।

কাসেদের মনে হলো জাহানারার কথাবার্তায় আগের সেই আন্তরিকতা নেই। বাড়িতে এসেছে যখন বসাতে হবে তাই বসতে বলছে সে। সামনে জাহানারা আর পেছনে শিউলি আর কাসেদ। পাশাপাশি। শিউলি চাপা স্বরে শুধালো, আপনার কি হয়েছে বলুন তো, সেই তখন থেকে কেমন যেন গুম হয়ে আছেন।

কাসেদ বললো, ও কিছু না।

জাহানারা পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে কিছু বললেন কি?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, না।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ওর। দেহটা কাঁপছে। বুকের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা। যন্ত্রণা। কাসেদের মনে হলো এ মুহূর্তে এখান থেকে ছুটে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে পারলে যেন কিছুটা শান্তি পেত সে। স্বস্তি পেতো। মাথাটা ভার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মনে হচ্ছে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়িয়ে পড়তে চায় মাটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন এমন হলো?

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জাহানারাকে দেখে নিলো কাসেদ। আজ ওকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেক আকর্ষণীয়। ওর চোখের আর মুখের লাবণ্য অনেক বেড়ে গেছে। কথার মধ্যেও আশ্চর্য পরিবর্তন।

কাসেদের মনে হলো সে যেন এ মুহূর্তে আরো বেশি করে ভালবেসে ফেলেছে ওকে। তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে ওর মনে।

না। জাহানারাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের কোন কিছুই কল্পনা করতে পারে না কাসেদ। কিছুই না।

জাহানারা শুধালো, চা খাবেন, না কফি?

কাসেদ কোন উত্তর দিলো না। শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

জাহানারা বললো, আপনার কি হয়েছে বলুন তো? আজ কেমন যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে আপনাকে।

কাসেদ মনে মনে ভাবলো, পরিবর্তন আমার মধ্যে নয়, তোমার মধ্যে এসেছে। তুমি আগের সেই মেয়েটি নেই, সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিন্তু মুখে বললো, আমার শরীরটা ভালো নেই।

সে কি, অসুখ করে নি তো? জাহানারার চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়াপাত হলো। হাত বাড়িয়ে ওর কপাল স্পর্শ করে দেখলো সে, বললো, কই টেম্পারেচার নেই তো?

শিউলি বললো, ওর তো জ্বর হয়নি যে টেম্পারেচার পাবে। ওর শরীর খারাপ করছে।

জাহানারা বললো, এক কাপ কফি খান, শরীর ভালো হয়ে যাবে।

কাসেদ বললো, থাক। এখন আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া এখনি আমাকে উঠতে হবে।

জাহানারা চোখ বড় বড় করে বললো, সেকি, এই এলেন আর চলে যাবেন?

কথাটা কানে গেলো না ওর। ও তখন ভাবছে জাহানারার জন্যে একটা সেতারের মাস্টার ঠিক না করে দিয়ে কত বড় ভুল করেছে। জাহানারা বারবার করে বলেছিলো, একটা মাস্টার ঠিক করে দিন। তখন যদি ওর অনুরোধ রক্ষা করতো সে তাহলে হয়তো এত বড় বিপর্যয় ঘটতো না।

শিউলি শুধালো, আপনি কি বাসায় ফিরবেন?

কাসেদ বললো, হ্যাঁ।

খুলে যাওয়া খোঁপাটা ভালো করে বাঁধতে বাঁধতে জাহানারা জানালার পাশে সরে দাঁড়ালো। তারপর সেখান থেকে জিজ্ঞেস করলো, রোববার দিন বিকেলে কি আপনি বাসায় থাকবেন?

কেন?

যদি থাকেন তাহলে বাসায় আসবো। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার। বুকটা আবার মোচড় দিয়ে উঠলো ওর। আড়চোখে একবার ওকে দেখে নিয়ে বললো, রোববার ছাড়া অন্য কোন দিন আসতে পারেন না?

জাহানারা বললো, রোববার দিন আমার ছুটি কিনা তাই। অন্যদিন গেলে আমার সেতার শেখা হবে না। মাস্টার ভীষণ রাগ করবেন।

আবার সেতার শেখা!

আবার সেতারের মাস্টার!

রাগে দেহটা জ্বালা করে উঠলো ওর। পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ঠিক আছে, আমি বাসায় থাকবো, আসবেন। এখন চলি।

ওর সঙ্গে শিউলিও উঠে দাঁড়ালো। আমার একটা কথা রাখবেন কাসেদ সাহেব?

কি?

বাড়ি যাবার পথে আমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যাবেন?

কিন্তু.....কাসেদ ইতস্তত করে বললো, পথটা তো এক হলো না।

উল্টো।

শিউলি বললো, আমার জন্যে না হয় একটু উল্টো পথ ঘুরেই গেলেন। যাবেন কি?

কাসেদ জাহানারার দিকে এক পলক তাকালো। ও জানালা গলিয়ে বাইরে আকাশ দেখছে, দেখুন।

কাসেদ বললো, যাবো বইকি, চলুন। গলার স্বরে উৎসাহের আধিক্য দেখে নিজেই চমকে উঠলো। বুঝতে পারলো না কথাটা হঠাৎ এত জোরের সঙ্গে কেন বলতে গেলো সে।

জানালা থেকে সরে এলো জাহানারা।

শিউলি শুধালো, তুমি এখন ঘরে বসে বসে করবে কি জাহানারা?

জাহানারা ধীর গলায় বললো, কি আর করবো, মাস্টার একটা নতুন গদ দিয়ে গেছেন, বসে বসে সেতার বাজাবো।

আবার মাস্টার!

আবার সেতার!

শিউলিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো কাসেদ।

কিছুই ভালো লাগছে না।

মনটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে ওর।

আকাশে অনেক তারা জ্বলছে। রাস্তায় অনেক লোক। বাতাসে কার বাগানের মিষ্টি গন্ধ আসছে ভেসে। কিন্তু এর কোন কিছু দিয়ে এ শূন্যতা ভরানো যাবে না।

শুনেছেন? সহসা কাসেদ বললো, আপনার প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। আপনি আমার একটা কথা রাখুন আজ।

কি কথা? শিউলির দুচোখে ঔৎসুক্য ভীড় করেছে এসে।

কাসেদ মৃদু গলায় বললো, আমার সঙ্গে একটু বেড়াবেন। ঘুরবেন যেখানে যেখানে আমি নিয়ে যাই। আজ বড় একা লাগছে আমার।

শিউলি ভ্রূজোড়া প্রসারিত করে তাকালো ওর দিকে, তারপর হেসে বললো, কিন্তু আমাকে যে ন'টার মধ্যে হোস্টেলে ফিরতে হবে, নইলে সুপার ভেতরে ঢুকতে দেবে না। শেষে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে।

কাসেদ ম্লান হেসে বললো, আমি যদি আপনার জন্যে উল্টো পথে পাড়ি দিতে পারি, আপনি আমার জন্য এ ঝামেলার ঝুঁকিটা নিতে পারেন না? কিন্তু কেন বলুন তো? কণ্ঠে ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে শিউলি শুধালো, আজ হঠাৎ বেড়াতে ইচ্ছে হলো কেন আপনার? বিশেষ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

কাসেদ সহসা জবাব দিলো না।

নীরবে কি যেন ভাবলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা, কেন এমন করলে তুমি!

তোমাকে ভালবেসে পরিপূর্ণ ছিলাম আমি। যেদিকে তাকাতাম ভালো লাগতো আমার। আজ আকাশের নীল আর নিওনের আলো সব কিছু বিবর্ণ মনে হচ্ছে আমার চোখে।

কেন এমন হলো জাহানারা?

আমি জাহানারা নই, শিউলি। শিউলি মিটিমিটি হাসছে। কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে ওর।

কাসেদ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললো, না– মানে। কথাটা শেষ করলো না সে। সহসা শিউলির একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আবেগভরা গলায় কাসেদ বললো, আচ্ছা বলতে পারেন, আমি যা চাই তা পাইনে কেন?

হাতখানা সরিয়ে নিলো না শিউলি। মৃদু চাপ দিয়ে শুধু বললো, চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে সাপে-নেউলের সম্পর্ক রয়েছে যে। এই দেখুন না, আমি চাই ছেলেদের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে মিশতে আর ওরা চায় আমাকে ঘরের গিন্নী হিসেবে পেতে। ভাবুন তো কেমন বিচ্ছিরি ব্যাপার। শিউলি হাসল শব্দ করে। কিন্তু আপনাকে যদি কেউ গিন্নী হিসেবে পেতে চায়, সেটা কি অন্যায়?

ওর হাতে একটা নাড়া দিলো শিউলি।

শিউলি পরক্ষণে বললো, একতরফা চাওয়াটা অন্যায় বইকি।

কথাটা তীরের ফলার মত এসে বিঁধল ওর বুকে।

শিউলি কি বলতে চায় জাহানারার সঙ্গে একতরফা প্রেম করে অন্যায় করেছে কাসেদ? না। আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না আমি। কাসেদ জোরের সঙ্গে বললো, ভালবাসা অন্যায় নয়। সে একতরফা হোক কিম্বা দু'তরফা। হাতখানা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে শিউলি অপূর্ব কণ্ঠে বললো, ধরুন আমি যদি আপনাকে ভালবাসি। আপনি কি তা সহজ করে নিতে পারেন? অবশ্য, আপনাকে ভালবাসতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই আসছে না।

কেন, কেন বলুন তো ; শিউলির কথার জবাব দিতে গিয়ে বিচলিত বোধ করলো কাসেদ। সে বুঝে উঠতে পারলো না আর পাঁচটি ছেলেকে যদি ভালবাসা যেতে পারে, ওকে কেন নয়।

শিউলি কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে, তারপর বললো, এসব কেনর উত্তর দেয়া কঠিন কাসেদ সাহেব। আমার তরফ থেকে কিছু বলতে গেলে বলতে হয়, আপনি বন্ধু হিসেবে অত্যন্ত ভালো, কিন্তু প্রেমিক হিসেবে নন। বলে মুখ টিপে হাসলো সে।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো কাসেদের।

হাত-পাগুলো ভেঙ্গে আসছে।

না, আমি তো বন্ধু হিসেবে জাহানারাকে পেতে চাইনে।

আমি চাই আরো আপন করে।

একান্তভাবে নিজের করে।

কেন, কেন আমাকে ভালবাসা যেতে পারে না? আবেগের চাপে গলাটা ভেঙ্গে আসছে তার। আপনি কি মনে করেন– কথাটা শেষ করতে পারলো না কাসেদ। শিউলির হাসির শব্দে থেমে গেলো। শিউলি বললো, আপনার কি যেন হয়েছে আজ। এসব বাদ দিয়ে এখন বাসায় ফিরে যান। আমারও হোস্টেলে যেতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাসেদ কোন জবাব দেবার আগেই রিক্সাওয়ালাকে হোস্টেলের পথে যাবার নির্দেশ দিলো শিউলি।

পথে আর কোন কথা হলো না।

শিউলি চুপ। ঠোঁটের কোণে শুধু একটুখানি হাসি। মাঝে মাঝে জেগে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

কাসেদ নীরব। মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে ওর।

সারা রাত ঘুমালো না সে।

সকালে স্নান সেরে বড় সাহেবের কাছে একখানা দরখাস্ত লিখলো কাসেদ। দিন সাতেকের ছুটি চাই।

এ সাত দিন কোথাও বেরুবে না সে।

একা ঘরে বসে থাকবে। শুধু ভাববে আর ভাববে।

কেন এমন হলো?

আগামী রোববার বাসায় আসবে বলেছে জাহানারা। কেন আসবে? কিছু কথা আছে তার। কি কথা?

একবার ডেকেছিল সেতারের মাস্টার ঠিক করে দেবার জন্য।

এবার হয়তো বলবে, মাস্টারের সঙ্গে আমার বিয়ের আয়োজন করে দাও।

কাসেদ যেন এ জন্যেই এসেছিলো জাহানারার জীবনে।

দরখাস্তখানা লিখে পকেটে রাখলো কাসেদ।

সাত দিনের ছুটি চাই তার। যদি না দেয় তাহলে, ও চাকরিই ছেড়ে দেবে সে। কি হবে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত গাঁধার খাটুনি খেটে?

তারচে' লিখবে সে। দিন রাত শুধু লিখবে আর লিখবে।

সেই ভালো।

দরখাস্ত নিয়ে অফিসে এসে, খবর শুনে বোবা হয়ে গেলো কাসেদ। বড় সাহেব আবার বিয়ে করছেন। বিয়ে করছেন মকবুল সাহেবের মেজো মেয়েকে।

আগেই জানতাম, এ না হয়ে পারে না। এক নম্বর কেরানী বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন, বলি নি আমি, এতো যে ছুটোছুটি এর পিছনে কিন্তু আছে, দেখলেন তো?

একাউন্টেন্ট বললেন, আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। বলে একটা লম্বা হাই তুললেন তিনি, কিন্তু কি বলেন, ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না? দুনিয়াতে কতো মেয়ে থাকতে কিনা ওই কালো কুৎসিত মেয়েটাকে– কথাটা শেষ করলেন না তিনি। অঙ্গভঙ্গী দিয়েই বাকিটুকু বুঝিয়ে দিলেন।

এক নম্বর কেরানী হাসলেন কাসেদের দিকে তাকিয়ে।

কাসেদ নিজের খবরটা বিশ্বাস করতে পারছিলো না। সেই সেদিন মকবুল সাহেবের বাড়িতে, সন্ধ্যার আবছা আলোয় আবিষ্কার করা মেয়েটি এখন গিন্নি সেজে বড় সাহেবের বাড়িতে এসে উঠেছেন ঘর-সংসার করার জন্য। ইচ্ছে করলে কাসেদও বিয়ে করতে পারতো।

তাহলে এখন বড় সাহেবের ঘরে না থেকে মেয়েটি থাকতো কাসেদের ঘরে। অফিস শেষে বাড়ি ফিরে গেলে ছুটে এসে দরজা খুলে দিত সে। হেসে বলতো, ফিরতে এতো দেরি হলো যে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাসেদ গম্ভীর গলায় বলতো, একগাধা কাগজ ফেলে আসি কি করে বল তো?

বলতে বলতে এক হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিতো সে আর অন্য হাতে কাছে টেনে নিতো তাকে।

কিন্তু এসব কি চিন্তা করে কাসেদ?

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, বেয়ারার হাতে দরখাস্তখানা বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলো কাসেদ।

একটু পরে বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন।

কাসেদ ভাবছিলো, কি বলে ছুটি নেবে।

কিন্তু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভাবনা মুহূর্তে দূর হয়ে গেলো।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো সে।

কোট-প্যান্ট নয় আজ পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে অফিসে এসেছেন তিনি। সারা মুখে পরিতৃপ্তির উজ্জ্বল আভা। দু'চোখে আনন্দের অপূর্ব ঝিলিক। যেন জীবনে এ প্রথম প্রেমে পড়েছেন বড় সাহেব। তার এ রূপ আর কখনো দেখে নি কেউ।

সাহেব মৃদু গলায় শুধোলেন, হঠাৎ ছুটি চাইছেন, কি ব্যাপার?

কাসেদ বললো, মায়ের ভীষণ অসুখ। সারাক্ষণ তার কাছে থাকতে হচ্ছে, তাই। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও একেবারে মিথ্যে নয়। সাহেব উৎকণ্ঠা জানিয়ে বললেন ভীষণ অসুখ, সেকি? ভালো দেখে ডাক্তার দেখিয়েছেন তো?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো কাসেদ, বললো, ডাক্তার বলেছে সব সময় রোগীর কাছে কাছে থাকতে, তাইতো– কথাটা শেষ করলো না সে।

টেবিলের ওপর থেকে কলমটা তুলে নিয়ে দরখাস্তের একপাশে কি যেন লিখলেন বড় সাহেব। বললেন ছুটি আমি দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এর মধ্যে মায়ের শরীর যদি ভালো হয়ে আসে, তাহলে অফিস করবেন এসে। নইলে অনেক কাজ জমা হয়ে পড়ে থাকবে।

দরখাস্তখানা টেবিলের এক পাশে রেখে দিয়ে বেয়ারাকে ডাকবার জন্য বেল টিপলেন বড় সাহেব। তাকে সালাম জানিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো কাসেদ।

রোববার দিন আসবে বলেছিলো জাহানারা।

এলো না।

সকাল থেকে বাসায় অপেক্ষা করেছে কাসেদ। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো, দুপুর পেরিয়ে বিকেল, তখনো না আসায় বিচলিত বোধ করলো সে। একবার মনে হলো, হয়তো সে আর আসবে না, কাপড় পরে বাইরে বেরুবার তোড়জোড় করলো। কিন্তু কাপড় পরা হয়ে গেলে মনে হলো যদি সন্ধ্যার পরে আসে সে, তাহলে? কাসেদকে ঘরে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে জাহানারা। কে জানে, কি কথা বলার আছে তার– এমনো হতে পারে শিউলি যা বলেছে তার সবটুকু মিথ্যা। হায় খোদা, যদি তাই হতো।

ভাবতে গিয়ে আর বাইরে বেরুনো হয় না তার।

কিন্তু সন্ধ্যার পরেও এলো না জাহানারা। রাতেও না।

বিরক্ত হয়ে রাত দশটার পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কাসেদ।

ফিরেছে রাত দুটো বাজিয়ে।

সে রোববার না এলেও পরের রোববারে এলো জাহানারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন বিকেল।

ঘরে এসে মায়ের মাথার কাছে বসলো সে।

অসুস্থ মা অনুযোগভরা কণ্ঠে বললেন, এতদিন পরে এলে মা।

জাহানারা মৃদু গলায় বললো, কাজ ছিলো।

কাজ ছিলো না হাতি ছিলো। অদূরে দাঁড়ানো কাসেদ আনমনে বিড়বিড় করে উঠলো।

মা অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখছিলেন তাকে। আর ফিরে তাকাচ্ছিলেন কাসেদের দিকে।

মা কি চান আর এ মুহূর্তে তিনি মনে মনে কি ভাবছেন তা ভালো করে জানে কাসেদ।

যাঁরা ধর্মপ্রাণ, খোদা নাকি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন, তবে কি মায়ের বাসনা বাস্তবে রূপ পাবে?

কাসেদ কি বিয়ে করতে পারবে জাহানারাকে?

ওহ! এসব কি ভাবছে সে।

মা আর জাহানারার সামনে থেকে সরে নিজের ঘরে চলে এলো কাসেদ। একটা বিষয় সে এখনো বুঝতে পারছে না। আজ আসার পরে থেকে কাসেদের সঙ্গে এখনো একটা কথাও বলে নি জাহানারা। বললে নিশ্চয় ওর সম্মান হানি হতো না।

সেতারের মাস্টারকে যদি ও বিয়ে করতে চায় করুক না, তাতে কাসেদের কোন বক্তব্য থাকবে না। ব্যথা যদি সহ্য করতে হয় নীরবে সহ্য করবে সে। পাশের ঘরে মা আর জাহানারা কি আলাপ করছে, সব এ ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছে কাসেদ।

মা এখন নাহারের বিয়ের কথা শোনাচ্ছে তাকে।

ওর বিয়ের পাকা কথা দিয়ে দিলাম রে। দিন তারিখ আসছে হপ্তায় ঠিক হবে। ছেলেটি বড় ভালো।

জাহানারা শুধালো, ছেলে কি ঢাকাতেই আছে?

মা বললেন, হ্যাঁ। ঢাকায় বাসা আছে ওর।

জাহানারা বললো, তাহলে ভালোই হলো, সব সময় আমাদের কাছে কাছে থাকবে।

তা মা আমি যত দিন বেঁচে আছি ওকে চোখের আড়াল করছি নে। বিয়ের পরেও ও আমার কাছে থাকবে। মা ভাঙ্গা গলায় বলছেন, ও আমার ডান হাত। ও কাছে না থাকলে আমি চোখে দেখিনে মা। বড় ভালো মেয়ে। লক্ষ্মী মেয়ে। অমনটি আর হয় না। বলতে গিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। কিন্তু থামলেন না। আবার বললেন, মেয়েদের পাঁচ দশটা স্বাদ আহলাদ থাকে। ওর তাও নেই। কোনদিন মুখ ফুটে কিছুই চায় নি সে আমার কাছে। বলতে গিয়ে একবার কেঁদে ফেললেন তিনি। কান্নায় বন্ধ হয়ে এলো তাঁর কণ্ঠস্বর।

নাহার ডাকলো, মা।

জাহানারা নীরব। কি বলবে হয়তো সে বুঝে উঠতে পাচ্ছিলো না। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে মা বললেন, যাও, তুমি এবার ও ঘরে গিয়ে বসো। নাহার, মা আমার ওদের জন্যে দু'কাপ চা বানিয়ে দে। কাসেদ বিছানায় বসে বসে এতক্ষণ ওদের আলাপ শুনছিলো।

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে সরে গেলো সে।

দরজার দিকে পেছন ফিরে থাকায় সেদিককার কিছুই এখন সে দেখতে পাচ্ছে না। দেখছে বাইরের আকাশ। যদিও সজাগ মন তার পেছনেই পড়ে আছে। জাহানারার পায়ের শব্দ শোনা গেলো এ ঘরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালার ওপর আরো ঝুঁকে এলো সে।

শব্দ থেমে গেছে।

কাসেদ আড়চোখে একবার তাকালো পেছনে।

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে জাহানারা। দেখছে ওকে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো। কাসেদ। ও, আপনি!

ও কখন এসেছে যেন জানে না সে।

জাহানারা মৃদু গলায় শুধালো, অমন তন্ময় হয়ে কি দেখছিলেন বাইরে?

কিছু না। এমনি দাঁড়িয়েছিলাম। সরে এসে বিছানায় বসলো কাসেদ, বসুন। চেয়ারটা টেনে জাহানারা বসলো। গত রোববার দিন আসবো বলেছিলাম। হঠাৎ একটা কাজ পড়ে যাওয়ায় আসতে পারি নি।

যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে সে।

কাসেদ বললো, অবশ্য আমিও বাসায় ছিলাম না। একটা কাজে সারাদিন বাইরে থাকতে হয়েছিলো। মিথ্যে কথাই বললো সে, কেন যে বললো হঠাৎ তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নিজেও খুঁজে পেলো না।

জাহানারা হেসে বললো, তাহলে না এসে ভালোই করেছি। কি বলেন?

কাসেদ হাসতে চেষ্টা করলো, পারলো না। টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে লাগলো জাহানারা। কিছু বলবে সে। কিন্তু, কোত্থেকে যে শুরু করবে তাই ভেবে উঠতে পারছে না। বার দুয়েক ব্যর্থ হয়ে অবশেষ জাহানারা বললো, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিলো আমার।

কাসেদ ঢোক গিলে বললো, বলুন।

বুকটা আবার অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে তার। হাত-পাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

বইটা বন্ধ করে জাহানারা বললো, আপনি হয়তো জানেন না যে শিউলি একটি ছেলেকে ভালবাসতো।

না, নাতো। কাসেদ অবাক হয়ে তাকালো জাহানারার দিকে। সে বুঝতে পারলো না জাহানারা হঠাৎ শিউলির প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছে কেন। স্বল্প বিরতি নিয়ে জাহানারা আবার বললো, ছেলেটি এখন ইটালিতে আছে। ফাইন আর্টসের ছাত্র সে।

কিন্তু– কিছু বলতে গেলো কাসেদ।

ওকে থামিয়ে দিয়ে জাহানারা আবার বললো, দু'বছরের ট্রেনিং-এ গেছে সে। ফিরে এসে ওদের বিয়ে হবে।

কিন্তু সেতো কোনদিন বলে নি আমায়। ঈষৎ বিস্মিত স্বরে কাসেদ বললো। আজ আপনার কাছ থেকেই প্রথম শুনছি।

জাহানারা স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর টেনে টেনে বললো, আপনি জানেন না বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। নইলে– সে থেমে গেলো হঠাৎ।

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, কিন্তু এসব আপনি কেন বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আপনি অবুঝ নন। জাহানারা পরক্ষণে বললো, কাউকে ভালবাসতে যাওয়ার আগে তার সব কিছু জেনে নেয়া উচিত, নইলে পরের দিকে অশেষ অনুতাপে ভুগতে হয়। বলতে গিয়ে চোখেমুখে রক্ত এসে জমেছে তার। কথাগুলো জড়িয়ে আসতে চাইছে বারবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাসেদ চমকে উঠলো।

কিছু বলতে যাবে এমন সময় চা হাতে নাহার এসে ঢুকলো ঘরে।

দু'জনের দিকে দু'কাপ চা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে উভয়ের দিকে তাকালো নাহার। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো সে।

টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে জাহানারা আবার বললো, অবশ্য শিউলি মেয়ে হিসেবে খারাপ নয়। আমার কাজিন। আমি ওকে ভালো করে জানি।

তাছাড়া আপনার সঙ্গেও মানাবে বেশ। কিন্তু কথাটা শেষ করলো না সে।

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, কি ভেবে আবার বসে পড়লো কাসেদ। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শুধালো, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

জাহানারা কথার জবাবে বললো, আমার অনধিকার চর্চার জন্যে হয়তো আপনি রাগ করেছেন। তাই ক্ষমা চাইছি।

কাসেদ বললো, ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু কথা কি জানেন, আপনি যে এই এতক্ষণ এত কিছু বললেন আমি তার কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছি না। শিউলিকে আমি ভালবাসি এ কথা আপনাকে কে বললো শুনি?

ভয় নেই। জাহানারা মৃদু হেসে বললো, আমি নিশ্চয় এ নিয়ে দশ জায়গায় আলোচনা করবো না।

কাসেদ বিরক্তির সঙ্গে বললো, আপনি ভুল করছেন। শিউলির সঙ্গে আমার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্বাস করুন।

সহসা গম্ভীর হয়ে গেল জাহানারা। স্থিরচক্ষে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। কি যেন খুঁজতে চেষ্টা করলো ওর দু'চোখের মণিতে। তারপর টেনে টেনে বললো, সেদিন বাসা থেকে ফিরে আসার পথে আপনি কি কিছু বলেন নি ওকে?

কাসেদ ভাবতে চেষ্টা করলো।

সেদিন অনেক কথা হয়েছে শিউলির সঙ্গে। অনেক আলাপ। সঠিক সব কিছু ভাবতে গিয়েও মনে হলো না তার।

ওকে চুপ থাকতে দেখে জাহানারা মৃদু হাসল। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অনেক রাত হয়ে গেলো, এখন উঠি তাহলে।

কাসেদ সঙ্গে সঙ্গে বললো, একটা ভুল ধারণা নিয়ে আপনি চলে যাবেন? বসুন।

আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

জাহানারা বসলো। বসে বললো, বলুন কি কথা।

পাশের ঘরে মা নামাজ শেষে টেনে টেনে সুর করে কোরান শরীফ পড়ছেন। শরীরটা আজ একটু ভালো যাচ্ছে তাঁর। তাই উঠে বসেছেন বিছানায়।

কাসেদ নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মেঝের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, সেদিন ওর সঙ্গে আমার তেমন কোন কথা হয়নি। যা হয়েছিল তার সবটুকু আমার মনে নেই। তবে যে কথাই হোক না কেন, তা থেকে আপনি যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তা– সত্যি বলতে কি হাসি পাওয়ার মতো।

জাহানারা মৃদু হাসলো। আপনার কাছে কৈফিয়ত চাই নি কাসেদ সাহেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কৈফিয়ত দিচ্ছিও না। সহসা রেগে গেলো কাসেদ। আপনি শুনতে চেয়েছিলেন তাই বলছিলাম। না করলে বলবো না। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে সরে গেলো সে।

দু'জনে নীরব।

পাশের ঘর থেকে শুধু মায়ের সুর করে কোরান পড়ার শব্দ আসছে ভেসে। ধীরে ধীরে রাত বাড়ছে বাইরে।

আকাশে অনেক তারা।

এবার চলি। পেছন থেকে জাহানারার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কাসেদ। ফিরে তাকালো না।

বললো, আসুন।

ঘরের মাঝখান থেকে জুতোর শব্দ ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে চলে গেলো। পাশের ঘরে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে জাহানারা।

কাসেদ তখনও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে।

মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার পরিণাম অবশেষে এই দাঁড়ায়। জাহানারার মাধ্যমে আলাপ হয়েছিলো। তারপর দেখা হলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতো। আলোচনা করতো। এর উর্ধ্বে অন্য কোন সম্পর্ক ছিলো না।

কে জানে হয়তো এটা জাহানারার একটা মনগড়া ব্যাপার। নিজে থেকে হয়তো একটা সিদ্ধান্ত টেনেছে সে। আর তাই নিয়ে ছুটে এসেছে কাসেদকে বলতে। বলতে নয় ঠিক, বকতে। কিন্তু কেন?

কাসেদ যদি শিউলিকে সত্যি ভালবেসে থাকে তাতে জাহানারার এত মাথাব্যথ্যা কেন। ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন একটু আলোর সন্ধান পেলো কাসেদ।

জাহানারা ভালবাসে ওকে।

শিউলি যা বলেছে সব মিথ্যে।

এতো অস্থিরতার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য মনটা ভালো হয়ে গেলো ওর। বেশ হাল্কা বোধ করলো সে।

কাল বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে জাহানারাদের বাসায় যেতে হবে তাকে। ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে সব। তুমি যা ভেবেছো তার সবটুকু মিথ্যে জাহানারা। শিউলির সঙ্গে আমার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। যদি কিছু থেকে থাকে সেতো তোমার সঙ্গে।

আমি তোমাকে ভালবাসি জাহানারা।

না। তা হয় না। মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আমাদের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে।

জাহানারা অটল।

না জাহানারা। একবার চেয়ে দেখো তোমাকে ভালবেসে আমি যে নিঃশেষ হয়ে গেলাম।

আমি একটি মেয়ে, ক'জনকে ভালবাসবো বলুন তো? জাহানারার চোখে মুখে কৌতুক।

শুধু আমাকে। শুধু আমাকে জাহানারা। কাসেদের গলার স্বর কাঁপছে। বুকের নিচে যন্ত্রণা।

বাইরে কাক ডাকছে। বোধ হয় ভোর হয়ে এলো।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো কাসেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখজোড়া জ্বালা করছে।

মাথা ঘুরছে।

সারা দেহে ঘাম ঝরছে ওর।

মা আর নাহার চাপাস্বরে কথা বলছে পাশের ঘরে।

ভোর হবার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে ওরা। সাংসারিক আলাপ আলোচনাগুলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ সময়ে সেরে নেয়।

কলতলায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাথায় জল ঢাললো কাসেদ।

মাথা তুলতে দেখে, নাহার তোয়ালে হাতে পেছনে দাঁড়িয়ে।

হাত বাড়িয়ে তোয়ালেখানা ওকে দিলো নাহার। আস্তে করে বললো, সাবান এনে দেবো?

তোয়ালেখানা হাতে নিয়ে কাসেদ বললো, না।

নাহার আর দাঁড়ালো না, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনি চলে গেলো সে।

ঘরে এলে মা শুধালেন, কিরে আজ এত সকাল-সকাল উঠলি যে?

কাসেদ সংক্ষেপে বললো, এমনি।

বেলা ন'টার সময় অফিসে যাবার জন্যে বেরুচ্ছে, মা কাছে ডাকলেন, পাশে বসিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলালেন ওর। বললেন, আজ একটু তাড়তাড়ি বাসায় ফিরে আসবি বাবা, আমার কেমন যেন লাগছে।

কাসেদ বললো, ভেবো না মা, তুমি খুব শিগ্গী ভালো হয়ে যাবে।

মা ম্লান হাসলেন।

বাসা থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ এসেছে, একখানা রিক্সা এসে থামলো সামনে।

শিউলি বসে, মিটিমিটি হাসছে সে।

মুহূর্তে বিগত বিকেলের কথা মনে পড়ে গেলো কাসেদের।

বাহ্, বেশ তো! রিক্সা থেকে দ্রুত নেমে এসে শিউলি বললো, আমি এলাম বাসায় আর আপনি চলে যাচ্ছেন?

আপনার কোন বাঁধন নেই, আমাকে অফিসে চাকুরি করে খেতে হয়। –যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো কাসেদ।

শিউলি বললো, সে আমি জানি। আর এও জানি আপনি একজন অনুগত কেরানী। কাজ ফেলে বসে থাকেন না। মিষ্টি করে কথাটা বললো সে, বলে হেসে উঠলো তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে।

কাসেদ তেমনি গম্ভীর স্বরে বললো, বাসায় মা আছেন, নাহার আছে, যান না, ওদের সঙ্গে গল্প করে বেশ কিছুটা সময় কাটবে আপনার। আমি ওদের কাছে আসি নি তা আপনি জানেন, শিউলির কণ্ঠস্বর সহসা পাল্টে গেলো।

কাসেদ ইতস্তত করে বললো, তাহলে কার কাছে এসেছেন?

তাও আমাকে বলতে হবে? ভ্রূজোড়া বিস্তারিত করে অপূর্ব ভঙ্গীতে হাসলো শিউলি, তাহলে শুনুন, আমি আপনার কাছে এসেছি এবং আপনার কাছেই আসি।

কিন্তু কেন? উত্তেজিত গলায় কাসেদ শুধালো, আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই যার জন্যে আপনি আমার কাছে আসতে পারেন। সারা মুখ কালো হয়ে গেলো শিউলির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠোঁটের কোণে একসূতো হাসি জেগে উঠলো ধীরে ধীরে, তারপর সে হাসি অতি সুক্ষ্ম ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়লো তার সম্পূর্ণ ঠোঁটে, চিবুকে, চোখে, সারা মুখে।

শিউলি মৃদু গলায় বললো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া না করে, আসুন রিক্সায় উঠুন। ভয় নেই আপনাকে নিয়ে আমি কোথাও পালিয়ে যাবো না, অফিসে নামিয়ে দিয়ে আমার হোস্টেলে ফিরে যাবো।

কাসেদ বললো, আমি রোজ হেঁটে যাই, আজও যেতে পারবো।

শিউলি বললো, দেখুন মেয়েমানুষের মত রাগ করবেন না, উঠুন, রিক্সায় উঠুন। শিউলির চোখের দিকে তাকিয়ে এবার আর না করতে পারলো না কাসেদ, নীরবে উঠে বসলো সে।

রিক্সাওয়ালাকে যাবার জন্যে নির্দেশ দিয়ে শিউলিও উঠে বসলো পাশে। আজ একটু ছোট হয়ে বসতে চেষ্টা করলো কাসেদ।

শিউলির গায়ে গা লাগতে পারে সেই ভয়ে।

শিউলি আড়চোখে এক পলক দেখে নিয়ে মৃদু হাসলো। হেসে বললো, আপনারা পুরুষ মানুষগুলো এত সহজে বদলে যেতে পারেন যে কি বলবো!

কাসেদ চুপ করে থাকবে ভেবেছিলো, কিন্তু জবাব না দিয়ে পারলো না। অন্য পুরুষের কথা আমি বলতে পারবো না। নিজে আমি সহসা বদলাই নে। আমি যা ছিলাম তাই আছি, তাই থাকবো।

তাই নাকি? চোখজোড়া বড় বড় করে ওর দিকে তাকালো শিউলি। শুনে বড় খুশি হলাম। কিন্তু জনাব, একটা কথা যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে রাগ করবেন না তো? মুখ টিপে হাসছে শিউলি।

কাসেদ বললো, বলুন।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে শিউলি ধীরে ধীরে বললো, সেদিন বিকেলে সেই একসঙ্গে রিক্সায় চড়ে হাতে হাত রেখে বেড়ানো আর মাঝে মাঝে একটা কি দুটো কথা বলা এর সবটুকুই কি মিথ্যা। মুখখানা নুইয়ে ওর চোখে চোখে তাকাতে চেষ্টা করলো শিউলি।

সহসা কোন উত্তর দিতে পারলো না সে।

একটু পরে কি ভেবে বললো, আপনি যা ভাবছেন সে অর্থে মিথ্যে।

আমি কি ভেবেছি তা আপনি বুঝলেন কি করে?

কারণ আমি শুনেছি সব। কাসেদ বিরক্তির সঙ্গে বললো : জাহানারা এসেছিলো বাসায়, কাল বিকেলে।

শিউলি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভাবলো সে।

রিক্সাটা কাসেদের অফিসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে।

শিউলি আস্তে করে বললো, সেদিন আপনি একটা অনুরোধ করেছিলেন, আমি রেখেছিলাম। আজ আমার একটা কথা আপনি রাখবেন? ওর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য আবেগ।

নড়েচড়ে বসে কাসেদ শুধালো, কি কথা বলুন?

শিউলি ধীর গলায় বললো, আজ বিকেলে আমি নিউ মার্কেটের মোড়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো, আপনি আসবেন, কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। আসবেন তো?

রিক্সা থেকে নেমে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো কাসেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর মৃদুস্বরে বললো, চেষ্টা করবো।

চেষ্টা করবো নয়, অবশ্যই আসবেন।

ততক্ষণে অফিসের দোড়গোড়ায় পা দিয়েছে কাসেদ।

শিউলি রিক্সা নিয়ে তখনো দাঁড়িয়ে রইলো, না চলে গেলো, একবার ফিরেও দেখলো না সে।

অফিসে এখন আর সে উত্তেজনা নেই।

সব শান্ত।

মকবুল সাহেব পক্ষাঘাত রোগে এখনও বিছানায় পড়ে আছেন। ভালো হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

পরস্পরের কাছ থেকে শোনা যায় আজকাল আর আগের সে আর্থিক অনটন নেই তাঁর। বড় সাহেবের শ্বশুর এখন, বেশ সুখেই আছেন। বড় সাহেবও বেশ সুখী।

রোজ দুপুরে মকবুল সাহেবের মেয়ে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে তাঁর জন্যে। পরনে সুন্দর একখানা শাড়ি, মাথায় ছোট একটা ঘোমটা, হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার, পায়ে পাতলা স্যাণ্ডেল। নিঃশব্দে মেয়েটি উঠে আসে ওপরে। হাল্কা পায়ে সে এগিয়ে যায় বড় সাহেবের কামরার দিকে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে খায়। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে নীরবে আবার বাড়ি ফিরে যায় মেয়েটি।

প্রথম প্রথম অফিসের সবাই মুখ টিপে হাসতো। চাপা স্বরে আলোচনা চলতো ওদের নিয়ে।

আজকাল তাও বন্ধ।

শুধু মেয়েটি যখন আসে আর সামনে দিয়ে হেঁটে বড় সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় তখন কি একটা অস্বস্তিতে ভোগে কাসেদ।

ইচ্ছে করে মেয়েটিকে দেখতে।

কিন্তু ও যখন আসে তখন ওর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েও পারে না সে। কোথা থেকে একটা জড়তা এসে সারা দেহ গ্রাস করে নেয় ওর। মেয়েটি ওর বউ হতে পারতো।

ইচ্ছে করলে ওকে বিয়ে করতে পারতো কাসেদ।

হয়তো ওকে নিয়ে বেশ সুখী হতে পারতো সে। আজ বড় সাহেবের জন্যে খাবার নিয়ে আসে, সেদিন কাসেদের জন্যে আসতো মেয়েটি।

দু'জনে এক সঙ্গে খেতো ওরা।

কথা বলতো।

গল্প করতো।

কত না আলাপ করতো খেতে বসে।

কিন্তু জাহানারা।

জাহানারা, একি করলে তুমি?

অফিসের কাজ করতে বসে একটুও মন বসল না ওর। গতদিন বিকেলের ছবিটা বার বার ভেসে উঠছে চোখে। জাহানারার প্রতিটি কথা আবার নতুন করে কানে বাজছে এখন। টাইপরাইটারটা একবার কাছে টেনে নিয়ে আবার দূরে ঠেলে দিলো সে। হঠাৎ সামনে টেবিলের উপর বিছানো কাগজের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল কাসেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারার নাম লিখে সম্পূর্ণ কাগজটা ভরিয়ে তুলেছে সে।

চারপাশে দ্রুত তাকিয়ে নিয়ে একটা কলম দিয়ে ধীরে ধীরে নামগুলো কেটে ফেললো সে।

কাটতে গিয়ে একটুখানি ম্লান হাসলো সে।

ওর জীবনে থেকেও জাহানারার নামটাকে হয়তো এমনি করে কেটে ফেলতে হবে একদিন।

অফিস থেকে বেরুবার আগে মন স্থির করে নিয়েছিলো কাসেদ। বিকেলে যাবে জাহানারার ওখানে। কাল যে ভুল বুঝাবুঝির মধ্য দিয়ে সে চলে এসেছে তা দূর করে আসবে আজ।

যে কথাটা এতদিন বলে নি, বলতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছে। আজ সে কথাটা ওকে খুলে বলবে সে। হয়তো শুনে হাসবে জাহানারা। শব্দ করে হেসে উঠবে, তবু বলবে কাসেদ।

যা হবার হোক।

জীবনে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে চায় সে।

জাহানারাদের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর মনে হলো কে জানে হয়তো আজ এখানে এই শেষ আসা।

বুড়িটা বাচ্চা কোলে নিয়ে বারান্দায় বসেছিলো। ডেকে এনে ওকে বসালো ভেতরে। বললো, বয়েন, উনি উপরে আছেন, খবর দিই গিয়া। বলে সে চলে গেলো ভেতরে। সেই যে গেলো অনেকক্ষণ আর তার দেখা নেই। একা ঘরে বসে বসে ক্লান্তিবোধ করলো সে। উঠে দাঁড়িয়ে বারকয়েক পায়চারী করলো। বসলো, আবার উঠে দাঁড়ালো।

জাহানারা এলো না, এলো সেই বুড়ি। ওর মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শুধালো, আপনার নাম কি?

কাসেদ নাম বলতে আবার ভেতরে চলে গেলো বুড়ি।

আবার সব চুপ।

অনেকক্ষণ হলো কারো আসার লক্ষণ দেখা গেলো না।

চোখ মেলে প্রতিনিয়ত দেখা দেয়াল আর কড়িকাঠগুলো দেখতে লাগলো কাসেদ।

কিভাবে জাহানারার সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে, মনে মনে একবার তার মহড়া করে নিলো।

তবু কেউ আসে না।

অবশেষে এল।

জাহানারা নয়। বুড়িটিও নয়। ওদের বাচ্চা চাকরটা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কাসেদ।

চাকরটা মৃদু হেসে বলল, আপাজানের শরীর খারাপ, আজ দেখা হবে না। অন্যদিন আসতে বলেছে।

শরীর খারাপ বলে নিচে নেমে এসে একবার কাসেদের সঙ্গে দেখাও করতে পারলো না জাহানারা? এর আগে জ্বর নিয়েও ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছে সে, কাসেদ নিষেধ করলেও আমল দেয়নি।

আর আজ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা সহসা বিশ্বাস হতে চাইলো না ওর।

চাকরটা মৃদু হেসে চলে গেলো ভিতরে।

হাসলো না, যেন বিদ্রুপ করে গেলো ওকে।

আবার একা।

ঘরের মধ্যে বারকয়েক পায়চারি করলো কাসেদ। ভালো লাগছে না, বারবার করে মনে হলো, জাহানারা আজ ইচ্ছে করে অপমান করলো তাকে। সে কোন অপরাধ করে নি তবু তাকে শাস্তি দিলো জাহানারা। কাসেদের মনে হলো পুরো দেহটা জ্বলছে ওর।

অপমান আর অনুশোচনার তীব্র জ্বালা যেন পাগল করে তুলেছে তাকে। কেন ওকে ভালবাসতে গেল সে!

সামান্য ভদ্রতা আর সহজ মানবিক বৃত্তিগুলোও হারিয়ে ফেলেছে জাহানারা। অতি নিচে নেমে গেছে সে।

ওর তুলনায় সালমা অনেক বড়ো। অনেক উদার মনের মেয়ে সে। দেখতে শুনতেও সে খারাপ নয়। প্রাণভরে কাসেদকে ভালবাসতো সালমা। মুহূর্তের জন্যে কাসেদের মনে হলো সালমার ডাকে সেদিন সাড়া না দিয়ে মস্ত বড় ভুল করেছে সে।

আর শিউলি?

শিউলির কথা মনে হতে কাসেদের মনে পড়লো, সন্ধ্যার আগে আগে শিউলি ওর জন্যে অপেক্ষা করবে বলেছে নিউমার্কেটের মোড়ে।

শিউলির পাশে জাহানারাকে আজ অনেক ছোট মনে হলো কাসেদের। শিউলির হাসি। কথা। আলাপের ভঙ্গী আর বাচ্চা মেয়ের মতো ব্যবহার সব সুন্দর। অন্তত জাহানারার চেয়ে।

AMARBOI.COM

সন্ধ্যার স্বল্প আলোয় শিউলিকে ছায়ার মত মনে হলো।

রাস্তার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে সে।

উচ্ছ্বাস নেই। উচ্ছলতা নেই।

মৃদু হেসে শুধু শুধালো, এলেন তাহলে? ভেবেছিলাম হয়তো আর আসবেন না।

কাসেদ বললো, আমি তো না করি নি।

ওর এলোমেলো চুল, ছন্নছাড়া দৃষ্টি আর ক্লান্ত মুখের দিকে সন্ধানী চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো শিউলি।

কাসেদ ম্লান গলায় জিজ্ঞেস করলো, অমন করে কি দেখছেন?

হাতের ব্যাগটা এ হাত থেকে অন্য হাতে সরিয়ে নিতে নিতে শিউলি বললো, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছেন।

কাসেদ বললো, অনেকটা তাই।

শিউলি বললো, তার মানে?

কাসেদ বললো, লড়াই শুধু রাজার সঙ্গে রাজার, এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের আর এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশেরই হয় না। একটি মনের সঙ্গে অন্য একটি মনেরও লড়াই হয়।

শিউলি মুখ টিপে হাসলো, তার মানে আপনি এতক্ষণ অন্য একটি মনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন, তাই না? শিউলি থামলো। থেমে আবার বললো, সে মনটি কার জানতে পারি কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাসেদ নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, সে মনও আমার। আমার নিজের। একজন চায় স্বার্থপরের মত শুধু পেতে। অন্যজন পেতে জানে না, জানে শুধু দিতে। বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই তার আনন্দ।

শেষেরটাকেই আমার ভালো লাগে। কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে শিউলি বললো, আমার আপনার মধ্যে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় মিল আছে।

কোথায়? আস্তে করে শুধালো কাসেদ।

শিউলি মিষ্টি করে বললো, তা তো জানি না।

ওর শান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে বড় ভালো লাগলো কাসেদের। মৃদু গলায় সে বললো, একটা কথা বলবো মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছি।

কি কথা? শিউলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে।

কাসেদ কি ভেবে শুধালো, আপনি কেন ডেকেছিলেন তাতো বললেন না। কেন ডেকেছি তাতো আমি নিজেও জানি না। শুধু জানি ডাকতে ইচ্ছে করছিলো। হয়তো কিছু বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু– সহসা চুপ করে গেলো শিউলি।

কাসেদ বললো, আমি কিন্তু বলবো বলেই এসেছি।

বলুন।

চলুন আমরা দু'জনে বিয়ে করি। এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে ফেললো কাসেদ। সে কথাটা জাহানারাকে বলার জন্যে দীর্ঘ দিন ধরে মনের সঙ্গে লড়াই করছিলো, সে কথাটা শিউলিকে মুহূর্তেই বলে দিলো সে।

শিউলি চমকে উঠলো।

দু'জনে নীরব।

কারো মুখে কথা নেই।

কাছে, দূরে অনেক লোক। হাঁটছে। হাসছে। কথা বলছে। চিৎকার করে ডাকছে একে অন্যকে। তবু মনে হলো গোরস্তানের নির্জনতা যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে চারপাশের মুখরতাকে।

শিউলির ঠোঁটের একটি কোণে এক সুতো হাসি জেগে উঠলো সহসা। সে হাসি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো। তার পুরো ঠোঁটে, চিবুকে, চোয়ালে, চোখে, সারা মুখে।

মুহূর্তে শব্দ করে হেসে উঠলো শিউলি। আপনি কি আজ অসুস্থ?

না। মোটেই না।

তাহলে এসব কি বলছেন?

যা তুমি চাও, আজ সকালেও চেয়েছিলে, আমি তাই বলছি শিউলি।

শিউলি আবার হাসলো, মনে হচ্ছে আমার চাওয়া না চাওয়া সবটুকুই আপনি জানেন।

আজকের সকালটা যদি মিথ্যে না হয়ে থাকে, তাহলে বলবো জানি এবং সবটুকুই জানি।

আর আমি বলি আপনি কিছুই জানেন না। শিউলি গম্ভীর হয়ে এলো। মুখে এখন হাসির চিহ্নটুকুও নেই। ম্লান গলায় সে বললো, আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ চিনতে পারলো না।

কেন জানি না, সবাই ভুল বোঝে আমায়। হয়তো এই আমার ভাগ্যে লেখা ছিলো।

এসব কি বলছো শিউলি?

কাসেদ অবাক হলো, কথা বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো ওর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিউলি বললো, আপনাকে অন্য আর পাঁচজনের চেয়ে ভিন্ন মনে করতাম বলেই হয়তো এতো সহজভাবে মিশতাম। কিন্তু– বলতে গিয়ে থামলো সে। কপালে ভাঁজ ফেলে কি যেন ভাবলো, ভেবে বললো, আপনিও শেষে ওদের মতো হয়ে যাবেন এ আমি ভাবিনি কোন দিন।

কাসেদের বুঝতে আর বিলম্ব হলো না সন্ধেবেলার এই শিউলির সঙ্গে সকালের সেই শিউলির কোন মিল নেই। এরা যেন দু'টি ভিন্ন মেয়ে। সম্পূর্ণ আলাদা।

কিন্তু কেন?

কেন এমন হলো?

শিউলি!

বলুন।

একটি দিনের মধ্যেই কি মানুষ এত বদলে যেতে পারে?

আমিও তাই ভাবছি। সকালের সঙ্গে বিকেলের আপনার যেন কোন মিল নেই।

আর তুমি? তুমি কি সেই সকালের মেয়েটি আছো?

আমি? আমার কথা বাদ দিন। আমি যে কখন কি অবস্থায় থাকি, সে আমি নিজেও জানি না।

বাহ্ চমৎকার।

কাসেদের দিকে চমকে তাকালো শিউলি। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, আমার দিক থেকে যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে আমি মাফ চাইছি কাসেদ সাহেব।

সত্যি আমি অপারগ, নইলে–।

কথাটা শেষ করলো না সে।

কাসেদের মনে হলো শিউলি হাসছে।

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ঠোঁটের কোণজোড়া জ্বলছে ওর।

কাসেদ হেরে গেলো।

প্রথম পরাজয়ের গ্লানি মুছে যাবার আগেই দ্বিতীয় বার পরাজিত হলো সে। নিজের বোকামির জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো ওর। আগুনে হাত বাড়ালে পুড়বে জানতো।

তবু কেন সে এমন করলো?

রাত বাড়ছে।

রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

আরো অনেক ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেছে শিউলি।

শিউলি আর জাহানারা, ওরা দুই নয়, এক।

একের এপিঠ আর ওপিঠ।

বাসায় ফিরতে অনেক রাত হলো ওর।

খালু এসে দরজা খুলে দিলেন।

এত রাতে তাঁকে দেখে অবাক হলো কাসেদ। মুখখানি ক্লান্ত আর বিমর্ষ।

কোন প্রশ্ন করার আগে খালু চাপাস্বরে বললেন, তুমি এসেছো? এসো. শব্দ করো না।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরের সবটুকু দেখতে পেলো কাসেদ। মা বিছানায় শুয়ে. মাথার একপাশে নাহার বসে। অন্য পাশে খালাম্মা। চাপাস্বরে মাকে কি যেন বলছেন খালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালু বললেন, বড়বু'র শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে। ভাগ্যিস আমরা এসেছিলাম, নইলে কি যে হতো, কথা বলতে বলতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো ওরা।

মা এতক্ষণে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তাকালেন এবার। বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। নাহার উঠে দাঁড়িয়ে কাসেদকে বসবার জায়গা করে দিলো। মায়ের পাশে এসে বসলো কাসেদ।

রুগ্ন হাতখানা ওর দিকে বাড়িয়ে আস্তে করে বললেন, এসেছিস বাবা। শীর্ণ ঠোঁটে ম্লান হাসলেন তিনি। ফিসফিস করে আবার বললেন, এত রাত হোল কেন তোর? অনিয়ম করে শরীরটাকে তো শেষ করলি বাবা। মায়ের কপালে হাত বুলাতে বুলাতে কাসেদ বললো, তুমি এখন ঘুমোও মা।

মা চুপ করে গেলেন।

খালা একটা শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে খাওয়ালেন তাঁকে।

কাসেদ উঠতে যাচ্ছিলো, শার্টে টান পড়ায় আবার বসে পড়লো।

মা বললেন, যাচ্ছিস কোথায়? আমার পাশে বোস।

আর কোন কথা বললেন না মা। নীরবে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন ওকে।

রাত বেড়ে চললো।

আরো, রাত হলে পরে, মাকে দেখাশোনার ব্যাপারে প্রচুর উপদেশ দিয়ে খালা খালু বিদায় নিলেন।

নিজের ঘরে এসে নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইলো কাসেদ।

বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলো কিছুক্ষণ।

আকাশ-পাতাল অনেক ভাবলো। কি যে ভাবলো সে নিজেও বলতে পারে না।

মাঝে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো সে।

নাহার এসে দাঁড়ালো দরজায়।

মা ডাকছেন আপনাকে।

হুঁ। কাসেদ উঠে দাঁড়ালো।

মা শান্তভাবে শুয়ে আছেন বিছানায়। দেহটা সাদা লেপে ঢাকা। একটুও নড়ছেন না তিনি।

কাছে আসতে মা বললেন, বোস, তোকে কতগুলো কথা বলার জন্যে ডেকেছি। কাসেদ বললো, একি কথা বলার সময় মা, তোমার এখন ঘুমোনো উচিত। নইলে শরীর খারাপ করবে যে।

মা ম্লান হাসলেন, বললেন, শরীর আমার ঠিক আছে বাবা। বলে কিছুক্ষণ থামলেন তিনি। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছিলো। আঁচল দিয়ে সেগুলো মুছে নিয়ে বললেন– একটা কথা মনে রাখিস, খোদা আমাদের এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। মারা যাবার পরে আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবো। খোদা তাদেরই ভালো চোখে দেখেন যারা ধর্মকর্ম করে। কোরান-হাদিস মেনে চলে। তোর বাবা– বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো তাঁর। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তোর বাবা এসব কোনদিনও মানেননি। তুই তাঁর মত হবি আমি চাই নে। আবার থামলেন মা। কড়িকাঠের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, দুনিয়াটা কিছু না বাবা, এখানে লোভ করতে নেই, তাহলে আখেরে ঠকতে হয়।

মায়ের গলার স্বরটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে।

নাহার পায়ের কাছে বসে।

কাসেদ তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললো, তুমি এখন চুপ করো মা, ঘুমাও।

মা শুনলেন কিনা বোঝা গেলো না। অন্যমনস্ক চোখজোড়া কড়িকাঠ থেকে নামিয়ে এনে তিনি বললেন, আরেকটা কথা বাবা, আমি যখন মারা যাবো তখন লক্ষ্য রাখিস আমি যেন কলেমা পড়তে পড়তে মরি। আর আমি মরে গেলে, কবর দেবার সময় বাইরের কোন লোককে আমায় দেখাসনে বাবা। মা থামলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ঘামানোর পর এখন ঘাম একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। গায়ের লেপটা টেনে নিতে নিতে ক্লান্ত স্বরে মা বললেন, যাও বাবা, এবার তুমি ঘুমোও গিয়ে।

কিন্তু ঘুমোনো হলো না তার।

ভোররাতের দিকে ঈষৎ তন্দ্রায় চোখজোড়া জড়িয়ে এসেছিলো। নাহারের ডাকে চমকে জেগে গেলো সে।

দেখে যান। মা কেমন করছেন। নাহারের কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠায় ভরা। কাসেদের বুকের ভেতরটা আতঙ্কে মোচড় দিয়ে উঠলো।

সহসা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে মায়ের ঘরে গেলো সে।

সেই মাঝরাতে যেমনি ছিলেন তেমনি শুয়ে মা।

চোখজোড়া খোলা, কড়িকাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। কাসেদ সামনে এসে দেখলো দু'চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে।

জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন মা।

শুকনো ঠোঁটজোড়া নেড়ে কি যেন বলতে চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু কোন কথা বেরুচ্ছে না, শুধু একটা কর্কশ আওয়াজ বেরুচ্ছে ভেতর থেকে। কাসেদ ডাকলো, মা!

মা আবার চেষ্টা করলেন কিছু বলতে। বলতে পারলেন না।

অসহায়ের মত চারপাশে এক পলক তাকালো কাসেদ। সহসা দেহটা কেঁপে উঠলো তার। ভয় করতে লাগলো।

একটা বাটি থেকে মায়ের মুখে এক চামচ পানি তুলে দিতে দিতে নাহার কাঁপা গলায় বললো, মা কলেমা পড়, মা কলেমা পড়।

হঠাৎ মায়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো কাসেদ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সেও বললো, মা শুনছো? মা কলেমা পড়ো, মা গো।

কিছু বলবার জন্যে মা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

নাহার বললো, মা কলেমা পড়ো।

কাসেদ বললো, মা, মাগো, কলেমা।

সহসা মায়ের কণ্ঠ শোনা গেলো। মা বললেন, বাবা আমি চললাম, তোরা সাবধানে থাকিস।

মা চুপ করে গেলেন।

চামচে করে দেয়া পানি মুখ থেকে চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়লো বিছানার ওপর।

মা, মাগো, বলে নাহার চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

কাসেদ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলো বিছানার পাশে। বাইরে রাত ভোর হচ্ছে এখন। একটু আগে এখানে তিনটি প্রাণী ছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন দু'টি। একটি হারিয়ে গেছে সময়ের স্রোতে।

কাসেদ কাঁদলো না। কান্না এলো না তার। হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেছে সে।

আজ সকালে খালু এসে নাহারকে নিয়ে গেছেন ওদের বাড়িতে। কাল ওর বিয়ে।

মা মারা যাবার পর ক'দিন মেয়েটা একটানা কেঁদেছে। শেষের দিকে শুধু চোখ দিয়ে পানি ঝরতো কোন আওয়াজ বেরুতো না।

মায়ের শূন্য বিছানার পাশে বসে বসে কি যেন ভাবতো সে।

আজ সেও চলে গেছে।

যাবার আগে পা ছুঁয়ে সালাম করে গেছে তাকে।

বলেছে, ছোট্ট করে বলেছে, যাই।

এখন এ বাড়িতে কাসেদ একা।

চারপাশটা কেমন ফাঁকা লাগছে ওর।

মনটা শূন্য।

সারাদিন বাইরে বেরুলো না কাসেদ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটালো। একবার এপাশ আর একবার ওপাশ। আর সারাক্ষণ অনেক কিছু কথা ভাবলো সে। অনেকের কথা মনে পড়লো।

মায়ের বড় ইচ্ছে ছিলো জাহানারাকে বউ করে আনবে ঘরে। মুখ ফুটে কোনদিন না বললেও বেশ বুঝতে পারতো কাসেদ। মায়ের ইচ্ছাটা গোপন ছিলো না।

কিন্তু জাহানারা?

থাক, যার নাম জীবন থেকে মুছে গেছে তাকে স্মৃতির পাতায় ঠাঁই দিয়ে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। ওকে নিয়ে অনেক ভেবেছে কাসেদ। শিউলিকে নিয়েও কম ভাবেনি সে। দুই দেহ, এক মন। মেয়ে জাতটাই বোধ হয় অমনি।

না, তা নয়? সালমা তো ওদের মত নয়। আর মকবুল সাহেবের মেয়ে? কত শান্ত, কত সরল। বড় সাহেবের জীবনটাকে কি সুন্দর করে তুলেছে সে। ওরা কত সুখী।

না, কাসেদ বিয়ে করবে না।

একা থাকবে।

মাঝে একটু তন্দ্রা এসেছিলো। একটা বড় ইঁদুরের কিচ কিচ শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেলো ওর। বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো সে।

খোলা জানালা দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে ঘরের মাঝখানে। কাসেদ বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে সরে গেলো। বাইরের আকাশটা মেঘে ছেয়ে আছে।

কোথাও মেঘের রঙ কালো, কোথাও সাদা, কোথাও ঈষৎ লাল। এখন শেষ বিকেল।

লাল সূর্যটা হারিয়ে গেছে উঁচু উঁচু দালানের ওপাশে। ওটাকে এই জানালা থেকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু তার শেষ আভাটুকু বাড়িগুলোর মাথার ওপর দিয়ে আকাশে ছড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে দূরের দিগন্তে কোথাও যেন আগুন লেগেছে। তার উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্যে টুকরো টুকরো মেঘগুলো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে আরেক দিগন্তের দিকে।

বাতাস বইছে জোরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের বাড়ির ছাদে মেলে দেয়া কুমারী মেয়ের হাল্কা নীল শাড়িখানা বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে পতপত করে।

আরো দূরের আকাশে একটা চিল একা একা ঘুরছে। শেষ বিকেলের সোনালি আভায় মসৃণ পাখাটি চিকচিক করছে তার।

পুরো শহরটা একটা থমথমে ভাব নিয়ে রাত্রির অপেক্ষা করছে। সহসা বাইরের দরজায় কড়াটা নড়ে উঠলো।

একবার।

দু'বার।

তিনবার।

কাসেদ ঠিক ভেবে উঠতে পারলো না এ সময়ে তার কাছে কে আসতে পারে। মা মারা যাবার প্রথম দু'দিন আত্মীয়-স্বজন অনেকে দেখা করতে এসেছিলো। আজকাল তারা আসে না।

তবে কে আসতে পারে এমনি বিকেলে?

দরজাটা খুলে দিতে কাসেদ অবাক হয়ে দেখলো নাহার দাঁড়িয়ে। এক হাতে খোলা কপাটটা ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

পরনের সাদা শাড়িটায় হলুদ মাখানো। হলুদ ছড়ানো সারা দেহে তার। হাতে মেহেদি, গাঢ় লাল।

কাসেদ বিস্মিত গলায় বললো, একি নাহার তুমি!

কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ভেতরে এলো নাহার। তারপর আলতো চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, এতকাল যার সাথে ছিলাম, তাকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না বলে চলে এসেছি। যেতে বলেন তো আবার ফিরে যাই।

কাসেদ বিস্ময় বিমূঢ় স্বরে বললো, কাল তোমার বিয়ে আর আজ হঠাৎ এখানে চলে আসার মানে?

নাহার নির্বিকার গলায় বললো, বিয়ে আমার হয়ে গেছে।

কার সাথে? কাসেদ চমকে উঠল যেন।

ক্ষণকাল ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নাহার। তারপর অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বললো, যার সাথে হয়েছে তার কাছেই তো এসেছি আমি। তাড়িয়ে দেন তো চলে যাই। কাসেদ বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওর হলুদ মাখানো মুখের দিকে। কিছুতেই সে ভেবে পেলো না, সেই চাপা মেয়েটা আজ হঠাৎ এমন মুখরা হয়ে উঠলো কেমন করে?

পেছনের দরজাটা বন্ধ করতে করতে সে শুধু মৃদু গলায় বললো, চলো, ও ঘরে চলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার বছর ধরে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্রজ

শহীদুল্লাহ্ কায়সারকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্ত বড় অজগরের মত সড়কটা একেঁবেঁকে চলে গেছে বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে।

মোঘলাই সড়ক।

লোকে বলে, মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে শাহ সুজা যখন আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন যাবার পথে কয়েক হাজার মজুর খাঁটিয়ে তৈরি করে গিয়েছিলো এই সড়ক।

দু'পাশে তার অসংখ্য বটগাছ। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দীর্ঘকাল ধরে। ওরা এই সড়কের চিরন্তন প্রহরী।

কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা।

মাঝে মাঝে ধান ক্ষেত সরে গেছে দূরে। দু'ধারে শুধু অফুরন্ত জলাভূমি। অথৈ পানি। শেওলা আর বাদাবনের ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুলিয়ে নাচে অগুণিত শাপলার ফুল।

ভোর হতে আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা ছুটে আসে এখানে। এক বুক পানিতে নেমে শাপলা তোলে ওরা। হৈ-হুল্লোর আর মারামারি করে কুৎসিত গালাগাল দেয় একে অন্যকে। বাজারে দর আছে শাপলার। এক আঁটি চার পয়সা করে।

কিন্তু এমনো অনেকে এখানে শাপলা তুলতে আসে, বাজারে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করা যাদের ইচ্ছে নয়।

মন্তু আর টুনি ওদেরই দলে।

ওরা আসে ধল-পহরের আগে, যখন পূর্ব আকাশে শুকতারা ওঠে। তার ঈষৎ আলোয় পথ চিনে নিয়ে চুপি চুপি আসে ওরা। রাতে শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে ধীরে। টুনি ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মন্তু নেমে যায় পানিতে।

তারপর, অনেকগুলো শাপলা তুলে নিয়ে, অন্য সবাই এসে পড়ার অনেক আগে সেখান থেকে সরে পড়ে ওরা।

পরীর দীঘির পাড়ে দু'জনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। শাপলার গায়ে লেগে থাকা আঁশগুলো বেছে পরিষ্কার করে।

মন্তু বলে, বুড়ো যদি জানে তোমারে আমারে মাইরা লাফাইবো।

টুনি বলে, ইস, বুড়ার নাক কাইটা দিমু না।

নাক কাইটলে বুড়ো যদি মইরা যায়?

মইরলে তো বাঁচি। বলে ফিক করে হেসে দেয় টুনি, বলে, পাখির মত উইড়া আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু। বলে আবার হাসে সে, সে হাসি আশ্চর্য এক সুর তুলে পরীর দীঘির চার পাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দীঘি এককালে এখানে ছিলো না।

আশেপাশের গায়ের ছেলে-বুড়োদের প্রশ্ন করলে তারা মুখে মুখে বলে দেয় এ দীঘির ইতিহাস। কেউ চোখে দেখে নি, সবাই শুনেছে। কেউ শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে । তার বাবা জেনেছে তার দাদার কাছ থেকে। আর তার দাদা শুনেছে তারও দাদার কাছ থেকে।

সে অনেক বছর আগে।

তখন গ্রাম ছিলো না। সড়ক ছিলো না। কিছুই ছিলো না এখানে। শুধু মাঠ, মাঠ, আর মাঠ। সীমাহীন প্রান্তর।

বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে, পরীরা নেমে আসতো এই পৃথিবীতে। ওরা নাচতো, গাইতো, খেলতো।

লাল পরী, নীল পরী আর সবুজ পরী। পরীদের অনেকের নামও জানা আছে এ গায়ের লোকের। পুঁথিতে লেখা আছে সব।

একদিন হঠাৎ পরীদের খেয়াল হলো, একটা দীঘি কাটবে। যার পানিতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটতে পারবে ওরা। ডুব দিয়ে, পানি ছিটিয়ে ইচ্ছেমত হৈ-হুল্লোড় করতে পারবে।

যেই চিন্তা সেই কাজ।

আকাশ থেকে খন্তা কোদাল আর মাটি ফেলবার ঝুড়ি নিয়ে এলো ওরা।

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত।

রুপালি জোছনার স্নিগ্ধ আলোয় ভরেছিলো এই সীমাহীন প্রান্তর। দক্ষিণের মৃদু বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিলো পরীদের হাসির শব্দে ।

কথায় গানে আর কাজে।

রাত ভোর হবার আগে দীঘি কাটা হয়ে গেল।

পাতাল থেকে কলকল শব্দে পানি ওঠে ভরে গেল দীঘি।

সেই দীঘি।

তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম। এক নয়, অনেক।

গভীর রাতে ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম করে গ্রামগুলো।

জোড়া বউকে ঢেঁকির উপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে বুড়ো মকবুল। পিদিমের শিখাটা ঢেঁকির তালে তালে মৃদু কাঁপে।

মকবুল ধমকে উঠে বউদের, কি, গায়ে শক্তি নাই? এত আস্তে ক্যান। আরো জোরে চাপ দাও না হুঁ। এমনভাবে গর্জে উঠে মকবুল, যেন ক্ষেতে লাঙ্গল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু জোড়াকে ধমকাচ্ছে সে। হুঁ, হট হট। হুঁ আরো জোরে। আরো জোরে। ধমক খেয়ে ঢেঁকিতে আরো জোরে চাপ দেয় ওরা। টুনি আর আমেনা। পাশের বাড়ি থেকে আম্বিয়ার গান শোনা যায়। স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার, স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুধের মত সুন্দর কুমার কিছু না গেল বইলারে।

ঢেঁকিতে চড়লেই গান গাওয়ার সখ চাপে আম্বিয়ার। সতেরো আঠারো বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয় নি ওর। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন, আট-হাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়। চেহারায় মাধুর্য আছে। চোখ জোড়া বড় বেশি তীক্ষ্ণ। ঢেঁকিতে চড়লে, ঢেঁকিকে আর সুখ দেয় না ও। এত দ্রুত তালে ধান ভানতে থাকে, মনে হয় ঢেঁকিটাই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ধান ভানা শেষ হলে গায়ে দর দর ঘাম নামে ওর। একটা চাটাইয়ের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে জোরে শ্বাস নেয় আম্বিয়া।

ঢেঁকির পাশে বসে এই মুহূর্তে বারবার আম্বিয়ার কথা মনে পড়ছিলো বুড়ো মকবুলের। দাঁত মুখ খিঁচে বউদের আবার ধমক মারলো, ও শুনছনি, আম্বিয়া কেমন ধপাস ধপাস কইরা ধান বাইনতাছে। আর তোরা, কিছু না কিছু না, বলে বার কয়েক মাটিতে থুতু ফেললো মকবুল। বাঁ হাতে কপালের ঘামগুলো মুছে নিল সে।

দাওয়ার ওপাশে পিদিম হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো ফকিরের মা। সেখান থেকে বললো, আহা, মকবুল! বউগুলোরে বুঝি এই রাতের বেলাও আর শান্তি দিবি না তুই। সারাদিন তো খাটাইছস, এহন দুপুর রাইতেও–, বলে টুনি আর আমেনার জন্য আফসোস করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেল ও।

এ বাড়িতে মোট আট ঘর লোকের বাস।

সামনে নুয়ে পড়া ছোট ছোট ঘরগুলো একটার সঙ্গে একটা লাগানো। বাঁশের তৈরি। বেড়ার ভাঙ্গা অংশগুলো তালপাতা দিয়ে মোড়ান। চালার স্থানে স্থানে খরকুটো উঠে ফুটো হয়ে গেছে। দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এসে একঝরি করে সে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে যায় ঘরের ভেতরে। আম, কাঁঠাল, পাটি পাতা আর বেতাক বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ। মাঝে মাঝে ছোট বড় অনেকগুলো সুপুরি আর নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে অনেক আগে। দু'একটা খেজুর গাছও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। ছোট পুকুর। পুকুরে শিং কই আর মাগুর মাছের কমতি নেই। দিনরাত শব্দ করে ঘাই দেয় ওরা। পানিটাকে সারাক্ষণ ঘোলাটে করে রাখে। সামনে মাঝারি উঠোন। শীত কিংবা গ্রীষ্মে শুকিয়ে একরাশ ধুলো জমে। বর্ষায় এক হাঁটু কাদা। কাদার ওপর ছোট ছোট ব্যাঙ এসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। হাঁস কি মোরগ দেখলেই তাড়া করে ওদের। ধরে ধরে মারে। পুবের সারে উত্তরের ঘরটা মকবুলের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে ওর অবস্থাটা কিছু ভালো।

মকবুল তিন বিয়ে করেছে। তিন বউই বেঁচে আছে ওর।

বড় বউ আমেনা। কালো মোটা আর বেঁটে। বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায় পৌঁছেছে এবার। খুব ঘন ঘন কথা বলে। কথা বলার সময় পোকায় খাওয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ছিটিয়ে সামনের লোকগুলোকে ভিজিয়ে দেয়। পারিবারিক কলহ বাঁধলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি দেখায়।

মেজ ফাতেমা। দেখতে রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। বছরে তিন মাস পেটের অসুখে ভোগে। ছ'মাস বাপের বাড়িতে কাটায়। বয়সের হিসেবটা সে নিজেও জানে না। কেউ পনেরো বললেও সায় দেয় না। পঁচিশ বললেও মেনে নেয়।

সবার ছোট টুনি। গায়ের রং কালো। ছিপছিপে দেহ। আয়ত চোখ। বয়স তার তের-চৌদ্দর মাঝামাঝি। সংসার কাকে বলে সে বোঝে না। সমবয়সী কারো সঙ্গে দেখা হলে সব কিছু ভুলে গিয়ে মনের সুখে গল্প জুড়ে দেয়। আর হাসে। হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো মকবুলের পরিবারে আরো একজন আছে।

নাম তার হীরন। ও তার বড় মেয়ে। বড় বউ-এর সন্তান। এবার দশ ছেড়ে এগারোয় পড়লো সে। এখন থেকে মকবুল ওর বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। দু'এক জায়গায় এর মধ্যে সম্বন্ধও পাঠিয়েছে সে। বড়, মেজ আর ছোট এই তিন বউ নিয়ে মকবুলের সংসার। তিন বউকে বসিয়ে খাওয়ানোর মত জমিজমা নেই ওর। আসলে বউদের আয় দিয়ে চলে ও। বড় দুই বউ দিব্যি আয় করে। বাজার থেকে পাতা কিনে এনে দিয়েই খালাস মকবুল। দুই বউ মিলে একদিনে তিন চারটে চাটাই বুনে শেষ করে। মাঝে মাঝে টুনিও বসে পড়ে ওদের সঙ্গে, কাজ করে। চাটাইগুলো বাজারে বিক্রি করে লাভের অংশ দিয়ে পেঁয়াজ. লঙ্কা, পান-সুপুরি কেনে মকবুল।

ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও । বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির উপরে যে ছোট জমিটা রয়েছে তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় মকবুল। নিজেও সঙ্গে থাকে। মাটি কুপিয়ে কুমড়ো আর সিমের গাছ লাগায়। দু'বেলা জল ঢেলে গাছগুলোকে তাজা রাখে। সুখ আছে আবার সুখ নেইও মকবুলের জীবনে। তিন বউ যখন ঝগড়া বাঁধিয়ে চুল ছেঁড়ার লড়াই শুরু করে তখন বড় বিস্বাদ লাগে ওর। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে তিনজনকে সমানে মারে সে। কাউকে ছাড়াছাড়ি নেই।

AMARBOI.COM

মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মার।

তার পাশেরটা আবুলের।

তার পাশে থাকে রশিদ।

পাশাপাশি তিনটে ঘর।

সবার দক্ষিণে যে ঘরটা সবার চেয়ে ছোট, ওটায় থাকে মন্তু। একা মানুষ। বাবা মা ভাইবোন কেউ নেই। বাবাকে হারিয়েছে ও জন্মের মাসখানেক আগে। মাকে, দশ বছর বয়সে। লোকে বলে, মন্তু নাকি বড় একগুঁয়ে আর বদমেজাজী। স্বভাবটা ঠিক জানোয়ারের মত।

টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ নাকি এ জন্মে আর দেখেনি সে।

আহা অমনটি আর হয় না।

ওপাশে আর কোন ঘর নেই।

পশ্চিমের সারে, দক্ষিণের ঘরটা মনুর।

তার পাশে থাকে সুরত আলী।

তার পাশে গনু মোল্লা।

গনু মোল্লা নির্ভেজাল মানুষ। কারো সাথেও থাকে না। পাঁচেও না। জমি জমা নেই। চাষবাসের প্রশ্ন উঠে না। সারাদিন খোদার এবাদত করে। যেখানে যায় তছবির ছড়াটা হাতে থাকে তার। আপন মনে তছবিহ পড়ে।

দীঘিকে কেন্দ্র করে এই গ্রাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন কোন্ যুগে পত্তন ঘটেছিলো এ গ্রামের কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু এ বাড়ির পত্তন বেশি আগে নয়। আশি কি খুব জোর নব্বই বছর হবে।

সেই তেরশ' সনের বন্যা।

অমন বন্যা দু'চার জন্মে কেউ দেখেনি।

মাঠ ভাসলো, ঘাট ভাসলো, ভাসলো বাড়ির উঠান।

ঘর ভাসলো বাড়ি ভাসলো, ভাসলো কাজীর কুশান।

কিছু বাদ নেই। ঘরবাড়ি গোয়াল গরু সব। এমন কি মানুষও ভাসলো। জ্যান্ত মানুষ। মরা মানুষ।

তাল গাছের ডগায় ঝোলান বাবুই পাখির বাসায়ও কিছুকালের জন্য পরম নিশ্চিন্তে ঘর বেঁধেছিলো পুঁটি মাছের ঝাঁক।

রহমতগঞ্জ কুলাউড়া নিজামপুর ভেসে সব একাকার হলো।

বুড়ো কাসেম শিকদার ছিলো কুলাউড়ার বাসিন্দা।

বুড়ো আর বুড়ি। ছেলেপিলে ছিলো না ওদের। মাটির নিচে পুঁতে রাখা টাকা ভরা কলসিটা বুকে জড়িয়ে ধরে বানের জলে ভাসান দিলো বুড়ো আর বুড়ি।

কলা গাছের ভেলায় চারদিন চার রাত। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। একেবারে উপোস।

তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ভেলা ভাসছে আর ভাসছে।

অবশেষে এসে ঠেকল এই দীঘির পাড়ে।

লাল পরীর নীল পরী আর সবুজ পরীর দীঘি। ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মত উঁচু যার পাড়।

গ্রামটা পছন্দ হয়ে গেল কাশেম শিকদারের।

কলসী থেকে টাকা বের করে দু'চার বিঘে জমি কিনে ফেললো সে। গোড়াপত্তন হলো এ বাড়ির।

বাড়ির চারপাশে আম কাঁঠাল সুপুরি আর নারকেলের গাছ লাগালো কাশেম শিকদার। পুকুর কাটলো। ভিটে বাঁধলো। পছন্দ মত ঘর তুললো বড় করে। কিন্তু মনে কোন শান্তি পেলো না সে। ছেলেপুলে নেই। মারা গেলে কে দেখবে এত বড় বাড়ি।

মাঝে মাঝে চিন্তায় এত বিভোর হয়ে যেতো যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকতো না তার। বুড়ি ছমিরণ বিবি লক্ষ্য করতেন সব। বুঝতেন কোন স্বামীর মনে সুখ নেই, চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। মনে মনে তিনিও দুঃখ পেতেন।

তারপর, একদিন জলভরা চোখে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন ছমিরণ বিবি।

আস্তে করে বললেন, তুমি আর একডা নিকা কর। বলতে গিয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছিলো তাঁর। দু'গণ্ড বেয়ে অবিরাম পানি গড়িয়ে পড়ছিলো।

তবু স্বামীকে নিজ হাতে সাজিয়ে দিলেন ছমিরণ বিবি। হাতে মেহেদি দিলেন। মাথায় পাগড়ি পরালেন। ঘরটা লেপে মুছে নিয়ে নিজ হাতে বিছানা পাতলেন স্বামী আর তার নতুন বিয়ে করা বউ-এর জন্য। আদর করে হাত ধরে এনে শোয়ালেন তাদের।

নতুন বউ-এর কাঁচা হলুদ ঝলসানো দেহের দিকে তাকাতে সাহস পেলেন না ছমিরণ বিবি। ছুটে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে কে যেন তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলজেটা কুটিকুটি করে কাটছিল তাঁর। নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না তিনি। পুকুর পাড়ে ধুতরা ফুলের সমারোহ। গুনে গুনে চারটে ফুল হাতে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেগুলো মুখে পুরে দিয়ে নীরবে ঘুমিয়ে পড়লেন। দীঘির পাড়ে উঁচু ঢিপির মত তার কবরটা আজো চোখে পড়ে সবার আগে।

ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম শিকদার বাড়ি।

ঘুমে ঢুলুঢুলু বউ দুটোর গা বেয়ে দরদর ঘাম নামে। এতক্ষণে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। আঁচলটা কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে, সামনে হাত রাখার বাঁশের ওপরে গুটিয়ে রেখেছে দু'জনে। মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে বুক আর গলার ঘাম মুছে নিচ্ছে। ঘামে কাপড়টা চপ চপ করছে ওদের।

সেদিকে খেয়াল নেই মকবুলের। ও ভাবছে অন্য কথা।

বাড়ির ওপরের জমিটাতে লাঙ্গল না দিলে নয়। অথচ হাল যে একটা ধার পাবে সে সম্ভাবনা নেই। লাঙ্গল অবশ্য যা হোক একটা আছে ওর। অভাব হলো গরুর। গরু না হলে লাঙ্গল টানবে কিসে। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়। মকবুল ভাবলো, বউ দুটোকে লাঙ্গলে জুড়ে দিয়ে, দূর এটা ঠিক হবে না। লোকে গালাগাল দেবে ওকে। বলবে, দেহ বউ দুইড্যা দিয়া লাঙ্গল টানায়। তার চেয়ে এক কাজ করলে কি ভালো হয় না? না। বউদের দিয়েই লাঙ্গল টানাবে সে। দিনে নয়, রাতে। বাইরের কোন লোকে দেখবার কোন ভয় থাকবে না তখন। বউরা অবশ্য আপত্তি করতে পারে। কিন্তু ওসব পরোয়া করে না মকবুল। মুফত বিয়ে করে নি সে। পুরো চার চারটে টাকা মোহরানা দিয়ে এক একটা বিয়ে করেছে। হুঁ।

ভাবছিলো আর সোনারঙ ধানগুলো ঢেঁকির নিচে ঠেলে দিচ্ছিলো মকবুল। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ করে হাতটা চেপে ধরলো সে। অসতর্ক মুহূর্তে ঢেঁকিটা হাতের ওপর এসে পড়েছে ওর। আল্লারে বলে মুখ বিকৃত করলো মকবুল।

টুনি আর আমেনা এতক্ষণে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ঢেঁকির উপর। ঘোর কাটতে ছুটে নেমে এলো ওরা। ওদের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে ওদের গায়ের ওপরে থুতু ছিটিয়ে দিল মকবুল, দূর-হ দূর-হ আমার কাছ থাইকা। বলতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চাপালো মকবুল।

আমেনা বললো, দেহ কারবার, নিজের দোষে নিজে দুঃখ পাইল আর এহন আমাগোরে গালি দেয়। আমরা কি করছি?

তোরা আমার সঙ্গে শত্রুতামি করছস। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো মকবুল। তোরা দুই সতীনে ইচ্ছা কইরা আমার হাতে ঢেঁকি ফালাইছস। তোরা আমার দুশমন।

হ্যাঁ দুশমনই তো। দুশমন ছাড়া আর কি। কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো আমেনা।

টুনি এগিয়ে গেলো ওর ফুলো হাতে একটা ভিজে ন্যাকড়া বেঁধে দেয়ার জন্যে। লাফিয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেলো মকবুল। দরকার নাই, দরকার নাই। অত সোয়াগের দরকার নাই। বলে একখানা সরু কাঠের টুকরো নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে মারলো মকবুল।

বিষ উঠছে নাহি বুড়ার? এমন করতাছে ক্যান। চাপা রোষে গজগজ করতে করতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো টুনি। খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে ঠাণ্ডা বাতাসে দেহটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুড়িয়ে গেলো ওর। হঠাৎ মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। উঠোন থেকে মন্তুর ঘরের দিকে তাকালো ও। একটা পিদিম জ্বলছে সেখানে। একবার চারপাশে দেখে নিয়ে মন্তুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো টুনি।

মাচাঙের ওপর থেকে কাঁথা বালিশ নামিয়ে নিয়ে শোবার আয়োজন করছিলো মন্তু।

টুনি দোরগোড়া থেকে বলে, বাহ, বারে!

মন্তু মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। বলে, ক্যান কি অইছে?

টুনি ফিসফিসিয়ে বলে, আজ যাইবা না?

মন্তু অবাক হয়, কই যামু?

টুনি মুখ কালো করে চুপ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, ক্যান ভুইলা গেছ বুঝি?

মন্তুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বেড়ার সঙ্গে ঝোলান মাছ ধরার জালটার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে, অ- মাছ ধরতে?

যাইবা না? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে টুনি।

মন্তু হেসে বলে, যামু যামু। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে, বুড়ো যদি টের পায় তাইলে কিন্তুক জানে মাইরা ফালাইবো।

হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয় টুনি। মারেরে ডরাও নাকি?

মন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে টুনি বলে, ভাত খাইছ?

না। তুমি খাইছ?

হুঁ। তুমি গিয়া খাইয়া আস যাও। জল্দি কইরা আইসো। বিছানাটা আবার গুটিয়ে রেখে বেড়ার সঙ্গে ঝোলান জালটা মাটিতে নামিয়ে নেয় মন্তু।

ও ঘর থেকে আমেনার ডাক শোনা যায়, টুনি বিবি কই গেলা, খাইতে আহ!

আহি, বলে সেখান থেকে চলে যায় টুনি।

আজকাল রাতের বেলা আমেনার ঘরে শোয় মকবুল। টুনি থাকে পাশের ঘরে। আগে, ফাতেমা আর ও দু'জনে এক সঙ্গে থাকতো। মাসখানেক হলো ফাতেমা বাপের বাড়ি গেছে। এখন টুনি একা। রাতের বেলা ইচ্ছেমত যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ালেও ধরবার উপায় নেই। রাত জেগে মাছ ধরাটা ইদানীং একটা নেশা হয়ে গেছে ওদের। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে গ্রামের এ পুকুর থেকে অন্য পুকুরে জাল মেরে বেড়ায় ওরা। হাতে একটা টুকড়ি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে টুনি। জালে ওঠা মাছগুলো ওর মধ্যে ভরে রাখে।

পর পুকুরের মাছ ধরতে গিয়ে সমস্ত সময় সজাগ থাকতে হয় ওদের। চারপাশে দৃষ্টি রাখতে হয়। একদিন প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলো দু'জনে। জমীর মুন্সির বড় পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলো সেদিন। আকাশে চাঁদ ছিলো কিন্তু চাঁদনী ছিলো না। কালো মেঘে ছেয়ে ছিলো পুরো আকাশটা।

এক হাঁটু পানিতে নেমে জালটাকে সন্তর্পণে ছুঁড়ে দিয়েছিলো সে। পুকুরের মাঝখানটাতে। শব্দ হয় নি মোটেও। কিন্তু পুকুর পাড় থেকে জোর গলায় আওয়াজ শোনা গেল, কে, কে জাল মারে পুকুরে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক হাঁটু পানি থেকে নীরবে এক গলা পানিতে নেমে গেলো মন্তু। টুনি ততক্ষণে একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

জমীর মুন্সির হাতের টর্চটা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল পুকুরের এপার থেকে ওপারে। মনে মনে বার বার খোদাকে ডাকছিলো মন্তু, খোদা তুমিই সব।

একটু পরে পাড়ের ওপার থেকে টুনির চাপা গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো, এই উইঠা আহ। মুন্সি চইলা গেছে। বলে খিল খিল করে হেসে উঠে সে। ওর হাসির শব্দে রাগে সমস্ত দেহটা জ্বালা করে উঠেছে মন্তুর। এমন সময়ে মানুষ হাসতে পারে?

তারপর থেকে, আরো সাবধান হয়ে গেছে মন্তু। গনু মোল্লার কাছ থেকে তিন আনা পয়সা খরচ করে একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে সে। রাতে বিরাতে গাঁয়ের পুকুরে মাছ ধরে বেড়ানো, বিপদ আপদ কখন কি ঘটে কিছুতো বলা যায় না। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়া ভালো। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে, বাজুর ওপরে বাঁধা তাবিজটাকে আর একবার ভাল করে দেখে নিলো মন্তু। তারপর বুনো লতার ঝোঁপটাকে দু'হাতে সরিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেলো সে। টুনি পেছন থেকে বললো, বারে, অত জোরে হাঁটলে আমি চলি কি কইরা? মন্তু জালটাকে গুছিয়ে নিতে নিতে বললো, আস্তে আহ, তাড়া কিসের? টুনি বলে বারে, আমার বুঝি ডর ভয় কিছুই নাই। যদি সাপে কামড়ায়? সাপের কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ একটা আঁধি সাপ ফোঁস করে উঠে সরে যায় সামনে থেকে। আঁতকে উঠে দু'হাত পিছিয়ে আসে মন্তু। ভয় কেটে গেলে থুতু করে বুকের মধ্যে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দেয় সে। পেছনে টুনির দিকে তাকিয়ে বলে, বুকে থুক দাও তাইলে কিচ্ছু অইবো না। কোন রকম বিতর্কে না এসে নীরবে ওর কথা মেনে নেয় টুনি। কপালটা আজ মন্দ ওদের। অনেক পুকুর ঘুরেও কিছু চিংড়ি গুঁড়ো ছাড়া আর কিছু জুটল না। মাছগুলো কেমন যেন সেয়ানা হয়ে গেছে। পুকুরের ধারে কাছে থাকে না। থাকে গিয়ে একেবারে মাঝখানটিতে, এতদূর জাল উড়িয়ে নেয়া যায় না। টুনি বলে থাক, আইজ থাউক, চলো বাড়ি ফিইরা যাই। জালটাকে ধুয়ে নিয়ে মন্তু আস্তে বলে, চলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ফুলো হাতটা কোলে নিয়ে বসে বসে আবুল আর হালিমার ঝগড়া দেখছিলো মকবুল।

অনেকক্ষণ কি একটা বিষয় নিয়ে তর্ক চলছে ওদের মধ্যে। দাওয়ায় বসে বসে যা মুখে আসছে ওকে বলে যাচ্ছে আবুল। হালিমাও একেবারে চুপ করে নেই। উঠানে একটা লাউয়ের মাচা বাঁধতে বাঁধতে দু'একটা জবাবও দিচ্ছে সে মাঝে মাঝে।

মকবুল হাতের ব্যথায় মৃদু কাতরাচ্ছিলো আর পিটপিট চোখে তাকাচ্ছিলো ওদের দিকে। হঠাৎ দাওয়া থেকে ছুটে এসে মুহূর্তে হালিমার চুলের গোছাটা চেপে ধরলো আবুল। তারপর কোন চিন্তা না করে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিলো তলপেটে। উঃ মাগো, বলে পেটটা দু'হাতে চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়লো হালিমা। রাগে তখন ফোঁপাচ্ছে আবুল, আমার ঘরের ভাত ধ্বংস কইরা রাস্তার মানুষের লগে পিরীত। জানে খতম কইরা দিমু না তোরে। কাইটা রাস্তায় ভাসায় দিমু না। বলে আবার ওর চুলের গোছাতে হাত দিতে যাচ্ছিলো আবুল, বুড়ো মকবুল চিৎকার করে উঠলো, খবরদার আবুইল্যা, তুই যদি বউ-এর গায়ে আরেকবার হাত তুলছস তাইলে ভালো অইবো না কিন্তুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঘরণীর গায়ে আমি হাত তুলি কি যা ইচ্ছা তাই করি, তুমি কইবার কে. অ্যাঁ? পরক্ষণে আবুল জবাব দিলো, তুমি যখন তোমার ঘরণীরে তুলা পেডা কর তহন কি আমরা বাধা দেই?

অমন কোণঠাসা উত্তরের পর আর কিছু বলার থাকে না মকবুলের। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এক নজর ওর দিকে তাকালো মকবুল। আবুল তখন ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে চলেছে হালিমাকে। ভেতরে নিয়ে ঝাঁপি বন্ধ করে মনের সুখে মারবে। ওর ইচ্ছে হয়তো বুঝতে পেরেছিলো হালিমা। তাই মাটি আঁকড়ে ধরে গোঙাতে লাগলো সে, ওগো তোমার পায়ে পড়ি। আর মাইরো না, মইরা যামু।

চুপ, চুপ. তীব্র গলায় ওকে শাসিয়ে ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেয় আবুল। হেঁচকা টানে ওর পরনের ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা খুলে নিয়ে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। তালি দেয়া পুরান ব্লাউজটা আঁটসাঁট করে বাঁধা ছিলো টেনে সেটাও খুলে ফেলে আবুল। তারপর দু'পায়ে ওর নগ্ন দেহটাকে প্রচণ্ডভাবে মাড়াতে থাকে সে।

বেড়ার সঙ্গে পুরান একটা ছড়ি ঝোলান ছিলো। সেটা এনে হালিমার নরম তুলতুলে কপালে কয়েকটা আঁচড় টেনে দেয় আবুল। এইবার পিরীত কর। আরো পিরীত কর। রাস্তার মানুষের লগে।

আহারে। এর মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইন্যা, দরজা খোল মারিস না আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না। বাইরে থেকে দু'হাতে ঝাঁপিটাকে ঠেলছে ফকিরের মা। অবুল একবার তাকালো সেদিকে। কিন্তু ঝাঁপি খুললো না।

বউ মারায় একটা পৈচাশিক আনন্দ পায় আবুল। পান বিড়ির মত এও যেন একটা নেশা হয়ে গেছে ওর। মেরে মেরে এর আগে দু'দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে।

প্রথম বউটা ছিলো এ গাঁয়েরই মেয়ে। আয়েশা। একটু বেঁটে একটু মোটা আর রঙের দিক থেকে শ্যামলা। অপূর্ব সংযম ছিলো মেয়েটির। আশ্চর্য শান্ত স্বভাব। কত মেরেছে ওকে আবুল। কোনদিন একটু শব্দও করে নি। পিঠটা বিছিয়ে দিয়ে উপুর হয়ে চুপচাপ বসে থাকতো। কিল, চাপড়, ঘুষি ইচ্ছেমত মারতো আবুল।

একটা সামান্য প্রতিবাদ নেই।

প্রতিরোধ নেই।

শুধু আড়ালে নীরবে চোখের পানি ফেলতো মেয়েটো।

তারপর একদিন ভীষণভাবে রক্তবমি শুরু হলো ওর। জমাট বাঁধা কালো কালো রক্ত। ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে মারা গেলো আয়েশা।

আয়েশা টিকেছিলো বছর তিনেক। তার পরেরটা কিন্তু ওর চাইতেও কম। মাত্র দু'বছর।

অবশ্য জমিলার মাত্র দু'বছর টিকে থাকার পেছনে একটা কারণও আছে। ও মেয়েটা ছিলো একটু বাচাল গোছের আর একটু রুক্ষ মেজাজের। সহজে আবুলের কিল চাপড়গুলো গ্রহণ করতে রাজি হতো না সে। মারতে এলে কোমরে আঁচল বেঁধে রুখে দাঁড়াতো।

হাজার হোক মেয়েতো। পুরুষের সঙ্গে পারবে কেন? বাধা দিতে গিয়ে পরিণামে আরো বেশি মার খেতো জমিলা। ও যখন মারা গেল আর ওর মৃত দেহটা যখন গরম পানি দিয়ে

পরিষ্কার করছিলো সবাই তখন ওর সাদা ধবধবে পিঠের ওপর সাপের মত আঁকাবাঁকা ফুলে ওঠা রেখাগুলো দেখে শিউরে উঠেছিলো অনেকে। ওরে পাষাইন্যারে এমন দুধের মত মাইয়াটারে শেষ করলি তুই।

আয়েশা মারা যাবার পর অবশ্য ভীষণ কেঁদেছিলো আবুল। গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিলো সারা উঠোনে। পাড়াপড়শীদের বলেছিলে, আহা বড় ভালো বউ আছিলো আয়েশা। আমি পাষাইন্যা তার কদর বুঝলাম না। আহারে এমন বউ আর পামু না জীবনে।

আয়েশার শোকে তিনদিন এক ফোঁটা দানাপানিও মুখে পোরে নি আবুল। তিন রাত কাটিয়েছে ওর কবরের পাশে বসে আর শুয়ে। পাড়াপড়শীরা ভেবেছিলো ওর চরিত্রে বুঝি পরিবর্তন এলো এবার। এবার ভালো দেখে একটা বিয়ে শাদি করিয়ে দিলে সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে আবুল।

কিন্তু জমিলার সঙ্গেও সেই একই ব্যবহার করেছে আবুল। একই পরিণাম ঘটেছে জমিলার জীবনেও।

দ্বিতীয় বউ-এর মৃত্যুতে আবুলের গড়াগড়ি দিয়ে কান্নার কোন মূল্য দেয় নি পড়শীরা। মুখে বিরক্তি এনে বলেছে, আর অত ঢঙ করিস না আবুইল্যা। তোর ঢঙ দেইখলে গা জ্বালা করে।

আমার বউ-এর দুঃখে আমি কাঁদি, তোমাগো গা জ্বালা করে ক্যান? ওদের কথা শুনে ক্ষেপে উঠে আবুল। কপালে এক মুঠো ধুলো ছুঁইয়া সহসা একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে সে, এই তৌবা করলাম বিয়া শাদি আর করমু না। খোদা, আমারে আর বিয়ার মুখ দেখাইও না। খোদা, আমার শত্রুরা আরামে থাহুক। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে আবুল।

পড়শীরা গালে হাত দিয়ে বলেছে, ইয়া আল্লা, এই কেমনতর কথা। বউ মারলি তুই, সেই কথা বইলা কি শত্রুতামি করলাম নাকি আমরা। সাচা কথা কইলেই তো মানুষ শত্রু হয়।

ঠিক কইছ বঁইচির মা, সাচা কথা কইলেই এমন হয়। তা, আমাগো কইবারও বা দরকার কি। ওর বউরে মারুক কি কাটুক কি নদীতে ভাসায়া দিক, আমাগো কি আছে তাতে।

সেদিন থেকে আবুলের সাতে পাঁচে আর কেউ নেই ওরা।

আজকাল হালিমাকে যখন প্রহর অন্তর একবার করে মারে আবুল তখন কেউ কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে বুড়ো মকবুল এক-আধটু বাধা দেবার চেষ্টা করে। আবুইল্যা তোর কি মানুষের পরান না, এমন কইরা যে মারছ বউডারে তোর মনে একটুও চোট লাগে না আবুইল্যা? বউদের অবশ্য মকবুলও মারে। তাই বলে আবুলের মত অত নির্দয় হওয়াটা মোটেই পছন্দ করে না সে। মারবি তো মার; একটুখানি সইয়া মার। অপরাধের গুরুত্ব দেইখা সেই পরিমাণ মার। এ হলো মকবুলের নিজস্ব অভিমত। অপরাধ, এমন কোন সাংঘাতিক করে নি হালিমা। পাশের বাড়ির নুরুর সঙ্গে কি একটা কথা বলতে গিয়ে হেসেছিলো জোরে। দূর থেকে সেটা দেখে গা জ্বালা করে উঠেছে আবুলের। একটা গভীর সন্দেহে ভরে উঠেছে মন।

এমন মন খোলা হাসিতো আবুলের সঙ্গে কোনদিন হাসে নি হালিমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁহুশ হালিমাকে ভেতরে ফেলে রেখে আবুল যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত নেমেছে ওর। পরনের লুঙ্গি দিয়ে গায়ের ঘামটা মুছে নিয়ে দাওয়ার ওপর দম ধরে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিলো আবুল। মাটির হুঁকোটাকে নেড়েচেড়ে কি যেন দেখলো, তারপর কলকেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

রশীদের বউ সালেহা উঠোনে বসে চাটাই বুনছিলো। আবুলকে এদিকে আসতে দেখে মুখ টিপে হেসে বললো, বউ-এর পিরীত বুঝি আর সইলো না মিয়ার।

আর সইবো, বহুত সইছি। মুখ বিকৃত করে পুরনো কথাটাই আবার বলে গেলো আবুল, আমার ঘরের ভাত খাইয়া রাস্তার মানুষের সঙ্গে পিরীত। তুমি কও ভাবী, এইডা কি সহ্য করন যায়।

হ্যাঁ তাতো খাঁটি কথাই কইছ। সালেহা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ঘরনী যদি মনের মত না হয় তাইলে কি তারে নিয়ে আর সুখে ঘর করন যায়? আর ভাবী দুনিয়াদারী আর ভাল লাগে না। ইচ্ছা করে দুই চোখ যেই দিকে যায় চইল্যা যাই। বলে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে আবুল। তারপর সালেহার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, চুলায় আগুন আছে? একটু আগুন দাও।

এই দিই, বলে কলকেটা হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেলো সালেহা। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলো সে। ও কাছে আসতে গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে এনে আবুল বললো, আইজ আর ছাড়ি নাই ভাবী। যতক্ষণ পারছি মারছি। তুমি একটু তেল গরম কইরা মালিশ কইরা দিও ওর গায়ে। হাড়ডি না দুই একখান ভাইঙ্গা গেছে কে জানে। তাইলে তো বড় বিপদ অইবো। কাম-কাজ কত পইর‍্যা রইছে। সব কিছু বন্ধ অইয়া যাইবো।

সেই কথা আগে খেয়াল আছিলো না মিয়ার? সালেহা মুখ বাঁকালো। কাম কাজের যখন ক্ষতি অইবো জান, তহন না মারলেই পাইরতা। মারলা ক্যান।

উঁহু, আবুল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, মারছি ঠিক করছি, না মারলে আস্কারা পাইয়া যাইতো।

আর আস্কারা কি এমনে কম পাইছে? চারদিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে সালেহা বললো, নূরুর সঙ্গে কি আজকা কথা কইছে? ওতো রোজ রোজ কথা কয়।

কি? চোখ জোড়া আবার ধপ করে জ্বলে উঠলো আবুলের। আমারে এতদিন কও নাই ক্যান?

সালেহা বললো, কি দরকার বাপু আমাগো মিছামিছি শত্রু বইনা। কইতাম গেলে তো অনেক কথাই কইতে অয়। তাকি আর একদিনে শেষ করা যায়।

কি কথা কও ভাবী। খোদার কসম ঠিক কইরা কও। তামাক খাওয়াটা একবারে ভুলে গেলো আবুল।

সালেহা আস্তে করে বললো, যাই কও বাপু কারো বদনাম করার অভ্যাসই আমার নাই। কিন্তুক কই কি এই বউডা তোমার বড় ভালো হয় নাই। আমরা তো আয়শারেও দেখছি, জমিলারেও দেখছি। ওরাতো আমাগো হাতের ওপর দিয়েই গেছে। চরিত্রে ওগো তুলনা আছিলো না। কিন্তু হালিমার স্বভাব চরিত্র বাপু আমার বড় ভালো লাগে না। বলতে গিয়ে বার কয়েক কাশলো সালেহা। কাশটা গিলে নিয়ে আবার সে বললো, ইয়ে মানে, বাইরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের সঙ্গে হাসাহাসি আর ঢলাঢলি। একটুহানি লজ্জা শরমও তো থাকা চাই। কথা শেষে আবুলের রক্তলাল চোখ জোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলো সালেহা। একটু ধমকের সুরে বললো, দেইখো বাপু, তুমি মাইয়াডারে মারতা শুরু কইরো না। এমনিতেই বহুত মারছ। এতে যদি শিক্ষা না হয় তাইলে আর জন্মেও হইবো না। সালেহার কথাটা শেষ হবার আগেই সেখান থেকে চলে গেছে আবুল। কল্‌কেটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে সে। একটু পরে আবার হালিমার কান্নার শব্দ শোনা গেলো ঘর থেকে। আবুল আবার মারছে তাকে।

এতক্ষণ ঘুম থেকে উঠলো টুনি।

এত শিগ্রী উঠতো না সে, বুড়ো মকবুলের ধমক খেয়ে শুয়ে থাকাটা নিরাপদ মনে করলো না। মনে মনে বুড়োকে এক হাজার একশো অভিশাপ দিলো। চোখজোড়া জ্বালা করছে তার। মাথাটা ঘুরছে। সারা দেহে বিশ্রী এক অবসাদ। ছড়ানো শাড়িটা চাটাইয়ের ওপর থেকে গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো টুনি। ঘরের পাশে ছাইয়ের গাদা থেকে একটা পোড়া কাঠের কয়লা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পুকুরের দিকে চলে গেলো। একগলা পানিতে নেমে মন্তু গোছল করছে পুকুরে।

ঘোলাটে পানি আরো ঘোলা হয়ে গেছে।

কতগুলো হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে সাঁতার কাটছে এপার থেকে ওপারে। আর মাঝে মাঝে মুখটা পানিতে ডুবিয়ে চ্যাপটা ঠোঁট দিয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো ঘাটের এককোণে এসে নীরবে বসলো টুনি। পা জোড়া পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে এক মনে দাঁতন করতে করতে হঠাৎ তার নজরে এলো মন্তুর পিঠের ওপর একটা লম্বা কাটা দাগ। মনে হলো কিছুক্ষণ আগেই বুঝি কিছুর সঙ্গে লেগে চিরে গেছে পিটটা। ওমা, বলে মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিলো টুনি, এই এই শোন। মন্তু ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, কি, কি হইছে?

এই দিকে আহ না, আহ না এই দিকে।

কাছে আসতে ওর পিঠটাকে ভালো করে দেখে নিয়ে বললো, এইখানটা চিরলো কেমন কইরা, আঁ?

মন্তু হেসে দিয়ে বললো, গতকাল রাতে সগন শেখের পুকুর পাড়ে একটা বুনো লতার কাঁটা লাগছিলো পিঠে।

টুনির চোখ জোড়া মুহূর্তে করুণ হয়ে এলো। দরদ ভরা কণ্ঠে সে আস্তে করে বললো, চলো কচু পাতার ক্ষির লাগাইয়া বাইন্দা দি, নইলে পাইকা যাইবো, শেষে কষ্ট পাইবা।

মন্তু আবার একগলা পানিতে নেমে যেতে যেতে বললো, দূর কিছু অইবো না আমার।

টুনি কিছু বলতে যাচ্ছিলো হঠাৎ মকবুলের উঁচু গলার ডাকে ওর কথায় ছেদ পড়লো।

কই টুনি বিবি, রলি বিবিজানের মুখ ধোয়ন কি এহনো অইলো না নাকি? রান্না ঘর থেকে চিৎকার করছে বুড়ো মকবুল। কাল রাতে যে ধানগুলো ভানা হয় নি সেগুলো ভানতে হবে এখন। হাত ভেঙ্গে ফুলে গেলেও সহজে বসে থাকার পাত্র নয় মকবুল।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে বুড়োর মৃত্যু কামনা করতে করতে ঘাট থেকে উঠে গেলো টুনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তুর কোন জমিজমা নেই।

পরের জমিতে খেটে রোজগার করে। লাঙ্গল চষে। ধান বোনে। আবার সে ধান পাকলে পরে কেটে এনে মালিকের গোলা ভর্তি করে। তারপর ধানের মরশুম শেষ হয়ে গেলে কলাই, মুগ, তিল সরিষার ক্ষেতে কাজ করে মন্তু। মাঝে মাঝে এ বাড়ি ও বাড়ি লাকড়ি কাটার চুক্তি নেয়। পাঁচ মণ এক টাকা। কোন কোন দিন আট নয় মণ লাকড়িও কেটে ফেলে সে। মাঝে কিছুকাল মাঝি-বাড়ির নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখের সঙ্গে নৌকা বেয়েছিলো মন্তু। নৌকায় পাল তুলে অনেক দূরের গঞ্জে চলে যেতো ওরা। ওখান থেকে যাত্রী কিংবা মাল নিয়ে ফিরতো। ক্ষেতের রোজগারের চেয়ে নৌকায় রোজগার অনেক বেশি।

মাচাঙের উপর থেকে আধ ময়লা ফতুয়াটা নামিয়ে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে মন্তু ভাবলো, আজ একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করবে গিয়ে। তখন সন্ধ্যার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে গ্রামের বুকে। মিয়া বাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে তছবিহ হাতে নামাজ পড়তে চলেছেন গনু মোল্লা। মোরগ হাঁসগুলো সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার পর এখন উঠোনের এককোণে এসে জটলা বেঁধেছে। একটু পরে যার যার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে ওরা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো মন্তু।

মাঝি-বাড়িটা বেশি দূরে নয়।

সগন শেখের পুকুরটাকে বাঁ দিকে রেখে ডান দিকে মিয়াদের খেজুর বাগানটা পেরিয়ে গেলে দুটো ক্ষেত পরে মাঝি-বাড়ি। বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে নন্তু শেখের গরু ঘরে পেছন থেকে একটা লোম ওঠা হাড় বের করা কালো কুকুর দৌড়ে এসে বিকট চিৎকার জুড়ে দিলো। হেই হেই করে কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলো সে।

দেউড়ির সামনে বাঁশের উপরে ঝুলিয়ে রাখা সুপুরি পাতার ঝালরের আড়াল থেকে একটা গানের কলি গুন্‌গুন্ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এলো আম্বিয়া।

আরে মন্তু ভাই দেহি। কি খবর?

মন্তু বললো, করিম আছে নাহি?

মাথার চুলগুলো খোঁপার মধ্যে গুটিয়ে নিতে নিতে আম্বিয়া বললো, আছে।

আইজ কয়দিন থাইকা জ্বর অইছে ভাইজানের।

কি জ্বর? কহন অইছে? মন্তুর চোখে উৎকণ্ঠা।

আম্বিয়া আস্তে করে বললো, পরশু রাইত থাইকা অইছে। কি জ্বর তা কইবার পারলাম না।

হুঁ। মন্তু কি যেন চিন্তা করলো। তারপর ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতে আম্বিয়া পেছন থেকে ডাকলো, চইল্যা যাও ক্যান? দেখা কইরা যাইবা না? আম্বিয়ার পিছু পিছু হোগলার বেড়া দেয়া ঘরটায় এসে ঢুকলো মন্তু। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে ম্লান হেসে করিম বললো, মন্তু মিয়া যে, তোমারে তো আইজ-কাল দেখাই যায় না। বাঁইচা আছি না মইরা গেছি তাও তো খোঁজ-খবর নাও না মিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তু প্রথমে বিব্রত বোধ করলো, তারপর বলল, দেখা না অইলে কি অইবো মিয়া খোঁজ-খবর ঠিকই নিই।

কল্‌কেতে তামাক সাজিয়ে এনে হুঁকোটা মন্তুর দিকে বাড়িয়ে দিলো আম্বিয়া। তারপর জিজ্ঞেস করলো, পান খাইবা? মন্তু হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে বললো, না থাউক। আপন মনে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো সে। তারপর আসল কথাটা আলোচনা করলো ওর সঙ্গে। করিম শেখের আবার কিছুদিনের জন্য নৌকায় কাজ করতে চায় মন্তু।

শুনে খুশি হলো করিম। বললো, নাওটারে একটু মেরামত করন লাগবো।

কাল পরশু একবার আইসো।

আবার আসবে বলে উঠতে যাচ্ছিলো মন্তু।

করিম সঙ্গে সঙ্গে বললো, আহা যাও কই, বহ না।

না। রাইত অইছে যাই এইবার।

আম্বিয়া বললো, বহ মন্তু ভাই, চাইরডা ভাত খাইয়া যাও।

এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা পাল্টে একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে আম্বিয়া। মুখখানা গামছা দিয়ে মুছে এসেছে সে। কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন, আট হাত শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়। ওকে অমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করলো আম্বিয়া, দাঁড়াইয়া রইলা ক্যান, বহ না।

মন্তু বললো, না আইজ না। আর এতদিন থামু। বলে বাইরে বেরিয়ে এলো মন্তু।

পিদিম হাতে দেউড়ি পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে গেলো আম্বিয়া। মন্তু শুধালো, তোমার আব্বা কই গেছে?

আম্বিয়া বললো, যেই কাজ কইরা বেড়ায় সেই কাজ করতে গেছে। যাইবো আবার কই।

ওর গলায় ক্ষোভ।

ওর মুখের দিকে এক নজর তাকালো মন্তু। ওর ক্ষোভের কারণটা সহজে বুঝতে পারলো। সাত গ্রামের মরা মানুষকে কবর দিয়ে বেড়ায় নন্তু শেখ। আশেপাশের গ্রামে গত ত্রিশ বছর ধরে যত লোক মরছে সবার কবর খুঁড়েছে নন্তু শেখ। এ তার পেশা নয়, নেশা।

আম্বিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় নেমে এলো মন্তু তখন সে অনুভব করলো বেশ রাত হয়েছে।

চারপাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাক। মাঝে মাঝে গাছের মাথায় দু-একটা পাখি হঠাৎ পাখা ঝাঁপটিয়ে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভরা চাঁদ হাসছে খলখলিয়ে।

বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই সুরত আলীর সুর করে পুঁথি পড়ার শব্দটা কানে এলো মন্তুর।

কইন্যা দেইখা গাজী মিয়ার চমক ভাঙ্গিলো।
কইন্যার রূপেতে গাজী বেহুঁশ হইল।

উঠোনে বেশ বড় রকমের জটলা বেঁধেছে একটা। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে সবাই। আর তার মাঝখানে পিদিমের আলোতে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত। পুরুষরা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেও মেয়েরা বসেছে একটু দূরে। যাদের বয়স কম তারা বসেছে আরো দূরে। দাওয়ার ওপরে।

বুড়ো মকবুল গুড়ুম গুড়ুম হুঁকো টানছে আর বারবার প্রশংসা করছে সুরত আলীর পুঁথি পড়ার। বড় সুন্দর পুঁথি পড়ে সুরত আলী। এ গাঁয়ের সেরা পুঁথি পড়ুয়া সে।

অকাশে যখন জোছনার বান ডাকে। ভরা চাঁদ খলখলিয়ে হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায় পাতায়। কাক ডাকে না। চড়ুই আর শালিক কোন সাড়া দেয় না। গ্রামের সবাই সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুঁথি পড়ে সুরত আলী। গাজী কালুর পুঁথি। ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি।

শুন শুন বন্ধুগণরে, শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্ব্বজন।।
কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।।
আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী।
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূলের পরী।।

উৎকর্ণ হয়ে শোনে সবাই। সুরত আলী পড়ে। ঢুলে ঢুলে সুর করে পড়ে সে। পুরুষেরা গুড়ম গুড়ম তামাক টানে। মেয়েরা পান চিবোয়। মাঝে মাঝে কমলার পুঁথিটাও পড়ে শোনায় সুরত। কমলার কিচ্ছা বর্ণনা করে সবার কাছে। কিচ্ছা নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। হিরণ্য নগরের মেয়ে ছিল কমলা। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভোজ উৎসব করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একদিন বিয়ে হয়ে গেলো তার হিরণ্য নগরের রাজকুমারের সঙ্গে।

বড় সুখে দিন কাটছিলো ওদের।

এক বছর পরে একটা দুধের মত মেয়ে জন্ম নিলো ওদের।

আট বেহারার পালকি চড়ে একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লাল পরী, নীল পরী আর সবুজ পরীর দীঘির পাড় দিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলো কমলা। দীঘি দেখে পালকি থেকে নামলো সে। চৈত্র মাসের খর রোদে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিলো ওর। দীঘির স্বচ্ছ পানি দেখে বড় লোভ হলো কমলার। পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে আঁজল ভরে পানি খেলো সে। তারপর যখন উঠতে যাবে, দেখলো, চুলের মত সরু কি যেন একটা কড়ে আঙ্গুলের গোড়ায় আটকে রয়েছে। হাত দিয়ে ছাড়াতে গেলো। পারলো না কমলা। যত টানে তত লম্বা হয় সে চুল। তার এক প্রান্ত পানির ভেতরে, অন্য প্রান্ত কড়ে আঙ্গুলের সঙ্গে গিঁট আঁটা। ছাড়াতে পারে না কমলা, এগুতেও পারে না। এগুতে গেলে পানির ভেতর চুলে টান পড়ে। কে যেন টেনে ধরে রেখেছে ওটা। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেলো । কত লোক এলো। কত লোক গেলো।

কত কামার কুমার ওঝা এসে জড়ো হলো। কেউ কিছু করতে পারলো না। ইস্পাতে তৈরি কুড়োল দিয়েও কাটা গেলো না চুলটা? তিন মাস তিন দিন চলে গেলো।

তারপরে এক রাতে স্বপনে দেখিলো সুন্দরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীঘির পানিতে আছে এক রাজপুরী।
সেইখানে আছে এক রাজপুত্র সুন্দর।
আসেক হইয়াছে তার কমলার উপর।
কমলারে পাইতে চায় আপন করিয়া।
কমলার লাইগা তার কান্দিছে হিয়া।।

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙ্গে গেলো কমলার। কাঁদলো সবাই। বাবা, মা। স্বামী সবাই। দীঘির পানি থেকে চুলে টান পড়লো এতদিনে। পাতা পানি থেকে হাঁটু পানিতে নেমে গেলো কমলা। হাঁটু থেকে বুক। তারপর গলা। ধীরে ধীরে দীঘির পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো কমলা সুন্দরী।

চাঁদ হেলে পড়ে পুব থেকে পশ্চিমে।
ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।
ঢুলে ঢুলে পুঁথি পড়া শেষ করলো সুরত আলী।
হীন মোয়াজ্জেমে কহেরে শুন সর্ব্বজন।
কমলা সুন্দরীর কিচ্ছা হইল সমাপন।।
ভুল চুক হইলে মোরে লইবেন ক্ষেমিয়া।
দোয়া করিবেন মোরে অধীন জানিয়া।

পুঁথি পড়া শেষ হয়। কমলা সুন্দরী আর ভেলুয়া সুন্দরীর জন্যে অনেকে অনেক আফসোস করে মেয়ে বুড়োরা। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মোছে আমেনা। টুনির চোখ জোড়াও পানিতে টলটল করে ওঠে। ফকিরের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সব খোদার ইচ্ছা, খোদা মাইরবার চাইলে কিনা করতা পারে। বুড়ো মকবুল কিছুক্ষণের জন্য হুঁকো টানতে ভুলে যায়। সে চুপ করে কি যেন ভাবে আর নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

খড়ম জোড়া তুলে নিয়ে হাত পা ধোয়ার জন্যে পুকুর ঘাটে চলে যায় মন্তু। অজু করে এসে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে আজ।

মাঝি বাড়ি থেকে ধপাস ধপাস ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

রাত জেগে আজও ধান ভানছে আম্বিয়া। বড় মিহি কণ্ঠস্বর ওর, বড় সুন্দর গান গায় সে।

ভাটুইরে না দিয়ো শাড়ি,
ভাটুই যাবো বাপের বাড়ি।
সর্ব লক্ষণ কাম চিক্কণ,
পঞ্চ রঙের ভাটুইরে।

পুকুর ঘাট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মন্তু। ছোট পুকুরের পূর্ব পাড় থেকে কে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাড়ের দিকে। আবছা আলোতে সব কিছু স্পষ্ট না দেখলেও মেয়েটিকে চিনতে ভুল হলো না মন্তুর। আবুলের বউ হালিমা। এত রাতে একা একা কোথায় যাচ্ছে সে। পশ্চিম পাড়ের লম্বা পেয়ারা গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো মেয়েটা। চারপাশে বার কয়েক ফিরে তাকালো সে। তারপর ধীরে ধীরে পরনের ছেঁড়া কাপড়টা খুলে ফেললো সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মন্তু। হাত-পাগুলো কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর।

পরনের কাপড়া খুলে তার একটা প্রান্ত পেয়ারা গাছের মোটা ডালটার সঙ্গে বাঁধলো হালিমা। আরেকটা প্রান্ত নিজের গলার সঙ্গে পেঁচিয়ে কি যেন পরখ করলো সে।

মন্তুর আর বুঝতে বাকি রইলো না, গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে চায় হালিমা।

এ দুনিয়াটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর কাছে। তাই আর বাঁচতে চায় না ও।

মন্তু এ মুহূর্তে কি করবে ভেবে উঠতে পারছিলো না।

হঠাৎ ওকে অবাক করে দিয়ে গলার ফাঁসটা খুলে ফেলে আপন মনে কেঁদে উঠলো হালিমা। পেয়ারা গাছটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সে।

হয়তো, বাবা-মার কথা মনে পড়েছে ওর। কিম্বা, দুনিয়াটা অতি নির্মম হলেও ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না হয়তো।

এর মধ্যে বার চারেক গলায় ফাঁস পরেছে আর খুলেছে হালিমা। ওর অবস্থা দেখে অতি দুঃখে হাসি পেলো মন্তুর। ধীরে ধীরে ওর খুব কাছে এগিয়ে গেলো সে। তারপর অকস্মাৎ ওর একখানা হাত চেপে ধরলো মন্তু।

একটা করুণ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো হালিমা। বড় বিষণ্ন চাহনি ওর। অনেকক্ষণ কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলো দু'জন। ঈষৎ চাঁদের আলোয় মন্তু দেখলো, হালিমার নাক আর চোখ দুটো অসম্ভব রকম ফুলে গেছে। এত মার মেরেছে ওকে আবুল।

মন্তু শিউরে উঠলো। তারপর কি বলতে যাচ্ছিলো সে।

হঠাৎ এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চাপা কান্নার সঙ্গে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলো হালিমা। বোবা দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু।

পুকুর পাড় থেকে ফিরে এসে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো সে।

চেয়ে দেখে, ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথির কথাগুলো গুন্‌গুন্ করছে টুনি।

দাওয়া থেকে নেমে এসে টুনি শুধালো, কোথায় গিছলা মিয়া। তোমারে আমি খুঁইজা মরি।

শোবার ঘর থেকে মকবুল আর আমেনার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। রশীদ আর সালেহাও বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি নিয়ে যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

সুরত আলীর ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আবুল আর হালিমার ঘরেও কোন বাতি নেই।

মন্তু সহসা টুনির কথার কোন জবাব দিলো না।

টুনি আরো কাছে এগিয়ে এসে বললো, এহনি ঘুমাইবা বুঝি?

মন্তু বললো, হুঁ। শরীরটা আইজ ভালো নাই।

ক্যান, কি অইছে? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা। জ্বর হয় নাই তো? মন্তু বললো, না এমনি খারাপ লাগতাছে।

টুনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে করে বললো, আইজ শাপলা তুলতে যাইবা না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্তু বললো, আজ থাক, কালকা যামু।

টুনি কি যেন ভাবলো। ভেবে বললো, পরশু দিনকা আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।

তাই নাহি?

হুঁ। বাপজানের অসুখ, তাই।

অসুখের কথা কার কাছ থাইকা শুনলা? ওর মুখের দিকে তাকালো মন্তু।

টুনি আস্তে করে বললো, বাপজান লোক পাঠাইছিলো।

অ। উঠোনের মাঝখানে দু'জন কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। একটু পরে মন্তু নীরবতা ভাঙলো, পরশু থাইকা আমিও নাও বাইতে যাইতাছি।

কোনহানে যাইবা? টুনি সোৎসাহে তাকালো ওর দিকে।

মন্তু বললো, কোনহানে যাই ঠিক নাই। করিম শেখের নাও। সে যেই হানে নিয়া যায় সেই হানেই যামু।

টুনি বললো, তোমার নায়ে আমারে বাপের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবা? বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো টুনি।

সহসা কোন জবাব দিতে পারে না মন্তু। তারপর ইতস্তত করে বলে, অনেক রাত অইছে এইবার ঘুমাও গিয়া। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় মন্তু।

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙলো মন্তুর।

বাইরের উঠোনে তখন কি একটা বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাঁধিয়েছে আমেনা আর সালেহা। অকথ্য ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দিচ্ছে ওরা। গনু মোল্লার ঘরের সামনে একটা বড় রকমের ভীড়।

গ্রামের অনেক ছেলে বুড়ো এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। ব্যাপারটা কি প্রথমে বুঝতে পারলো না মন্তু। পরে বুড়ো মকবুলের মেয়ে হিরনীর কাছ থেকে শুনলো সব।

মজু ব্যাপারীর মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে। ভূত তাড়াবার জন্য ওকে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে সবাই। ব্যাপারীর ছোট ভাইকে সামনে পেয়ে মন্তু শুধালো, কি মিয়া ভূতে পাইল কহন অ্যাঁ?

ব্যাপারীর ভাই আদ্যপ্রান্ত জানালো সব।

কাল ভোর সকালে পরীর দীঘির পাড়ে শুকনো ডাল পাতা কুড়োতে গিয়েছিলো মেয়েটা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো মেয়ে আর ফিরে না। ওদিকে মেয়ের মা তো ভেবেই আকুল। বয়স্কা মেয়ে, কে জানে আবার কোন বিপদে পড়লো। প্রথমে ওকে দেখলো কাজী বাড়ির থুরথুরে বুড়িটা। লম্বা তেতুঁল গাছের মগডালে উঠে দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে টেনে টেনে দিব্যি গান গাইছে মেয়েটা। বুড়ি তো অবাক, বলি লজ্জা শরমের কি মাথা খাইছ? দিন দুপুরে গাছে উইঠা পিরীতের গীত গাইবার লাগছ। ও মাইয়্যা, বলি লজ্জা শরম কি সব উইঠা গেছে নাহি দুনিয়ার উপর থাইক্যা?

বুড়ি যত চিৎকার করে মরে, মেয়ে তত শব্দ করে হাসে। সে এক অদ্ভুত হাসি। যেন ফুরোতেই চায় না।

খবর শুনে মজু ব্যাপারী নিজে ছুটে এলো দীঘির পাড়ে। নিচে থেকে মেয়েকে নাম ধরে বারবার ডাকলো সে। সখিনা, মা আমার নাক-কান কাটিছ না মা, নাইম্যা আয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবাকে দেখে ওর গায়ের ওপরে থুথু ছিটিয়ে দিলো সখিনা। তারপর খিলখিল শব্দে হেসে উঠে বললো, আর যামু না আমি। এইহানে থাকুম।

ওমা কয় কি। মাইয়্যা আমার এই কি কথা কয়? মেয়ের কথা শুনে চোখ উল্টে গেলো মজু ব্যাপারীর।

থুরথুরে বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। সহসা বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়লো সে, লক্ষণ বড় ভালো না ব্যাপারী। মাইয়ারে তোমার ভূতে পাইছে।

খবরদার বুড়ি বাজে কথা কইস না। উপর থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো সখিনা।

বেশি বক বক করলে ঘাড় মটকাইয়া দিমু।

এ কথার পরে কারো সন্দেহের আর অবকাশ রইলো না।

বুড়ি বললো, এ বড় ভালো লক্ষণ নয়, জলদি কইরা লোকজন ডাহ।

লোকজন ডাকার কোন প্রয়োজন ছিলো না। কারণ হাঁক-ডাক শুনে ততক্ষণে গ্রামের অনেক লোক এসে জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। বুড়ো ছমির মিয়া বললো, দাঁড়ায়া তামাশা দেখতাছ ক্যান মিয়ারা, একজন উইঠ্যা যাও না উপরে। কে উঠবে, কে উঠবে না তাই নিয়ে বচসা হলো কিছুক্ষণ। কারণ যে কেউ তো আর উঠতে পারে না। এমন একজনকে উপরে উঠতে হবে, মেয়ের গায়ে হাত ছোঁয়াবার অধিকার আছে যার। অবশেষে ঠিক হলো তকু ব্যাপারীই উঠবে উপরে। মেয়ের আপন চাচা হয় সে। সুতরাং অধিকারের প্রশ্ন আসে না।

তকু ব্যাপারীকে উপরে উঠতে দেখে ক্ষেপে গেলো সখিনা। চিৎকার করে ওকে শাসাতে লাগলো সে, খবরদার, খবরদার ব্যাপারী, জানে খতম কইরা দিমু। বলে ছোট ছোট ডাল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওর ঘাড়ের ওপরে ছুঁড়ে মারতে লাগলো সে। তারপর অকস্মাৎ এক লাফে দীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটা। অনেক কষ্টে দীঘির পানি থেকে পাড়ে তুলে আনা হলো তাকে।

কলসি কলসি পানি ঢালা হলো মাথার ওপর। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো সখিনার তখন সে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। তারপর থেকে একটা কথাও বলে নি সখিনা। একটা প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি সে। তাই আজ সকালে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে ওকে, যদি ভূতটাকে কোন মতে তাড়ানো যায়। নইলে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। ব্যাপারীর ভাইয়ের কাছ থেকে সব কিছু শুনলো মন্তু। গনু মোল্লার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো একটা সাদা কাপড়কে সরষের তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে সেই কাপড়টাকে সখিনার নাকের ওপর গনু মোল্লা ধরেছে আর চিৎকার করে বলছে, কোনহানে থাইকা আইছস শীগগীর কইরা ক, নইলে কিন্তুক ছাড়মু না আমি। ক শীগগীর। সখিনা নীরব।

তার ঘাড়ের ওপর চেপে থাকা ভূতটা কোন কথাই বলছে না।

মন্তু আর দাঁড়ালো না সেখানে। ঘরের পিছন থেকে একটা নিমের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে দাঁতন করতে করতে পুকুর ঘাটে চলে গেলো সে। পুকুর পাড়ের পেয়ারা গাছের নিচে লাউ গাছগুলোর জন্য একটা মাচা বাঁধছে হালিমা। এখন দেখলে কে বলবে যে ওই মেয়েটা এই গতকাল রাতে ওই পেয়ারা গাছটার ডালে গলায় কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো। ওর দিকে চোখ পড়তেই, কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার মাচা বাঁধতে লাগল হালিমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকাটা ঘাটে বেঁধে রেখে একগাদা কাদা ডিঙিয়ে পাড়ে উঠে আসে ওরা। মন্তু আর করিম শেখ। হাটের এক কোণে মনোয়ার হাজীর চায়ের দোকানে বসে গরম দু'কাপ চা খায়।

হাটের নাম শান্তির হাট। কিন্তু সারাদিন অশান্তিই লেগে থাকে এখানে। দূর দূর বহুদূর গ্রাম থেকে লোক আসে সওদা করতে। খুচরো জিনিসপত্রের চেয়ে পাইকারী জিনিসপত্রের বিক্রি অনেক বেশি। এখান থেকে মালপত্র কিনে নিয়ে গ্রামে গ্রামে আর ছোট ছোট হাট বাজারের দোকানীরা দোকান চালায়।

মাঝে মাঝে দু'একটা সার্কাস পার্টিও আসে এখানে। তখন সমস্ত পরগণায় সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে ছেলে বুড়ো মেয়ে এসে জড়ো হয় এখানে। দোকানীদেরও তখন খুশির অন্ত থাকে না। জোর বিক্রি চলে। নদীর পাড়ের ভরাট জায়গাটায় কয়েকটা দোচালা ঘর তুলে নিয়ে সেখানে হোটেল খোলে কেউ। ভিড় লেগেই থাকে।

মানোয়ার হাজীর সঙ্গে করিম শেখের অনেক দিনের খাতির। এ হাটে এলে একমাত্র হাজীর দোকানেই চা খায় করিম। হাজীও বাইরের কোথাও যেতে হলে করিম শেখের নাও ছাড়া অন্য কারো নৌকায় যায় না। চায়ের পয়সা দিতে এলে হাজী একমুখ হেসে শুধালো, কি মিয়া খবর সব ভাল তো?

করিম শেখ বিরক্তির সঙ্গে বললো, আর খবর, হাঁপানি হয়া মরতাছি।

আহা, ওইডা আবার কখন থাইকা হইলো? হাজীর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। তা মিয়া হাঁপানি নিয়া না বাইরলেই পারতা।

কি আর করমু ভাই। পেট তো চলে না। করিম শেখ আস্তে করে বললো, পেট তো ঠাণ্ডা গরম কিছু মানে না।

মন্তুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে করিম।

কিছুক্ষণ হাটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ওরা।

আকাশটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে দু'পাশের গ্রামগুলো। মাঝে মাঝে দু'একটা মিটমিটে বাতি দেখে বোঝা যায় গেরস্থদের বাড়ি গেলো একটা। কিম্বা হঠাৎ কোথাও একসার বাতি দুলতে দুলতে এগিয়ে যেতে দেখলে চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায় হাট থেকে ফিরছে ওরা হাটুরের দল।

মাঝে মাঝে দু' একটা শিয়াল আর অনেকগুলো কুকুরের দলবাঁধা ডাক শোনা যায়। আর উজান নদীর একটানা কলকল শব্দ।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরে মন্তু।

আশা ছিলো মনে মনে প্রেম করিমু তোমার সনে।

তোমায় নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে।

গানের সুর বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। করিম শেখ হুঁকোটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে, নাও মিয়া তামুক খাও।

হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নেয় মন্তু। গুড়ুম গুড়ুম টান মারে হুঁকোতে।

তারপর আবার গান ধরে, আশা ছিল মনে মনে।

গান শুনে করিম শেখের মনটা উদাস হয়ে যায়। ও বলে, এইবার একডা বিয়া শাদি করমু ঠিক করছি। একা একা আর ভালো লাগে না। মন্তু গান থামিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। অন্ধকারে ওর মুখখানা ভালো করে দেখতে পায় না সে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিম শেখ আবার বলে, কি মিয়া কিছু কও না যে?

মন্তু বলে, বিয়া করবা সেতো ভালো কথা।

করিম শেখ বলে, করবার তো ইচ্ছা হয়, করি কারে? ভাল দেইখ্যা একটা মাইয়া দেহায়া দাও না।

মন্তু হাসে, বলে, ভাল মাইয়া পাইলে কি আর নিজে এতদিন অবিয়াত থাকি মিয়া। বলে আবার গান ধরে সে।

আশা ছিল মনে মনে.....।

বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখলো বুড়ো মকবুলের ঘরের সামনে একটা ছোট-খাট জটলা বসেছে। বাড়ির সবার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করছে মকবুল। বাড়ির সবার চেয়ে বড় সে। গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সকলকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না বুড়ো। অন্য সবার বেলাও তাই। মকবুলকে জিজ্ঞেস না করে বাড়ির কেউ কোনদিন কোন কাজ কারবার করে না। সুরত আলীর সঙ্গে হয়তো রশীদের মনোমালিন্য আছে। আবুলকে হয়তো মকবুল দু'চোখে দেখতে পারে না। গনু মোল্লাকে হয়তো দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার অভিশাপ দেয় ফকিরের মা। কিন্তু বাড়ির মান-সম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোন কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। তখন সবাই এক। একসঙ্গে বসে পরামর্শ করবে ওরা। মন্তুকে আসতে দেখে ওর দিকে একখানা পিঁড়ি বাড়িয়ে দিলো সালেহা, বহ, মন্তু মিয়া বহ।

আলোচনার ধারটা মুহূর্তে বুঝে নিলো মন্তু।

বুড়ো মকবুলের মেয়ে হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনিদের বাবার বাড়ির গ্রাম থেকে। আজ সন্ধ্যায় টুনিকে নিয়ে যাবার জন্যে ওর বাবার বাড়ি থেকে লোক এসেছিলো। সেই দিয়ে গেছে প্রস্তাবটা। জুলু শেখের বেটা কদম শেখ। হাল গরু জমি সব আছে ওদের। খাস গেরস্থ ঘরের ছেলে। বিয়ে একটা অবশ্য করেছিল একবার। মাস তিনেক হলো বউ মারা গেছে।

আমেনা বলছে, অত চিন্তা কইরা আর কি অইবো; পাকা কথা দিয়া দ্যান। গনু মোল্লা বললো, সব খোদার ইচ্ছা। মাইয়ার কপালে যদি সুখ থাকে তাইলে যেইহানে বিয়া দিবা সেইহানেই সুখে থাকবো। বড় বেশি বাছ বিচার কইরো না।

মকবুল সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলো, হ্যাঁ, তাতো ঠিক কথা।

হীরনের বিয়ের কথা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল, মাঝখানে রশীদের বউ সালেহা বলে উঠলো, আমাগো মন্তু মিয়ারেও এইবার একটা বিয়া করাইয়া দ্যান। এককোণে নীরবে বসেছিলো মন্তু। ওর দিকে তাকিয়ে সকলে সালেহার কথায় একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলো।

বুড়ো মকবুল গম্ভীর গলায় বললো, হ, ঠিক কথা কইছ সালেহা।

ওর লাইগ্যা একটা মাইয়া দেহন লাগে।

আমেনা বললো, ওর তো বাপ-মা কেউ নাই, আপনেরা আছেন দেইখা শুইনা করায়া দেন বিয়াডা।

সঙ্গে সঙ্গে দু'চারজন মেয়ে নিয়েও আলাপ করলো ওরা।

ফাতেমার এক খালাতো বোন আছে। রসুন তার নাম। রসুনের মত সাদা হলুদে মেশানো গায়ের রঙ। সুঠাম দেহ। টানা টানা চোখ।

বয়স তের চৌদ্দ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল বললো, ওর মামার এক মেয়ে আছে। দেখতে যেমন হুরপরী। তাই মামা আদর করে পরী বলে ডাকে। শুধু স্বভাবটা যেন একটু কেমন কেমন। তাও তেমন কিছু নয়। খায় একটু বেশি। আর ঘুমোয়। মকবুল পরক্ষণে বললো, ও মাইয়া ঘরে আইনা কাজ নাই মিয়া। আমেনা বললো, অত দূরে দূরে যাইতাছ ক্যান, নিজ গেরামে দেহ না। আমাগো আম্বিয়া কি খারাপ মাইয়া নাহি। ও হইলেই খুব ভালো হয়। দিনরাত গতর খাটাবার পারে। মন্তু মিয়ারে সুখে রাখবো। আম্বিয়ার প্রশ্নে কারো কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া গেলো না। ও মেয়ে গতর খাটাতে পারে এ কথা সত্যি। কিন্তু ঘরের বউ করে আনার মতো মেয়ে ও নয়।

মকবুল বললো, ওগো বংশে হাঁপানি রোগ আছে। শেষে হাঁপানি হইয়া মন্তু মরবো।

মন্তু কিন্তু একটা কথাও বললো না। সে চুপ করে বসে রইল এক কোণে।

আলোচনা অসমাপ্ত রেখে সেদিনের মত উঠে গেলো সবাই।

একটু পরে যে যার ঘরে চলে গেলো ওরা।

পিদিম জ্বালিয়ে অবাক হলো মন্তু। মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলার ফুল ঝুলছে। বকের মত সাদা ধবধবে পাতার মাঝখানে হলুদ রঙের কুঁড়ি। টাটাসহ ফুলগুলো মাচাঙ থেকে নামিয়ে নিলো মন্তু।

আজ সন্ধ্যায় বাপের বাড়ি চলে গেছে টুনি। যাবার আগে এগুলো রেখে গেছে ওর ঘরে। এক টুকরো ম্লান হাসি জেগে উঠলো মন্তুর ঠোঁটের কোণে। ফুলগুলো আবার মাচাঙের উপর তুলে রেখে বিছানাটা নামিয়ে নিলো মন্তু।

কিছুদিন ধরে শীত পড়তে শুরু করেছে।

দিনের বেলা ঈষৎ গরম। শেষ রাতে প্রচণ্ড শীত, হাড় কাঁপুনী শুরু হয়। কাঁথার নিচেও দেহটা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে।

এ সময়ে বাড়ির সবাই মাটির ভাড়ে ভুসির আগুন জ্বেলে মাথার কাছে রাখে। মাঝে মাঝে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আগুনটাকে উস্কে দেয়। আজকাল ভোর হওয়ার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে যায় মন্তু। সোয়া দু'টাকা দিয়ে কেনা খদ্দরের চাদরটা গায়ে মাথায় মুড়িয়ে নিয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাঝি বাড়ির দিকে ছুটে সে। ক'দিন হলো করিম শেখ হাঁপানিতে পড়েছে। সারাদিন খুক খুক করে কাশে আর লম্বা শ্বাস নেয়।

মন্তু বলে একডা কবিরাজ দেহাও মিয়া।

করিম বলে, কিছু হয় না মিয়া, অনেক দেহাইছি।

আম্বিয়া বলে, হাটে-গঞ্জে যাও ভাল দেইখা ডাকতর দেখাইতে পার না?

করিম শেখ চুপ করে থাকে, কিছু বলে না। আজ সকালে মাঝি বাড়ির দিকে সবে রওয়ানা দিয়েছে মন্তু। দাওয়া থেকে মকবুল ডেকে বললো, রাইতের বেলা একটু সকাল কইরা ফিরো মন্তু মিয়া। হীরনের বিয়ার ফর্দ হইব আজই।

বাড়ির সকলকে আজ একটু সকাল সকাল ঘরে ফিরে আসতে বলে দিয়েছে বুড়ো মকবুল। বিদেশ থেকে মেহমানরা আসবে, ওদের খাতির যত্ন করতে হবে। আদর আপ্যায়ন করে খাওয়াতে হবে ওদের। নইলে বাড়ির বদনাম করবে ওরা।

মন্তুর উপরে আরো একটা ভার দিয়েছে মকবুল। নাও নিয়ে গিয়ে টুনিকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

দু'-এক দিনের মধ্যে নবীনগরে যাবে মন্তু। করিম শেখের শরীরটা একটু ভালো হয়ে উঠলেই নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথের দু'পাশের ক্ষেতগুলোতে কলাই, মুগ, মটর আর সরষে লাগানো হয়েছে। সারারাতের কুয়াশায় এই সকালে সতেজ হয়ে উঠেছে ওরা। রোদ পড়ে শিশিরের ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে ওদের গায়ে।

মাঝি-বাড়ির দেউড়ির সামনে আম্বিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মন্তুর। পুকুর থেকে এইমাত্র গোছল করে ফিরছে সে। ঘন কালো চুলগুলো থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এখনো পানি ঝরছে। হাতের ভেজা শাড়িটার পানি নিংড়াতে নিংড়াতে আম্বিয়া বললো, মন্তু ভাই হুট কইরা চইলা যাইও না। পিঠা বানাইছি খাইয়া যাইও।

মন্তু বললো, এই সকাল বেলা গোছল করছো তোমার শীত লাগে না? আম্বিয়া একটু হাসলো শুধু। কিছু বললো না।

সারারাত মিয়া-বাড়িতে ধান ভেনেছে সে। এই শীতের রাতেও ধান বানতে গিয়ে সারা দেহে ঘাম নেমেছে ওর। পুরো গায়ের কাপড়ে ঘামের বিশ্রী গন্ধ। তাই সকাল সকাল গোসল করে নিয়েছে আম্বিয়া। খেয়ে-দেয়ে একটু পরে ঘুম দেবে সে। উঠবে সেই অপরাহ্নে। তারপর আবার মিয়া-বাড়ি চলে যাবে আম্বিয়া। ধান ভানবে, সারারাত।

মন্তুকে একটা পিঁড়িতে বসতে দিয়ে ওর সামনে এক বাসন পিঠা এগিয়ে দিলো আম্বিয়া। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে করিম শেখ বললো, খাও মিয়া খাও। বলে আবার কাশতে শুরু করলো সে। আম্বিয়া তখন পাশের ঘরে গিয়ে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে। মাঝে মাঝে বুড়ো নন্তুশেখের সঙ্গে কি যেন কথা বলছে সে।

বেড়ার খুপরি দিয়ে চোরা চাউনি মেলে ওকে দেখতে লাগলো মন্তু। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন। আট হাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়। আজ আম্বিয়াকে বড় ভালো লাগছে মন্তুর। চোখের পলক জোড়া ঈষৎ কেঁপে উঠলো।

হ্যাঁ, আম্বিয়াকে বিয়ে করবে সে। হোক হাঁপানি। সে পরে দেখা যাবে। বুড়ো মকবুলকে আজকেই ওর মনের কথাটা জানিয়ে দেবে মন্তু। সহসা একটা সিদ্ধান্ত করে বসলো সে।

করিম শেখ লম্বা শ্বাস নিয়ে বললো, কি মিয়া হাত তুইলা বইসা রইলা যে?

মন্তু তাড়াতাড়ি একটা পিঠা মুখে পুরে দিয়ে বললো, হুঁ হুঁ এইতো খাইতাছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো বাসনটা শূন্য করে দিলো মন্তু। কাঁথাটা ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে করিম শেখ কাঁপা গলায় বললো, আমার বুঝি দিনকাল শেষ হইয়া আইলো মিয়া, আর বাঁচুম না।

আহা অমন কথা কয় না মিয়া। অমন কথা কয় না। পরক্ষণে ওকে বাধা দিয়ে মন্তু বললো, মরণের কথা চিন্তা কইরতে নাই। আয়ু কইমা যায়।

করিম শেখ তবু বিড়বিড় করে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় শোক প্রকাশ করতে লাগলো।

রাতে এলো ওরা।

বরের মামা, চাচা আরো দু'তিনজন লোক।

হিরণের বিয়ের ফর্দ হবে আজ।

মকবুলের বাইরের ঘরটাতে ফরাস পেতে বসানো হলো ওদের।

গনু মোল্লা বসলেন সবার মাঝখানে।

আবুল রশীদ আর সুরত আলী ওরাও বসলো সেখানে। বুড়ো মকবুল প্রথমে আসতে রাজী হয় নি। বলছিলো, তোমরা সবাই আছ, ভাল মন্দ যা বুঝ আলাপ কর গিয়ে। আমারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর মধ্যে টাইনো না। রশীদ বললো, কি কথা, আপনের মাইয়া আপনে না থাকলে চলবো কেমন কইরা?

ঘরের ভেতর থেকে বরের চাচা হাঁক ছাড়লো, কই, বেয়াই কই, তেনারে দেহি না ক্যান?

অবশেষে ঘরে এসে এককোণে গুটিসুটি মেরে বসে পড়লো মকবুল। প্রথমে মেহমানদের ভাত খাওয়ান হবে। তারপরে ফর্দ হবে বিয়ের। মন্তু এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলো কখন বুড়ো মকবুলকে কিছুক্ষণের জন্যে একা পাওয়া যায়। তাহলে নিজের বিয়ের কথাটা ওকে বলবে সে। এই শীতে, হ্যাঁ এই শীতেই বিয়ে করে ঘরে বউ আনতে চায় মন্তু। কিন্তু মকবুলকে একা পাওয়া গেলো না।

সারা বাড়িতে আজ ভিড়।

রান্না ঘরের ভিড়টা সবচেয়ে বেশি। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা, সবাই গিয়ে জুটেছে সেখানে। সারাক্ষণ বকবক করছে। কার কথা কে শুনছে কিছু বোঝা যায় না।

হাঁড়িপাতিলগুলো একপাশে টেনে নিয়ে বাসন বাসন ভাত বাড়ছে আমেনা।

হঠাৎ মন্তুকে সামনে পেয়ে আমেনা জিজ্ঞেস করলো, মানুষ ক'জন?

মন্তু বললো, আটজন।

আটজন! আমেনার মাথায় রীতিমত বাজ পড়লো। আটজনের কি ভাত রানছি আমি। আমি তো রানছি চাইরজনের। তোমার ভাইয়ে আমারে চারজনের কথা কইছিল।

বড় ঘর থেকে রান্না ঘরের দিকে আসছিলো মকবুল, কথাটা কানে গেলো ওর। পরক্ষণে ভিতরে এসে রাগে ফেটে পড়লো সে। আমি কি জাইনতাম, আটজন আইব ওরা? বারবার কইরা কইয়া দিছি চাইরজনের বেশি অইসেন না আপনেরা। ওরা তহন মাইনা নিছে। আর এহন– বলে ঠোঁট জোড়া বিকৃত করে একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করলো মকবুল, হালার ভাত যেন এই জন্মে দেহে নাই হালারা।

হইছে হইছে। আপনে আর চিল্লায়েন না, থামেন। মেজ বউ ফাতেমা চাপা গলায় বললো, যান যা আছে তা দিয়ে একবার খাওয়ান। আমরা না হয় পরে খামু।

ফাতেমার কথায় শান্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলো মকবুল, মন্তুর দিকে চোখ পড়তেই বললো, তাইলে মন্তু মিয়া তুমি কাইল পরশু একদিন নবীনগর যাও। কেমন?

মন্তু সংক্ষেপে ঘাড় নাড়লো।

নিজের কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলো না সে। সহসা তার মনে একটা নতুন চিন্তা এলো। টুনি ফিরে এলে ওকে দিয়ে কথাটা মকবুলকে বলাবে মন্তু?

খাওয়া-দাওয়া শেষে ফর্দ করতে বসলো সবাই।

প্রথমে উঠলো দেনা-পাওনার প্রশ্নটা।

বরের চাচা ইদন শেখ বললো, অলঙ্কার-পত্র বেশি দিবার পারমু না মিয়া। হাতের দুই জোড়া চুড়ি আর কানের দুইডা ঝুমকা।

গলার আর কমড়েরডা দিবো কে? সুরত আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো, ওইগুলোও দিতে অইবো আপনেগোরে।

পায়েরটারে বাদ দিলা ক্যান মিয়া, অ্যাঁ? আবুল জোরের সঙ্গে বললো, পায়ের একজোড়া মলও দেওন লাগবো।

বুড়ো মকবুল নড়েচড়ে বসলো। সুরত আর আবুলের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকালো সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরের মামা আরব পাটারী মৃদু হেসে বললো, এই বাজারে এতগুলান জিনিস দিতে গেলে কি কম টাকার দরকার মিয়া। আরো কম-সম কইরা ধরেন। আচ্ছা, পায়েরটা না হয় নাই দিলাম। মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থতা করে দিলো রশীদ। বাকিগুলান তো দিবেন? হ্যাঁ তাই সই। সুরত আলী বললো, সোনার জিনিস তো আর দিবার লাগছে না, রূপার জিনিস দিবেন। তা মন কষাকষির কি দরকার?

মকবুল কিছুই বললো না। একপাশে বসে রইলো চুপ করে।

গনু মোল্লাও নীরব। নীরবে শুধু তছবিহ পড়ছেন ঢুলে ঢুলে।

গহনার কথা শেষ হলে পরে মোহরানার কথা উঠলো।

ইদন শেখ বললো, সব ব্যাপারে আপনাগোডা মাইনা নিছি। এই ব্যাপারে কিন্তুক আমাগোডা আইবো।

আহা কয়েন না শুনি। রশীদ ঘাড় ঝাঁকালো।

ইদন বললো, মোহরানাডা পাঁচ টাকাই ধরেন।

পাঁচ টাহা? অ্যাঁ, পাঁচ টাহা? কন কি? রীতিমত ক্ষেপে উঠলো সুরত। মাইয়া কি মাগনা পাইছেন নাহি? অ্যাঁ। মাইয়ার কি কোন দাম নাই?

আহ, দাম আছে বইলাই তো পাঁচ টাহা কইবার লাগছি। নইলে কি আর তিন টাহার উপরে উঠতাম। আবার পাটারীর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়লো। কণ্ঠস্বরে বিকৃতি এনে সে বললো, সক্কল দিক দিয়াই বাড়াবাড়ি করবার লাগছেন আপনারা। আচ্ছা যান, আরো আট আনা বাড়ায়া দিলাম। মোট সাড়ে পাঁচ টাহা।

না বিয়াই। তা অয় না, অইবো না। এতক্ষণে কথা বললো বুড়ো মকবুল। এত কম মোহরানায় মাইয়ারে বিয়া দিবার পারমু না। বলে হঠাৎ কেঁদে উঠলো সে, মাইয়া আমার কইলজার টুকরা বেয়াই। কত কষ্ট কইরা মানুষ করছি। দু'হাতে চোখের পানি মুছলো মকবুল।

বিশ টাহা যদি মোহরানা দেন তাইলে মাইয়া বিয়া দিমু।

মকবুলের চোখের পানি দেখে অপ্রতিভ হয়ে গেলো সবাই। মাঝ রাত পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর সোয়া এগার টাকায় মিটমাট হলো সব। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে মেহমানরা বিদায় নিয়ে গেলো। মনে মনে খুশি হলো মকবুল। সোয়া এগার টাকা মোহরানায় এর আগে এ বাড়ির কোন মেয়ের বিয়ে হয় নি।

নবীনগরের ছোট খালে এসে নাওয়ের নোঙ্গর ফেললো মন্তু।

খাল পাড়ে উঠে দাঁড়ালে টুনিদের বাড়ির লম্বা নারকেল আর তাল গাছগুলো দেখা যায়। আর সেই তাল নারকেলের বনের ফাঁকে ওদের দেউড়ি ঘরটাও চোখে পড়ে এখান থেকে।

নৌকো থেকে নামবার আগে মুখ হাত ভালো করে ধুয়ে নিলো মন্তু। পুরনো লুঙ্গিটা পালটে নিয়ে নতুন লুঙ্গিটা পরলো, ফতুয়াটা খুলে জামাটা গায়ে দিলো সে। তারপর খদ্দরের চাদরটা কাঁধে ফেলে, পুরনো ছাতাটা বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে নৌকো থেকে নেমে এলো মন্তু।

কিছুদূর এসে পকেট থেকে টুপিটা বের করলো।

আসার সময় বুড়ো মকবুল বার বার করে বলে দিয়েছে; কুটুমবাড়িতে গিয়ে যেন মন্তু এমন কিছু না করে যার ফলে বাড়ির বদনাম হতে পারে। টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে চারপাশে দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো মন্তু। পথঘাট জানা আছে ওর। এর আগে মকবুলের বিয়ের

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় একবার এসেছিল সে। দিন তিনেক থেকে গিয়েছে এখানে। রাস্তার দু'চারজন অপরিচিত লোক ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো ওকে।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঝাঁক ঝাঁকে বাঁদুড় উড়ে যাচ্ছে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। একটু একটু করে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। এদিকের লোকেরা এর মধ্যে খেজুর গাছ কেটে রস নামাতে শুরু করে দিয়েছে। পথে আসতে তিন চারজন গাছুনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো মন্তুর।

ধারালো বাটাল দিয়ে গাছ কাটছে ওরা। তারপর মাটির কলসি ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে আসছে গাছ থেকে।

টুনিদের বাড়ির সামনে এসে যার সঙ্গে মন্তুর প্রথম দেখা হলো সে টুনির চাচা মোতালেব শিকদার। সন্ধে বেলা গরু-বাছুরগুলোকে ঠেঙ্গিয়ে গোয়াল ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো সে। মন্তুকে দেখে হা করে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, মন্তু মিয়া না? কি মনে কইরা? মন্তু এগিয়ে এসে পা ধরে সালাম করলো ওর। তারপর বললো, ভাইজান পাঠাইছে, টুনু ভাবীরে নিবার লাইগা।

অ। মুখখানা ঈষৎ ফাঁক করে গরুগুলোকে ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে আবার গোয়াল ঘরের দিকে চলে গেলো মোতালেব শিকদার।

একটু পরে আবার ফিরে এলো সে। বললো, আয়েন ভিতরে আয়েন। টুপিটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিলো মন্তু, তারপর শিকদারের পিছু পিছু ভেতর বাড়িতে এগিয়ে চললো সে।

দেউড়ির পাশে একখানা বাঁশের বেড়া দিয়ে বাইরের লোকদের কাছ থেকে ভেতর বাড়ির পর্দা রক্ষা করা হয়েছে। তারই পাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরে দিয়ে অবাক চোখে দেখছে ওরা। ভেতর বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতে মন্তু দেখলো, ঘরের দাওয়ায় একটা বাঁশের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে টুনি। সারা মুখে ওর হাসি যেন উপচে পড়ছে। নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

মন্তুকে টুনিদের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল শিকদার।

রসুই ঘর থেকে টুনির মা বেরিয়ে এলেন বাইরে। মন্তু সালাম করলো তাকে।

মা বললেন, কইরে টুনি। মিয়ারে একখানা জলচৌকি আইনা দে বউক।

চৌকি এনে দিলে দাওয়ায় বসলো মন্তু।

টুনির মা সবার কুশল জানতে চাইলো। টুনি কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করলো না, শুধু মুখ টিপে বারবার হাসতে লাগলো সে।

টুনির মা বললো, টুনি তো ক'দিন ধইরা যাওনের লাগি উথাল পাথাল লাগাইছে। উঁ যাইবো। যামু না আমি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো টুনি।

মা বললো, দাঁড়ায়া থাইকো না। মিয়ার অজুর পানি দাও।

মন্তুর জন্যে হাত-মুখ ধোয়ার পানি আনতে চলে গেলো টুনি। মা-ও গেলো একটু পরে, বললো তরকারিটা নামায়া আই।

চারপাশটা তাকিয়ে দেখছিলো মন্তু। এক বছরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে বাড়িটার। উঠোনের কোণে পাশাপাশি দুটো জাম গাছ ছিলো। কেটে ফেলা হয়েছে। রান্নাঘরের এ পাশটা নুয়ে পড়েছে এখন। আগে অমনটি ছিলো না। আগে গোয়াল ঘরটা পুকুরের পূর্ব পাশে ছিলো, এখন সেটা উত্তর পাশে সরিয়ে আনা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুনি এসে এক ঘটি পানি রাখলো ওর সামনে আর এক জোড়া খড়ম। বললো, হাত-মুখ ধুইয়া নাও।

মন্তু মুখ হাত ধুয়ে নিলে ওর দিকে একটা গামছা বাড়িয়ে দিয়ে টুনি বললো, চল ভেতরে চল, বাইরে শীত পড়তাছে!

মন্তু কোন কথা বললো না। শান্ত শিশুর মত ওকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে গেলো সে।

পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝখানে একটা দরজা। ও পাশেরটাতে মা-বাবা থাকে আর টুনির ছোট দুই ভাইবোন। এ পাশের ঘরটা দেখিয়ে টুনি মৃদু হেসে বললো, এইডা আমার ঘর।

ওর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো মন্তু। ছোট ঘর মালপত্র ভরা। কয়েকটা বড় বড় মাটির ঘটি এক কোণে রাখা, তার পাশে তিন চারটে বেতের ঝুড়ি। ঝুড়ি ভর্তি লাল আলু রাখা আছে। দক্ষিণ কোণে একটা কাঠের চৌকি। চৌকির উপরে একটা কাঁথা বিছানো। একটা তেল চিটচিটে বালিশ। চৌকির নিচে দুটো ছোট ছোট টিনের প্যাটরা। পশ্চিমের বেড়ার সঙ্গে একটা কাঠের তাক বসানো হয়েছে। তাকের উপরে রাখা আছে কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ভাঁড় আর একটা মুড়ির টিন। তার পাশে বেড়ার সঙ্গে একটা ভাঙা আয়না ঝোলান। উত্তর কোণে একটা দড়ির সঙ্গে ঝুলছে টুনির দু'খানা শাড়ি, একটা ময়লা কাঁথা। তা'ছাড়া ঘরের ঠিক মাঝখানে চিলে কাঠের সঙ্গে কতগুলো ছিকে। ছিকের মধ্যে কয়েকটা হাঁড়িপাতিল রাখা। মন্তু মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে নিলো পুরো ঘরটার ওপর। টুনি চৌকিটা দেখিয়ে বললো, এইখানে বও।

মন্তু বসলো।

কিছুক্ষণ ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টুনি বললো, অমন শুকায়া গেছ ক্যান?

মন্তু পরক্ষণে বললো, কই না, শুকাই নাই তো।

টুনি মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মন্তুর মনে হলো এ ক'মাসে টুনি অনেক পাল্টে গেছে। ওর দেহ পা আগের থেকে অনেক ভারী হয়ে গেছে আর গায়ের রঙে একটা চিকচিকে আভা জেগে উঠেছে। আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়েছে টুনি।

রাতে টুনির ঘরে ওর শোবার বন্দোবস্ত হলো।

ময়লা কাঁথাটার ওপর ওর একখানা শাড়ি বিছিয়ে দিলো। বালিশটাকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলো। তারপর বললো, আর বইসা থাইকো না শুইয়া পড়।

মন্তু বললো, বেহান রাইতে কিন্তুক রওয়ানা দিতে হবে।

ওর কথা শেষ না হতে শব্দ করে হেসে দিলো টুনি।

বললো, ইস, কইলেই অইলো। তারপর একটুকাল থেমেই আবার বললো, সে কম কইরা অইলেও তিনদিন আমাগো বাড়ি বেড়ান লাগবো। তারপরে যাওনের নাম।

মন্তু বললো, পাগল অইছ? তাহলে ভাইজানে মাইরা ফালাইবো আমারে। করিম শেখের নাও নিয়ে আইছি। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো সে। টুনি বললো, যাই শুই গিয়া, কথা যা অইবার কাল সকালে অইবো। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল সে।

কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে একটু পরেই শুয়ে পড়লো মন্তু। করিম শেখের কথা মনে হতে আম্বিয়ার কথাও মনে পড়ছে তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকে ফিরে যাওনের পথে টুনিকে সব বলবে মন্তু। টুনি নিশ্চয় এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ওকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো মন্তু।

ঘুম ভাঙলো কখন সে ঠিক বলতে পারবে না। রাতের গভীর অন্ধকারে সে অনুভব করলো একটা হাত তার চুলগুলো নিয়ে খেলছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলো মন্তু।

গনু মোল্লার কাছ থেকে নেয়া তাবিজটা বাহুতে বাঁধা আছে কিনা দেখলো। তারপরে কে যেন চাপা স্বরে ওকে ডাকলো, এই। সহসা কোন সাড়া দিলো না মন্তু।

হঠাৎ ওর হাতখানা শক্ত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো সে। নরম তুলতুলে একখানা হাত।

একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি শোনা গেল, উঃ এই।

পরমুহূর্তে হাতখানা ছেড়ে দিলো মন্তু। টুনি?

ইস, কথা কয়ো না। মায় হুনব। ওর মুখের ওপরে একখানা হাত রাখলো টুনি। তারপর মুখখানা আরো নামিয়ে আস্তে আস্তে করে বলল, চুপ, শব্দ কইর না। শোন, চুপচাপ উইঠ্যা আইও আমার সঙ্গে।

কিছু বুঝে উঠতে পারলো না মন্তু। টুনির মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলো সে। একটু পরে টুনির পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এলো মন্তু।

বাইরে এসে দেখলো টুনির হাতে একটা মাটির কলস। শীতে দু'জনে রীতিমত কাঁপছিলো ওরা।

মন্তু প্রশ্ন করলো, কি, কি অইছে?

টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, কিছু অয় নাই, এদিকে আইও। ওর একখানা হাত ধরে অন্ধকারে টেনে নিয়ে চললো তাকে। বার বাড়িতে এসে মন্তু আবার প্রশ্ন করলো, কই চললা?

টুনি শব্দ করে হাসলো আবার, বললো, কলসি গলায় দিয়া দুইজনে পুকুরে ডুইবা মরুম চল। তার পরেই মন্তুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সহসা প্রশ্ন করল সে, আমার সঙ্গে মরতা পারবা না?

কি উত্তর দিবে ভেবে পেলো না মন্তু। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার হেসে উঠলো টুনি। হাসির দমকে দেহটা বারবার দুলে উঠলো তার। বললো, ঘাবড়ায়ো না মিয়া তোমারে মারুম না। বলে আবার চলতে লাগলো সে।

এতক্ষণ এত অবাক হয়ে গিয়েছিলো মন্তু যে শীতের প্রকোপটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে না যেতে প্রচণ্ড শীতে দাঁতে দাঁতে লেগে এলো ওর।

একটা লম্বা খেজুর গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো টুনি। কলসিটা মন্তুর হাতে দিয়ে বললো, এইটা রাখ হাতে।

তারপর পরনের শাড়িটা লুঙ্গির মতো গুটিয়ে নিল সে। মন্তু কাঁপা গলায় শুধালো কি কর?

ওর প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না টুনি। নির্বিকারভাবে খেজুর গাছটা বেয়ে উপরে উঠে গেলো সে।

মন্তুর মনে হলো ও স্বপ্ন দেখছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু পরে হাতে রসের হাঁড়িটা নিয়ে অন্য হাতে গাছ বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো টুনি। কলসির মধ্যে রসটা ঢেলে হাঁড়িটা রেখে আসবার জন্য আবার উপরে যাচ্ছিলো টুনি। মন্তু বললো, আরে কি করো। গাছ এখন পিচ্ছিল। পইড়া যাইবা।

পেছনে ফিরে তাকিয়ে হাসলো টুনি। বললো, ইস কত উঠছি। পাশের ঝোপ থেকে দুটো শিয়াল ছুটে এসে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মন্তুর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চোখজোড়া অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে ওদের। মন্তু একটা ধমক দিতে ছুটে পালিয়ে গেল ওরা।

টুনি নেমে এসে বললো, কারে ধমকাও?

মন্তু আস্তে করে বললো, শিয়াল।

আরো অনেকগুলো খেজুরগাছ থেকে রস নামিয়ে কলসি ভর্তি করলো ওরা। শীতের রাতে কুয়াশার বৃষ্টি ঝরছে চারদিকে। মাটি ভিজে গেছে। গাছের পাতাগুলোও ভেজা। আশেপাশে তাকাতে গেলে বেশি দূরে দেখা যায় না। কুয়াশার আবরণে ঢেকে আছে চারদিক। হঠাৎ মন্তুর গায়ে হাত দিয়ে টুনি বললো, শীত লাগতাছে বুঝি? মন্তু কোন জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, তোমার লাগে না?

টুনি বললো, উঁহু। বলে মাথাটা দোলাল সে ।

মন্তু বললো, রস দিয়া করবা কি?

টুনি বললো, সিন্নি রান্দুম।

মন্তু কোন কথা বলার আগেই টুনি আবার বললো, তোমার নায়ে চল।

মন্তু অবাক হলো, নায়ে গিয়া কি করবা?

টুনি নির্লিপ্ত গলায় বললো, সিন্নি রান্দুম।

মন্তু বললো, পাগল হইছ?

টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, হুঁ। বলে মন্তুর মুখের দিকে তাকালো সে, কই নাওয়ে যাইবা না?

মন্তু কঠিন স্বরে বললো, না।

ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো টুনি। ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মুহূর্তে একটা অবাক কাণ্ড করে বসলো সে। হাতের কলসিটা উপরে তুলে মাটিতে ছুঁড়ে মারলো। মাটিতে পড়ে মাটির কলসি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

রস গড়িয়ে পড়লো চারপাশে।

কিছুক্ষণের জন্য দু'জনে বোবা হয়ে গেলো ওরা।

কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না।

মন্তু নীরবে তাকিয়ে রইলো, ভাঙ্গা কলসির টুকরোগুলোর দিকে। টুনি মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুকুর পাড়ে লম্বা তালগাছগুলোর মাথায় দুটো বাদুড় হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উঠলো।

টুনি আস্তে করে বললো, চল ঘরে যাই, চল।

মন্তু কোন কথা বললো না। নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলো শুধু।

পরদিন যাওয়া হলো না মন্তুর।

টুনির মা বললো, কুটুমবাড়ি আইয়ে নিজের ইচ্ছায়, যায় পরের ইচ্ছায়। ইচ্ছা করলেই তো আর যাইতে পারবা না মিয়া। যহন যাইতে দিমু তহন যাইবা। অগত্যা থেকে যাওয়া হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাদিন একবারও কাছে এলো না টুনি। অথচ সারাক্ষণ বাড়িতে ছিল সে। ঘরদোর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করেছে। ঘাটে গিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে এনেছে। রান্নাবান্না করেছে।

তারপর খাওয়ার সময় মা ডেকে বলছে, কইরে টুনি এই দিকে আয়। মন্তু মিয়াকে ভাত বাইড়া দে। তখন শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে থেকেছে সে।

রাতের বেলা হঠাৎ বেঁকে বসলো টুনি। বললো, কাল সক্কাল বেলাই চইলা যামু আমি। জিনিসপত্র সব গুছাইয়া দাও।

মা বললো, আরো দুইটা দিন থাইকা যা। আবার কবে আইবার পারবি কে জানে।

টুনি বললো, না, মন্তু মিয়ার কাম কাজের ক্ষতি অইয়া যাইতেছে।

মা বললো, মন্তু মিয়াকে বুঝাইয়া কইছি। হে রাজী আছে।

টুনি তবু বললো, না, কাল সক্কালেই চইলা যামু।

পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনলো মন্তু।

পরদিন ভোরে রওয়ানা হয়ে গেলো ওরা।

মন্তু আর টুনি।

ওর বাবা আর চাচা দুই শিকদার খাল পাড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলো ওদের। সঙ্গে ছোট দুই ভাইবোনও এলো। আর এলো ওদের কাল কুকুরটা।

ছই-এর মধ্যে টুনির জন্যে কাঁথাটা বিছিয়ে দিয়েছিলো মন্তু। তার ওপর গুটিসুটি হয়ে বসলো সে।

খালের পাড়ে যতক্ষণ তার বাবা চাচা আর ভাইবোনদের দেখা গেলো ততক্ষণ সে দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো টুনি।

তারপর মুখখানা ঘুরিয়ে এনে নীরবে বসে রইলো।

খাল পেরিয়ে যখন নৌকা নদীতে এসে পড়লো তখন দুপুর হয়ে আসছে।

টুনি এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। মন্তু সারাক্ষণ কথা বলার জন্য আঁকুপাকু করছিলো। কিন্তু একবারও সুযোগ দিলো না টুনি। উজান নদীতে দাঁড় বেয়ে চলতে চলতে এক সময়ে মন্তু বললো, বাইরে আইয়া বহো, গায়ে বাতাস লাগবো।

ও নড়েচড়ে বসলো কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এলো না।

একটু পরে একটা কাপড়ের পুটলি থেকে কিছু চিড়া আর এক টুকরো খেজুরের গুড় বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলো টুনি। বললো, বেলা অইয়া গেছে-খাইয়া নাও। বলে আবার চুপ করে গেলো সে।

মন্তু বললো, তুমি খাইবা না?

না।

না কেন?

ক্ষিধা নাই।

ঠিক আছে আমারও ক্ষিধা নাই। বলে আবার দাঁড় বাইতে লাগলো মন্তু। নদীর পানিতে দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেলো না।

ক্ষণকাল পরে টুনি আবার বললো, খাইবা না।

না।

শেষে শরীর খারাপ করবো।

করুক গা। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলো মন্তু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বেশিক্ষণ ছইয়ের ভেতর বসে থাকতে পারলো না টুনি। অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এলো সে, চিড়ার বাসনটা তুলে নিয়ে ওর সামনে এসে বসলো।

নাও, খাও।

কইলাম তো খামু না।

তাইলে কিন্তু পানির মধ্যে সব ফালাইয়া দিমু আমি। টুনি ভয় দেখালো ওকে।

মন্তু নির্বিকার গলায় বললো, দাও ফালাইয়া।

কিন্তু ফেললো না টুনি। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে। হাসির দমকে মাথার ঘোমটাটা খসে পড়লো কাঁধের ওপর।

টুনি বললো, আমি খাওয়াইয়া দিই।

মন্তু বললো, না।

টুনি বললো, তাহলে তুমি নিজ হাতে খাও। আমিও খাই। বলে এক মুঠো চিড়ে মুখের মধ্যে পুরে দিলো সে।

মন্তুর মুখেও এক ঝলক হাসি জেগে উঠলো। এতক্ষণে টুনির কোলের ওপরে রাখা বাসন থেকে এক মুঠো চিড়ে নিয়ে সেও মুখে পুরলো।

টুনি বললো, গুড় নাও। খাজুরি গুড়।

চিড়ে খেতে খেতে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সহজ হয়ে এলো টুনি।

এক ফাঁকে ওকে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ি পৌঁছাইতে কতক্ষণ লাগবো?

মন্তু একটু চিন্তা করে নিয়ে বললো, মাইজ রাতে।

বেশ জোরে দাঁড় বাইছিলো মন্তু।

হঠাৎ টুনি বললো, এত তাড়াতাড়ি করতাছ কেন? আস্তে বাও না।

মন্তু বললো, তাইলে বাড়ি যাইতে তিনদিন লাগবো।

লাগে তো লাগুক না। টুনির কণ্ঠস্বরে চরম নির্লিপ্ততা।

মন্তু কোন জবাব দিলো না।

আঁজলা ভরে নদীর পানি পান করলো ওরা। তারপর ছইয়ের বাইরে বসে টুনি দু'হাতে নদীর পানি নিয়ে খেলা করতে লাগলো। দু'পাশে অসংখ্য গ্রাম। একটার পর একটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝে মাঝে রবি-শস্যের ক্ষেত, নারকেল আর ঘন সুপারির বন। জেলেদের পাড়া।

ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে মাঝ নদীতে এসে জাল ফেলেছে ওরা।

একখানা হাত পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে টুনি বললো, তুমি এইবার জিরাও।

আমি দাঁড় টানি।

মন্তু হেসে বললো, পাগল নাকি?

টুনি বললো, ক্যান?

মন্তু বললো, অত সহজ না, দাঁড় বাইতে ক্ষেমতার দরকার আছে।

টুনি আবার চুপ করে গেলো।

বিকেলের দিকে শান্তির হাটের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো ওরা। নদী এখন দম ধরেছে। পানিতে আর সেই স্রোত নেই। একটা থমথমে ভাব। একটু পরে জোয়ার আসবে। তখন আর নৌকো নিয়ে এগোন যাবে না, কূলে এনে বেঁধে রাখতে হবে। তারপর জোয়ার নেমে গিয়ে ভাটা পড়লে তখন আবার নৌকো ছাড়বে মন্তু।

দূর থেকে শান্তির হাটটা দেখা যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে সেখানে।

ওদিকে তাকিয়ে টুনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, ওইহানে কি?

মন্তু বললো, ওইটা শান্তির হাট।

টুনি পানি থেকে হাতটা তুলে নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গী করে বললো, ওইহানে চুড়ি পাওন যায়?

আমারে কিন্না দিবা?

মন্তুর ইচ্ছে জোয়ার আসার আগে শান্তির হাটে গিয়ে নৌকো ভিড়াবে। তাই সংক্ষেপে বললো, হুঁ দিমু।

শান্তির হাটে পৌঁছে, একটা নিরাপদ স্থান দেখে নৌকো বাঁধলো মন্তু।

নদীর পাড়ে খালি জায়গাটায় তাঁবু পড়ছে একটা। বিচিত্র তার রঙ।

বাইরে ব্যান্ড পার্টি বাজছে খুব জোরে জোরে। চারপাশে লোকজনের ভিড়। হাটের কাছে আসার পর থেকে ছইয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে টুনি।

সেখান থেকে মুখ বের করে হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, ওইহানে কি?

মন্তু বললো, সার্কাস পার্টি। সার্কাস পার্টি আইছে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে টুনি আবার বললো, সেইটা আবার কি?

মন্তু বললো, নানা রকম খেলা দেহায় ওরা। মানুষের খেলা, বাঘের খেলা। আর কত কি! বাঘের নাম শুনে ভয় পেয়ে গেলো টুনি। কিন্তু পরক্ষণেই বললো, আমারে দেহাইবা?

মন্তুর কোন আপত্তি ছিলো না। কিন্তু হাটের মধ্যে মেয়ে মানুষ নিয়া যাওয়াটা সমীচীন মনে হলো না ওর। তাই বললো, না, তোমার যাইয়া কাজ নাই। তুমি বহ, আমি আইতাছি। ওর চলে যাওয়ার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের বাইরে এলো টুনি। বললো, ওমা, আমি একলা থাকবার পারমু না এহানে। তুমি যাইও না।

মুহূর্তে নিরাশ হয়ে গেলো মন্তু। ও নিজে এর আগে কোনদিন সার্কাস দেখেনি। ভেবেছিলো এই সুযোগে দেখে নিবে। কিন্তু টুনির কথায় ভেঙ্গে পড়লো সে। সার্কাসের তাঁবুর দিকে চোখ পড়তে দেখলো শুধু পুরুষ নয়, অসংখ্য মেয়েছেলেও দলে দলে ঢুকছে এসে তাঁবুর মধ্যে।

মন্তু কি যেন ভাবলো। ভেবে বললো, আহ্, দেরি কইরো না, আহ।

ওর পিছু পিছু নিচে নেমে এলো টুনি। মাথার ঘোমটাটা সে এক হাত লম্বা করে দিয়েছে।

আর সেই ঘোমটার ভেতর দিয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে সে।

তাঁবুর সামনে বড় বড় দুটো হ্যাজাক জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। এক পাশে এক এক দল লোক ব্যান্ড বাজাচ্ছে।

তাঁবুর দরজার উপরে একটা মাচায় চড়ে দু'টি মেয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে। সারা গায়ে, মুখে নানারকমের রঙ মেখেছে ওরা। টুনি অবাক হয়ে বললো, ওমা শরম করে না।

মন্তু বললো, শরম করবে ক্যান, ওরা মাইয়া লোক না, পুরুষ মানুষ মাইয়্যা সাজছে। অ। হা করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো টুনি।

দরজায় দাঁড়ান লোকটার কাছ থেকে তিন আনা দামের দু'খানা টিকেট কাটলো মন্তু। ভেতরে ঢুকে দেখে ছেলে বুড়ো মেয়েতে তিল ধারণের জায়গা নেই। তাঁবুর একটা কোণে অল্প একটু জায়গা নিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়লো ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে সার্কাস শুরু হয়ে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে একটা মেয়ে দুটো লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা একখানা দড়ির উপর দিয়ে নির্বিকারভাবে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে হেঁটে চলে গেলো।

লোকেরা হাতে তালি দিয়ে উঠলো জোরে।

তারপর আসলো বিকটাকার লোক। হাতের মুঠোর উপরে তিনটে মানুষকে তুলে নিয়ে চরকির মত ঘোরাতে লাগলো সে।

সবাই এক সঙ্গে বাহবা দিয়ে উঠলো।

এরপরে খুব জোরে ব্যান্ড বাজলো কিছুক্ষণ।

তার পরেই এলো বাঘ। এসেই একটা হুঙ্কার ছাড়লো সে।

মন্তুর একখানা হাত ওর মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখলো টুনি। দু'চোখে ওর অপরিসীম বিস্ময়। ঘোমটার ফাঁকে একবার চারপাশের দর্শকের দিকে তাকালো সে। তাকালো মন্তুর দিকে। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিলো বাঘের ওপর।

ইতিমধ্যে ভয়ে গুটিসুটি হয়ে মন্তুর বুকের মধ্যে সিঁধিয়ে গেছে টুনি।

মন্তু নিজেও জানে না কখন টুনিকে একেবারে কাছে টেনে নিয়েছে সে। সার্কাস শেষ হতে দু'জনের চমক ভাঙলো। শক্ত করে ধরে রাখা মন্তুর হাতখানা মুহূর্তে ছেড়ে দিলো টুনি। তারপর মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সে। মন্তু নিজেও কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।

ইতস্তত করে বললো, চলো।

ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। ঘাটে আসার পথে মনোয়ার হাজীর চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে হয়। মন্তুকে দেখে হাজী দোকান থেকে চিৎকার করে উঠলো, আরে মন্তু মিয়া, কই যাও, শুন শুন।

মন্তু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, পারলো না।

আরে মিয়া কাজের কথা আছে, শুইনা যাও। দু'হাতে ওকে কাছে ডাকলো মনোয়ার হাজী।

টুনি পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে গেলো মন্তু। কাউন্টারে আরো অনেকগুলো লোক কথা বলছিলো।

হঠাৎ মনোয়ার হাজী শব্দ করে হেসে উঠে বললো, বাহরে বাহ বিবিজানরে সঙ্গে নিয়ে সার্কাস দেখবার আইছ বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গে আটজোড়া চোখ অদূরে দাঁড়ান টুনির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো।

মন্তু কিছু বলবার আগেই মনোয়ার হাজী সামনে ঝুঁকে পড়ে বললো, কহন করলা, অ্যাঁ? একবার খবর দিলা না। দাওয়াত করলা না, এইডা কেমুন কথা?

হতবুদ্ধি মন্তু কি করবে কিছু ভেবে পেলো না। সে শুধু ইতস্তত করে একবার মনোয়ার হাজীর দিকে আরেকবার টুনির দিকে তাকালো বার কয়েক। এক বিচিত্র অনুভূতির আবেশে মনটা ভরে উঠেছে ওর। মনোয়ার হাজী শুধালো. কোন কাজ কাম নাইতো?

একটা ঢোক গিলে মন্তু বললো, কিছু চুড়ি কিনন লাগব।

হ্যাঁ, তা কিনবা না, নিশ্চয় কিনবা। একগাল হাসলো মনোয়ার হাজী। তারপর বললো, এহন চল মিয়া ভাবীরে নিয়া আজকা রাতে আমাগো বাড়ি মেহমান অইবা।

মন্তু পরক্ষণে বাধা দিলো, না না, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরন লাগবো। ওর কথাটা কানে নিলো না মনোয়ার হাজী। সে জানালো থাকার কোন অসুবিধা হবে না ওদের। বাড়ি ঘর আছে অনেকগুলো, তারই একটিতে সুন্দর করে বিছানা পেতে দেবে। তাতে যদি মন্তুর আপত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে তাহলে, আর একটা ভাল বন্দোবস্ত করে দিতে পারে মনোয়ার হাজী। সার্কাস পার্টির ওখানে হোটেল উঠেছে কয়েকটা। এক একটা ঘর এক টাকায় এক রাতের জন্যে ভাড়া দেয় ওরা। সেখানেও ইচ্ছে করলে থাকতে পারে মন্তু। পান-খাওয়া দাঁতগুলো বের করে মনোয়ার হাজী বললো, আরে মিয়া নতুন বউ নিয়া যদি একটু ফুর্তি না কইরলা তাইলে চলে কেমন কইরা। এইতো বয়স তোমাগো।

এই শীতেও ঘামিয়ে উঠেছে মন্তু। টুনির দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো, ও ভীষণ বিব্রত বোধ করছে।

ক্ষণকাল পরে মন্তু বললো, আরেকদিন আইসা আপনাগো বাড়ি মেহমান হমু। আজকা যাই।

ওর আমন্ত্রণ রক্ষা না করার জন্যে কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করলো মনোয়ার হাজী। অবশেষে বললো, আরেকদিন কিন্তুক আইবা মিয়া। আর হ্যাঁ, ভাবী সাহেবরে সঙ্গে নিয়া আইবা কিন্তুক। বলতে বলতে টুনির দিকে তাকালো হাজী।

জোয়ার পড়ে যাওয়ায়, ভাটার পানি অনেক নিচে নেবে গেছে। যেখানে নৌকোটা বেঁধে রেখে গিয়েছিলো সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে ওটা। মাঝখানের জায়গাটা পানি আর কাদায় ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। ওর ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে অতি সাবধানে আঙ্গুলের নখগুলো দিয়ে মাটি চেপে রাখতে হয়। নইলে যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

নিচে নামতে গিয়ে অন্ধকারে মন্তুর ফতুয়াটার একটি কোণ শক্ত করে ধরে রেখেছে টুনি। একটু অসতর্ক হতে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলো সে। মন্তু ধরে ফেললো। মাথার আঁচলটা কাঁধের উপরে গড়িয়ে পড়লো, একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করলো টুনি। কাঁধের উপর থেকে ওর মুখখানা সরিয়ে দিতে গিয়ে মন্তু সহসা অনুভব করলো, টুনির দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। নিঃশব্দে কাঁদছে টুনি।

ভাটি গাঙে নাও ভাসিয়ে দিয়ে বসে রইলো মন্তু। মনটা আজ ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছে ওর। সারা দেহে আশ্চর্য এক অবসাদ। সেদিন রাতে রসের কলাসটা ভেঙ্গে ফেললো টুনি তখনও এত খারাপ লাগে নি ওর। আজ কেমন ব্যথা অনুভব করছে সে। বুকের নিচটায়। কলজের মধ্যে।

নৌকোর ছইয়ের ভেতরে চুপচাপ বসে রয়েছে টুনি। একটা কথা বলছে না সে, একটু হাসছে না।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরলো মন্তু।

বন্ধুরে আশা ছিলো মনে মনে প্রেম করিমু তোমার সনে।

তোমারে নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে।

ও পরাণের বন্ধুয়ারে॥

নদীর স্রোত নৌকোর গায়ে ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। যেন বহুদিনের এই স্নেহের টানকে চিরন্তন করে ধরে রাখার জন্যে প্রাণহীন কাঠের টুকরোগুলোকে গভীর আবেগে বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইছে ওরা। টুনি এখনো নীরব।

খালের মুখের কাছে নৌকো থামাতে হলো।

ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। পাতা পানিতে নৌকো নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না। এখানে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না আবার জোয়ার আসে। জোয়ারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রোতে নৌকো নিয়ে ভেতরে চলে যাবে মন্তু। কিন্তু সে এখনো অনেক দেরি। ভোর রাতের আগে জোয়ার আসবে না।

নৌকো থামাতে দেখে টুনি এতক্ষণে কথা বললো, কি, নাও থামাইল্যা ক্যান?

হঠাৎ নিজের অজান্তে একটা কথা বলে বসলো মন্তু। বললো, বাড়ি যামু না। এইহানে থাকুম আমরা।

ক্যান? ক্যান? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো মন্তু। ওর হাসিটা কাটা বাঁশের বাঁশির মতো শোনাল।

নৌকো থেকে নোঙরটা তুলে নিয়ে নিচে নেবে গেলো মন্তু। ভালো করে মাটিতে পাতলো ওটা। নইলে জোয়ারের প্রথম ধাক্কায় মাঝ নদীতে চলে যাওয়ার ভয় আছে। তারপর পা জোড়া ধুয়ে নিয়ে নৌকোয় উঠতে উঠতে টুনির প্রশ্নের উত্তর দিলো মন্তু।

জোয়ার না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে ওদের।

এইহানে? বলতে গিয়ে চারপাশে তাকালো টুনি।

আশেপাশে কোন জনবসতি নেই। দক্ষিণে যতদূর তাকানো যায় অথৈ পানির ঢেউ। নদী এখানে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে সাগরের দিকে। কয়েকটি জেলে নৌকো মাঝ নদীতে টিমটিম বাতি জ্বালিয়ে জাল পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে একে অন্যকে জোর গলায় ডাকছে ওরা। নিশীর বাপ জাইগা আছনি, ও নিশীর বাপরে কুই-কুই।

পশ্চিমে চর পড়েছে। বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে কোন লোকালয় নেই। শুধু বালু আর বালু। তার উপরে আরো এগিয়ে গেলে সীমাহীন বুনো ঘাসের বন। দিনের বেলায় অসংখ্য গরু বাছুর নিয়ে রাখাল ছেলেরা আসে এখানে, রাতে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে থাকে সমস্ত প্রান্তর।

পুবে, ফেলে আসা নদী এঁকে-বেঁকে চলে গেছে শান্তির হাটের দিকে।

উত্তরে খাল। খালের পারে অসংখ্য বুনো ফুলের বন। একটু ভালো করে তাকালে ওপারে তৈরি লম্বা সাঁকোটা নজরে আসে এখান থেকে। চারপাশে এক পলক তাকিয়ে চুপ করে গেলো টুনি।

ও মাঝি। মাঝ-ও-কু-ই। জেলে নৌকো থেকে কে যেন ডাকলো, কোন হানের নাও।

অ্যাঁ?

গলা চড়িয়ে মন্তু জবাব দিলো, পরীর দীঘি।

জবাব শুনে চুপ করে গেলো জেলেটা।

এতক্ষণ নৌকো বেয়ে আসছিলো বলে শীতের মাত্রাটা বুঝে উঠতে পারে নি মন্তু।

তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্যে এসে ঢুকলো সে।

টুনি নড়েচড়ে একপাশে সরে গেলো।

ছইয়ের সঙ্গে ঝোলান হুঁকো আর কল্কেটা নামিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিল মন্তু। তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে এসে গলুইয়ের উপর আরাম করে বসে তামাক টানতে লাগলো।

দক্ষিণ থেকে কনকনে বাতাস বইছে জোরে।

আকাশে মেঘ।

মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আবার মুখ লুকুচ্ছে তাড়াতাড়ি।

টুনি ডাকলো, ওইহানে বইসা ক্যান, ভেতরে আহ।

মন্তু কোন জবাব দিলো না। আপন মনে হুঁকো টানতে লাগলো সে।

টুনি আবার ডাকলো, আহ না, বাইরে ঠাণ্ডা লাগবো।

মন্তু নীরব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইবা না? টুনির কণ্ঠে অভিমান।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওর হাত থেকে হুঁকোটা নিলো টুনি। চলো, ভেতরে গিয়া শুইবা।

এবার আর কোন বাধা দিলো না। নিঃশব্দে ছইয়ের ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়লো সে। ওর গায়ের উপর কাঁথাটা টেনে দিয়ে মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইল টুনি।

বাইরের কনকনে বাতাস শূন্য প্রান্তরের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে দূর থেকে দূরে। সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে বসে রইলো।

ভোরে ভোরে গ্রামে এসে পৌছল ওরা।

মন্তু আর টুনি।

পরীর দীঘির পাড়ে তিনটে নতুন কবর।

দূর থেকে দেখে বুক কেঁপে উঠলো তার। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কে মরলো?

ঘোমটার নিচে থেকে টুনিও চোখ বড় বড় করে দেখছিলো কবরগুলো। পথে আসতে মাঝি বাড়ির কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা হতে সব শুনলো মন্তু। প্রথম কবরটা এ গাঁয়ের তোরাব আলীর। আশির উপর বয়স হয়েছিলো ওর। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে চলাফেরা করতে পারতো না। মরে বেঁচেছে বেচারা। নইলে আরো কষ্ট সহ্য করতে হতো।

দ্বিতীয় কবরটা আসকর ফকিরের। পেটে পিলে হয়েছিলো। প্রায়ই রক্তবমি করতো।

বুড়োরা বলতো, শত্রুপক্ষ কেউ তাবিজ করেছে। নইলে অমন হবে কেন।

তার পাশের কবরটা হালিমার। আবুলের বউ হালিমা। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ চিতল মাছের মত তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে হালিমা।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো মন্তুর।

হালিমার মৃত্যুর সংবাদে কাঁদতে শুরু করেছে টুনি। ঘোমটার নিচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

ইতস্তত করে মন্তু বললো, কান্দ ক্যান, কাইন্দা কি অইবে।

বাড়ি ফিরে এলে বুড়ো মকবুল গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করলো একদিন নয়, দু'দিন নয়, চার চারটে দিন। দুশ্চিন্তায় বারবার ঘর-বার করেছে সে। আইতে এত দেরি অইলো ক্যান? অ্যাঁ।

মন্তু খুলে বললো সব। কুটুম বাড়িতে গিয়ে কুটুম যদি আসতে না দেয় তাহলে কি করতে পারে সে? তাছাড়া নদীতে যে জোয়ার ভাটা আসে সেটাও কারো ইচ্ছেমত চলে না। তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে ওদের। মকবুল শুনলো সব, শুনে শান্ত হলো। তারপর কোদালটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়ির উপরের ক্ষেতটার দিকে চলে গেলো সে। যাবার পথে আমেনাকে আর ফাতেমাকে ডেকে গেলো মকবুল। মাটি কুপিয়ে সমান করে মরিচের চারা লাগাতে হবে।

দেখতে না দেখতে হীরনের বিয়ের দিনটা ঘনিয়ে এলো।

একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাই আয়োজনের কোন কার্পণ্য করে নি বুড়ো মকবুল। সাড়ে আট টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনেছে সে। হাট থেকে চিকন চাল কিনে এনেছে আর আধ সের ঘি।

মিয়া বাড়ি থেকে কয়েকটা চিনে মাটির পেয়ালা আর বরতন ধার নিয়ে এলো আমেনা। বরপক্ষের লোকদের মাটির বাসনে খেতে দিলে ফিরে গিয়ে হয়তো বদনাম করবে ওরা, তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো মকবুলের শরীরটা ভালো নেই। চারদিকে ছুটাছুটি করবে সে শক্তি পাচ্ছে না সে। তাই বাড়ির অন্য সবার ওপরে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়ে দিয়েছে। সুরত আলী, রশীদ, আবুল, মন্তু সবাই ব্যস্ত। বুড়ো শুধু দাওয়ায় একখানা পিঁড়ির উপর বসে তদারক করছে সব। খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ভূঁইয়া বাড়ির গড়ের পাশে বড় মেহেদী গাছ থেকে মেহেদী তুলতে গেছে সালেহা আর ফকিরের মা।

আমেনা আর ফাতেমা, ঘরদোরগুলো লেপে মুছে ঠিক করে নিচ্ছে।

পুরো উঠেনটাকে ঝাড় দিয়ে পরিস্কার ঝকঝকে তকতকে করে তুলেছে ওরা।

টুনি পুকুর ঘাটে, বাসনপত্রগুলো মাজছে।

যার বিয়ে, সেই হীরন রসুই ঘরের দাওয়ায় চুপটি করে বসে রয়েছে আর অবাক হয়ে বারবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে সবার।

দুপুর রাতে পাড়াপড়শীরা অনেকে এলো। কাচ্চাবাচ্চা ছেলেমেয়েদের দল। দু'খানা বড় বড় চাটাই বিছিয়ে নিয়ে উঠোনে বসলো ওরা। তারপর সবাই এক সঙ্গে সুর করে গান ধরলো।

মেহেদী তোমরা লাগ কোন কাজে।
আমরা লাগী দুলহা কইন্যার সাজে।

ঢেঁকির উপরে তখন আম্বিয়াও গান ধরেছে। বিয়ের ধান ভানতে এসেছে সে। সন্ধে থেকে ঢেঁকির উপরে উঠেছে ও আর টুনি। তখন থেকে এক মুহূর্তের বিরাম নেই। উঠোনে মেয়েরা গান গাইছিলো। তাদের পাল্লা দেয়ার জন্যে টুনি আর আম্বিয়া দু'জনে গলা ছেড়ে গান ধরলো।

ভাটুইরে না দিয়ে কলা
ভাটুইর হইবে লম্বা গলা।
সর্ব লইক্ষণ কাম চিক্কণ পঞ্চ রাঙের ভাটুইরে।

সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো বুড়ো মকবুল। ওর মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে আজ। জোরে জোরে হুঁকো টানছে, আর চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে।

হীরনকে মাঝখানে বসিয়ে ওর হাতে মেহেদী দিচ্ছে সবাই। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে চুপ করে আছে মেয়েটা।

সুরতের ছেলেমেয়ে, কুদ্দুস, পুটি, বিন্তি ওরা হাতে মেহেদী দেবার জন্যে কাঁদাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ওদের ধমকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলো সালেহা।

মকবুল বললো, আহা তাড়াও ক্যান, বউ। একটুহানি মেহেদী ওগোও দাও না।

হঠাৎ ফকিরের মা নাচতে শুরু করলো। আঁচল দুলিয়ে, কোমর ঘুরিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো সে।

কই গেলা সুরতের বিবি আমার কথা শোন।
আবের পাক্ষা হাতে করি আউলাইয়া বাতাস কর।
ফুলের পাখা হাতে নিয়া জোরে বাতাস কর।

ওর নাচ দেখে ছেলে বুড়ো সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো এক সঙ্গে।

ধান ভানা বন্ধ করে টুনি আর আম্বিয়াও বাইরে বেরিয়ে এলো।

আম্বিয়াকে আসতে দেখে নাচ থামিয়ে তার দিকে দৌড়ে এলো ফকিরের মা, হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেলো দলের মাঝখানে। তারপর ওকে লক্ষ্য করে ফকিরের মা গাইলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন তোমার মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া
এত বড় মাইয়া অইছ না করাইছ বিয়া।
ওর গানটা শেষ না হতেই আম্বিয়া নেচে উঠে গানের সুরে জবাব দিলো।
কেমন ওরে মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া।
তোমার মত কাঞ্চন পাইলে এখন করি বিয়া।

দূর পোড়া কপাইল্যা, দূর দূর করে ওকে তাড়া করলো ফকিরের মা। দৌড়ে গিয়ে মন্তুর ঘরের মধ্যে ঢুকে দুয়ারে খিল দিলো আম্বিয়া। বাইরে ছেলে বুড়োদের রোল পড়েছে তখন। সালেহা হেসে বললো, কিরে আম্বিয়া, এত ঘর থাইকতে শেষে আমাগো মন্তু মিয়ার ঘরে ঢুইকা খিল দিলি?

আরেক প্রস্থ হেসে উঠলো সবাই।

মন্তু তখন উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওকে দেখে গ্রামের রসুন নানী তার ফোকলা দাঁত বের করে একগাল হেসে বললো, কি মিয়া ডুইবা ডুইবা পানি খাও। ঘরে গিয়া দেহ কইন্যা তোমার ঘরে গিয়া খিল দিছে। মন্তু কি বলবে ভেবে পাচ্ছিলো না। হঠাৎ টুনির কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো সবাই।

তীব্র গলায় সে বললো, কি অইতাছে অ্যাঁ। কি অইতাছে। কাম কাজ ফালাইয়া কি শুরু করছ তোমরা। অ্যাঁ?

সহসা সবাই চুপ করে গেলো। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো ওরা। টুনি ততক্ষণে রসুই ঘরের দিকে চলে গেছে।

মন্তু নির্বাক।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আম্বিয়া। তার চোখমুখ পাকা লঙ্কার মত লাল। চিবুক আর গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলো। একটু আগেকার সেই আনন্দ উচ্ছল পরিবেশটা আর এখন নেই। ফকিরের মা বিড়বিড় করে বললো, এমন কি কইরছি যে রাগ দেহান লাগছে। বিয়া বাড়ির মধ্যেই হৈ-চৈ না কইরা কি কান্দাকাটি করমু? সালেহা বললো, আমরা না হয় মন্তু মিয়া আর আম্বিয়ারে নিয়া একটুখানি ঠাট্টা মস্করা কইরতাছিলাম, তাতে টুনি বিবির এত জ্বলন লাগে ক্যান। ওর কথা শেষ না হতে ঝড়ের বেগে রসুই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো টুনি। কি কইলা অ্যাঁ, কি কইল্যা অ্যাঁ। চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ওর। চোখজোড়া জ্বলছে। সালেহা সঙ্গে সঙ্গে বললো, যা কইবার তা কইছি, তোমার এত পোড়া লাগে ক্যান। বলে মুখ ভ্যাংচালো সে।

পরক্ষণে একটা অবাক কাণ্ড করে বসলো টুনি। সালেহার চুলের গোছাটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে মাটিতে ফেলে দিলো সে। তারপর চোখেমুখে কয়েকটা এলোপাতারি কিল ঘুষি মেরে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো টুনি। ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যেতে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সালেহা। মনে হলো মুহূর্তে ওর মা মারা গেছে।

কান্না শুনে এঘর ওঘর থেকে বেরিয়ে এলো অনেকে।

মকবুল দাওয়া থেকে চিৎকার করে উঠলো, কিরে কি অইলো অ্যাঁ। কি অইলো।

রশীদ, সুরত সবাই ছুটে এলো সেখানে।

রশীদ বললো, কি কান্দবি, না কইবি কিছু, কি অইছে? সালেহা কোন জবাব দিলো না।

ফকিরের মা বুঝিয়ে বললো সব।

সালেহার কোন দোষ নেই। আম্বিয়া আর মন্তুকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিলো ওরা। টুনি বেরিয়ে এসে হঠাৎ সালেহাকে মেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইরছে। মাইরছে ক্যান? রশীদ ক্ষেপে উঠলো।

ওকে রাগতে দেখে আরো জোরে কান্না জুলে দিল সালেহা।

বুড়ো মকবুল বিব্রত বোধ করলো। ইতস্তত করে বললো, মন্তু আর আম্বিয়া কই গেছে?

মন্তুকে ঘরের দাওয়াতে বসে থাকতে দেখা গেলো। কিন্তু আম্বিয়াকে পাওয়া গেলো না সেখানে। এই গণ্ডগোলের মধ্যে নীরবে এখান থেকে সরে পড়েছে সে।

ফকিরের মা বললো, ওগো কোন দোষ নাই।

কি ভেবে বুড়ো মকবুল একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। আস্তে করে বললো, তোমরা হৈ চৈ কইরো না। বিয়ার সময় এই সব ভালো না। যা অইছে তার বিচার আমি করমু। খাঁটি বিচার আমি করমু। বলে দাওয়ার দিকে চলে গেলো সে। তারপর হুঁকোটা হাতে তুলে নিয়ে আবার বললো, কই তোমরা চুপ কইরা রইলা ক্যান? গীত গাও, হ্যাঁ গীত গাও।

ছেলে-বুড়োরা আবার হৈ-চৈ করে উঠলো।

ফকিরের মা আবার গান ধরলো।

এক বাটা পান এনে ওদের সামনে নামিয়ে রেখে গেলো আমেনা। বললো, খাও। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরনো আবেশটা ফিরে এলো আবার। ফকিরের মা নাচতে শুরু করলো।

কেমন তোমার মাও বাপরে কেমন তোমার হিয়া।

এত বড় ডাঙ্গর অইছো না করাইছ বিয়া।।

বিয়ের জন্যে কিনে আনা ছাগলটা ঘরের পেছনে বেঁ-বেঁ করে ডাকছে। চোখের কোণ জোড়া পানিতে ভেসে উঠেছে ওর।

ভোর রাত পর্যন্ত কেউ ঘুমালো না।

তারপর একজন দু'জন করে স্ত্রী যার ঘরে চলে যেতে লাগলো। মন্তু সবে তার ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেবে এমন সময় বাইরে থেকে ধাক্কা দিল টুনি। ও কিছু বলার আগে ভেতরে এসে ঢুকলো সে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল করে এসেছে। মুখে একটা প্রসন্ন হাসি, হাতে মেহেদী। সঙ্গে একটা মাটির বাটিতে করে আরো কিছু মেহেদী এনেছে সে।

বাটিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে টুনি আস্তে করে বললো, দেহি, তোমার হাত দেহি।

মন্তু বললো, ক্যান?

টুনি বললো, তোমারে মেহেদী দিমু।

মন্তু বললো, না।

টুনি বললো, না ক্যান, বলে ওর হাতটা টেনে নিলো সে। মাটিতে বসে ধীরে ধীরে ওর হাতে মেহেদী পরিয়ে দিতে লাগলো টুনি। মন্তু কোন বাধা দিলো না। নীরবে বসে শুধু তাকে লক্ষ্য করে মৃদু হাসলো। কিছুক্ষণ পরে টুনি আবার বললো, আমার একটা কথা রাইখবা?

কি?

একডা বিয়া কর।

হুঁ।

দু'জনের আবার চুপ করে গেলো ওরা।

ওর দু'হাতের তালুতে সুন্দর করে মেহেদী পরিয়ে দিতে দিতে টুনি আবার বললো, আরেকডা কথা রাইখবা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি?

আমার পছন্দ ছাড়া বিয়া কইরবা না।

হুঁ। একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো মন্তু। টুনি পরক্ষণে ওর হাতটা কোলের ওপরে টেনে নিয়ে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, কথা দিলা? বলে অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকালো টুনি। মন্তু কি বলবে ভেবে পেলো না। বার কয়েক ঢোক গিললো সে।

তারপর হঠাৎ করে বললো শাপলা তুলতা যাইবা?

মৃদু হেসে মাথা নাড়লো টুনি। না।

তাইলে চল, মাছ ধরি গিয়া।

টুনি আরো জুরে মাথা নাড়লো, না।

না ক্যান? মন্তুর কণ্ঠে ধমকের সুর।

টুনি হেসে বললো, লোকে দেইখ্যা ফেলাইলে কেলেঙ্কারী বাধাইবো। বলে উঠে দাঁড়ালো সে। মন্তুকে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে পরক্ষণে সেখান থেকে চলে গেলো টুনি।

বিয়ের পরে ক'টা দিন বাড়িটা একেবারে জনশূন্য মনে হলো। ছেলে-বুড়ো সবাই চলে গেছে হীরনের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ি। শুধু যায় নি মকবুল আর মন্তু।

মকবুল যায় নি তার অসুখ বলে। প্রায় বিকেলে জ্বর আসছে ওর। সকালে একেবারে ভালো।

মন্তুরও শরীরটা ভালো নাই। বিয়ের দিন-রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়েছে সে। বুড়ো মকবুল বলেছে, থাক, তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই পরে যাইছ। তাই থেকে গেছে সে।

বাড়ির মেয়েছেলেরা ক'দিন ধরে ঘুমুচ্ছে খুব। বিয়ের সময়ে দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি কেউ, তাই।

বুড়ো মকবুল সাবধান করে দিয়েছে ওদের, অমন করে ঘুমায়ো না তোমরা, চোর আইসা সর্বনাশ কইরা দিবো।

আর আইলেই-বা কি নিবো। আছেই-বা কি। আমেনা শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছে। ওর মনটা ভালো নেই। একমাত্র মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে শান্তি পাচ্ছে না সে। বড় একা একা লাগছে। কে জানে স্বামীর বাড়ি গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করছে হীরন।

আজ সকাল থেকে মরাকান্না জুড়েছে ফকিরের মা। মৃত ছেলেটার কথা মনে পড়েছে ওর। বেঁচে থাকলে হয়তো সে এখন বিয়ের বয়সী হতো।

জ্বর নিয়েও বুড়ো মকবুল পুকুর পাড়ে বসে মরিচের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। ফাতেমা দু'বার এসে ডেকে গেছে ওকে, আপনের কি অইছে। এই রকম কাজ কইরলে তো দুই দিনে মরবেন আপনে।

কথাটা কানে নেয় নি মকবুল। একমনে পানি ঢালছে সে।

মন্তুকে পাঠিয়েছে গাঁয়ের কোবরেজ মশায়ের কাছে। লক্ষণ বলে ঔষধ নিয়ে আসার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠোনে টুনিকে ডেকে তার হাতে ওষুধগুলো দিয়ে দিলো মন্তু। বললো, কবিরাজ মশায় কইছে, এইগুলান ঠিকমত খাইতে।

টুনি ওষুধগুলো হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বললো, কি অইবো ওষুধ খাইয়া, বুড়া মরুক। বলেই চারপাশে তাকালো টুনি, কেউ শুনলো কিনা দেখলো। মন্তু কোন জবাব দিলো না ওর কথায়। বেড়ার সঙ্গে ঝুলানো হুঁকো আর কল্কেটা নিয়ে রসুই ঘরের দিকে চলে গেলো সে। একটু পরে এক বাটি তেঁতুল মরিচ মেখে এনে মন্তুর সামনে বসলো টুনি।

অল্প একটু তেঁতুল মুখে পুরে দিয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে টুনি শুধালো, খাইবা?

বাটিটার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে মন্তু বললো, না। তারপর একমনে হুঁকো টানতে লাগলো সে।

টুনি বললো, কবিরাজ কি কইছে?

একরাশ ধুঁয়ো ছেড়ে মন্তু জবাব দিলো, কইছে, কিছু না, ভালো অইয়া যাইবো।

ভালো অইয়া যাইবো? চোখজোড়া কপালে তুললো টুনি।

নেড়ী কুকুরটা টুনিকে কিছু খেতে দেখে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলো। হঠাৎ দাওয়া থেকে পিঁড়ি তুলে ওর গায়ে ছুঁড়ে মারলো টুনি।

সারাদিন কেবল পিছে পিছে ঘুরে, কোনহানে গিয়া একটু শান্তি নাই।

পিঁড়ির আঘাতে ঘেউ ঘেউ করে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো কুকুরটা।

চৈত্র মাসের রোদে মাঠটা খা খা করছে।

যেদিকে তাকানো যায় শুধু শুকনো মাটি। পাথরের চেয়েও শক্ত। আর অসংখ্য ফাটল। মাটি উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। দাঁড়কাকগুলো তৃষ্ণায় সারাক্ষণ কা-কা করে উড়ে বেড়ায় এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে, বাড়ির আনাচে কানাচে।

নদী-নালাগুলোতে পানি থাকে না। মানুষ গরু ইচ্ছেমত পায়ে হেঁটে এপার-ওপার চলে যায়। পুকুরগুলোর পানিও অনেক কমে আসে।

গরমে ঘরে থাকে না কেউ। গাছের নিচে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে বসে দিন কাটায়। বাতাসে একটি পাতাও নড়ে না। সারাক্ষণ সবাই শুধু হা-হুতাশ করে। এমনি সময়ে হীরনকে দেখবার জন্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে গেছে বুড়ো মকবুল। যাবার সময় একটা ন্যাকড়ার মধ্যে এককুড়ি মুরগীর ডিম সঙ্গে নিয়ে গেছে সে। শূন্য হাতে বেয়াই বাড়ি গেলে হয়তো ওরা লজ্জা দিতে পারে, তাই। পথে বামুন বাড়ির হাট থেকে চার আনার বাতাসাও কিনেছে সে। বাড়ির বাচ্চাদের হাতে দেবে।

ভর সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এলো মকবুল। বার বাড়ি থেকে ওর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল সুরত! সুরত! ও মন্তু, কেউ কি নাই নাকি রে।

মন্তু গেছে মিয়া বাড়ি। গাছ কাটার চুক্তি নিয়েছে সে।

সুরতও সেখানে।

আবুল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি ভাই সাব, কি অইছে?

টুনি আর আমেনাও বেরিয়ে এলো বাইরে।

মকবুল বললো, সুরত, রশীদ ওরা কই?

আমেনা বললো, সুরত কাজে গেছে, রশীদ গেছে হাটে, সালেহার লাইগা সাবু আনতে।

ওর জ্বর হইছে ভীষণ।

জ্বর নাহি, আহা কখন আইলো? গায়ের ফতুয়াটা খুলতে খুলতে মকবুল বললো, বাপু তোমরা সক্কলে একটু সাবধানে থাইকো। ও বিন্তির মা, বঁইচির মা শোনো, তোমরা একটু সাবধানে থাইকো।

গেরামে ওলা বিবি আইছে।

ইয়া আল্লা মাপ কইরা দাও। আতঙ্কে সবাই শিউরে উঠলো।

গনু মোল্লা ওজু করছিলো, সেখানে থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলো, কোন্‌হানে আইছে ওলা বিবি? কোন্ বাড়িতে আইছে?

মকবুল বললো, মাঝি বাড়ি।

মাঝি বাড়ি? এক সঙ্গে বলে উঠলো সবাই। কয়জন পড়ছে?

তিনজন।

তিনজন কে কে সেকথা বলতে পারবে না মকবুল, পথে আসার সময় ও বাড়ির আম্বিয়ার কাছ থেকে শুনে এসেছে সে। বাড়ির সবাইকে আরেক প্রস্থ সাবধান করে দিলো বুড়ো মকবুল, তোমরা সক্কলে একডু হুইসারে থাইকো বাপু। একডু দোয়া দরুদ পাইড়ো। বলে খড়মটা তুলে নিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেলো সে।

ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ নীরবে শুনছিলো সব। এবার বিড়বিড় করে বললো, বড় খারাপ দিন কাল আইছে বাপু। যেই বাড়িডার দিকে একবার নজর পড়ে সেই বাড়িডারে এক্কেবারে শেষ কইরা ছাড়ে ওলা বিবি। বড় খারাপ দিন-কাল আইছে। বলে নিজের মৃত ছেলেটার জন্য কাঁদতে শুরু করলো সে।

টুনি দাঁত মুখ শক্ত করে তেড়ে এলো ওর দিকে, বুড়ি যহন তহন কান্দিছ না কইলাম। শিগ্‌গীর থাম।

ধমক খেয়ে ফকিরের মা চুপ করে গেলো। সেই বিয়ের সময় সালেহাকে মারার পর থেকে টুনিকে ভীষণ ভয় করে বুড়ি।

ইতিমধ্যে মন্তু, সুরত ফিরে এসেছে।

কাঁধের উপর থেকে কুড়োলটা মাটিতে নাবিয়ে রাখতে না রাখতে টুনি একপাশে টেনে নিয়ে গেলো ওকে।

মাঝি-বাড়ি যাও নাই তো?

মন্তু ঘাড় নাড়লো, না, ক্যান কি অইছে?

টুনি বললো, ওলা বিবি আইছে ওইহানে। বলতে গিয়ে মুখখানা শুকিয়ে গেলো ওর।

মন্তুর দু'চোখে বিস্ময়। বললো, কার কাছ থাইকা শুনছ?

ও কথার কোন জবাব না দিয়ে টুনি আবার বললো, শোন, ওই বাড়ির দিকে গেলে কিন্তুক আমার মাথা খাও। যাইও না ক্যাম?

মন্তু সায় দিয়ে মাথা নাড়লো কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারলো না সে। আজ সকালে মিয়া-বাড়ি যাওয়ার পথে একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে গেছে মন্তু। নৌকোটাকে ভালোভাবে মেরামত করার বিষয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করে গেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন তো এমন কিছু শুনে নি সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্বিয়ার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, সেও কিছু বলে নি।

উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সাত পাঁচ ভাবলো মন্তু। বুড়ো মকবুলকে তামাক সাজিয়ে দেবার জন্যে রসুই ঘরে গেছে টুনি। এই সুযোগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো সে।

দীঘির পাড়ে মন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের সঙ্গে দেখা হলো। পরনে লুঙ্গি আর কুর্তা। হাতে লাঠি। বগলে একজোড়া পুরনো জুতো। মন্তুকে দেখে প্রসন্ন হাসির সঙ্গে তোরাব প্রশ্ন করলো, কি মিয়া খবর সব ভালো তো? মন্তু নীরবে ঘাড় নাড়লো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কই যাও, শ্বশুর বাড়ি বুঝি?

হুঁ, তোরাব শ্বশুরবাড়িতেই যাচ্ছে। কাজকর্মের ফাঁকে অনেক দিন আসতে পারে নি, খোঁজ-খবর নিতে পারে নি। তাই সুযোগ পেয়ে একবার সকলকে দেখে যেতে এসেছে সে।

পকেট থেকে দু'টি বিড়ি বের করে একটা মন্তুকে দিয়ে আরেকটা নিজে ধরালো সে। বিড়ি খেতে ইচ্ছে করছিলো না ওর। তবু নিতে হলো। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে থামলো তোরাব। জুতো জোড়া বগল থেকে নামিয়ে নিয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্যে ঘাটে নেমে গেলো সে।

বললো, একটুহানি দাঁড়ান মিয়া। অজু কইরা নি।

হাত-পা ধুয়ে জুতোজোড়া পরে আবার উপরে উঠে এলো তোরাব।

পকেট থেকে চিরুনি বের করে নিয়ে বললো, মাঝি-বাড়ির খবর জানেন নাহি, সক্কলে ভালো আছে তো?

মন্তু বললো, ভালো তো আছিলো, কিন্তুক একটু আগে শুনছি, ওলা লাগছে। ওলা? তোরাব যেন আঁতকে উঠলো। পায়ের গতিটা কমিয়ে এনে সে শুধালো, কার কার লাগছে?

মন্তু বললো, কি জানি ঠিক কইবার পারলাম না।

হুঁ। হঠাৎ থেমে গেলো তোরাব। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর পায়ের জুতোজোড়া খুলে আবার বগলে নিতে নিতে বললো, এই দুঃখের দিনে গিয়া ওনাগোরে কষ্ট দেয়নের কোন মানি অয় না মিয়া। যাই ফিইরা যাই। যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়ালো সে। আস্তে করে বললো, আমি যে আইছিলাম এই কথাডা কেউরে কইয়েন না মিয়া। বলে মন্তুর উত্তরের অপেক্ষা না করে যে পথে এসেছিলো সে পথে দ্রুতপায়ে আবার ফিরে চললো তোরাব।

হাতের বিড়িটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মন্তু।

মাঝি-বাড়ি থেকে করুণ বিলাপের সুর ভেসে এলো সেই মুহূর্তে। একজন বুঝি মারা গেলো। কলজেটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো মন্তুর। মাঝি বাড়ির দেউড়িটা পেরিয়ে ভেতরে আসতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠলো ওর। নন্তু শেখ মারা গেলো। হাঁপানি জর্জর করিম শেখ মৃত বাবার পাশে বসে কাঁদছে। আম্বিয়া কাঁদছে তার বিছানায় শুয়ে। ওলা বিবি তাকেও ভর করেছে। তাই বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি পাচ্ছে না মেয়েটা। সেখান থেকে কাঁদছে সে।

দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে রইলো মন্তু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝি-বাড়ির ছমির শেখ ওকে দেখে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠলো। এই কি মুছিবত আইলো মিয়া, আমরা বুঝি এইবার শেষ অইয়া যামু। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো মন্তু। তারপর ওর কাছ থেকে বাকি খোঁজ-খবর নিলো সে। ছোট ভাই জমির শেখ কবিরাজ আনতে গেছে দু'ক্রোশ দূরে রতনপুরের হাটে। এখনো আসে নি; ভোরের আগে যে আসবে তারও কোন সম্ভাবনা নেই। এই একটু আগে ছমির শেখ, পরিবারের ছেলেমেয়ে সবাইকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বুড়োরা মরে গেলেও ছেলেমেয়েগুলো যাতে বাঁচে। নইলে বাপ-দাদার ভিটার ওপর বাতি দিবার কেউ থাকবে না। ছমির শেখের দু'গণ্ড বেয়ে পানি ঝরছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের চোখজোড়াও ভিজে এলো ওর। আম্বিয়ার ঘরের দিকে তাকাতে দেখলো, বিছানায় শুয়ে বিলাপ করছে মেয়েটা।

পরদিন ভোরে একটা খন্তা আর কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মন্তু।

পরীর দীঘির পাড়ে জায়গাটা আগেই দেখিয়ে গেছে ছমির শেখ। কথা ছিলো একটা কবর খোঁড়ার। এখন দুটো খুঁড়তে হবে। একটা নন্তু শেখের জন্যে আরেকটা ছমির শেখের জন্য। রাতে কবিরাজ আনতে যাওয়ার সময় ভেদবমি শুরু হয় ওর। বাড়িতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে মারা গেছে ও।

আগে মরার জন্যে কবর খোঁড়ার কাজটা নন্তু শেখ করতো। গত ত্রিশ বছর ধরে এ গাঁয়ে যত লোব মরেছে সবার জন্যে কবর খুঁড়েছে সে। কোদাল হাতে কবর খোঁড়ার সময় প্রায় একটা গান গাইতো নন্তু শেখ। আর ওর কবরের ছক কাটতে গিয়ে সে গানটার কথা মনে পড়ে গেলো মন্তুর।

এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফিরখানা ও ভাইরে।

মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।

মাটি খুঁড়তো আর টেনে টেনে গান গাইতো নন্তু শেখ। বলতো, কত মানুষেরে কবর দিলাম, কত কবর খুঁইড়লাম এই জীবনে। তার হিসাব কি আর আছে মিয়া। এমনও দিন গ্যাছে যহন, একদিন সাত আটটা কইরা মাটি দিছি।

গোরস্থানে কার কোনটা কবর, কাকে কোনদিন এবং কোথায় কবর দিয়েছে সব কিছু মুখে মুখে বলে দিতে পারতো নন্তু। আর যখন কবর খুঁড়তে গিয়ে মানুষের অস্থি কিম্বা মাথার খুলি পেতো সে, তখন সবাইকে দেখিয়ে বিজ্ঞের মতো বলতো, চিনবার পার এরে? না না তোমরা চিনবা কেমন কইরা? আমি চিনি। এইডা কলিমুল্লা মাঝির মাইয়ার খুলি। এইহানেই তো কবর দিছিলাম ওরে। আহা মাইয়া আছিল বটে একডি। যেনো টিয়া পাখির ছাও। যে একবার দেইখছে সেই আর তারে ভুলবার পারে নাই। বলে খুলিটার দিকে খুব ভালো করে তাকাতো নন্তু শেখ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে দেখতো ওটা, আহা কি মাইয়া কি অইয়া গেছে। সোনার চাঁদ সুরত এহন চিনবারই পারা যায় না। অতি দুঃখের সঙ্গে নন্তু আবার বলতো, গলায় ফাঁস দিয়া মইরছিলো অভাগী। জামাইর সঙ্গে বনিবনা অইতো না তাই। খুলিটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নন্তু বলে যেতো, সেই বহুত দিনের কথা মিয়া, তহন তোমরা সব মায়ের পেটে আছিলা। সেই নন্তু শেখের মৃতদেহটা কবরে নামাতে গিয়ে চোখজোড়া পানিতে ঝাপসা হয়ে এলো মন্তুর। মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে অইবো কবরে। সারাদিন আর বাড়ি ফিরলো না মন্তু। দীঘির পাড়ে কাটিয়ে দিলো সে। ওর মায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবরটা দেখলো। এককালে বেশ উঁচু ছিলো ওটা। অনেক দূর থেকে চোখে পড়তো, এখন মাটির নিচে খাঁদ হয়ে গেছে এক হাঁটু। অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত নেমে গেছে ভেতরের দিকে, সেখানে মায়ের দু-একখানা হাঁড় হয়তো আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। মায়ের জন্যে আজ হঠাৎ ভীষণ কান্না পেলো ওর। মনে হলো ও বড়ো একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নেই। শুকনো পাতার শব্দে পেছনে ফিরে তাকালো মন্তু। টুনি দাঁড়িয়ে পেছনে। সারাদিন ওর দেখা না পেয়ে অনেক খোঁজের পর এখানে এসেছে সে। মন্তুকে ওর মায়ের কবরের পাশে বসে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো টুনি।

তারপর ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে আস্তে করে বললো, ঘরে যাইবা চল।

কোন কথা না বলে নীরবে উঠে দাঁড়ালো মন্তু। কিন্তু তক্ষুণি বাড়ি ফিরলো না সে।

বললো, তুমি যাও আমি আহি।

টুনি উৎকণ্ঠিত গলায় বললো, কই যাইবা?

মন্তু বললো, যাও না আইতাছি। কিন্তু তক্ষুণি বাড়ি ফিরলোনা সে। বললো, তুমি যাও আমি আহি।

টুনি উৎকণ্ঠিত গলায় বললো, কই যাইবা?

মন্তু বললো, যাও না, আইতাছি। বলে টুনিকে সঙ্গে নিয়ে পরীর দীঘির পাড় থেকে নেমে এলো সে।

ও যখন বাড়ি ফিরে তখন বেশ রাত হয়েছে। বার বাড়ি থেকে মন্তু শুনতে পেল গনু মোল্লা ওরা বসে বসে কি যেন আলাপ করছে।

গনু মোল্লা বলছে, সব অইছে খোদার কুদরত বাপু। নইলে এই দিনে তো কোনদিনই ওলা বিবিরে আইতে দেহি নাই।

মকবুল বললো, ওলা বিবির আর আজকাইল দিনকাল কিছু নাই। যহন তহন আহে।

আমেনা বললো, এক পা খোঁড়া বিবির। তবু যেন কেমন কইরা এত বাড়ি বাড়ি যায়, আল্লা মালুম।

ওর কথা শেষ না হতেই টুনি জিজ্ঞেস করলো, কেমন কইরা ওর এক পা খোঁড়া অইল বুয়া?

তখন টুনিকে বুঝাতে লেগে গেলো আমেনা।

ওলা বিবি, বসন্ত বিবি আর যক্ষ্মা বিবি ওরা ছিলো তিন বোন এক প্রাণ। যেখানে যেত এক সঙ্গে যেতো ওরা। কাউকে ফেলে কেউ বেরুতো না বাইরে।

একদিন যখন খুব সুন্দর করে সেজেগুজে ওরা রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো তখন হঠাৎ হজরত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ওদের। রঙ্গিন শাড়ি পরে বেরুলে কি হবে, ওদের চিনতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হলো না হযরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন এরা একজন কলেরা, একজন বসন্ত, আর একজন যক্ষ্মা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক কাণ্ড কইরা বইসলেন তিনি। খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছার। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেলো ওলা বিবির। আহা সব খোদার কুদরত। মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, একখানা পা দিয়া দুনিয়াডারে জ্বালাইয়া খাইতাছে বেটি। দুই পা থাইকলে তো দুনিয়াডারে একদিনে শেষ কইরা ফালাইতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বুড়ো মকবুল মুহূর্তে রেগে গেলো। কিরে নবাবের বেটা তোরে একশবার কই নাই, মাঝি বাড়ি যাইস না, গেলি ক্যান অ্যাঁ।

গনু মোল্লা বললো, আক্‌কেল পছন্দ নাই তোর।

সুরত আলী বললো, বাড়ির কারো যদি এহন কিছু অয় তাইলে কুড়াইল মাইরা কল্লা ফালাইয়া দিমু তোর।

ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে বললো, বাপু গেলেই কি অইবো, আর না গেলেই অইবো না যার মউত আল্লায় যেই দিন লেইখা রাইখছে সেই দিন অইবো। কেউ আটকাইবার পারবে না।

ঠিক কইছেন চাচি, আপনে ঠিক কইছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন জানালো টুনি।

ওর কথা শেষ হতেই হঠাৎ ফাতেমা জানালো গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছে সে।

দেখেছে একটা খোঁড়া কুকুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

বড় ভালা দেখছ বউ। বড় ভালা দেখছ। ফকিরের মা পরক্ষণে বললো, ওই খোঁড়া কুত্তা, খোঁড়া মোরগ আর গরুর সুরত ধইরাই তো আহে ওলা বিবি। এক গেরাম থাইকা অন্য গেরামে যায়। বলে সমর্থনের জন্যে সবার দিকে এক নজর তাকালো সে।

মকবুল জানালো, শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে খোঁড়া কাক, শিয়াল কিম্বা খোঁড়া মানুষের রূপ নিয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত করে ওলা বিবি।

হ্যাঁ মিয়ারা। বুড়ো মকবুল সবাইকে সাবধান করে দিলো। খোঁড়া কিছুরে বাড়ির ধারে কাছে আইতে দিয়ো না তোমরা। অচেনা কোন খোঁড়া মানুষও না। দেখলেই ওইগুলোরে তাড়ায়ে খাল পার কইরা দিও।

সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। তাই তাই করবে।

রাতে ঘুম হলো না মন্তুর।

সারাক্ষণ বিছানায় ফটফট করলো সে। না, একটা বিয়ে ওকে এবার করতেই হবে। এমনি একা জীবন কতদিন কাটাবে মন্তু। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবতে গেলে ইদানীং টুনি ছাড়া অন্য কোন মেয়ের কথা ভাবতে পারে না সে। শান্তির হাটের সেই রাত্রির পর থেকে টুনি তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসে আছে। গ্রামের কত লোক তাদের বউকে তালাক দেয়। বুড়ো মকবুল কেন তালাক দেয় না টুনিকে।

হঠাৎ পরীবানুর পুঁথির কথা মনে পড়লো মন্তুর। সুরত আলী মাঝে মাঝে সুর করে পড়ে ওটা।

ঘর নাই বাড়ি নাই দেখিতে জবর।
পরীবানুর আসিক লইল তাহারি উপর।

কুলাটিয়া গ্রামের এক গৃহস্থের বউ পরীবানু। স্বামীর সঙ্গে মিলমিশ হতো না। অষ্টপ্রহর ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো। ঘর ছেড়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে নীরবে বসে থাকতো সে। আর সেখান থেকে দেখতো একটি রাখাল ছেলেকে। দূরে একটা বট গাছের নিচে বসে এক মনে বাঁশি বাজাতো সে। এমনি চোখের দেখায় প্রেম হয়ে গেলো।

তারপর

তারপর একদিন সময় বুঝিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুইজনে পালায়া গেলো চোখে ধূলা দিয়া।

মন্তুর তাই মনে হলো। টুনিকে নিয়ে যদি একদিন পালিয়ে যায় সে। দূরে বহুদূরে, দূরের কোন গ্রামে কিম্বা শহরে। না শান্তির হাটে যদি ওকে নিয়ে যায় সে তা হলে মনোয়ার হাজী নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। সেখানে টুনিকে নিয়ে সংসার পাতবে মন্তু। যে-কোন দোকানে হাজীকে দিয়ে একটা চাকুরি জুটিয়ে নেবে সে।

এমনি আরো অনেক চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো মন্তু।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুতেই আমেনা জিজ্ঞেস করলো, নন্তু শেখের বাড়ির কোন খবর জান।

না।

ওমা জান না? নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখ পড়েছে আজ।

মন্তু কোন কথা বললো না।

আমেনা বলে চললো, কবিরাজে কিছু কইরবার পারলো না। তাই ও গনু মোল্লারে ডাইকা নিছে। একটু ঝাড়ফুঁক দিয়া যদি কিছু অয়।

মন্তুকে চুপ করে থাকতে দেখে আমেনাও চুপ করে গেলো।

অবশেষে আরও দশটি প্রাণ হরণ করে তবে গ্রাম থেকে বিদায় নিলেন ওলা বিবি।

গ্রামের সবাই মসজিদে সিন্নি পাঠালো। মিলাদ পড়ালো বাড়ি বাড়ি।

ওলা বিবি গেলেন। আর দিন কয়েক বৃষ্টি এলো জোরে। আকাশ কালো করে নেমে এলো অবিরাম বর্ষণ। সারা রাত মেঘ গর্জন করলো। বাতাস বইলো আর প্রচণ্ড বেগে ঝড় হলো।

আগের দিন বিকেলে আকাশে মেঘ দেখে বুড়ো মকবুল তার পুরনো লাঙ্গলটা ঠিক করে নিয়েছে। গরু নেই ওর। রওশন ব্যাপারীর কাছ থেকে এক জোড়া গরু ঠিকে নেবে। যে ক'দিন হাল চলবে সে কটা দিনের জন্যে নগদ টাকা দিতে হবে। তাছাড়া গরুর ঘাস-বিচালীর পয়সাও জুটাতে হবে তাকে।

ভোর না হতেই সবাই বেরিয়ে পড়লো মাঠে।

আবুল, মন্তু, সুরত আলী, রশীদ, বুড়ো মকবুল আর গ্রামের সবাই।

পুরুষেরা কেউ বাড়ি নেই।

পুরো মাঠ জুড়ে হাল পড়েছে। পাথরের মত শক্ত মাটি বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে নরম হয়ে গেছে।

হট, হট, হট, হুঁ উঁ উঁ।

বড় মিয়ার জমিতে লাঙ্গল নামিয়েছে মন্তু আর সুরত।

এককালে এ জমিটা সুরত আলীর ছিলো। সরেস জমি। প্রায় মণ সাতেক ধান ফলতো তখন। ধানের ভারে গাছগুলো সব নুয়ে পড়ে থাকতো মাটিতে।

নিজ হাতে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতো সুরত। মই দিতো। ধান ফেলতো খুব সাবধানে। গাছ উঠলে, বসে বসে আগাছাগুলো পরিষ্কার করতো।

ছাই আর গোবর ছড়িয়ে দিয়ে যেতো প্রতিটি অঙ্কুরের গোড়ায়। তারপর খাজনার টাকা জোটাতে না পেরে ওটা বড় মিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহা জমিডার কি অবস্থা কইরাছে দেখছস? লাঙল ঠেলতে ঠেলতে সুরত আলী বললো, জমির লাইগা ওগো আধ পয়সার দরদ নাই। দরদ নাই দেইখাই তো জমিনও ফাঁকি দিবার লাগছে।

মন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললো, গেল বছর মোটে দেড় মণ ধান পাইছে।

কোথায় সাত মণ আর কোথায় দেড় মণ!

বুকটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো সুরত আলীর। রুগন্ গরু দুইটাকে হট, হট করে জোড়ে তাড়া দিয়ে বললো, জমির খেদমত করন লাগে।

বুঝলা মন্তু মিয়া, জমির খেদমত করন লাগে। যত খেদমত কইরবা তত ধান দিব তোমারে।

শেষের কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যায় না। আপন মনে বিড়বিড় করে সুরত। হঠাৎ কোনখানে যদি কতগুলো টাকা পেয়ে যেত তাহলে জমিটাকে আবার কিনে নিতো সে।

তখন সাত মণের জায়গায় আট মণ ধান বের করতো এই জমি থেকে।

আকাশে এখনও অনেক মেঘ, দক্ষিণের বাতাসে উত্তরে ভেসে যাচ্ছে ওরা। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে নিচে। সুরত তখনো বলে চলছে আপন মনে। খোদার ইচ্ছা অইলো, জমিনগুলান আমার থাইকা কাইড়া নিলো। খোদার ইচ্ছা অইলো জমিনগুলান বড় মিয়ারে দিয়া দিলো। জমির লাইগা যার একটুও মায়াদয়া নাই তারেই দিলো খোদা দুনিয়ার সকল জমি। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া। ইনছাফ ইনছাফ করো মিয়া। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া? হিরর। হট হট। হুঁ উঁ উঁ। গরুগুলোর লেজ ধরে জোরে তাড়া দিলো সুরত আলী।

অদূরে তার জমিতে ধান ফেলছে। মিশকালো দেহ বেয়ে চুইয়ে ঘাম ঝরছে ওর। হাঁটার সময় মনে হচ্ছে মুখ থুবড়ে ক্ষেতের মধ্যে পড়ে যাবে সে। ওটাও বড় মিয়ার ক্ষেত। বর্গা নিয়ে চাষ করছে রশীদ। ওর পাশের ক্ষেতে মই জুড়েছে বুড়ো মকবুল।

কাজ করার সময় আশেপাশের দুনিয়াকে একেবারে ভুলে যায় সে। কোথায় কি ঘটছে লক্ষ্য করে না। ধান ফেলা শেষ হলে, রশীদ ডাকলো অ-ভাইজান।

মকবুল মুখ না তুলেই জবাব দিলো, কি কও না।'

ধান তো ফালায়া দিলাম আল্লার নাম নিয়া।

দাও, দাও, ফালায়া দাও। এহন যত তাড়াতাড়ি ফালাইবা তত লাভ।

আর লাভের কথা কইও না। গরুজোড়ার সঙ্গে মই জুড়তে জুড়তে রশীদ জবাব দিলো।

ধান বেশি অইলেই বা কি, না অইলেই বা কি। বড় মিয়াকে অর্ধেক দিয়া দেওন লাগবো।

ওই দিয়া থুইয়া যা থাকে, তাই লাভ। মকবুল সান্ত্বনা দিলো ওকে।

সুরত আলী তখনও আপন মনে বলে চলেছে, পরের জমিতে খাইট্যা কোন আরাম নাই মন্তু মিয়া, পরের জমি, আরে গরুগুলোর আবার কি অইলো। হালার নবাবের ব্যাটা।

হট, হট, হুঁ উঁ উঁ।

মন্তু ততক্ষণে গান ধরেছে।

আশা ছিলো মনে মনে প্রেম করিমু তোমার সনে

তোমায় নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ গান থামিয়ে গরুজোড়ার লেজ ধরে সজোরে টান দিলো মন্তু।

ইতি, ইতি, ইতি, চল।

সুরত বললো, গান থামাইলি ক্যান মন্তু। গাইয়া যা, গাইয়া যা।

মন্তু বললো, না ভাইজান, গলাডা হুকাইয়া গেছে, গান বাইরয় না।

হ, হ, দুনিয়াডাই হুকাইয়া গেছে মন্তু মিয়া। তোর গলা হুকায় নাই।

জোগে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সুরত আলী। আমাগো জমানায় আহা, কত গান গাইছি, কত ফুর্তি কইরাছি। কত রংবাজি দেইখছি। আর অহন দুনিয়াডাই আরেক রকম হইয়া গেছে মন্তু মিয়া। গাজী কালুর দুনিয়া আর নাই। সোনাভানের দুনিয়া পুইড়া ছাই অইয়া গেছে। বলে কর্কশ গলায় সে নিজে একখানা গান ধরলো।

যা ছিলো সব হারাইলাম হায় পোড়া কপাল দোষে।

ও খোদা,

আমার কপাল এমন তুমি কইরলা কোন রোষে।

গান গাইতে গাইতে খুক খুক করে অনেকক্ষণ কাশলো সুরত। বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলো। থাম, থাম, আরে থামরে নবাবের বেটা। থাম। গরুগুলোকে থামিয়ে তামাক খাওয়ার জন্যে আলের ধারে এসে বসলো সেও। বললো, মন্তু মিয়া আহ, তামুক খাইয়া লও। তামাকের গন্ধ পেয়ে মকবুল আর রশীদ ওরাও ক্ষেত ছেড়ে উঠে এলো।

জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বুড়ো মকবুলের দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিলো সুরত।

প্রথমে এক নিঃশ্বাসে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো মকবুল। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, মন্তু মিয়া তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আইজ।

সইন্ধ্যা বেলা বাড়ি থাইকো।

রশীদ আর সুরত একবার হুঁকোর দিকে তাকালো, কিছু বললো না।

ওদের নজর এখন হুঁকোর দিকে।

সন্ধে বেলা বুড়ো মকবুলের কাছ থেকে কথাটা শুনলো মন্তু। ওর বিয়ের কথা।

মকবুল ঠিক করেছে এবার সত্যি সত্যি একটা বিয়ে করিয়ে দেবে মন্তুকে। চাচা-চাচী এতোদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বিয়ে দিয়ে দিতেন।

চাচা নেই। মকবুল বেঁচে আছে। বাড়ির মুরব্বি সে। এ ব্যাপারে তার একটা দায়িত্ব রয়েছে।

পাত্রী ঠিক করে নিয়েছে মকবুল। মাঝি-বাড়ির আম্বিয়া।

নন্তু শেখ আর তার ছেলে করিম শেখ কলেরায় মারা যাবার পর থেকে আম্বিয়া একা।

বসত বাড়িটা, বাড়ির ওপরের ছোট্ট ক্ষেতটা আর সেই নৌকোটার এখন মালিক সে।

ওকে বিয়ে করলে মন্তু অনেকগুলো সম্পত্তি পেয়ে যাবে একসঙ্গে।

রশীদ তার ঘরের চালায় খড় দিয়ে ফুটোগুলো মেরামত করছিলো।

তাকে ডাকলো মকবুল। তোমরা এইটার একটা ফয়সালা কইরা ফালাও মিয়া। ওই মাইয়া বেশিদিন থাকবো না। বহু লোকের চোখ পইড়ছে।

উপর থেকে রশীদ বললো, মাইয়ার হাঁপানি, শেষে বাড়ির সক্কলের হাঁপানি অইবো।

মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বললো, আরে একবার বিয়া কইরা সম্পত্তিগুলান হাত কইরা নিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে দেহা যাইবো, যদি হাঁপানি হয় তো তালাক দিয়া দিবো। মন্তু সহসা কিছু বললো না। সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে। আম্বিয়াকে অনেক ভালো লাগছিলো তার। সেদিন যদি বুড়ো মকবুল বলতো তাহলে তক্ষুণি রাজী হয়ে যেতো সে। আজ ভাবতে গিয়ে অদূরে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকালো মন্তু।

বুড়ো মকবুল বললো, অমন সম্বন্ধ আর পাইবি না মন্তু। চিন্তা করার কিছু নাই। মত দিয়া দে। কাইল রাইতে গিয়া ওর চাচা ছমির শেখের সঙ্গে আলাপ কইরা আহি।

ফকিরের মা বললো, আপনেরা মুরব্বি, আপনেরা ঠিক কাইরা ফালান।

আমেনা বললো, ঠিক কথা কইছ চাচি।

মন্তু তখনও ভাবছে।

একটা বসতবাড়ি। একটা নৌকো। আর বাড়ির ওপরে এক টুকরো ক্ষেত। দেখতেও সুন্দরী সে। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন আট হাত শাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেটে পড়তে চায়।

বুড়ো মকবুল বললো, তাইলে ওই কথাই রইলো। কাইল রাইতের বেলা ওর চাচার সঙ্গে আলাপ করি গিয়া।

মন্তু চুপ করে রইলো। তারপর খুব আস্তে করে বললো, ও, আপনেরা যেইডা ভালা মনে করেন, করেন।

মুখ তুলে তাকাতে পারলো না সে। রসুই ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে টুনি। দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটছে সে। মন্তুর কথা শুনে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে। বললো, আমাগো মন্তু মিয়ার বিয়ায় কিন্তুক বড় দেইখা একখানা পাল্কি আনন লাগবো।

ফকিরের মা বললো, মাইয়া এমন কইরা হাসতাছে য্যান ওর বিয়ার কথা অইতাছে, দেহ না কারবার।

ওর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে পরমুহূর্তে সেখান থেকে সরে গেলো টুনি। বিয়ের কথা শুনে সুরত আলী আর আবুলও সমর্থন জানালো। গনু মোল্লা বললো, ভালা অইছে। মন্তু এইবার সংসারী অইবো।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টুনি মকবুলকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে আমার একডা কথা আছে।

মকবুল রেগে উঠলো। এই রাতের বেলা এখন ঘুমোতে যাবো। এই সময়ে আবার এমন কি কথা বলতে চায় টুনি। রেগে বললো, কাইল দিনের বেলা কইয়ো।

টুনি বললো, না, অহনি লাগবো।

বুড়ো মকবুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললো, আচ্ছা কও কি কথা।

চারপাশে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে কথাটা বললো টুনি। মকবুল বড় বোকা। নইলে এমন সুযোগ কেন হেলায় হারাচ্ছে সে। একটা বসত বাড়ি। একটা ক্ষেত। আর একটা নৌকো। ইচ্ছে করলে ওগুলোর মালিক সেও হতে পারে। সে কেন বিয়ে করে না আম্বিয়াকে। বুড়ো মকবুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এ সম্ভাবনার কথা সে নিজেও ভাবে নি এর আগে। টুনি যা বললো, শুধু তাই নয় আরো লাভ আছে আম্বিয়াকে বিয়ে করায়। সারাদিন একটানা ধান ভানতে পারে সে। খাটতে পারে অসম্ভব।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বললো, চিন্তা কইরতাছ কি, চিন্তা করার কিছুই নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ মুহূর্তে টুনিকে ওর নিজের চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হলো মকবুলের। মনে হলো টুনির কাছে নেহায়েত একটা শিশু সে।

একটু পরে চাপা গলায় মকবুল বললো, বড় বউ আর মাইঝা বউ যদি রাজী না অয়।

টুনি বললো, রাজী অইব না ক্যান। নিশ্চয় অইবো।

মকবুল বললো, ওগো না অয় রাজী করান গেল। কিন্তুক আম্বিয়া?

মকবুলের কণ্ঠস্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা।

টুনি বললো, চেষ্টা কইললে সব অয়, অইব না ক্যান?

এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো ওরা। মকবুল বললো, বহ বউ। বহ।

টুনি বসলো ওর পাশে। দু'জনে পাশাপাশি । মকবুলের কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখলো টুনি। তারপর নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইল ওরা। বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের উঠোনে বসিয়ে কিচ্ছা বলছে ফকিরের মা। চাঁদ সওদাগরের কিচ্ছা। একমনে হা করে শুনছে সবাই।

সালেহা কাঁদছে ওর ঘরে। কাল দুপুরে ওর মুরগিটাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে ধরে। সেই শোকে কাঁদছে সে।

আমেনা আর ফাতেমা দু'জনকে ডেকে এনে সামনে বসিয়ে কথাটা বললো বুড়ো মকবুল।

শুনে আমেনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো, এমন কি অভাব আছে আপনের যে ওকে বিয়ে করতে চান?

ফাতেমা বললো, এই বুড়ো বয়সে মাইনষে কইবো কি?

টুনি বললো, মাইনষের কথা হুইনা কি অইবো। মাইনষে তো অনেক কথা কয়। তবু ফাতেমা আর আমেনা ঘোর আপত্তি জানালো। মকবুল অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলো ওদের। কিন্তু ওরা রাজী হলো না।

অবশেষে মকবুল রেগে গেলো, শাসিয়ে বললো, অত কথা বুঝি না। আম্বিয়ারে বিয়া আমি করমুই। তোমরা পছন্দ কর কি না কর।

কথাটা চাপা থাকলো না।

পরদিন বাড়ির সবাই জেনে গেলো ব্যাপারটা।

মন্তুর বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে মকবুল।

কথাটা আমেনা আর ফাতেমার কাছ থেকে শুনেছে সবাই।

মন্তু রীতিমত অবাক হলো।

সালেহা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললো, ইতা কেমন কথা অ্যাঁ। মাইনষে হুনলে কইবো কি?

ফকিরের মা বললো, মকবুল মিয়ার এইডা উচিত অয় নাই। যাই কও মিয়া, এইডা উঠিত অয় নাই।

আমেনা আর ফাতেমা দু'জনে মিলে গনু মোল্লার কাছে কাঁদাকাঁটি করেছে। বলেছে, মাইনষে হাসাহাসি কইরবো। আপনে ওনারে বাধা দ্যান। আপনের কথা ওনি হুনবেন। সুরত আর আবুলকে ডেকে ওদের সঙ্গে আলাপ করলো গনু মোল্লা। বললো, বাড়ির বদনাম অইয়া যাইবো।

শুনে সুরত আলী আর আবুল দু'জনে ক্ষেপে উঠলো। এইসব কি অ্যাঁ। বুড়ার কি ভীমরতি অইছে নাহি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল বললো, বুড়ো বয়সে এইসব কি পাগলামি শুরু অইছে।

কিছু বললো না শুধু মন্তু।

রাতে গনু মোল্লার ঘরে জমায়েত হলো সবাই।

রশীদ এলো। আবুল এলো। সুরত আলী, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা, ফকিরের মা সবাই এলো।

এলো না শুধু মন্তু, টুনি, আর যাকে নিয়ে বসা সেই বুড়ো মকবুল।

মকবুল তার ঘরের মধ্যে নীরবে বসে রইলো।

সব কিছু সেও শুনেছে।

গনু মোল্লার ঘরে ওরা কেন জমায়েত হয়েছে সব বুঝতে পেরেছে সে।

এর মূলে আমেনা আর ফাতেমা। ওর দুই স্ত্রী। যাদের এতদিন খাইয়েছে পরিয়েছে সে।

নিমকহারাম, এক নম্বরের নিমকহারাম। চাপা আক্রোশে গর্জাতে লাগলো বুড়ো মকবুল।

টুনি বললো, ওগো হিংসা অইতাছে। ওরা চায় না আপনে সম্পত্তির মালিক হন।

টুনি ঠিক বলেছে, বাড়ির কেউ চায় না ও আম্বিয়াকে বিয়ে করুক।

বিয়ে করলে একদিনে অনেকগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বুড়ো মকবুল। বাড়ির কেউ সেটা সহ্য করতে পারছে না।

এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে ওর হাতে তুলে দিলো টুনি। বললো, মাথা গরম কইরেন না। এই সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখন লাগে।

গনু মোল্লার ঘরে সবাই জমায়েত হলেও মকবুলকে সেখানে ডেকে আনার জন্যে যেতে কেউ সাহস করলো না। আবুল বললো, সুরতকে যেতে।

সুরত বললো, ফকিরের মার কথা। ফকিরের মা ভয়ে আঁতকে উঠে বললো, ওরে বাবা আমি যাইবার পারমু না।

অবশেষে গনু মোল্লাকে আসতে হলো।

উঠান থেকে মকবুলের নাম ধরে ডাকলো সে।

মকবুল বেরুলো না। বেরিয়ে এলো টুনি ।

একটু পরে ভেতরে এসে টুনি বললো, আপনারে যাইতে কয়।

গনু মোল্লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুড়ো মকবুল বললো, ক্যান, ক্যান, যাইতে কয়।

টুনি বললো, কি কথা আছে।

মকবুল বললো, কথা এখানে আইসা কইতে পারে না। আমি যামু ক্যান? টুনি ওকে শান্ত করলো। বললো, মাথা গরম কইরেন না, যান না, ওরা কি কয় শুনেন গিয়া।

স্ত্রীর মুখের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকালো বুড়ো মকবুল।

তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়ালো সে।

বুড়ো মকবুলকে গনু মোল্লার ঘরে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসলো সবাই।

কারো মুখে কথা নেই।

টুনি এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো মকবুলের পাশে।

গনু মোল্লা তার নামাজের চৌকিটার উপরে বসলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই চুপ।

কেউ কিছু বলছে না।

কথাটা কি দিয়ে যে শুরু করবে ভেবে উঠতে পারছে না কেউ।

টুনিই প্রথম কথা বললো, কই আপনেরা কিছু কইতেছেন না ক্যান। ক্যান ডাকছেন, কন না।

সুরত আলী নড়েচড়ে বসলো।

আমেনা নীরব।

ফাতেমা মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গনু মোল্লা বললো, মন্তুর বিয়ার ব্যাপারে কি অইছে। কথাটা বলে মকবুলের দিকে তাকালো সে।

বুড়ো মকবুল কোন জবাব দেবার আগেই টুনি বললো, মন্তু কইছে ও আম্বিয়াকে বিয়া করবো না।

ওর কথা শুনে পরস্পর মুখের দিকে তাকালো সবাই।

ফকিরের মা বললো, কই মন্তু মিয়া কই, তারে ডাহ না।

কিন্তু মন্তুকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেলো না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সে। টুনি বললো, ডাহন লাগবো না ওরে, ও আমারে কইছে বিয়া কইরবো না।

আবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, তাইলে আমি বিয়া করুম আম্বিয়ারে।

আমার ঘরে বউ নাই খানাপিনার অসুবিধা অয়।

ওর কথা সম্পূর্ণ না হতেই আমেনা আর ফাতেমা একসঙ্গে বলে উঠলো, হু তোমার একটা বউ দরকার।

বুড়ো মকবুল টুনির দিকে তাকালো।

টুনি বললো, ক্যান, ধইরা ধইরা মাইরা কবরে পাঠাইবার লাইগা নাহি।

আবুল রেগে উঠলো, আমার বউ যদি আমি মারি তোমার তাতে কি?

চুপ কর বেয়াদপ, হঠাৎ গর্জে উঠলো মকবুল। এই জিন্দেগিতে আর তোরে বিয়া করামু না আমরা। তিন তিনটা মাইয়ারে তুই কবরে পাঠাইছস। আবার বিয়ার নাম করছে, শরমও লাগে না। একটুখানি দম নিয়ে বুড়ো পরক্ষণে বললো, আম্বিয়ারে আমি বিয়া করমু ঠিক করছি। বলে টুনির দিকে তাকালো সে।

আমেনা আর ফাতেমা পরমুহূর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, আপনেরা শুনছেন, শুনছেন আপনেরা ইতা কিতা কইবার লাগছে উনি।

যা কইছি ঠিক কইছি। আঙ্গুল তুলে ওদের দুইজনকে শাসালো মকবুল। তোমাগো যদি ভালো না লাগে তোমরা বাড়ি ছাইরা চইলা যাও।

শুনছেন, শুনছেন আপনেরা। কি কয় শুনছেন। আমেনা কেঁদে ফেললো। গনু মোল্লা বললো, এইডা ঠিক অইলো না মকবুল মিয়া।

এইডা কোন কামের কথা অইলো না। এই বুড়ো বয়সে আরেকডা বিয়া কইরলে মাইনষে কি কইবো।

সুরত আলী আর ফকিরের মা বললো, মাইনষে বাড়ির বদনাম করবো।

আমেনা বললো, মাইয়া বিয়া দিছে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছি ছি কইরবো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কটমট চোখে আমেনার দিকে তাকালো মকবুল।

ফাতেমা বললো, বুড়ো বয়সে ভূতে পাইছে।

'নিমকহারাম' বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো বুড়ো মকবুল। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো সে। ঘরের মাঝখানে, এতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ আমেনা আর ফাতেমা দু'জনকে এক সঙ্গে তালাক দিয়ে দিলো সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, তোরা বাইরইয়া যা আমার বাড়ি থাইকা।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে চমকে উঠল।

পরক্ষণে একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আমেনা।

ফাতেমা মূর্ছা গেলো।

ফকিরের মা চিৎকার করে উঠলো, আহারে পোড়াকপাইল্যা এই কি কইরলি তুই, ওরে পোড়াকপাইল্যারে এই কি কইরলি।

আবুল হঠাৎ বসার পিঁড়িটা হাতে তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলো মকবুলের কপাল লক্ষ্য করে। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ অ্যাঁ। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ, বেআকেইল্যা কোনহানের।

দু'হাতে কপাল চেপে মাটিতে বসে পড়লো বুড়ো মকবুল। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকির মত রক্ত ঝরছে ওর।

কান্না, চিৎকার গালাগালি আর হা-হুতাশে সমস্ত ঘরটা মুহূর্তে নরকের রূপ নিলো।

মকবুলকে দু'হাতে কাছে টেনে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো টুনি।

ফাতেমার মাথায় পানি ঢালতে লাগলো সালেহা।

ফকিরের মা আমেনাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেললো।

উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনলো মন্তু। সব দেখলো সে।

কিন্তু কাউকে কিছু বললো না। নীরবে পরীর দীঘির দিকে চলে গেলো সে।

পরদিন বিকেলে খবর পেয়ে আমেনা আর ফাতেমার বাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে গেল ওদের। যাবার সময় করুণ বিলাপে পুরো গ্রামটাকে সচকিত করে গেলো ওরা। এতদিনের গড়ে তোলা সংসার এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। ঘরের পেছনে লাগানো লাউ কুমড়োর মাচাগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমেনা। যাবার সময় ফকিরের মাকে কেঁদে কেঁদে বলে গেলো, হীরনকে খবরডা দিয়ো না। শুইনলে মাইয়া আমার বুক ভাসাইয়া মইরা যাইব। খোদার কসম রইলো, বুয়া, মাইয়ারে আমার খবরডা দিয়ো না।

ফাতেমাকে নেয়ার জন্য ভাই এসেছিলো ওর। যাবার সময় বাড়ির সবাইকে শাসিয়ে গেছে ও। বলে গেছে শিকদার-বাড়ির লোকগুলোকে একহাত দেখে নেবে সে। বোনের জন্য চিন্তা করে না ও। আগামী তিন মাসের মধ্যে এর চেয়ে দশগুণ ভাল ঘর দেখে ফাতেমার বিয়ে দিয়ে দিবে।

মকবুল বিছানায়। মাথায় ওর একটা পট্টি বেঁধে দিয়েছে টুনি। হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে বুড়োর। মাঝে দু'একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলো এখন নীরবে ঘুমুচ্ছে। টুনি পাশে বসে বাতাস করছে ওকে। রাতে গনু মোল্লা এলো ওর ঘরে। বুড়ো মকবুলের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে ওর জ্বর আছে কিনা দেখলো। তারপর আস্তে কইরা বললো, রাগের মাথায় ইতা কিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কইরলা মিয়া। শরীর ভালা অইয়া গেলে ভাবীসাবগোরে বাড়ি নিয়া আহ। রাগের মাথায় তালাক দিলে তো আর তালাক অয় না। ওই তালাক অয় নাই তোমার।

এক বাটি বার্লি হাতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো টুনি। ওকে আসতে দেখে গনু মোল্লা চুপ করে গেলো।

টুনির উপরে আক্রোশ পড়েছে সবার। সবাই বুঝতে পেরেছে, এই যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে এর জন্যে টুনিই দায়ী।

উঠোনে দাঁড়িয়ে অনেকে অনেক কথা বললো। ওর নাম ধরে অনেক গালাগাল আর অভিশাপ দিলো বাড়ির ছেলেমেয়েরা।

টুনি নির্বিকার। একটি কথারও জবাব দিলো না।

দিন কয়েক পরে আম্বিয়ার চাচা ছমির শেখ জানিয়ে গেলো বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করবে না আম্বিয়া। তাছাড়া খুব শীঘ্রি আম্বিয়ার বিয়ের সম্ভাবনাও নেই।

কথাটা শুনলো বুড়ো মকবুল। শুনে কোন ভাবান্তর হলো না। ঘরের কড়ি-কাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। ইদানীং দিনরাত মকবুলের সেবা শুশ্রূষা করছে টুনি। সারাক্ষণ ও ওর আশেপাশে থাকে। একটু অবকাশ পেলে রসুই ঘরে গিয়ে রান্নাবান্নার পাটটা সেরে আসে সে। মরিচ ক্ষেত আর লাউ কুমড়োর গাছগুলোর তদারক করে আসে। মাঝে মাঝে ফকিরের মা আর সালেহার আলাপ শুনে টুনি। মন্তু আর আম্বিয়াকে নিয়ে আলাপ করে ওরা। আজকাল নাকি অনেক রাত পর্যন্ত আম্বিয়াদের বাড়িতে থাকে মন্তু। টুনি শুনে। কিছুই বলে না। একদিন বিকেলে মন্তু যখন বাইরে বেরুবে তখন তার সামনে এসে দাঁড়াল টুনি। বললো, জ্বরডা ওর ভীষণ বাইড়া গেছে। কবিরাজের কাছ থাইকা একটু ওষুধ আইনা দিবা?

ওর মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মন্তু। ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি। হঠাৎ বয়সটা যেন অনেক বেড়ে গেছে ওর। চোখের নিচে কালি পড়েছে। চুলগুলো শুকনো।

মন্তু ইতস্তত করছিলো।

টুনি আবার বললো, আজকা না হয় মাঝি বাড়ি নাই গেলা। একটু ওষুধটা আইনা দাও।

ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো ম্লান হাসি।

মন্তু বললো, মাঝি বাড়ি না গেলে তুমি খুশি অও?

টুনি পরক্ষণে শুধালো, আমার খুশি দিয়া তুমি কইরবা কি?

মন্তু কি জবাব দেবে ভেবে পেলো না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বললো, যাইবা না ক্যান, একশো বার যাইবা।

পুরুষ মানুষ তুমি, কতদিন একা একা থাইকবা। ঘর থেকে বুড়ো মকবুলের ডাক শুনে আর এখানে দাঁড়ালো না টুনি। পরক্ষণে চলে গেলো সে।

ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মন্তু। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

রাতে কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো মন্তু। বর্ষা এগিয়ে আসছে। আম্বিয়া বলেছে নৌকোটা ঠিক করে নেবার জন্য। চাচা ছমির শেখ চেয়েছিলো নৌকোটা নিজে বাইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আম্বিয়া রাজী হয়নি। মন্তু ছাড়া অন্য কাউকে ওতে হাত দেবার অধিকার দিতে রাজী নয় সে।

ছমির শেখ রেগে গালাগাল দিয়েছে ওকে। মন্তু সম্পর্কে কতগুলো অশ্লীল মন্তব্য করে বলেছে, ওর সঙ্গে তোমার মিলামিশা কিন্তুক ভালো অইতাছে না আম্বিয়া। গেরামের লোকজনে পাঁচ রকম কথাবার্তা কইতাছে।

কউক। তাগো কথায় আমার কিছু আইবো যাইবো না। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে আম্বিয়া।

ওর স্পষ্ট উত্তরে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়েছে ছমির শেখ। বলেছে, তোমার কিছু আহে না আহে, আমাগো আহে। মন্তুরে কিন্তুক এই বাড়িতে আইতে নিষেধ কইরা দিও বইলা দিলাম।

তবু বারবার মন্তুকে বাড়িতে ডেকেছে আম্বিয়া।

ও গেলে সংসারের নানা কথা নিয়ে আলাপ করেছে ওর সঙ্গে।

আজও মন্তুর জন্যে অপেক্ষা করছিলো আম্বিয়া। চুলে তেল দিয়ে সুন্দর করে চুলটা আঁচড়েছে সে। সিঁথি কেটেছে। পান খেয়ে ঠোঁট জোড়া লাল টুকটুকে করে তুলেছে।

ও আসতে একখানা পিঁড়ি এগিয়ে দিলো আম্বিয়া।

অর্ধেকটা মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সলজ্জ হাসির ঈষৎ আভাটা চোখে পড়েও যেন পড়তে চায় না।

আম্বিয়া বললো, এত দেরি অইলো?

মন্তু বললো, কবিরাজের কাছে গিছলাম।

কেন গিয়েছিলো তা নিয়ে আর প্রশ্ন করেনা আম্বিয়া।

দূরে নিজ ঘরের দাওয়ায় বসে আড়চোখে বার বার এদিকে তাকায় ছমির শেখ আর বিড়বিড় করে কি যেন সব বলে।

রাতে ওখানে খেলো মন্তু।

পানটা মুখে পুরে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

বাইরে তখন ইলশেগুঁড়ি ঝড়ছে।

ক'দিন পর পর বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার উপর দিয়ে পানি গড়াচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে।

পানির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট বেলে আর পুঁটি ছুটোছুটি করছিলো এদিকে সেদিকে।

অন্ধকারের ভেতর মকু আর ছকু দু'ভাই মাছ ধরছিলো বসে বসে।

মন্তুকে দেখে বললো, কি মিয়া এত রাইতে কোন্ দিক থাইকা?

মাঝি বাড়ি।

হুঁ। একটা পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু বললো, চইলা যাও ক্যান মন্তু মিয়া। তামুক খাইয়া যাও।

না মিয়া শরীরডা ভালা নাই।

মন্তু যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে মকু বললো, আরে মিয়া যাইবা আর কি, বও। কথা আছে।

কি কথা কও। জলদি কও। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে মাটিতে বসলো মন্তু। নিঝুম রাত। শুধু একটানা জল গড়ানোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'একটা ব্যাঙ ডাকছে এখানে ওখানে। আরো তিন চারটে পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু আস্তে বললো, কি মন্তু মিয়া তুমি নাহি করিমনের বইন আম্বিয়ারে বিয়া কইরতাছ হুনলাম। বলে অন্ধকারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসলো সে।

তামাক খেতে খেতে ওর দিকে তাকাল মন্তু। কিছু বললো না।

মকু বললো, ভালো মাইয়ার উপর তোমার চোখ পইড়ছে মন্তু মিয়া।

তোমার পছন্দের তারিফ করন লাগে। অমন মাইয়া এই দুই চাইর গেরামে নাই। আহা সারা গায়ে যেন যৈবন ঢল ঢল করতাছে।

কি মন্তু মিয়া চুপ কইরা রইলা যে? ওকে কনুইয়ের একটা গুঁতো মারলো ছকু। বিয়া শাদি করবার আগে আমাগোরে একটু জানাইয়ো, একটু দাওয়াত টাওয়াত কইরো।

করমু। করমু। আগে বিয়া ঠিক হোক তারপর করমু। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো সে।

দাওয়ার পাশে টুনি দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে হঠাৎ চেনা যায় না।

মন্তুর পায়ের গতিটা শ্লথ হয়ে এলো।

উঠোনে সালেহা আর ফকিরের মা বসে। মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ে নিয়ে রসালো আলোচনা করছে ওরা।

আম্বিয়ার চাচা আজ বলেছে, সামনের শুক্রবারে জুমার নামাজের পর গাঁয়ের মাতবরদের কাছে কথাটা তুলবে সে। বিচার চাইবে। এই যে রাত বিরাতে আম্বিয়ার সঙ্গে মন্তুর এত অন্তরঙ্গ মেলামেশা এ শুধু সামাজিক অন্যায় নয়। অধর্মও বটে।

তাই নিয়ে মসজিদে বিচার বসাবে আম্বিয়ার চাচা।

ফকিরের মা বললো, আমি কিন্তুক একটা কথা কইয়া দিলাম বউ। এই মাইয়া একেবারে অলুক্ষুইণ। যেই ঘরে যাইবো সব পুড়াইয়া ছাই কইরা দিবো।

সালেহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ঠিক কইছ চাচি।

কথাটা বলতে গিয়ে আমেনা আর ফাতেমার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। আম্বিয়ার জন্যেই তো ওদের তালাক দিয়েছে বুড়ো মকবুল।

নিজেও পড়েছে মরণ রোগে।

উঠোনে এসে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো মন্তু।

সালেহা আর ফকিরের মা কথা থামিয়ে তাকালো ওর দিকে।

টুনি কিছু বললো না। একটু নড়লো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

মন্তু ওর দিকে গিয়ে দরজা এঁটে দিলো।

কাল ভোরে আবার বেরুতে হবে ওকে।

অবশেষে মকবুল মারা গেলো।

ধলপহর দেবার অনেক আগে যখন সারা গ্রাম ঘুমে অচেতন তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো সে।

সারা রাত কেউ ঘুমালো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গনু মোল্লা, আবুল, রশীদ, সালেহা, মন্তু, টুনি সবাই জেগে রইল মাথার পাশে। সন্ধেবেলা ফকিরের মা বলছিলো লক্ষণ বড় ভালা না।

তোমরা কেউ ঘুমায়ো না মিয়ারা, জাইগা থাইকো।

বহুলোককে হাতের উপর দিয়ে মরতে দেখেছে ফকিরের মা। তাই রোগীর চেহারা আর তার ভাবভঙ্গী দেখে সে অনেকটা আন্দাজ করতে পারে।

সারা রাত প্রলাপ বকেছে বুড়ো মকবুল।

কখনো আমেনার নাম ধরে ডেকেছে সে। কখনো ফাতেমার জন্যে উতলা হয়ে উঠছে। আবার কখনো প্রলাপের ঘোরে গরু তাড়িয়েছে। হুঁ হট-হট। আরে মরার গরু চলে না ক্যান। হুঁ হট-হট।

মাথার কাছে বসে সারাক্ষণ কোরান শরীফ পড়লো গনু মোল্লা।

তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো বুড়ো মকবুল। প্রলাপ বন্ধ হলো।

একটু পরে মারা গেলো সে।

ওর বুকের উপর পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো টুনি।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সে।

তার বিলাপের শব্দ অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে দূরে পরীর দীঘির পাড়ে মিলিয়ে গেলো।

বিস্ময়ভরা চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু।

পরদিন দুপুরে বুড়ো মকবুলের মৃতদেহটা যখন কাফনে আবৃত করে খাটিয়ার ওপর তোলা হলো তখন বুক ফাটা আর্তনাদ করে উঠোনের মাঝখানে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত তড়পাতে লাগলো টুনি। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নানা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো ওকে। সালেহা, ফকিরের মা, সুরতের বউ ওরাও অনেক কান্নাকাটি করলো অনেকক্ষণ ধরে।

পরীর দীঘির পাড়ে বুড়ো মকবুলকে কবর দিয়ে আসার পর সবার মনে হলো বাড়িটা যেন কেমন শূন্য হয়ে গেছে। একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে গাছের পাতায়। ঘরের চালে। উঠোনে। বাড়ির পেছনে। ছোট্ট পুকুরে আর সবার মনে। একটি লোক দীর্ঘদিন ধরে একবারও ঘরের দাওয়ায় বেরুতে পারেনি, বিছানায় পড়েছিলো। যার অস্তিত্ব ছিলো কি ছিলো না সহসা অনুভব করা যেত না, সে লোকটা আজ নেই। কিন্তু তার এই না থাকাই যেন সমস্ত থাকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে।

সারা দুপুর টুনি কাঁদলো।

সারা বিকাল।

সারা সন্ধ্যা।

সালেহা অনেক চেষ্টা করলো ওকে কিছু খাওয়াতে। সে খেল না।

ফকিরের মা বললো, কিছু খাও বউ। না খাইলে শরীর খারাপ অইয়া যাইবো।

কিছু খাও।

তবু খেল না টুনি।

মন্তু, সুরত আলী, আবুল, কারো মুখে কোন কথা নেই। কেউ দাওয়ায়, কেউ উঠোনে, কেউ দোরগোড়ায় বসে।

আজ সহসা যেন সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলেছ ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিয়াবাড়ির মসজিদ থেকে আযানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে গামছাটা কাঁধে চড়িয়ে নামাজ পড়তে গেলো গনু মোল্লা। সুরত আলী, রশীদ আর আবুলও উঠে দাঁড়ালো।

রোজ যে তারা নামাজ পড়ে তা নয়। কিন্তু আজ পড়বে। বুড়ো মকবুলের মৃত্যু হঠাৎ পরকাল সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে ওদের।

পুকুর থেকে অজু করে এসে সুরত আলী বললো, কই যাইবা না মন্তু মিয়া?

মন্তু তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তারপর বললো, চলো।

বলতে গিয়ে গলাটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠলো ওর।

দিন তিনেক পর নৌকো নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো মন্তু।

টুনি ডাকলো, শোন।

মন্তু তাকিয়ে দেখলো এ কয়দিনে ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি।

চোয়ালের হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে তার। মুখখানা বিষণ্ন। মাথায় ছোট একটা ঘোমটা।

মন্তু বললো, কি।

টুনি চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে করে বললো, আমার একটা কথা রাইখবা?

মন্তু বললো, কও।

মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো টুনি। তারপর আস্তে করে বললো, আমারে একদিন সময় কইরা আমাগো বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া আইবা? টুনির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে।

বুড়ো মকবুল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির সাথে সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে টুনির। আর কতদিন এখানে এমনি করে পড়ে থাকবে সে।

মন্তু আস্তে করে বললো, ঠিক আছে যামুনি। কোন্ দিন যাইবা?

টুনি মৃদু গলায় বললো, যেই দিন তোমার সুবিধা হয়। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো সে।

মন্তু বিব্রত বোধ করলো। কি বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেলো না সে।

টুনি একটু পরে কান্না থামিয়ে বললো, বড় ইচ্ছা আছিল তোমার বিয়া দেইখা যামু, তোমার হাতে মেন্দি পরায়া দিমু। থাকন গেলো না।

এ কথার আর উত্তর দিলো না মন্তু। গাঁয়ের সবাই জানে সামনের শীতে আম্বিয়াকে বিয়ে করছে ও। টুনিও জানে।

কাপড়ের আঁচলে চোখের পানি মুছে টুনি আবার বললো, বিয়ার সময় আমারে নাইয়র আনবা না?

নিস্তেজ গলায় মন্তু পরক্ষণে বললো, আনমু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহসা ওর চোখের দিকে মুখ তুলে তাকালো টুনি। এক টুকরো ম্লান হাসিতে ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠলো ওর। আস্তে করে বললো, কথা দিলা মনে থাহে যেন।

মন্তু বললো, থাকবো।

একে একে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিল টুনি।

সবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদলো সে।

পরীর দীঘির পাড়ের উপর দিয়া আসার সময় দূর থেকে বুড়ো মকবুলের কবরটা চোখে পড়লো। শুকনো মাটির সাদা ঢেলাগুলো ঢিপির মত উঁচু হয়ে আছে। সেদিকে তাকাতে সারা দেহে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কি এক অজানা ভয়ে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে যেন।

ভাটার স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে দিলো মন্তু।

সেই নৌকো।

যার মধ্যে চড়িয়ে টুনিকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলো সে। দু'ধারে গ্রাম। মাঝখানে নদী। যতদূর চোখে পড়ে শুধু অথৈ জলের ঢেউ। বর্ষার পানিতে নদী নালা ক্ষেত সব এক হয়ে গেছে। এ সময়ে ভরা নদী দিয়ে নৌকো চালানোর প্রয়োজন হয় না। ক্ষেতের ধারে গেরস্থ বাড়ির পেছনের ডোবার পাশ দিয়ে নৌকো চালিয়ে নেয়া যায়। এতে করে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।

টুনি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে রইলো। মাথায় ছোট একখানা ঘোমটা।

মন্তু সহসা বললো, বাইরে আইসা বসো না। গায়ে বাতাস লাইগবো।

টুনি পরক্ষণে বললো, আইতাছি। কিন্তু সহসা এলো না সে।

এলো অনেকক্ষণ পরে।

বাইরে কাঠের পাটাতনের উপরে ছোট হয়ে বসলো টুনি।

সেই নদী।

পুরনো নদী।

আগে যেমনটি ছিলো তেমনি আছে।

আজ নদীর জলে হাতের পাতা ডুবিয়ে খেলা করলো না টুনি।

উচ্ছল দৃষ্টি মেলে তাকালো না কোন দিকে।

শুধু বললো, আম্বিয়ারে বিয়া কইরলে এই নাওডা তোমার অইয়া যাইবো না?

মন্তু সংক্ষেপে বললো, হুঁ।

টুনি বললো, বিয়ার পরে এই বাড়িতে থাইকবা, না আম্বিয়াগো বাড়ি চইলা যাইবা?

এ কথার কোন জবাব দিলো না মন্তু। সে শুধু দেখলো, ঘোমটার ফাঁকে এক জোড়া চোখ গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

উত্তর না পেয়ে টুনি আবার বললো, চুপ কইরা রইলা যে?

মন্তু হঠাৎ দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো, শান্তির হাট।

টুনি চমকে তাকালো সেদিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাটার স্রোত ঠেলে নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে শান্তির হাটের দিকে। সার বাঁধা দোকানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

সহসা জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগলো মন্তু। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো নৌকো। পড়তে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলো টুনি। মাথার উপর থেকে ঘোমটাটা পরে যেতে পরক্ষণে সেটা তুলে নিলো আবার।

মন্তু এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গভীরভাবে কি যেন দেখছে সে।

নৌকোটাকে ঘাটের দিকে এগোতে দেখে টুনি বললো, ঘাটে ভিড়াইতাছ ক্যান, নামবা নাকি?

মন্তু চুপ করে রইলো।

টুনি আবার বললো, হাটে কি কোন কাম আছে?

মন্তু মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ মরিয়া গলায় বললো, মনোয়ার হাজীরে কথা দিছিলাম ওর ওইখানে এক রাইতের লাইগা নাইয়র থাকমু। চল যাই।

টুনির দেহটা ধরে কে যেন একটা সজোরে নাড়া দিল। মুহূর্তে চোখজোড়া পাথরে মত স্থির হয়ে গেলো ওর। মন্তুর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে।

মন্তু আবার বললো, মনোয়ার হাজীরে কইলে ও মোল্লা ডাইকা সব ঠিক কইরা দিবো।

আবেগে গলাটা কাঁপছে ওর।

টুনির চোখের কোণে তখনও দু'ফোটা জল চিকচিক করছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়লো সে। আর অতি চাপা স্বরে ফিসফিস করে বললো, না, তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না। বলতে গিয়া ডুকরে কেঁদে উঠলো সে। হাতের বৈঠাটা ছেড়ে দিয়ে বোবা চাউনি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু। একটা কথাও আর মুখ দিয়ে বেরুলো না ওর।

তারপর।

তারপর নদীর স্রোত বয়ে চললো। কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে।

সেদিন হাটবার। সওদা করে বাড়ি ফিরছে মন্তু। দু'পয়সার পান।

এক আনার তামাক। আর দশ পয়সার বাতাসা।

কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের শুরু। ঘরে ঘরে ধান উঠেছে। অনেক রাত পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম থাকে না। কাজ আর কাজ। সারাদিন ধান কেটে এনে পারা দিয়ে রাখে। রাতে গরু দিয়ে মাড়ায়। তারপর ঝেড়ে মুছে সব পরিষ্কার করে রাখতে রাখতে রাত অনেক গড়িয়ে পড়ে।

হাট থেকে বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখে, উঠোনে আসর জমিয়ে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত আলীর বড় ছেলেটা। মৃত বাবার এ গুণটি অতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছে সে। দূর থেকে শুনলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। মনে হয় সুরত আলী বুঝি বসে বসে পুঁথি পড়ছে।

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন।

ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওদের সবার কথা মনে পড়লো মন্তুর।

বুড়ো মকবুল, রশীদ, আবুল, সুরত আলী।

কেউ নেই।

জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা।

টুনির সঙ্গে দেখা হয় নি অনেক বছর।

প্রথম প্রথম খোঁজ খবর নিতো। আজকাল সে সময় হয়ে ওঠে না মন্তুর। সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে।

হীরন আজকাল বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। বহু আগে স্বামী তালাক দিয়েছে ওকে। আবার বিয়ে হয়েছিলো। বছর তিন চারেক ঘর-সংসার করার পর সেখান থেকেও তালাক পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তারপর আর বিয়ে হয়নি।

এবার ওর একটা ভালো দেখে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মন্তু। এখন সে বাড়ির কর্তা। সবার বড়ো। যে-কোন কাজে সবাই এসে পরামর্শ নেয় ওর।

উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওর হাত থেকে পাঁপ, তামাক আর বাতাসাগুলো এগিয়ে নিলো আম্বিয়া। তারপর কোলের বাচ্চাটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, দুপুর থাইকা কানছে একটু কোলে নাও।

কোলে নিয়ে ছেলেকে আদর করলো সে।

মন্তুকে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে আসরের মাঝখানে বসালো ওকে। এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে ওর হাতে দিয়ে গেলো আম্বিয়া। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগলো। চাঁদ হেলে পড়লো পশ্চিমে।

উঠোনের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। পরীর দীঘির পাড়ে রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেলো। সুরত আলীর ছেলেটা তখনো একটানা পুঁথি পড়ে গেলো।

কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।

দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।

আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী

দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকুলের পরী।

সুর করে ঢুলে ঢুলে এক মনে পুঁথি পড়ছে সে। রাত বাড়ছে। হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেক ফাল্গুন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত দুপুরে সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন বৃটিশ মেরিনের সেপাহীরা এসে ছাউনি ফেলেছিলো এখানে। শহরের এ অংশটার তখন বসতি ছিলো না। ছিলো, সার সার উর্ধ্বমুখী গাছের ঘন অরণ্য। দিনের বেলা কাঠুরের দল এসে কাঠ কাটতো আর রাতে হিংস্র পশুরা চড়ে বেড়াতো। শহরে তখন গভীর উত্তেজনা। লালবাগে সেপাহীরা যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহ করবে। যে ক'টি ইংরেজ পরিবার ছিলো, তারা সভয়ে আশ্রয় নিলো বুড়িগঙ্গার ওপর গ্রিনবোটে।

খবর পেয়ে যথাসময়ে বৃটিশ মেরিনের সৈন্যরা এসে পৌঁছেছিলো আর শহরের এ অংশটা দখল করে তাঁবু ফেলেছিলো এখানে। সে থেকে এর নাম হয়েছিলো, আণ্ডার গোরা ময়দান। লোকে বলতো, আণ্ডা গোরার ময়দান। শেষরাতে লালবাগের নিরস্ত্র সেপাহীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিলো তারা। মানুষের রক্তে লালবাগের মাটি লাল হয়ে ওঠে। কিছু সেপাহী মার্চ করে পালিয়ে যায় ময়মনসিংহের দিকে। যারা ধরা পড়ে তাদের ফাঁসি দেয়া হয় আণ্ডা গোরার ময়দানে। মৃতদেহগুলোকে ঝুলিয়ে রাখা হয় গাছের ডালে ডালে।

লোকে দেখুক। দেশদ্রোহীতার শাস্তি কত নির্মম হতে পারে, স্বচক্ষে দেখুক নেটিভরা।

এসব ঘটেছিলো একশো বছর আগে। আঠারশো সাতান্ন সালে।

আণ্ডা গোরার ময়দান এখনো আছে। শুধু নাম পালটেছে তার। লোকে বলে, ভিকটোরিয়া পার্ক।

সে অরণ্য আজ নেই। সমাঝে একটা প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিলো। সে ঝড়ে কি আশ্চর্য, গাছের-ডালগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেলো, আর গুঁড়িশুদ্ধ গাছগুলো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। লোকে বলতো, গাছেরো প্রাণ আছে। পাপ সইবে কেন?

তারপর থেকে আবাদ শুরু হলো এখানে।

ঘর উঠলো। বাড়ি উঠলো। রাস্তা ঘাট তৈরি হলো। আর মহারানীর নামে গড়া হলো একটা পার্ক।

আগে জনসভা হতো এখানে। এখন হয় না। শুধু বিকেলে ছেলে বুড়োরা এসে ভিড় জমায়। ছেলেরা দৌড়ঝাঁপ দেয়। বুড়োরা শুয়ে-বসে বিশ্রাম নেয়, চিনে বাদামের খোসা ছড়ায়।

এ হলো গ্রীষ্মে অথবা বসন্তে। শীতের মরশুমে লোক খুব কম আসে, সন্ধ্যার পরে কেউ থাকে না।

এবারে শীত পড়েছিলো একটু বিদঘুটে ধরনের।

দিনে ভয়ানক গরম। রাতে কনকনে শীত।

সকালে কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিলো পুরো আকাশটা। আকাশের অনেক নিচু দিয়ে মন্থর গতিতে ভেসে চলেছিলো এক টুকরা মেঘ। উত্তর থেকে দক্ষিণে। রঙ তার অনেকটা জমাট কুয়াশার মত দেখতে।

ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে ঠিক সেই মেঘের মত একটি ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখা গেলো নবাবপুরের দিকে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পরনে তার একটা সদ্য ধোয়ান সাদা শার্ট। সাদা প্যান্ট। পা জোড়া খালি। জুতো নেই। রাস্তার দু'পাশে দোকানীরা পসরা নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসেছে। টাউন সার্ভিসের বাসগুলো চলতে শুরু করেছে সবে। ভিড় বাড়ছে। কর্মচঞ্চল লোকেরা গন্তব্যের দিকে ছুটছে রাস্তার দু'ধার ঘেঁষে। কিন্তু ওদের সঙ্গে এ ছেলেটির একটা আশ্চর্য অসামঞ্জস্য প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। সব আছে তার। ধবধবে জামা। প্যান্ট। পকেটে কলম। কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি। হাতে একটা খাতা। মুখের দিকে তাকালে, ভদ্রলোকের সন্তান বলে মনে হয়। কিন্তু, পায়ে জুতো নেই কেন ওর? জুতো অবশ্য এ দেশের অনেকেই পরে না। পরে না, পরবার সমর্থ নেই বলে আর সামর্থ যে নেই ওদের জীর্ণ মলিন পোষাকের দিকে তাকালে বোঝা যায়। এ ছেলেটির পোষাকে কোন দৈন্য নেই। বরং আভিজাত্যের চমক আছে। তবে, এ পোষাক পরে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে কেন সে?

এ দৃশ্য যাদের চোখে পড়লো, তারা একটু অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে। তাদের চোখে হঠাৎ জাগা বিস্ময়। মনে ক্ষণিক প্রশ্ন। ছেলেটির মাথায় কোন ছিট নেই তো! পাগল নয় তো ছেলেটা?

কেউ কেউ তাকে নিয়ে ইতস্তত মন্তব্য করলো। আরে না না, পাগল না। ছেলেটার বোধ হয় কেউ মারা গেছে। তাই শোক করছে খালি পায়ে হেঁটে।

কেউ বললো, কে জানে এটা একটা ফ্যাশনও হতে পারে। আজকাল কত রকমের ফ্যাশন যে দেখি।

কেউ বললো, মহররমের তো এখনো অনেক দেরি, তাই না?

ছেলেটা তখনো হেঁটে চলেছে আপন মনে। মাঝে মাঝে সন্ধানী দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে সে। কি যেন তালাশ করছে। কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চঞ্চল দুটো চোখ। আর যখন কোন লোকের দিকে তাকাচ্ছে সে, তখন তার মুখের দিকে না তাকিয়ে তার পায়ের দিকে দেখছে আগে।

এমনি করে যখন বংশালের মোড় পেরিয়ে গেলো সে, তখন একজনের দিকে চোখ পড়তে সারামুখে আনন্দের আবীর ছড়িয়ে গেলো তার। পেছন থেকে সে তাকালো, মুনিম ভাই, এই যে, ওদিকে নয়, এদিকে।

মুনিম পেছন ফিরে তাকালো।

গায়ের রঙ তার রাতের আঁধারের মতো কালো। মসৃণ মুখ। খাড়া নাকের গোড়ায় পুরু ফ্রেমের চশমা। পরনে একটা ধবধবে পায়জামা। পা জোড়া কিন্তু তারও নগ্ন। জুতো নেই।

মুখোমুখি হতে পরস্পরের দিকে স্নেহার্দ্র চোখে তাকালো ওরা। মৃদু হাসলো। হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলো দু'জনে। তারপর পথ চলতে চলতে মুনিম বললো, বাসা থেকে মা বেরুতেই দিচ্ছিলেন না। বুঝলে আসাদ। মায়ের আমার সব সময় ভয়, যদি কিছু ঘটে? আমার অবশ্য এসব বালাই নেই। আসাদ আস্তে করে বললো, মা মরে গিয়ে বোধহয় ভালই হয়েছে। থাকলে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করতো।

বলতে গিয়ে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে।

ঠাটারী বাজার পর্যন্ত সংখ্যায় ওরা দু'জন ছিলো। রেলওয়ে লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে গুলিস্তানের কাছে এসে পৌছতে সে সংখ্যা দু'জন ছাড়িয়ে দশজনে পৌছলো।

ওরা এখন দশজন।

দশজন মার্জিত পোষাক পরা নগ্ন পায়ের যাত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ একজন বললো, একি একসঙ্গে হাঁটছো কেন?

আইনে পড়বে যে, ভাগ হয়ে যাও।

আসাদ চুপ করে ছিলো। সে বললো, জানো আমি যখন একা ছিলাম তখন সত্যি ভীষণ ভয় হচ্ছিলো আমার। এখন অবশ্য আর তা করছে না।

ঠিক বলছো। আমারও তাই। তাকে সমর্থন জানালো আরেকজন।

রমনা পোস্টাফিসটা পেছনে ফেলে ওরা যখন রেলওয়ে হাসপাতালের কাছে এসে পৌঁছেছে তখন একটা পুলিশ বোঝাই লরী এসে আচমকা থামলো ওদের সামনে, একটু দূরে। তিন চারজন পুলিশ লরী থেকে নেমে রাস্তায় টহল দিতে লাগলো। পায়ে কালো রঙ দেয়া চকচকে বুট জুতো। পরনে খাকি পোষাক। মাথায় লোহার টুপি। হাতে একটা করে রাইফেল। পুলিশ দেখে প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো ওরা। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

একটি নীরব মুহূর্ত। তারপর আবার চলতে শুরু করলো।

আসাদ বললো, মনে হচ্ছিলো আমাদের ধরবার জন্যে লরীটা থামিয়েছে ওরা। আমিও তাই ভাবছিলাম। বললো, আরেকজন।

মুনিম কিছু বললো না। পকেট থেকে রুমালটা বের করে নীরবে মুখখানা মুছলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সোজা উত্তরে, তার দু'পাশে আকাশমুখী যে গাছগুলো দাঁড়িয়ে তার নাম দেবদারু। ফাল্গুন আসতে সে গাছের পাতা ঝরতে থাকে। ঝরে অনেকটা ইলশেগুঁড়ির মত। ছোট ছোট সবুজ পাতাগুলো ঝরে পড়ে, রাস্তার ওপর সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দেয়। ভোরের দিকে সেখানে শিশিরের অসংখ্য সোনালি বিন্দু আলতো ছড়িয়ে থাকে।

সেদিনের সেই কুয়াশা ছড়ান ভোরে রাস্তা যখন অনেকটা ফাঁকা আর জনশূন্য তখন তিনটি মেয়েকে এক সারিতে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

তাদের সবার পরনে চওড়া পাড়ের ধবধবে শাড়ি।

প্রথমার চুলগুলো সুন্দর করে বিনুনী করা। মুখে তার চিকেন পক্‌সের গুড়ি গুড়ি দাগ।

দ্বিতীয়ার দৈহিক গড়ন একটু ভারী গোছের। চেহারাটা সুন্দর আর কমনীয়। গায়ের রঙ দুধে আলতা মেশানো।

তৃতীয়ার মেঘ কালো চুল পিঠময় ছড়ান। চোখজোড়া কাটাকাটি আর চিবুকের ওপর একটা মস্ত বড় তিল।

জুতোবিহীন তিনজোড়া পা সমতালে মাটিতে ফেলছিলো তারা আর এগিয়ে আসছিলো নগ্ন পায়ে শিশির মেখে মেখে।

ওরা ছিলো তিনজন।

রানু, বেনু আর নীলা।

রানু বললো, আপা, কেমন লাগছে রে?

নীলা মুখ তুলে তাকালো, কি?

এই খালি পায়ে হাঁটতে?

কেন, জীবনে কি প্রথম খালি পায়ে হাঁটছো নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তবে রাস্তায় এই প্রথম।

বেনু সহসা হেসে উঠলো ওদের কথায়। বললো, আমার কিন্তু বেশ লাগছে। ওপাশ থেকে তখন আরো একটি মেয়ে এগিয়ে আসছিলো মেডিকেল কলেজের দিকে। তার গায়ের এ্যাপ্রন আর হাতের স্টেথোস্কোপ খানা দেখে সহজে অনুমান করা যাচ্ছিলো যে, সে ডাক্তারী পড়ে। অন্যদিন তার পায়ে এক জোড়া সুন্দর স্যান্ডেল পরানো থাকতো। আজ সেও নগ্ন পায়ে। চলনে তার জড়তা নেই। ক্লান্তি নেই। দৃঢ় পদক্ষেপ।

কাছে আসতে নীলা মিষ্টি হেসে বললো, কি সালমা যে, ক্লাশে যাচ্ছ বুঝি? তারপর তার নগ্ন পা জোড়ার দিকে চোখ পড়তে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো সে, তুমিও তাহলে, বেশ বেশ।

হ্যাঁ, আমি। আমিও তোমাদের দলে। সালমা শান্ত গলায় জবাব দিলো। বেনু বললো, তোমাদের আর সবাই, ওরাও খালি পায়ে হাঁটছে তো?

হ্যাঁ।

ইডেন কলেজের ওরা?

ওরাও খালি পায়ে।

কামরুন্নেছা?

হ্যাঁ, ওরাও।

সহসা কি এক আনন্দে চার জোড়া চোখ চিকচিক করে উঠলো।

রানু বললো, সত্যি কি মজা না?

তার কথায় আবার মৃদু হেসে উঠলো নীলা। হাসতে গেলে বড় সুন্দর দেখায় ওকে। ছিটে-ফোঁটার মত ব্রণের দাগ ছড়ানো মুখখানা হঠাৎ লাল হয়ে পরক্ষণে আবার শুভ্রতায় ফিরে আসে।

পেছনে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে নীলা বললো, আচ্ছা আমরা এবার চলি সালমা। চলতে গিয়ে কি ভেবে আবার থেমে পড়লো। একা একা যাচ্ছো যে, পুলিশের ভয় নেই?

ভয়? ভ্রূজোড়া অস্বাভাবিকভাবে বাঁকা হয়ে এলো তাঁর! ঠোঁটের কোণে ঈষৎ কাঁপন জাগলো। নীলার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে চাপা অথচ তীব্র গলায় বললো, ভয়, বলতে গিয়ে দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বেরুলো? তার, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিলো সালমা।

আশ্চর্য শান্ত গলায় বললো, আমার স্বামী জেলে। ভাই জেলে। ছোট বোনটিও আমার জেলখানায়, আমার ভয় করার মত কিছু আছে?

তিনটি মেয়ে। তিনটি নারী হৃদয়। মুহূর্তে মোচড় দিয়ে উঠলো।

সালমার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না ওরা। গুমোট ভাবটা কেটে গেলে নীলা আস্তে করে বললো, চলো। গলা থেকে ফাটা বাঁশের মত আওয়াজ বেরুলো তার।

বেনু বললো, কি আশ্চর্য।

রানুর চোখে তখনো বিস্ময়। সে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে এলো নীলার দিকে। বেনুর দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর।

রানু, বেনু আর নীলা। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করলো।

কিছুদূরে এসে রানু প্রথম কথা বললো। আপা, যা বলে গেলো সব সত্যি? কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো নীলা। বেনু কিছু বললো না। সে বোবা হয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সবুরের সঙ্গে কথা বলছিলো মুনিম। ছেলেটা একটা বদ্ধ পাগল। কি যে সব বকে বোঝা ভার। বলে, এসব কিছু হবে না মুনিম ভাই, প্রয়োজন একটা আঘাত। সে আঘাত না দিতে পারলে কিছু হবে না। বলে হাসে সবুর। বদ্ধ পাগলের মত হাসে। মুনিম সরে গিয়ে পকেট থেকে এক আনা পয়সা বের করে সিগারেট কিনলো। তারপর পাশে ঝুলানো দড়ি থেকে সিগারেটটা ধরিয়ে নিলো সে। সবুরে চোখ পড়লো মেয়ে তিনটির দিকে। চোখ পড়তেই মুখখানা বিকৃত করে অন্য দিকে সরিয়ে নিলো সে।

মেয়েরা ওর ভাবভঙ্গী দেখে হেসে উঠলো।

মুনিম বললো, কি ব্যাপার মুখটা অমন করলে কেন?

ওই মেয়েগুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না বলে।

কেন, ওরা আবার কি করলো তোমার?

আমার আবার কি করবে। সবুর মুখখানা প্যাঁচার মতো করে বললো, ওদের দিয়ে কোন কাজ হয় কোনদিন? আজ পর্যন্ত একটা আন্দোলনে ওদের আসতে দেখেছো? এখন তো খালি পায়ে হেঁটে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছে। একটা পুলিশ আসুক, দেখবে তিনজন একসঙ্গে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে রাস্তার ওপর।

কি যা তা বকছো? মুনিম ধমকে উঠলো। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। সবুর তবু থামলো না। যাই বল তুমি, ও মেয়েগুলোকে দিয়ে কিছু হবে না। এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

তুমি একটা বদ্ধ পাগল। বলে ফিক করে হেসে দিলো মুনিম। আধপোড়া সিগারেটটা সবুরের দিকে এগিয়ে দিলো। নাও টানো। বলে দ্রুত পায়ে মধুর রেস্তোঁরার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

আমগাছ তলায় একদল ছাত্র জটলা করে এতক্ষণ কি যেন আলাপ করছিলো। মুনিমকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ালো ওকে।

একজন বললো, পোস্টারগুলো কোথায় লাগাবা মুনিম ভাই? প্রক্টার সাহেব বড় বেশি গোলমাল শুরু করেছেন। বলছেন, এখানেও লাগাতে দেবেন না। আরেকজন বললো, দেয়াল পত্রিকার কি খবর মুনিম ভাই, ওটা লিখতে দিয়েছেন?

তৃতীয় জন বললো, ব্যাপার কি? লিফলেটগুলো এখনো এসে পৌঁছলো না প্রেস থেকে?

একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পকেট থেকে রুমালটা বের করে মুখ মুছলো মুনিম। সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বললো, সব হবে, এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন তোমরা?

কিন্তু পোস্টারগুলো?

হ্যাঁ, ওগুলো আমাদের ইউনিয়ন অফিসের দেয়ালে সেঁটে দাও। তারপর একটা ছেলের দিকে তাকালো মুনিম। এই যে রাহাত, তুমি আমার সঙ্গে এসো। একটু প্রেস থেকে ঘুরে আসি। দেখি লিফলেটগুলোর কি হলো।

ক্লাশে মন বসছিলো না সালমার।

প্রফেসর নার্ভাস সিসটেমের উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর সে ভাবছিলো তার কারারুদ্ধ স্বামীর কথা।

মাঝে মাঝে এমনি হয় তার। মনটা খারাপ থাকলে অথবা কোনো আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ালে, কোন মিছিল দেখলে, কোন সভা-সমিতিতে গেলে, স্বামীর কথা মনে পড়ে। বড় বেশি মনে পড়ে তখন। কে জানে এখন কেমন আছে রওশন।

মাসখানেক আগে শেষ চিঠি পেয়েছিলো তার। তারপর আর কোন চিঠি আসেনি।

আগে নিজ হাতে লিখতো। কি সুন্দর হাতের লেখা ছিলো তার। আজকাল অন্যের হাতে লেখায়।

হাতের কথা মনে হতে মুখখানা ব্যথায় ম্লান হয়ে এলো তার। দু'খানা হাতই হারিয়েছে রওশন।

একখানাও যদি থাকতো।

প্রথমে কিছুই জানতো না সালমা। শুনেছিলো রাজশাহী জেলে গুলি চলেছে। শুনে আর্তচিৎকারে কিংবা গভীর কান্নায় ফেটে পড়ে নি সে। বোবা দৃষ্টি মেলে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়েছিলো। মুহূর্তের জন্য চারপাশের এই সচল পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল ভুলে গিয়ে, জানালার দুটো শিক দু'হাতে ধরে নির্বাক দাঁড়িয়েছিলো সে। বুকের ঠিক মাঝখানটায় আশ্চর্য এক শূন্যতা।

হয়তো মারা গেছে রওশন।

পরে শুনলো মরে নি। ভালো আছে সে। সুস্থ আছে।

এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে রাজশাহী জেলে রওশনের সঙ্গে দেখা করতে যায় সালমা। জেল অফিসের সেই ঘরে সেদিন সহসা যেন মাথায় বাজ পড়েছিলো সালমার। যে বলিষ্ঠ হাত দুটো দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করতো সে দুটো হাত হারিয়েছে রওশন। শার্টের হাতজোড়া শুধু ঝুলে আছে কাঁধের দু'পাশে।

সালমার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেছিলো রওশন। তাই ক্ষণিকের জন্যে সেও কেমন উন্মনা হয়ে পড়েছিলো। সেই প্রথম অতি কষ্টে, বাঁধ ভেঙ্গে আসা কান্নাকে সংযত করলো সালমা। আস্তে করে শুধালো, কেমন আছো?

শূন্য হাতজোড়া সামান্য নড়ে উঠলো। ঠোঁট কাঁপলো। রওশন মৃদু গলায় জবাব দিলো, ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে বড় বিপন্ন মনে হলো সালমার, মনে হলো শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। বুকের নিচে একটা চিনচিনে ব্যথা। সালমা সহসা প্রশ্ন করে বসলো, খাও দাও কেমন করে? বলে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলো সে। মুখের রঙ হলদে থেকে নীলে বদল হলো।

চোখজোড়, অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে রওশন ইতস্তত করে জবাব দিলো, বন্ধুরা খাইয়ে দেয়। বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এসেছিলো তাঁর। আর সালমার চোখে টলটল করে উঠেছিলো দু'ফোটা পানি।

ভাত না হয় বন্ধুরা খাইয়ে দেয়। কিন্তু কেমন করে বিড়ির ছাই ফেলে সে? কেমন করে বইয়ের পাতা উল্টোয়? কেমন করে জামা-কাপড় পরে? ভাবতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিলো তার। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ তুলে শুধালো, দু'হাতেই কি গুলি লেগেছিলো? হ্যাঁ। রওশন জবাব দিলো, আর কয়েক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই এ জন্মে আর দেখা পেতে না। সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো রওশন। অপরিসর সেই ঘরের চার দেয়ালে প্রতিহত হয়ে সে হাসি তীরের ফলার মত এসে বিঁধলো সালমার কানে।

সালমা শিউরে উঠলো। লোকটা কি পাগল হয়ে গেলো নাকি?

শূন্য হাতজোড়া তখনো কাঁপছে হাসির ধমকে।

রওশনের সঙ্গে সালমার প্রথম আলাপ হয়েছিলো এক শাওন ঘন রাতে, ঢাকাতে ওদের টিকাটুলীর বাসায়।

তখন সালমা স্কুলে পড়তো। বয়সে আরো অনেক ছোট ছিলো। তখন আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনের অনেকটা থিতিয়ে এসেছে। গ্রেফতার করে কয়েকশো লোককে আটক করা হয়েছে জেলখানায়। অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে।

রওশনের নামেও পরোয়ানা বেরিয়েছিলো। আর তাই, আজ এখানে, কাল সেখানে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো সে।

একদিন শাওন রাতে রিমঝিম বৃষ্টি ঝরছিলো। দাদার সঙ্গে রওশন এলো ওদের বাসায়।

বৃষ্টিতে গায়ের কাপড় ভিজে গিয়েছিলো।

গামছায় গা মুছে নিয়ে দাদা ডাকলেন, সালমা শুনে যা।

এই আসি, বলে দাদার ঘরে এসে রওশনকে দেখে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিলো সালমা।

লম্বা গড়ন। উজ্জ্বল রঙ। তীক্ষ্ণ চেহারা। দাদা পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার বন্ধু রওশন। আর এ আমার বোন সালমা। ক্লাশ নাইনে পড়ে। সালমা হাত তুলে আদাব জানালো তাকে।

রওশন মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, কোন স্কুলে পড়ছো?

কামরুন্নেছায়।

দাদা বললেন, মাসখানেক ও এখানে থাকবে সালমা। ওর দেখাশোনার ভার কিন্তু তোমার ওপর।

মাসখানেকের জন্যে ওর ভার নিয়েছিলো সালমা।

জীবনের জন্যে নিতে হবে কে জানতো?

ক্লাশ শেষে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পুরনো দিনের স্মৃতিটা যেন স্বপ্নের মত মনে হলো ওর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের এ অংশটা পুরানো আর ভাঙ্গাচোরা। বাড়িগুলো সব একটার সঙ্গে আরেকটা একেবারে ঠাসা। দরজাগুলো সব এত ছোট যে, ভেতরে যেতে হলে উপুর হয়ে ঢুকতে হয়। রাস্তাগুলো খুব সরু সরু। অনেক জায়গায় এত সরু যে পাশাপাশি একটার বেশি দুটো রিকশা যেতে পারে না। এমনি একটা সরু রাস্তার ওপরে মতি ভাইয়ের ছোট রেস্তোঁরা।

সকাল থেকে মনটা আজ কেমন উন্মুখ হয়ে পড়ে আছে তার। কাউন্টারে বসে এতক্ষণ ফজলুর সঙ্গে তর্ক করছিলো সে।

ফজলু বলছিলো, আমি নিজ কানে শুনে এলাম, করাচীতে কোন এক মন্ত্রী মারা গেছে, তার জন্য খালি পায়ে হেঁটে শোক করছে ওরা।

আর তুমি বলছো মিথ্যে কথা?

তুমি একটা আস্ত উল্লুক। মতি ভাই গাল দিয়ে উঠলো। মন্ত্রীর জন্যে শোক করতে ওদের বয়ে গেছে। আসলে অন্য কোন কারণ আছে।

আমার তো মনে কেমন ধাঁ ধাঁ লাগছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে। আর জানো? কাল রাতে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। মনে আছে, সেবারো আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই সেবার। মনে পড়ছে না তোমার? উহ্ সে এক জামানা গেছে ভাই। আমার তো মনে হয়েছিলো দুনিয়াটা বুঝি ফানাহ্ হয়ে যাবে। চারদিকে শুধু হরতাল আর হরতাল। ইউনিভারসিটির ছাত্ররা। মেডিকেল কলেজ। সেক্রেটারিয়েট। হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি। ব্রিক ওয়ার্কস। রেলওয়ে। সব হিসেব দিয়ে কি আর শেষ করা যায়? তাই মিছিলের তো অন্ত ছিলো না। এ গলি দিয়ে একটা বেরুচ্ছে, ও গলি দিয়ে আরেকটা। সবার হাতে বড় বড় সব প্লাকার্ড। তাতে লাল কালিতে লেখা খুনীরা সব গদি ছাড়। সে এক জমানা গেছে ভাই। একটানা কথা বলতে গিয়ে ঘামিয়ে উঠলো মতি ভাই। কোলের উপর থেকে গামছাখানা তুলে নিয়ে গায়ের ঘাম মুছলো সে। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে বললো, জানো? এই যে বসে আমি, এখান থেকে বিশ হাত দূরে, ওই-ওইযে ল্যাম্পপোস্টটা দেখতে পাচ্ছো, ওটার নিচে গুলি খেয়ে মারা গেলো আমাদের আমেনার বার বছরের বাচ্চা ছেলেটা।

ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে। হঠাৎ কোত্থেকে একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামলো ওখানটায়। পুলিশ দেখে, কি যে বলবো, ভাই, এতটুকুন বাচ্চার যে কি সাহস। চিৎকার করে বললো, জুলুমবাজ ধ্বংস হোক।

মতি ভাই যখন কথা বলছিলো ঠিক তখন চা খাবে বলে রেস্তোঁরায় এসে ঢুকলো মুনিম আর রাহাত। মতি ভাই তাকিয়ে দেখলো ওদের পা জোড়া নগ্ন। দেখে খুশীতে নড়েচড়ে বসলো সে। এবার ওদের জিজ্ঞেস করে আসল খবর জেনে নিতে পারবে। সকালে অবশ্য একটা ছেলেকে মতি ভাই পাঠিয়েছিলো মোড়ে যে মেয়েদের স্কুল আছে সেখান থেকে খবর আনতে। কিন্তু, মেয়েরা নাকি গালাগালি করে তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে। বলেছে, অমন ছেঁড়া কাপড় পরে থাকলে কি হবে টিকটিকিদের আমরা ভালো করে চিনি। খবরদার এখানে যদি আবার আসো, তাহলে ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবো।

এটা ওদের বাড়াবাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনকে না জেনেশুনে টিকটিকি বলা উচিত হয় নি ওদের। নিজের মনে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো মতি ভাই। কিন্তু দেশের যা অবস্থা হয়েছে ওদেরও বা কি দোষ। কে গোয়েন্দা আর কে ভদ্রলোক সেটা বুঝাই বড় মুশকিল হয়ে পড়েছে। অদূরে বসা রাহাত আর মুনিমের দিকে বার কয়েক ফিরে তাকালো মতি ভাই। চা খাচ্ছে আর চাপা গলায় কি যেন আলাপ করছে। মতি ভাইয়ের ভীষণ ইচ্ছে হলো ওরা কি বলছে শুনতে। কিন্তু, সাহস হলো না তার। কে জানে, যদি ছেলে দুটো আবার তাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করে বসে। কিম্বা এমন তো হতে পারে যে ছেলে দুটোই গোয়েন্দার লোক। আজকাল তো এসব হরদম হচ্ছে!

একটু পরে চা কাউন্টারে পয়সা দিতে এলো মুনিম।

মতি ভাই আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনারা সবাই আজ খালি পায়ে হাঁটছেন কেন?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুনিম আর রাহাত পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে মতি ভাইকে কি যেন বললো মুনিম। শুনে মুখটা আনন্দে চিকচিক করে উঠলো তার। তাহলে সে যা আঁচ করেছিলো তাই।

পয়সা দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছিলো। মতি ভাই পেছন থেকে ডাকলো ওদের। ডেকে পয়সাগুলো ফিরিয়ে দিলো হাতে।

মুনিম অবাক হলো। কি ব্যাপার, এগুলো অচল নাকি?

না। অচল হতে যাবে কেন? মতি ভাই লজ্জিত হলো, চায়ের পয়সা দিতে হবে না, যান।

সেকি কথা, জোর করে পয়সাগুলো হাতে গুঁজে দিতে চাইলো মুনিম।

মতি ভাই তবু নিলো না।

রাস্তায় নেবে রাহাতকে বিদায় দিলো মুনিম। বললো, তোমার আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। তুমি যাও। লিফলেটগুলো প্রেস থেকে নিয়ে আমি একটু পরেই আসছি। তুমি আসাদকে গিয়ে বলো, নীরার সঙ্গে দেখা করে ও যেন দেয়াল পত্রিকাগুলো নিয়ে আলাপ করে।

রাহাত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো, তারপর ধীরে ধীরে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলো সে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলো মুনিম। এটা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ওর। এ নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করে। ও হাসে। কিছু বলে না। রুমালটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল মুনিম। এখান থেকে সোজা প্রেসে যাবে কিনা ভাবলো। ভাবতে গেলে কপালে ভাঁজ পড়ে ওর। মুখখানা সূচালো হয়ে আসে। চোখজোড়া নেমে আসে মাটিতে।

মুনিম ভাবছিলো। এমনি সময়ে একটা বাচ্চা ছেলে রাস্তার ওপাশ থেকে ছুটে এসে হাত চেপে ধরলো ওর। মুনিম ভাই, আপনাকে আপা ডাকছে।

আরে, মিন্টু যে! তুমি এখানে?

আপনাকে আপা ডাকছে।

ও। হঠাৎ মুনিমের খেয়াল হলো, তাইতো, ডলিদের বাসার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। এতক্ষণ কোন খেয়াল ছিলো না। নিজের এই অন্যমনস্কতার জন্যে রীতিমত অবাক হলো মুনিম। একটু ইতস্তত করে বললো, এখন আমি খুব ব্যস্ত, বুঝলে মিন্টু, তোমার আপাকে গিয়ে বলো, পরে আসবো। না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে আপা আমায় বকবে। ওইতো উনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। চলুন না। মিন্টু একেবারে নাছোড়বান্দা।

ওকে অনেক করে বোঝাতে গিয়েও ব্যর্থ হলো মুনিম।

চোখজোড়া বিড়ালের চোখের মত জ্বলজ্বল করছিলো ডলির।

মুখটা লাল হয়ে উঠেছিলো রাগে। দোরগোড়ায় পৌঁছতে বললো, না এলেই তো পারতে।

আসতে তো চাইনি। জোর করে নিয়ে এলো।

তাইতো বলছি, এলে কেন, চলে যাও না।

আহ্ বাঁচালে তুমি। বলে চলে যেতে উদ্যত হলো মুনিম।

পেছন থেকে চাপা গলায় ডলি চিৎকার করে উঠলো। যাচ্ছ কোথায়?

কেন, তুমি যে যেতে বললে।

না। ভেতরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

ডলির পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলো মুনিম।

বাসাটা বেশ বড় ডলিদের। সামনে যত্ন করে লাগানো বাগান। পেছনে একটা ছোট টেনিস কোর্ট, সামনের গোল বারান্দাটা পেরোলে সাজানো বৈঠকখানা। পাশের ঘরটা খালি। তারপর চাকরদের থাকবার কামরা। নিচে ওরা কেউ থাকে না। থাকে দোতালায়।

মুনিমকে ওর ঘরে বসিয়ে, আলনা থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো ডলি। বললো, তুমি বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।

আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারবো না। পরক্ষণে জবাব দিলো মুনিম।

ডলি তখন চলে গেছে।

এ ঘর মুনিমের অনেক পরিচিত। বহুবার এখানে এসেছে সে। বসেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে ডলির সঙ্গে।

একটা খাট। খাটের পাশে ডলির পড়বার ডেস্ক। একখানা চেয়ার! ডান কোণে একটা তাকের ওপর যত্ন করে সাজানো কয়েকটা বই। গল্প। উপন্যাস। ওর মধ্যে একখানা বইয়ের ওপর চোখ পড়তে এক টুকরো স্নিগ্ধ হাসির আভা ঢেউ খেলে গেলো ওর ঠোঁটের কোণে। ও বইটা ডলিকে উপহার দিয়েছিলো মুনিম।

ডলিকে প্রথম দেখেছিলো মুনিম দীর্ঘ ছ'বছর আগে। দেশ বিভাগের পরে তখন সবে নতুন ঢাকায় এসেছে সে। বাবা-মা তখনো কোলকাতায়। ঢাকায় এসে জাহানারাদের বাসায় উঠেছিলো মুনিম। সম্পর্কে জাহানারা ফুফাত বোন। স্বামী-স্ত্রীতে ওরা মিটফোর্ডের ওখানে থাকত। পাশাপাশি দু'টো কামরা। একটা পাকঘর আর সরু একফালি বারান্দা। সপ্তাহ খানেক থাকবে বলে এসেছিলো মুনিম। কিন্তু জাহানারা ছাড়লো না, বললো, কোনোদিন আসবে তা ভাবি নি। এসেছো যখন দিন পনেরো না থেকে যেতে পারবে না। পাগল হয়েছো। সাতদিনের বেশি থাকলে মা-বাবা ভীষণ রাগ করবেন। মুনিম জবাব দিয়েছিলো। সামনের বার এলে পনেরো দিন কেন, মাস খানেক থাকবো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিন পনেরো থাকতে হয়েছিলো তাকে। কোলকাতায় ফিরে যাবার আগের দিন ডলিকে প্রথম দেখলো সে। হাল্কা দেহ, ক্ষীণ কটি, কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লেগে গিয়েছিলো মুনিমের। ডলিরা তখন ও পাড়াতেই থাকতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারার সঙ্গে আলাপ ছিলো বলে বাসায় মাঝে মাঝে আসতো ডলি। তীক্ষ্ণ নাক। পাতলা চিবুক। সরু ঠোঁটের নিচে একসার ইঁদুরের দাঁত। ভেতরের ঘরে বসে জাহানারার সঙ্গে গল্প করছিলো সে। পর্দার এপাশ থেকে ওকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো মুনিম। আর, পরদিন ওকে কোলকাতায় চলে যেতে হবে ভেবে মনটা কেন যেন সেদিন বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিলো।

বছর খানেক পরে ওরা যখন কোলকাতা ছেড়ে স্থায়ীভাবে ঢাকাতে চলে এলো, ডলিরা তখন চাটগাঁ-এ। খোঁজটা জাহানারার কাছ থেকে পেয়েছিলো মুনিম। জাহানারা প্রশ্ন করলো, হঠাৎ ডলির খোঁজ করছো, ব্যাপার কি? যতদূর জানি, ওর সাথে তো তোমার কোন পরিচয় ছিলো না। মুনিম ঢোক গিলে বললো, না এমনি। সেবার তোমাদের এখানে দেখেছিলাম কিনা, তাই।

জাহানারা মুখ টিপে হাসলো। তাই বলো।

তারপর থেকে ডলির কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলো মুনিম। মাঝে মাঝে যে মনে হতো না তা নয়। তবে সে মনে হওয়ার মধ্যে প্রাণের তেমন সাড়া ছিলো না।

তখন প্রথম বর্ষের পাঠ চুকিয়ে দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সে পড়ছে মুনিম। এমনি সময়, একদিন বিকেলে জাহানারাদের ওখানে বেড়াতে গিয়ে ডলিকে আবিষ্কার করলো সে।

টেবিলে বসে চা খাচ্ছিলো ওরা।

ওকে দেখে জাহানারা মৃদু হাসলো, মুনিম যে এসো। তারপর ডলির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম ডলি। ডলি আরক্ত হয়ে তাকালো ওর দিকে।

তারপর আদাব জানিয়ে বললো, জাহানারার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

তাই নাকি? খুব সহজভাবে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ শুরু হলো মুনিমের। একগাল হেসে বললো, আমিও আপনার কথা অনেক শুনেছি ওর কাছ থেকে। কি শুনেছেন? চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে এনে আবার নামিয়ে রাখলো ডলি।

মুনিম বললো, আপনি যা শুনেছেন তাই।

উত্তরটা শুনে নিরাশ হয়েছিলো ডলি। কিন্তু নির্বাক হয় নি। মাঝে মাঝে দেখা হলে এটা সেটা নিয়ে আলাপ করতো ওর সঙ্গে। কখনো শহরের সেরা ছায়াছবি নিয়ে আলোচনা চলতো। কখনো শেকস্‌পীয়রের নাটক কিংবা শেলীর কবিতা। প্রথম প্রথম এ আলোচনা ক্ষণায়ু হতো, পরে দীর্ঘায়ু হতে শুরু করলো।

একদিন দুপুরে ওকে একা পেয়ে জাহানারা অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসলো, আচ্ছা মুনিম, ডলিকে তোমার কেমন লাগে?

সহসা কোন উত্তর দিতে পারলো না মুনিম। ইতস্তত করে বললো, মন্দ না, বেশ ভালই তো। শেষের কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিল সে। জাহানারা মুখ টিপে হাসলো, হুঁ, এই ব্যাপার।

কেন, কি হয়েছে? পরক্ষণে প্রশ্ন করলো মুনিম।

না এমনি। তা তুমি অমন লাল হচ্ছো কেন। এতে আবার লজ্জার কি হলো। এবার শব্দ করে হেসে দিলো জাহানারা। আমি সব জানি তো, ডলি আমাকে সব বলেছে।

হাতমুখ ধুয়ে এ ঘরে-ফিরে এসে ডলি দেখলো তাকের উপরে রাখা বইগুলো ঘাটছে মুনিম।

কি খুঁজছো? ডলি শুধালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু না। একটা বই হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুনিম। বাড়ির চাকরটা দরজা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে চলে গেলো। তোয়ালে দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ডলি। অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গি করে বললো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।

বইটা তাকের ওপর রেখে দিয়ে মুনিম আস্তে করে বললো, না, এবার চলি। না। মুহূর্তে খোলা দরজাটার সামনে পথ আগলে দাঁড়ালো ডলি।

পাগলামো করো না। আমার এখন অনেক কাজ?

কি কাজ?

জান তো সব। তবু আবার জিজ্ঞেস করো কেন?

না এমনি। কাপড়ের আঁচলটা আঙ্গুলে পেঁচাতে পেঁচাতে মৃদু গলায় জবাব দিলো ডলি।

তার মুখখানা ম্লান আর বিবর্ণ। খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো সে, আজ আমার জন্মদিন।

জন্মদিন! তাইতো, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

কোনদিন হয়তো আমাকেই ভুলে যাবে। অদ্ভুত গলায় জবাব দিল ডলি।

মুনিম ইতস্তত করে বললো, কি যা-তা বলছো ডলি।

ডলি মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুনিমের দিকে তাকিয়ে রইলো ক্ষণকাল।

ওর মুখে কি যেন খুঁজলো তারপর বললো, তুমি দিনে দিনে কেমন যেন বদলে যাচ্ছো।

বদলে যাচ্ছি! পরিবর্তনটা কোথায় দেখলে তুমি?

তোমার ব্যবহারে।

যেমন–।

নিজে বুঝতে পারো না? ওটা কি উদাহরণ দিয়ে বলে বুঝিয়ে দিতে হবে? অত্যন্ত পরিষ্কার গলায় টেনে টেনে কথাগুলো বললো ডলি।

মুনিম নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে মনে একটা উত্তর খুঁজছিলো সে।

কি বলবে ভেবে না পেয়ে বললো, চলি।

এবার আর বাধা দিলো না ডলি। বিষণ্ন মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দরজার সামনে থেকে সরে গেলো সে। আজ বিকেলে আসছো তো?

হ্যাঁ। আসবো।

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু পরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো মুনিম। দুপুরের দিকে রোদ খুব কড়া হয়ে উঠলো। বাতাস না থাকায় রোদের মাত্রা আরো তীব্রভাবে অনুভূত হলো। মনে হলো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বটা যেন অর্ধেক কমে গেছে।

ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে তার শোবার ঘর খানায় বজলে হোসেন গরমে অস্থির হয়ে পড়েছিলো। একটা কবিতা কি একটা গল্প যে লিখবে তাও মন বসছে না। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস ছিলো তিনটে। দুটো অনার্স, এটা সাবসিডিয়ারি। ওর বড়ো দুঃখ হলো যে আজ তিনটে পার্সেন্টেজ নষ্ট হলো। শুধু আজ নয়, আসছে দুটো দিনেও ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারবে না সে। কি করে যাবে? জুতো পায়ে দিয়ে গেলে যে ছেলেরা তাড়া করবে ওকে। অথচ জুতো ছাড়া খালি পায়ে হাঁটার কথা ভাবতেও পারে না বজলে হোসেন। সত্যি খালি পায়ে ইউনিভারসিটিতে যাওয়া কি সম্ভব?

পাগল। যতসব পাগলামো। হঠাৎ উদ্যোক্তাদের গালাগাল দিতে ইচ্ছে করলো ওর। খেয়ে-দেয়ে কোন কাজ নেই। কি যে করে সরকার। এসব ছেলেদের ধরে ধরে আচ্ছা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেঙ্গায় না কেন? গরমে গা জ্বালা করছিলো বজলে হোসেনের। বন্ধু মাহমুদকে আসতে দেখে মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। বিছানা ছেড়ে উঠে বললো, মাহমুদ যে, এসো। কি খবর?

উত্তরে কাঁধটা বেশকায়দা করে ঝাঁকলো মাহমুদ। তারপর সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম, তোমাকে এক নজর দেখে যাই। কি ব্যাপার, আজ বেরোও নি?

বজলে মাথা নাড়লো, না।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে মাহমুদ কি যেন ভাবতে লাগলো। গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করে সে। এককালে কবিতা লেখার বাতিক ছিলো খুব।

সেই সূত্রে বজলের সঙ্গে আলাপ। এখন আর লেখে না। একা থাকে শহরে। মা আর ছোট এক বোন আছে, তারা দেশের বাড়িতে।

একটুকাল পরে বজলে প্রশ্ন করলো, এদিকে কোথায় আসছিলে?

মাহমুদ জবাব দিলো, একটা প্রেসে।

প্রেসে?

হ্যাঁ।

প্রেসে কি কাজ তোমার? বজলে অবাক হলো। তারপর সোৎসাহে বললো, কবিতার বই ছাপাতে দিয়েছ বুঝি? চমৎকার! কনগ্রেচুলেশন মাহমুদ। আমি বলি নি, তুমি ওই চাকরিটার মাথা খেয়ে আবার কবিতা লিখতে শুরু করে দাও। স্যন গড বলছি তুমি খুব সাইন করবে।

ওর কথা শুনে হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলো মাহমুদ। বললো, তোমাদের ছাত্ররা নাকি এখানে একটা প্রেসে লিফলেট ছাপতে দিয়েছে।

খবর পেয়ে খোঁজ নিতে এসেছিলাম।

নুইসেন্স। ধপ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো বজলে। তোমাদের সবাইকে ওই একই ভূতে পেয়েছে। খানিকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে অন্য মনস্কভাবে বললো, কিছু পেলে?

না, মাহমুদ একটা লম্বা হাই তুললো। ভার্সিটির খবর কি?

বজলে সংক্ষেপে বললো। জানি না। আমি যাই নি। তারপর কি মনে হতে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো সে। টেবিলের ওপর থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে আবার বললো, কাল রাতে হঠাৎ একটা দীর্ঘ কবিতার জন্ম দিয়েছি। দেখ তো কেমন হয়েছে। বলে কবিতাটা টেনে টেনে আবৃত্তি করে তাকে শোনাতে লাগলো বজলে হোসেন।

কলতাবাজারে ওদের ছোট বাসা বাড়িটায় যখন ফিরে এল সালমা তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারপাশে। স্বচ্ছ নীলাকাশে একটি দু'টি করে তারা জ্বলতে শুরু করেছে।

কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুলো সালমা। আলনা থেকে তোয়ালেটা নামিয়ে মুখ-হাত মুছলো। তারপর জানালার কবাট দুটো খুলে কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে দাঁড়ালো সে।

এমনি সময় যখন পুরো শহরটা আবছা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

এখানে সেখানে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত টিমটিমে আলো, কোথাও-বা হালকা নীল ধোঁয়া সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

কোথাও কোন শাশুড়ি তার বউকে গালাগালি দিচ্ছে, বাচ্চা ছেলেরা সুর করে পড়ছে কোন ছড়ার বই কিম্বা কোন ছন্দোবদ্ধ কবিতা, তখন এমনি জানালার রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগে সালমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর থেকে ভেসে আসা হিমেল বাতাসে বসন্তের ঘ্রাণ।

এ মুহূর্তে রওশন যদি থাকতো পাশে।

ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো সালমা।

আজ কত দিন হয়ে গেছে, দিন নয়, বছর। কত বছর।

বিয়ের মাস খানেক পরে ধরা পড়েছিল রওশন।

দাদাসহ কোথায় যেন বেরিয়েছিলো ওরা, সন্ধ্যার পরে। দু'জনের কেউ আর ফিরে আসে নি। ভাত সাজিয়ে সারা রাত জেগেছিলো সালমা। পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে শুনলো লালবাগে পুলিশের হেফাজতে আছে ওরা।

জানালার পাশ থেকে সরে এসে বিছানার নিচে রাখা একটা টিনের সুটকেস টেনে বের করলো সালমা। রওশনের পুরনো চিঠিগুলো একে একে বের করে দেখলো সে।

জানো সালমা,

কাল মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো আমার। বাইরে তখন অবিরাম বৃষ্টি ঝরছিলো। আর সেই বৃষ্টির রিমঝিম শব্দে জানি না কখন মনটা হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়েছিলো। আর সেই মুহূর্তে আকাশ ছোঁয়া চার দেয়ালের বাঁধন ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম আমি।

মনে হলো, আমার সেই গ্রামের বাড়িতে বুড়ো দাদীর কোলে মাথা রেখে রূপকথার গল্প শুনছি।

বাইরে এমনি বৃষ্টি ঝরছে। আর আমি দু'চোখে অফুরন্ত কৌতূহল নিয়ে শুনছি, কেমন করে সেই কদাকার রাক্ষসটা ছলনা চাতুরী আর মুক্তির তাণ্ডব মেলিয়ে কুঁচবরণ কন্যার স্নেহমাখা আলিঙ্গন থেকে তার অতি আদরের রাজকুমারকে নিয়ে গিয়ে আটক রাখলো পাথরের নিচে।

তারপর আর চিঠিখানা পড়তে পারলো না সালমা। সেন্সারের নিখুঁত কালো কালির আড়ালে পরের অংশটুকু চাপা পড়ে গেছে।

ওটা রেখে দিয়ে আরেকখানা চিঠি খুললো সালমা।

আরেকখানা।

আরো একখানা।

তারপর দুয়ারে কে যেন বড়া নাড়লো।

টিনের সুটকেসটা বন্ধ করে রেখে এসে দরজাটা খুললো সালমা।

বড় চাচা এসেছেন।

সারা মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। পরনে পায়জামা আর শার্ট। হাতে একটা ছাতা। সালমা জানতো চাচা আজ আসবেন।

ছাতাটা একপাশে রেখে দিয়ে কোন রকম ভূমিকা না করেই চাচা বললেন, শোনো, আগামী দু'তিন দিন রাস্তাঘাটে বেরিয়ো না। আমার শরীর খারাপ, গায়ে জ্বর নিয়ে এসেছি। জানি আমার কথার কোন দাম দিবে না তোমরা। আজকালকার ছেলেপিলে তোমরা বুড়োদের বোকা ভাবো। তবু না এসে থাকতে পারলাম না। শোনো, একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে এবার, এই আমি বলে রাখলাম।

আপনাকে এক কাপ চা করে দিই? ওর কথার মাঝখানে হঠাৎ একটা যতি টানার চেষ্টা করলো সালমা।

চাচা থেমে গিয়ে বললেন, ঘরে আদা আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে।

তাহলে একটু আদা মিশিয়ে দিও।

আচ্ছা । খাটের নিচের স্টোভটা টেনে নিয়ে চা তৈরি করতে বসলো সালমা। মাঝে মাঝে রওশনকেও এমনি চা বানিয়ে খাওয়াতো সে।

একদিন নিজের হাতে স্টোভ ধরাতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছিলো রওশন। সালমা পোড়া জায়গায় মলম লাগিয়ে দিতে শাসনের ভঙ্গীতে বলেছিলো, খবরদার, আর স্টোভের ধারে পাশেও আসতে পারবে না তুমি।

কি করবো বলো, কিছু করার জন্যে হাতজোড়া সব সময় নিসপিস করে।

মুহূর্তের জন্যে সালমার মনে হলো যেন হাতজোড়া আগের মত আছে রওশনের, বলিষ্ঠ একজোড়া হাত।

না, আর কোনদিনও সে আলিঙ্গন করতে পারবে না।

স্টোভের ওপর চায়ের কেতলিটা ধীরে ধীরে তুলে দিলো সালমা।

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, রওশনের কোন চিঠি পেয়েছো?

সালমা আস্তে করে বললো, হ্যাঁ।

চাচা সে কথা শুনলেন কিনা বোঝা গেলো না। তিনি নিজের মনেই বলতে লাগলেন, কি হবে এসব করে। এতো করে বলি ছেড়ে দে বাবা, ওসব আমাদের ঘরের ছেলেদের পোষায় না। ও হচ্ছে বড়লোকদের কাজ যাদের কাড়ি কাড়ি টাকা আছে। সারা দুনিয়ার লোকে লুটেপুটে খাচ্ছে। ঘর করছে। বাড়ি করছে। জমিজমা করছে। আর ওনারা শুধু জেল খেটেই চলেছেন। দেশ উদ্ধার করবে। বলি, দেশ কি তোমাদের জন্যে বসে রয়েছে? সবাই নিজের নিজেরটা সামলে নিচ্ছে। তোরা কেন বাবা মাঝখানে নিজের জীবনটা শেষ করছিস? না, এসব পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি রওশনকে কড়া করে একখানা চিঠি লিখে দাও সে যেন বন্ড দিয়ে চলে আসে। নিজের ঘর সংসার উচ্ছনে গেলো, দেশ নিয়ে মরছে। হ্যাঁ, তুমি ওকে চিঠি লিখে দাও ও যদি বন্ড সই করে না আসে তাহলে আমরা কোর্টে গিয়ে তালাকের দরখাস্ত করবো। হ্যাঁ, তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও তাই করতেন। বড়চাচা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। গলাটা একেবারে নিচের পর্দায় নামিয়ে এনে বললেন, আমি তোমাদের ভালো চাই বলেই বলছি নইলে বলতাম না।

সালমার দেহটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে। পাথরে মত নিশ্চল।

আজ নতুন নয় বহুদিন এ কথা বলেছেন চাচা।

রওশনও চিঠি লিখেছে।

আমার জন্যে তুমি নিজেকে শেষ করবে কেন সালমা। আমি কবে বেরুবো জানি না।

কখন ছাড়া পাবো জানি না। তুমি আর কতদিন অপেক্ষা করে থাকবে।

পরিষ্কার করে কিছু লেখে নি সে। লিখতে সাহস হয় নি হয়তো। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সালমা উঠে দাঁড়ালো। চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিলো বড় চাচার হাতে।

একটু পরে চা খাওয়া শেষ হলে আরো বার কয়েক সালমাকে সাবধান করে দিয়ে আর রওশনকে একখানা ঝাড়া চিঠি লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন বড় চাচা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার সঙ্গে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সালমা। বড় ক্লান্তি লাগছে। তেইশ বছরের এই দেহটা তার যেন আজ মনে হলো অনেক বুড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। হয়তো কিছু দিনের মধ্যে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। তখন অনেক অশ্রু ঝরিয়েও এ জীবনটাকে আর ফিরে পাবে না সে। ভাবতে গিয়ে সহসা কান্না পেলো সালমার। শাহেদের ডাকে চমক ভাঙলো। ভাত দে আপা, ক্ষিধে পেয়েছে। কি ভাবছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! দুলাভাইয়ের কথা?

সালমা শিউরে উঠলো। না, কিছু না। চলো ভাত খেতে যাবে। দরজার সামনে থেকে সরে গেলো সালমা।

ভাত খেয়ে উঠে শাহেদ বললো, ইয়ে হয়েছে আপা। আমি একটু বাইরে যাবো। ফিরতে দেরি হবে। তুই কিন্তু ঘুমোস নে।

আমার জেগে থাকতে বয়ে গেছে। সালমা রেগে গেলো। এখন বাইরে যেতে পারবে না তুমি।

কেন?

কেন মানে? এ রাত আটটায় বাইরে কি দরকার তোমার?

দরকার আছে।

কি দরকার?

বলতে পারবো না।

না বলতে পারলে যেতেও পারবে না।

বললাম তো দরকার আছে।

কি দরকার বলতে হবে।

সিনেমায় যাবো।

সিনেমায় যাবে তো রাত ন'টার শো কেন? দিনে যেতে পারো না? এখন পড়ো গিয়ে।

দেখতে হলে কাল দিনে দেখো।

আজ শেষ শো, কাল চলে যাবে।

কি সিনেমা শুনি।

ন্যাকেড কুইন।

ন্যাকেড কুইন? সালমা অবাক হলো, ওটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে। তোমার মত বাচ্চা ছেলেদের জন্য নয়।

আমি বুঝি বাচ্চা? শাহেদ ক্ষেপে উঠলো। তোর চোখে তো আমি জীবনভর বাচ্চাই থেকে যাবো।

ছোট ভাইটিকে নিয়ে বড় বিপদ সালমার। একটুতে রাগ করে বসে। অন্যায় কিছু করতে গেলে বাধা দেবে সে উপায় নেই। মাঝে মাঝে বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে সালমা।

ওকে চুপ থাকতে দেখে শাহেদ আবার বললো, আমি চললাম, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যা। বলেই যাবার উদ্যোগ করলো সে।

পেছন থেকে সালমা ডাকলো, যেয়ো না শাহেদ। শোন, বাচ্চা ছেলেদের ঢুকতে দিবে না ওখানে।

ইস্ দেবে না বললেই হলো। কত ঢুকলাম।

সালমার মুখে যেন একরাশ কালি ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো শাহেদ।

এমনি স্বভাব ওর।

ডলি তার ঘরে বসেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজলে হোসেন বায়রনের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলো তাকে।

Let us have wine and the women
Mirth and laughter
Sermens and soda water the day
After.....

সম্পর্কে বজলে হোসেন মামাতো ভাই হয় ওর। যেমন লেখে তেমনি ভালো আবৃত্তি করতে পারে বজলে। তাই ওকে ভালো লাগে ডলির।

ও এলে বায়রন অথবা শেলীর একখানা কবিতার বই সামনে এগিয়ে দিয়ে ডলি বলে একটা কবিতা পড়ে শোনাবে হাসু ভাই? তোমার আবৃত্তি আমার খুব ভালো লাগে।

তাই নাকি? বজলে হোসেন হাসে আর মিটমিট করে তাকায় ওর দিকে। তারপর বইটা তুলে নিয়ে আবৃত্তি করে শোনায়–

Man being reronable, muts get
Drunk
The bast of life is but intoxiction.

শুনতে শুনতে এক সময় আবেশে চোখজোড়া জড়িয়ে এলো ডলির।

নিওনের আলোয় গদি আঁটা বিছানার উপর এলিয়ে পড়লো সে।

কবিতা পাঠ থামিয়ে মৃদু গলায় বজলে হোসেন ডাকলো, ডলি।

ডলি চোখজোড়া মেলে কি যেনো বলতে যাচ্ছিলো। মুনিমকে করিডোর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেলো সে।

পরনে দুপুরের সেই পোষাক।

পা জোড়া তেমনি জুতোবিহীন।

মুনিমকে এখন এ পোষাকে আশা করেনি ডলি। তাই ঈষৎ অবাক হলো। কিন্তু বজলের সামনে ওকে কিছু বললো না সে। শুধু গম্ভীরকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালো, এসো।

বইটা বন্ধ করে রেখে বজলে বললো, মুনিম যে, কি ব্যাপার আন্দোলন ছেড়ে হঠাৎ জন্মদিনের আসরে?

কেন, যারা আন্দোলন করে তাদের কি জন্মদিনের আসরে আসতে নেই নাকি? পরক্ষণে জবাব দিলো মুনিম।

বজলে একগাল হেসে বললো, না, আসতে নেই তা ঠিক নয়। তবে একটু বেমানান ঠেকে আর কি।

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো মুনিম।

ডলি বিরক্তির সঙ্গে বললো, তোমরা কি শুরু করলে? বাজে কথা নিয়ে তর্ক করার আর সময় পেলে না। তারপর হাত ঘড়িটার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিলো সে। চলো, ওঘরে সবাই অপেক্ষা করছে।

সোফা ছেড়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বজলে। কাপড়ের ওপরে কোত্থেকে একটা পোকা এসে বসেছিলো। হাতের টোকায় সেটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললো, চলো। বলে আর ওদের জন্যে অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে।

বজলে চলে যাবার পরেও কেউ কিছুক্ষণ কথা বললো না ওরা। মুনিমের নগ্ন পা জোড়ার দিকে বারবার ফিরে তাকাচ্ছে ডলি।

অপ্রতিভ হয়ে মুনিম বললো, অমন করে কি দেখছো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডলি ঘার নাড়লো। কিছু না। তারপর মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললো, আমায় এমন করে অপমান করতে চাও কেন শুনি?

মুনিম কথাটা বুঝতে না পেরে অবাক হলো। তার মানে?

তিক্ত হেসে ডলি বললো, জন্মদিনের উৎসবে খালি পায়ে না এলেও পারতে।

ও। মুহূর্তে নিজের নগ্ন পা জোড়ার দিকে তাকালো মুনিম। আস্তে করে বললো, জানো তো আমরা তিনদিন খালি পায়ে হাঁটাচলা করছি।

এখানে জুতো পায়ে দিয়ে আসলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না।

পাগল। মুনিম এবার না হেসে পারলো না।

ডলি দাঁতে ঠোঁট চেপে কি যেন চিন্তা করলো। দাঁড়াও, বাবার স্যাণ্ডেল এনে দিই তোমায়। সহসা যেন একটা সমাধান খুঁজে পেলো ডলি। ভয় নেই, এখানে তোমার বন্ধুরা কেউ দেখতে আসবে না।

হাত ধরে ডলিকে থামালো মুনিম। কি পাগলামো করছো, শোন।

কি! ডলির মুখখানা কঠিন হয়ে এলো।

মুনিম বললো, আমায় তুমি ইমমোরাল হতে বলছো?

ঈষৎ হেসে চমকে ওর দিকে তাকালো ডলি। তারপর হতাশ আর বিরক্তির চাপে ফেটে পড়ে বললো, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো গে তুমি। বার কয়েক লম্বা লম্বা শ্বাস নিলো সে। ঠিক আছে তুমি এ ঘরেই বসো। ও ঘরে যেও না। আমি আসছি। বলে চলে যাচ্ছিলো ডলি।

পেছন থেকে মুনিম সহসা বললো, আমাকে ওঘরে নিয়ে যেতে তোমার লজ্জা হচ্ছে বুঝি?

ডলি থমকে দাঁড়ালো খুব ধীরে ধীরে ফিরে তাকালো ডলি। ওর চোখের মণিজোড়া জ্বলছে। ঠোঁটের প্রান্তটুকু ঈষৎ কাঁপছে। মৃদু গলায় সে বললো, হ্যাঁ। গলায় একটু জড়তা নেই। কথাটা বলে পলকের জন্যেও সেখানে অপেক্ষা করলো না ডলি, চলে গেলো।

আবার যখন ফিরে এলো তখন মুখখানা গম্ভীর। হাতে এক প্লেট মিষ্টি।

টেবিলের ওপরে ছড়ানো বইগুলো সরিয়ে নিয়ে প্লেটটা সেখানে রাখলো সে। মৃদু গলায় বললো, নাও খাও।

তুমি খাবে না?

না।

কেন?

আমি পরে খাবো। গলার স্বরে কোন উত্তাপ নেই।

প্লেট থেকে একটি মিষ্টি তুলে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল মুনিম।

নাও, তুমি আগে খাও নইলে কিন্তু আমি একটাও খাবো না বলে দিলাম। ডলি এবার আর না করলো না।

মুনিম আস্তে করে বললো, আমার ওপরে মিছামিছি রাগ করো না ডলি।

একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো, আমার কোন দোষ নেই।

ডলি মৃদু হাসলো, আমি কি তোমার কাছে কোন কৈফিয়ত চেয়েছি?

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো মুনিম, টেবিল ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে সে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো, ইতস্তত করে বললো, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। এক্ষুণি যেতে হবে আমার ডলি। ছ'টার সময় আমার একটা মিটিং আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিটিং? ডলির মুখখানা ম্লান হয়ে এলো। আমার জন্মদিনেও তোমাকে মিটিং-এ যেতে হবে! আমি তোমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবো বলে এ্যাডভান্স টিকিট কেটেছিলাম।

না ডলি, তা হয় না। মুনিমের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর। আমাকে মিটিং-এ যেতে হবে, না গেলে চলবে না। ডলি ভ্রু বাঁকিয়ে সরে গেলো জানালার পাশে, তারপর চুপচাপ কি যেন ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে।

মুনিম পেছন থেকে ডাকলো, ডলি।

ডলি ফিরে তাকিয়ে বললো, তুমি মিনিট কয়েকের জন্যেও কি বসতে পারবে না?

তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি আলাপ ছিলো।

বলো। মুনিম বসলো।

ডলি কোন রকম ভূমিকা করলো না। ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবাস?

মুনিম অবাক হলো। সে ভেবে পেল না কেন আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন করছে ডলি। কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

আছে।

কারণ?

আমার প্রতি তোমার উদাসীনতা। কি মনে করছো তুমি আমায়। আমি কি তোমার ভালবাসার কাঙাল? না তোমার ভালবাসা না পেলে আমি মরে যাবো? সব সময় তুমি সভা-সমিতি আর আন্দোলন নিয়ে থাকবে আর আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে, কি মনে করেছো তুমি? আমি বাচ্চা খুকি নই। সব বুঝি, এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে রীতিমত হাঁপাতে লাগলো ডলি।

কি বলবে, কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না মুনিম। হতবিহ্বলভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। ইতস্তত করে বললো, তোমার এসব প্রশ্নের জবাব দেবার মতো সময় এখন আমার হাতে নেই।

ডলি তীব্র গলায় বললো, যাচ্ছতো, আর এসো না।

যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে ফিরে তাকালো মুনিম। তারপর বললো, আচ্ছা! বলে বেরিয়ে গেলো সে।

মুনিম চলে গেলে খানিকক্ষণ পাথরে গড়া পুতুলের মুর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ডলি।

দেহটা উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করলে পর একখানা সোফার উপর বসে পড়লো সে।

পাশের ঘরে ডলিকে খোঁজ করে না পেয়ে এ ঘরে এলো বজলে হোসেন।

দেখা পেয়ে ঈষৎ ক্লান্তির ভাব করে বললো, কি ব্যাপার, তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। এখানে একা বসে করছো কি তুমি?

কিছু না। এমনি বসে আছি। ডলি সোফার ওপরে মাথাটা এলিয়ে দিলো। তোমার শরীর খারাপ করছে নাকি?

না।

মুনিম কি চলে গেছে?

হ্যাঁ।

ওকি, তোমার মাথা ধরেছে নাকি। অমন করছো কেন?

কি করছি। ওর উদ্বেগ দেখে ফিক করে হেসে দিলো ডলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর কি মনে হতে আজ এক নতুন দৃষ্টি নিয়ে বজলেকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলো ডলি। তারপর অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো, আচ্ছা হাসু বাই, রোজ তুমি কেন এখানে আস বলতো?

বজলে ইতস্তত করে বললো, যদি বলি তোমাকে দেখতে।

ওর কথায় হঠাৎ যেন শিউরে উঠলো ডলি। মনে মনে খুশি হলো সে। প্রসন্ন হলো।

কিন্তু সে ভাবটা গোপন রেখে আবার জিজ্ঞেস করলো, কেন দেখতে আসো? দেখবার মতো কি আছে আমার?

তোমার রূপ! তোমার সৌন্দর্য। নরোম গলায় জবাব দিলো বজলে।

ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। এক ঝলক সূক্ষ্ম হাসি ঢেউ খেলে গেলো ঠোঁটের এক কোণ ঘেঁষে। সাদা গাল রক্তাভ হলো। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সহসা সে বললো, আমার কাছে একখানা বাড়তি টিকিট আছে, সিনেমায় যাবে?

অফকোর্স। বজলের মনটা খুশিতে ভরে উঠলো।

ডলি ওর দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে বললো, চলো।

পথে ডলি রিকসা নিতে চাইলো।

বজলে বললো, না জন্মদিনে রিকসা নয় ট্যাক্সিতে যাবো।

ডলি না করতে পারলো না। মৃদু স্বরে বললো, তাই ডাকো।

সিনেমা হলে এসে মাহমুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ওদের। শাহানাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে মাহমুদ। কাঁধের উপরে ঈষৎ চাপ দিয়ে বজলে চাপা গলায় শুধালো, শাহানা বুঝি আজকাল তোমার কাছে আছে?

হ্যাঁ। মাহমুদ মৃদু হাসলো। জান তো, ওর স্বামী ওকে ডিভোর্স করেছে। এখন আমার কাছে থাকে।

শাহানার পরনে একটা কমলা রঙের শাড়ি। গায়ে কারু আঁকা ব্লাউজ। পায়ে একজোড়া হাইহিল জুতো। ডলির সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল বজলে। কাঁধটা একদিকে ঈষৎ কাৎ করে পিটপিট চোখে ডলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ধূর্তের মতো হাসলো মাহমুদ। তারপর বজলেকে একপাশে ডেকে এনে বললো, মেয়েটা দেখতে বেশ তো।

জোটালে কোত্থেকে।

বজলে বিস্মিত হলো। তোমাকে ওর কথা আগে একদিন বলেছিলাম, বলিনি?

কই মনে পড়ছে নাতো?

হ্যাঁ বলেছিলাম। তুমি ভুলে গেছো। ও আমার মামাতো বোন।

ওর কাঁধজোড়া ঝাঁকালো মাহমুদ। তারপর অদূরে দাঁড়ানো ডলির দিকে বারকয়েক ফিরে ফিরে তাকালো সে।

বজলে ওর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলো।

মাহমুদ বললো, চলো এককাপ করে কফি খাওয়া যাক। শো শুরু হবার এখনো বেশ দেরি আছে।

বজলে বললো, চলো।

শাহেদ চলে যাবার পর, টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে একটা বই নাড়াচাড়া করলো সালমা। বইতে আজ মন বসছে না তার। বড় চাচার শেষের কথাগুলো বারবার কানে বাজছে। আর রওশনের মুখখানা ভেসে উঠছে বইয়ের পাতায়। বসে বসে অনেক অবাস্তব চিন্তার জাল বুনে চললো সে। এখন যদি হঠাৎ রওশন এখানে এসে পড়ে? কে জানে হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে দেশে। রওশন ছাড়া পেয়েছে জেল থেকে। তার চোখে মুখে আনন্দের চমক। সে দোরগোড়া থেকে ডাক দিলো, সালমা আমি এসেছি দরজা খোল। না, এই নিঃসঙ্গ জীবন আর ভাল লাগে না। এই ক্ষুদ্র দেহে একবড় ক্লান্তির বোঝা আর বয়ে বেড়াতে পারে না সালমা। পাশের বাড়ির রেডিওটায় কি একটা গান হচ্ছিলো। মাঝে মাঝে কান পেতে সেটা শুনতে চেষ্টা করছিলো সে। সদরে কড়া নড়ার শব্দ হতে বইটা বন্ধ করে রেখে পরনের কাপড়াটা দু'হাতে একটু পরিপাটি করে নিলো সালমা। দরজাটা খুলে দিয়ে ঠিক তাকে চিনতে পারলো সে। আপনি আসাদ ভাই না?

হ্যাঁ। আস্তে জবাব দিলো আসাদ।

আসুন।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে এলো সালমা। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, বসুন।

আসাদ বসলো। বসে চারপাশে চোখ বুলিয়ে এটা সেটা দেখতে লাগলো সে। সালমা ভাবলো, এমনি বোবার মত চুপ করে বসে থাকা যায় না। কিছু একটা বলতে হয়। কিন্তু বলার মত কোন কথা খুঁজে পেলো না সে। অবশেষে ইতস্তত করে শুধালো চা খাবেন।

না থাক। আসাদ নড়েচড়ে বসলো।

না কেন। খান না এককাপ। বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে খাটের তলা থেকে স্টোভটা টেনে নিলো সালমা।

আসাদ এবার না করলো না। সেও খুঁজছিলো মনে মনে। কিছু বলতে হবে। এমনি জড়ের মত কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়। আর একটু পরে একটা প্রশ্ন করলো সে। আপনি বুঝি মেডিকেলে পড়েন?

ইউনিভার্সিটিতে।

ও। সালমা স্টোভে আগুন ধরিয়ে দিলো।

খানিকক্ষণ পর আসাদ আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনার ছোট ভাইকে দেখছি না যে, উনি কোথায়?

শাহেদের প্রসঙ্গ উঠতে মুখখানা কালো হয়ে গেলো সালমার। গলা নামিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে বললো, ও সিনেমায় গেছে।

সিনেমায়? আসাদ রীতিমত অবাক হলো। কিন্তু এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করলো না সে। চায়ের পেয়ালাটা ওর হাতে তুলে দিয়ে আলোচনাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো সালমা। আজ ধরপাকর হয়েছে। শুনেছেন কিছু?

না।

কাল তো রোজা রাখতে হবে।

হ্যাঁ।

ভোররাতের কিছু বন্দোবস্ত করেছেন?

ভাত রেঁধে রেখেছি। তরকারি নেই, সাদা ভাত। শুধু ডিম দিয়ে খেতে হবে কিন্তু। ঈষৎ হাসলো সালমা।

আসাদ আস্তে করে বললো, আমার অভ্যেস আছে।

রাতে বাসায় ফিরতে বেশ দেরি হলো মুনিমের। সারাদিন ছুটাছুটি করে ভীষণ ক্লান্ত সে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার শক্তি পাচ্ছিলো না। কিন্তু এই অপরিসীম ক্লান্তির মাঝেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় যেন একটা অফুরন্ত শক্তির উৎস লুকিয়ে ছিলো। যা তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো সামনের দিকে। মনে পড়লো। বাবার কেরানী বন্ধু রসুল সাহেবের সঙ্গে আজ বিকেলে যখন মেডিকেলের সামনে দেখা হয়েছিলো তখন তিনি কাছে এগিয়ে এসে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এবার কি একেবারে চুপ করে থাকবে তোমরা? কিছু করবে না?

আমরা আপনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখছেন তো আমাদের হাত পা একেবারে বাঁধা। বলেছিলো আরেকজন। সে লোকটা কাজ করে কোন এক ব্যাঙ্কে।

ওদের কথা ভাবতে গেলে নিজেকে অনেক বড় মনে হয় মুনিমের। আর তখন সমস্ত ক্লান্তি তার কর্পূরের মতো উড়ে যায়।

বাসায় ফিরে মুনিম দেখলো, টেবিলে ভাত সাজিয়ে মা বসে আছেন। আমেনার সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ করছেন তিনি। ওকে আসতে দেখে মা তিরস্কার করে বললেন, এই একটু আসি বলে সকালে বেরিয়ে গিয়ে এই রাত দশটায় ফিরছিস তুই। এদিকে আমি চিন্তা করে মরি। ঘর বাড়ি কি কিছু নেই নাকি তোর?

মায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো মুনিম। তারপর গম্ভীর গলায় বললো, জানো মা, সেবার যে গুলি করে কতগুলো ছেলেকে মেরেছিলো, তাদের জন্যে আমরা একটু শোক করবো তাও দিচ্ছে না ওরা।

মিনসেদের হয়েছে কি। কাঁদতেও দেবে না নাকি? মা অবাক হলেন। মুনিম সাগ্রহে বললো, তাইতো মা, কাঁদবার জন্যে আন্দোলন করছি।

কিন্তু বাবা তোমার আন্দোলন করে কাজ নেই। পরক্ষণে জবাব দিলো মা। যে মায়ের পাঁচ-সাতটা ছেলে আছে তারা আন্দোলন করুক। তুমি আমার এক ছেলে. তোমার ওসবে দরকার নেই।

আরো কিছুক্ষণ সেখানে বসে থেকে মা চলে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে। হতাশ হয়ে টেবিলের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মুনিম। মাকে নিয়ে বড় জ্বালা ওর।

মা চলে যেতে আমেনা বললো, মিন্টু এসেছিলো। কি একটা বই দিয়ে গেছে তোমার জন্যে। বলে মায়ের ঘর থেকে বইটা এনে ওর হাতে দিতে গিয়ে ফিক করে হেসে দিলো আমেনা। তারপর চলে গেলো সে।

প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলো মুনিম। পরে, বইটা দেখে বুঝতে পারলো কেন হেসেছে আমেনা। বহুদিন আগে কোন এক জন্মদিনে যে বইটা ডলিকে উপহার দিয়েছিলো সে, সেটা মিন্টুর হাতে ফেরত পাঠিয়েছে ডলি। কি অর্থ হতে পারে এর?

চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ, না ক্ষণিকের অভিমান?

বইটা ওলটাতে গিয়ে মুনিম দেখলো ভেতরে একখানা চিঠি। আগ্রহের সঙ্গে চিঠিটা খুলে পড়লো মুনিম। ডলি লিখেছে–

মুনিম,

তুমি উত্তর মেরুর মানুষ, আমি দক্ষিণ মেরুর।

ভেবে দেখলাম তোমাতে আমাতে মিলন সম্ভব নয়। তাই বজলেকে গ্রহণ করলাম। ওকে আমি ভালবাসি নি কোনদিন। তবু, একই মেরুর মানুষ তো, খাপ খাইয়ে নিতে পারবো। তুমিও পারবে বলে আশা করি।

ইতি। –ডলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠি পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেলো মুনিম।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে তার ওপরে বসলো সে।

হয়তো এমনো হতে পারে যে ডলি যা লিখেছে সেটা ওর মনের কথা নয়।

হয়তো বা মনের কথা। কিন্তু হঠাৎ এমন পরিবর্তনের কি হেতু থাকতে পারে?

মুনিম তো কোন দুর্ব্যবহার করে নি ওর সঙ্গে।

ডলি নিজে রাগ করে যেতে নিষেধ করেছ।

একটু পরে চিঠিটা জামার পকেটে রেখে দিয়ে মুনিম ভাবলো কাল একবার সময় করে ডলির সঙ্গে দেখা করবে।

রাতে জাহানারাদের বাসায় থাকবে বলে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিয়েছিলো মুনিম। ঘরে থাকা নিরাপদ নয়। যে কোন সময় হামলা হতে পারে।

তাই রাতের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়লে আমেনাকে বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে বলে রাস্তায় নেমে এলো মুনিম।

পেছন থেকে আমেনা চাপা স্বরে বললো, সাবধানে থেকো ভাইয়া।

মুনিম অন্ধকারে মৃদু হাসলো।

বাইরের জীবনে যখন গভীর নৈরাশ্য পাথরের মত চেপে বসছে মানুষের মনে, যখন প্রতিটি পদক্ষেপ শঙ্কা ভয় আর ত্রাসে জড়িয়ে আসতে চায় আর একটি মুহূর্তের জন্যে মানুষ তাকে বিপদমুক্ত বলে ভাবতে পারে না, সব সময় মনে হয় ওই বুঝি মৃত্যু নেমে এলো তার ভয়াবহ নীরবতা নিয়ে, তখনো সংসারে স্নেহ প্রেম আর ভালবাসা পাশাপাশি বিরাজ করে বলেই হয়তো মানুষগুলো এখনো বেঁচে আছে। একবার চারপাশে সন্তর্পণে তাকিয়ে নিয়ে দ্রুত সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে ওপাশের সরু গলিতে গিয়ে ঢুকলো মুনিম।

জাহানারা আর তার অধ্যাপক স্বামী টেবিলে ভাত সাজিয়ে ওর অপেক্ষায় বসেছিল। ওরা ভেবেছিলো হয়তো মুনিম এখানে খাবে। তাই দোকান থেকে কিছু ভাল কবাব এনে রেখেছিলো।

জাহানারা ভাত খাবে না। রুটি খাবে। দু'দিন থেকে ঠাণ্ডা লেগে গায়ে মৃদু জ্বর এসেছে ওর। তাছাড়া এক বেলা রুটি খাবার চিন্তাটা কিছুদিন থেকে মাথায় ঢুকেছে। ওতে নাকি বাড়তি মেদ কমে যায়। জাহানারার মতে শুধু ওর কেন সবার মতে দিনে দিনে বড় বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে সে। পরিচিত দু'একজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করেছে জাহানারা। সব রোগের ওষুধ আছে, আর এই যে বিশ্রী রকমের মোটা হয়ে যাচ্ছি এর কোন ওষুধ নেই আপনাদের কাছে?

ডাক্তার বন্ধুরা কেউ শব্দ করে হেসে দিয়েছে, আছে বইকি। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিন। দেখবেন, যে হারে মোটা হয়েছেন সে হারে শুকিয়ে যাবেন।

কেউ বলেছে, সকালে উঠে কিছু ডন বৈঠক দিন। দেখবেন দু'দিনেই সব বাড়তি মাংস ঝরে যাবে।

আবার কেউ বলেছে, এক কাজ করুন না, দু'বেলা ভাত খাওয়াটা বন্ধ করে একবেলা রুটি খেতে শুরু করুন আর দৈহিক শ্রমটা বাড়িয়ে দিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

শেষের প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো জাহানারার। তাই ক'দিন ধরে একবেলা রুটি খাবার চিন্তা করছিলো সে।

মুনিম এসে জানালো সে খেয়ে এসেছে। শুনে আহত হলো জাহানারা।

বললো, তোমাকে তখন বলে দিয়েছিলাম, এখানে খাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুনিম কি জবাব দেবে প্রথমে কিছু ভেবে পেলো না। পাঠ না পারা ছাত্রের মত বার কয়েক ঘাড় চুলকালো সে। একবার অধ্যাপকের দিকে আর একবার জাহানারার দিকে তাকিয়ে বললো, উপায় ছিলো না, বুঝলে বাসায় না খেলে মা ভীষণ রাগ করতেন। আর তুমি তো জান উনি আমাকে নিয়ে সব সময় কেমন বাড়াবাড়ি করেন।

জাহানারা কিছু বলতে যাচ্ছিলো। অধ্যাপক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, খেয়ে এসেছো ভালো কথা। আমরা অনেকক্ষণ ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি, বেশি না পারো আমাদের সঙ্গে অল্প চারটে খাও। অন্তত কবাবটা। ওটা তোমার জন্যেই আনা।

না বললে যে ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না তা জানতো মুনিম।

অগত্যা চেয়ার টেনে বসলো সে।

খাওয়ার অবসরে বাইরের অবস্থা জানতে চাইলো অধ্যাপক।

কাল সত্যি সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে? আবার সেই বায়ান্ন সালের পুনরাবৃত্তি হবে না তো, আবার সেই রক্তপাত?

অধ্যাপক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। তার প্রশস্ত কপালের ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকে এলো সামনে। মুনিমের কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে নিজে থেকে আবার বলতে লাগলো সে, তোমাদের ওই নেতাদের ওপর আমার এতটুকু আস্থা নেই। আমি জানি এবং বেশ ভালো করে জানি, ওদের মধ্যে কোন পৌরুষ নেই। কতগুলো ভীরু কাপুরুষ ওরা! তোমার কি মনে হয় ওরা এ সময়ে তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে?

মুনিম এবারও নিরুত্তর রইলো। নেতাদের সে নিজেও যে খুব বিশ্বাসের চোখে দেখে তা নয়। আর বিশ্বাস করবেই বা কেমন করে। নেতাদের কাছে দল বেঁধে দেখা করতে গিয়েছিলো। ওরা ওদের সক্রিয় সাহায্য চেয়েছিলো, ওরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে।

বিব্রত গলায় বলছে, দেখো সাংঘাতিক কিছু করে বসো না তোমরা। দেখো যেন শান্তি ভঙ্গ না হয়।

শান্তি বলতে কি মনে করে ওরা।

অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা? আক্রমণের মুখে আত্মসমর্পণ?

আমি জানি। তোমাদের ওই নেতারা কি চায়। টেবিলের ওপাশ থেকে অধ্যাপক আবার বললো, ওদের আশু লক্ষ্য হলো গদি দখল করা। আর পরবর্তী অভিপ্রায় হলো বাকি জীবনটা যাতে স্বচ্ছন্দে কাটে সে জন্যে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করা। তুমি কি মনে করেছো ওরা এ দেশকে ভালবাসে? দেশবাসীর জন্যে দরদে বুক ওদের ফেটে চৌচির হয়ে যায়, তাই না? তুমি কি–। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো অধ্যাপক। মুনিম মাঝপথে বাধা দিয়ে বললো, তা আমি জানি। তারপর আবার চুপ করে গেলো সে। খানিকক্ষণ তিনজনে নীরব রইলো।

ছোট মেয়েটা ঘুম থেকে ওঠে কান্না জুড়ে দিয়েছিলো। উঠে গিয়ে তাকে শান্ত করে এসে আবার টেবিলে বসলো জাহানারা। অধ্যাপক স্ত্রীর দিকে এক পলক তাকালো, তারপর মুনিমের দিকে চোখজোড়া ফিরিয়ে এনে আবার বললো, কিন্তু ওরা যদি এ সময়ে তোমাদের পাশে এসে না দাঁড়ায় তাহলে একা একা কতক্ষণ লড়বে তোমরা?

তা জানি না।

মুনিমকে হঠাৎ যেন বড় চিন্তিত মনে হলো। একটু থেমে আস্তে সে বললো, শুধু জানি, ওদের জন্যে আমাদের কাজ থেমে থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক টুকরো রুটি মুখে তুলতে গিয়ে থেমে মুনিমের দিকে তাকালো জাহানারা।

অধ্যাপকের মুখখানা শিশুর সরল হাসিতে ভরে উঠলো।

বার কয়েক মাথা নেড়ে সে বিড়বিড় করে বললো, হ্যাঁ, এমন কথা শুধু তোমরাই বলতে পারো। যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশকে ভালবাসতে শিখেছে শুধু তারাই বলতে পারে। হ্যাঁ, কেবলমাত্র তারাই পারে। আনন্দে দেহটা বার কয়েক কেঁপে উঠলো তার।

কিন্তু মনিম জানে এ কথা ওর নয়।

আরেকজনের।

বাইশে ফেব্রুয়ারি গুলি খেয়ে মরেছে সেই হাইকোর্টের মোড়ে, তিন বছর আগে।

তিন বছর?

হ্যাঁ তিনটে বছর। কিন্তু এখনো তার মুখখানা স্পষ্ট মনে আছে মুনিমের। শুধু তার মুখ কেন, তাদের সকলের মুখ আজো ভেসে ওঠে তার চোখে।

কাক ডাকা ভোর না হতে সেদিন দলে দলে তারা এসে জমায়েত হয়েছিলো মেডিকেল কলেজের পুরোনো হোস্টেলে।

ছেলে। বুড়ো। মেয়ে।

ছাত্র। শ্রমিক। কেরানী।

কত লোক হবে?

কেউ গুনে দেখে নি। আকাশের তারা গুনে কি শেষ করা যায়। যেদিকে তাকাও সমুদ্রের মত ছড়িয়ে আছে জনতা। আর সবার কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর।

এর জন্যে বুঝি পাকিস্তান চেয়েছিলাম আমরা?

আমাদের ছেলে-মেয়েদের ধরে ধরে মারবার জন্যে?

হায় খোদা তুমি ইনছাফ করো এর।

গায়েবি জানাযা পড়ার জন্যে সমবেত হয়েছিলো ওরা। আর বুড়ো ইমাম সাহেব মোনাজাত করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, যারা আমাদের কচি ছেলেদের গুলি করে মারলো, খোদা তুমি তাদের ক্ষমা করো না।

সূর্য তখন ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছিলো পুবের আকাশে।

গায়েবি জানাযা শেষ হলে পর জোয়ারের বেগে মিছিলে বেরিয়ে পড়লো সবাই। নেতারা কেউ ছিলেন না।

তারা কখনই বা ছিলেন?

ফরহাদ বললো, বাদ দাও ওদের কথা। আমাদের কাজ আমরা করে যাবো। মেডিকেল থেকে বেরিয়ে মিছিলটা এগিয়ে চলেছিলো হাইকোর্টের দিকে। ফরহাদ হাত ধরে টানলো ওর। এসো মুনিম।

তারপর জনতার মাঝখানে হারিয়ে গেলো ওরা।

ভাইসব মিছিলে আসুন। কে যেন ডাকলো।

তুমি কি যাবে না, চলে এসো।

খোদার কছম বলছি ওরা জাহান্নামে যাবে। খোদা কি ওদের বিচার করবে না মনে করছো? আলবত করবেন।

ওকি কাঁদছেন কেন। কেঁদে কি হবে।

আওয়াজ তুলুন ভাইসব।

তারপর সাগর কল্লোলের মত চিৎকারে ফেটে পড়লো বিক্ষুব্ধ জনতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরহাদের হাতে একটা নাড়া দিয়ে মুনিম বললো, তোমার কি মনে হয় আজকেও ওরা গুলি করবে?

জানি না। মৃদু গলায় জবাব দিয়েছিলো ফরহাদ। করলে করতে দাও। ক'জন মারবে ওরা।

প্রশস্ত রাস্তা জুড়ে মিছিলটা এগিয়ে চলেছিল হাইকোর্টের পাশ দিয়ে। অকস্মাৎ কয়েকখানা মিলিটারি লরী দ্রুতবেগে এসে রাস্তার তেমাথায় যেখানে লম্বা পলাশ গাছটায় অসংখ্য লালফুল ধরেছিলো, সেখানে এসে থামলো। আর পরক্ষণে ইউনিফর্ম পরা সৈন্যরা সার বেঁধে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে রাইফেলের নলগুলো তাক করে ধরলো মিছিলের দিকে। কয়েকটি উত্তেজিত মুহূর্ত।

ভাবতে গায়ের লোমগুলো এখনো বর্শার ফলার মত খাড়া হয়ে যায় মুনিমের। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর্ত চিৎকার ভেসে আসে কানে।

খোদা ইনছাফ করবে।

খোদা আমি যে মরে গেলাম।

মাগো।

আমাকে বাঁচাও, মরে গেলাম।

মুমূর্ষের চিৎকার আর পোড়া বারুদের গন্ধ।

পোনা মাছের মতো মানুষগুলো ছুটে চারপাশে। হাইকোর্টের রেলিঙ ডিঙ্গিয়ে ভেতরে আত্মগোপন করতে যাচ্ছিলো যে লোকটা, রেলিঙের উপরেই ঝুলে পড়লো সে। কে জানে হয়তো শেষ মুহূর্তে স্ত্রীর মুখখানা ভেসে উঠেছিলো তার চোখে। বাচ্চা মেয়েটার কথা মনে পড়েছিলো। হঠাৎ তাইতো জীবনের প্রতি গভীর মমতা জন্মে গিয়েছিলো। ভেবেছিলো পালিয়ে বাঁচবে। কিন্তু সে জানতো না ইতিমধ্যে তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে। আরেকটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলে। পায়ে গুলি লেগেছিলো তার, তবু বুকে হেঁটে পালাতে চেষ্টা করছিলো সে আর ভয়ার্ত স্বরে বারবার বিড়বিড় করে বলছিলো, আমাকে মেরো না।

কিছুদূর এগুতে জন্মের মত বাক রোধ হয়ে গেলো তার।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ছেলেটির দিকে ছুটে গিয়েছিলো ফরহাদ।

তার গায়ে যে গুলি লাগতে পারে সে কথা মনে ছিলো না। শুধু মনে ছিলো, আমাদের কাজ আমরা করে যাবো।

কি ভাবছো অমন করে? অধ্যাপকের গলার স্বরে চমকে তার দিকে তাকালো মুনিম। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে নিয়ে সে বললো, আমি বুঝতে পারছি তুমি কি ভাবছ।

কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, দিন এক রকম যায় না। বলে পানির গ্লাস এক নিঃশ্বাসে শেষ করে হাত ধোয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো সে। ওদের আলোচনার বিষয়গুলো খুব উপাদেয় লাগছিলো না জাহানারার। তাই বিষয়ান্তরে যাবার জন্যে মুনিমের দিকে একটু ঝুঁকে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, ডলির কি খবর?

নিজেকে সহসা বড় অসহায় মনে হলো মুনিমের। কে জানে, জাহানারা হয়তো ইতিমধ্যে শুনেছে সব, কিম্বা শোনে নি। তবু কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে গেলো সে।

জাহানারা আবার প্রশ্ন করলো, ডলি কেমন আছে?

মুনিম বললো, জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারার ঠোঁটে মৃদু হাসি জেগে উঠলো। না জানবার তো কথা নয়।

জাহানারার দিকে স্থির চোখে তাকালো সে। মুখখানা বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতায় ভরা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে বললো, তার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না জাহানারা, প্লিজ–। দৃঢ় গলায় কথাটা বলবে ভেবেছিলো, কিন্তু ফাটা বাঁশের বাঁশির মত শোনাল সবকিছু। এ সময় ডলির কথাটা না তুললে কি ভাল করতো না জাহানারা?

কাণ্ডজ্ঞানহীন আর কাকে বলে। তার ওপর রাগ করার কোন অর্থ হতে পারে না জেনেও চেয়ারটাতে সশব্দে পেছনের দিকে ঠেলে, পাশের ঘরের যেখানে অধ্যাপক হাত ধুয়ে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো, সেখানে তার পাশে গিয়ে বসলো মুনিম।

জাহানারা বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ।

রাত দুপুরে কিউ খানের বাসা থেকে লোক আসবে তাকে ডাকতে, এ কথা ঘুমোবার এক মুহূর্ত আগেও ভাবেনি মাহমুদ। লেপের ভেতরে কি আরামে শুয়েছিল সে। একটা সুন্দর স্বপ্নও ইতিমধ্যে দেখেছিলো। এখন আবার কাপড় পড়ে যেতে হবে সেই দু' মাইল দূরে, কিউ খানের বাসায়। ভাবতে গিয়ে মেজাজটা বিগড়ে গেলো মাহমুদের। দুত্তরি তোর চাকুরির নিকুচি করি। রাত নেই দিন নেই ডেকে পাঠাবে, যেন কেনা গোলাম আর কি। মনে মনে বিড়বিড় করলো সে। তারপর গরম কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে একটু পরে বাইরে বেরিয়ে এলো।

সাহানা ঘুমুচ্ছে।

ঘুমোক।

কিউ খানের বাসায় এসে দেখলো সে একা নয়। আরো অনেকে এসেছে সেখানে। বাইরে বারান্দায় রীতিমত ভিড় জমে গেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাসটা নীল হয়ে আসছে। ইন্‌সপেক্টর রশীদকে সামনে পেয়ে একপাশে ডেকে নিয়ে এলো মাহমুদ। ব্যাপারটা কি বলতো, এই রাত দুপুরে?

ইন্‌সপেক্টর রশীদ বিরক্তি প্রকাশ করে বললো, রাতে কয়েকটি বাসা সার্চ করতে হবে বোধ হয়, আমি ঠিক জানি না। তারপর গলার স্বরটা আরো একটু নামিয়ে এনে বললো, বড় কর্তারা সবাই ভীষণ ক্ষেপে গেছে। ভেতরে এখন ক্লোজ ডোরে আলাপ-আলোচনা চলছে ওদের।

মাহমুদ বললো, তাহলে এখনো কিছু ঠিক হয় নি।

রশীদ মাথা নাড়লো, না।

মাহমুদ হতাশ গলায় বললো, রাতের ঘুমটা একেবারে মাটি হলো। রশীদ মৃদু হেসে বললো, ক'রাতের হয় দেখো। আবহাওয়া ভীষণ গরম। বড় কর্তা রেগে গিয়ে বলেছে, এত কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে শহরে অথচ কাউকে গ্রেফতার করা হলো না, কেমন কথা?

মাহমুদ বললো, আমারো তাই মত। ধরে সবগুলোকে জেলে পোরা উচিত। রশীদ আবার হাসলো। তেমনি চাপা স্বরে বললো, ধরা উচিত তো বুঝলাম। কিন্তু ক'জনকে ধরবে।

মাহমুদ পরক্ষণে বললো, কেন যারা এসব করছে তাদের সকলকে। বাইরে আকাশটা কুয়াশায় ছাওয়া ছিলো। সেদিকে তাকিয়ে ইন্‌সপেক্টর রশীদ জবাব দিলো, ধরে শেষ করতে পারবে বলে তো মনে হয় না। বলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো রশীদ। কেউ শুনলো নাতো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাহমুদ কাঁধ ঝাঁকালো । যাকগে, আমাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কর্তারা যা করার করবে যদি বলে ধরো, ধরবো। যদি বলে ছাড়ো, ছাড়বো। যদি বলে মারো, মারবো। আমাদের কি ভাই, টাকা পাই চাকরি করি। বলে একটা চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লো মাহমুদ। হ্যাঁ তোমার কাছে সিগারেট আছে? তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে আমার প্যাকেটটা ফেলে এসেছি বাসায়। রশীদ কিছু বললো না, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলো তার দিকে। বাইরে ঘন কুয়াশা ঝরছে।

ভেতরে কর্তারা বৈঠক করছেন এখনো।

মাঝে মাঝে তাদের হাসির শব্দ ভেসে আসছে বাইরে। মাঝে মাঝে উগ্র গলার স্বর। এখান থেকে স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না কি বলছে তারা। মাহমুদ সিগারেটে একটা জোর টান দিলো।

পরদিন বিদ্যালয়ের গেটে যেখানে নোটিশ বোর্ডগুলো টাঙ্গানো ছিলো, তার পাশে সাঁটানো, লাল কালিতে লেখা একটি দেয়াল পত্রিকার উপর দল বেঁধে ঝুঁকে পড়লো ছেলে-মেয়েরা। কারো পরনে শাড়ি, কারো সেলওয়ার। দেয়াল পত্রিকাটা পড়ছিলো আর গম গম স্বরে কথা বলছিলো ওরা।

নীলা আর বেনু অদূরে দাঁড়িয়ে।

সারা রাত জেগে ওই দেয়াল পত্রিকা লিখেছে ওরা।

কাল রাতে কেউ ঘুমোয় নি।

কালো বার্নিশ দেয়া কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে পা টিপে টিপে যখন নিচে নেমে আসছিলো নীলা তখন হাত ঘড়িটায় বারটা বাজে। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর চাপা গলার ফিসফিসানি। করিডোর পেরিয়ে ডান কোণে বেনুর ঘরে এসে জমায়েত হয়েছিল ওরা।

বাতি কি জ্বালবো?

না।

মোম আছে?

আছে।

জানালাগুলো বন্ধ করে দাও। সুপার কি ঘুমিয়েছে?

হ্যাঁ।

দরজায় খিল দিয়ে দাও। ম্যাচেশটা কোথায়। আহ্ শব্দ করো না, সুপার জেগে যাবে।

টেবিল চেয়ারগুলো একপাশে সরিয়ে নিয়ে, মসৃণ মেঝের ওপরে গোল হয়ে বসলো ওরা।

বাইরে রাত বাড়ছে।

মোমবাতির মৃদু আলোয় বসে দেয়াল পত্রিকাগুলো লিখছে ওরা। তাই আজ বিদ্যালয়ের সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ওরা কান পেতে শোনার চেষ্টা করছিলো কে কি মন্তব্য করে।

আমতলায় জটলা করে দাঁড়িয়েছিলো তিনটি ছেলে আর দু'টি মেয়ে।

একটি ছেলে সহানুভূতি জানিয়ে একটি মেয়েকে বললো, খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে নাতো আপনাদের?

কষ্ট? কি যে বলেন। মেয়েটি ঈষৎ ঘাড় নেড়ে বললো, খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস আছে আমাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদূরে বেলতলায় বসে একদল নতুন ছেলেকে একুশে ফেব্রুয়ারির গল্প শোনাচ্ছিলো কবি রসুল।

সত্যি বরকতের কথা ভাবতে গেলে আজো কেমন লাগে আমার। মাঝে মাঝে মনে হয় সে মরে নি। মধুর রেস্তোঁরায় গেলে এখনো তার দেখা পাবো। বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো তার। সে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। কালো রঙের লম্বা লিকলিকে ছেলে।

সেদিন এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলাম আমরা। রাইফেলধারী পুলিশগুলো তখন সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে। ইউনিফর্ম পরা অফিসাররা ঘোরাফেরা করছিলো এদিক সেদিক আর মাঝে মাঝে উত্তেজিতভাবে টেলিফোনে কি যেন আলাপ করছিলো কর্তাদের সঙ্গে। বলতে গিয়ে সেদিনের সম্পূর্ণ ছবিটা ভেসে উঠলো কবি রসুলের চোখে। সকাল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে ছাত্ররা এসে জমায়েত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে। শহরে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ। দল বেঁধে কেউ আসতে পারছে না তাই। তবু এলো।

বেলা এগারোটায় আম গাছতলায় সভা বসলো ওদের।

দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর সভা।

একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করার চিন্তা করছিলো ওরা।

একজন বললো, ওসব হুজ্জত হাঙ্গামা না করে আসুন আমরা প্রদেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালাই।

ওসব স্বাক্ষর অভিযান বহুবার করেছি। ওতে কিছু হয় না। কে একজন চিৎকার করে উঠলো সভার এক প্রান্ত থেকে।

আর একজন বললো। ওসব মিষ্টি মিষ্টি কথা ছেড়ে দিন কর্তারা।

মিষ্টি কথায় চিড়া ভেজে না। কিছু হবে না ওসব করে।

ওরা তবু বললো। হবে, হবে না কেন। আমরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তারপর মন্ত্রীদের কাছে ডেপুটেশন পাঠাবো।

ওই মন্ত্রীদের কথা রেখে দিন। হঠাৎ ডায়াসের পাশ থেকে কে একজন লাফিয়ে উঠলো।

মন্ত্রীদের আমরা চিনে নিয়েছি।

আরেকজন বললো। দালালের কথা আমরা শুনতে চাই না।

আপনারা বসে পড়ুন।

তারপর বসে পড়ুন চিৎকারে ফেটে পড়লো সমস্ত সভা।

তবু ওদের মধ্য থেকে একজন বললো, দেখুন,আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আপনারা দয়া করে আমার কথা শুনুন। আমায় বিশ্বাস করুন। দেখুন । শুনুন।

না, না। আপনার কথা শুনবো না। আপনি বসে পড়ুন।

আরে, এ লোকটা আচ্ছা পাইট তো, আমরা শুনতে চাইছি না তবু জোর করে শোনাবে।

আরে তোমরা করছো কি লোকটাকে ঘাড় ধরে বসিয়ে দিতে পারছো না? সভার মধ্যে ইতস্তত চিৎকার শোনা গেলো। অবশেষে বসে যেতে বাধ্য হলো লোকটা।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বক্তাদের বাকযুদ্ধ চললো।

কেউ বললো, অমান্য করো।

কেউ বললো, অমান্য করো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে ঠিক হলো, দশজন করে একসঙ্গে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করবে ওরা। দল বেঁধে সবাই জেলে যাবে তবু তাদের মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে দেবে না।

তখন বেলা বারটা।

শীতের মরশুম হলেও সে বছর শীত একটু কম পড়েছিলো। রোদ উঠেছিলো প্রখর দীপ্তি নিয়ে। সে রোদ মাথায় নিয়ে প্রথম দলটা তৈরি হলো আইন অমান্য করার জন্য। একটা লম্বা মত ছেলে ওদের নাম ঠিকানাগুলো টুকে নিচ্ছিলো খাতায়।

আপনার কোন কলেজ?

জগন্নাথ।

আপনার?

আমার কলেজ নয় স্কুল। আরমানিটোলা।

আপনি কোন কলেজের?

মেডিকেল।

আপনি?

ইউনিভার্সিটি।

আর আপনি?

ঢাকা কলেজ।

সবার নাম আর ঠিকানাগুলো একটা খাতায় লিখে নিলো সে।

গেটের বাইরে দাঁড়ানো পুলিশের দল ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গিয়েছিলো। তাই তারাও তৈরি হয়ে নিলো।

একটু পরে ছাত্রদের প্রথম দলটা বেরুলো বাইরে। দশটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ওরা শ্লোগান দিলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

পুলিশের দল এগিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। তারপর গ্রেপ্তার করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিলো সবাইকে।

একটু পরে বেরুলো দ্বিতীয় দল।

তারপর তৃতীয় দল।

পুলিশ অফিসাররা হয়ত বুঝতে পেরেছিলো, গ্রেপ্তার করে শেষ করা যাবে না। তাই ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্যে একজন বেঁটে মোটা অফিসার দৌড়ে এসে অকস্মাৎ একটা কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে মারলো ইউনিভারসিটির ভেতরে।

তারপর আরেকটা।

তারপর কাঁদুনে গ্যাসের ধোঁয়ায় ইউনিভার্সিটি এলাকা নীল হয়ে গেলো। ছেলেমেয়েরা ছিটকে পড়লো চারদিকে। ছত্রভঙ্গ হলো। চোখগুলো সব জ্বালা করছে। ঝাপসা হয়ে আসছে চারদিক। পানি ঝরছে। দু'হাতে চোখ ঢাকলো। কেউ দু'চোখে রুমাল চাপা দিলো। কাঁদুনে গ্যাসের অকৃপণ ধারা তখনো বর্ষিত হয়ে চলেছে। একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো বেলতলায়। দুটো মেয়ে ছুটে এসে পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে এলো তাকে।

আমি আর বরকত দেয়াল টপকে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ঢুকলাম।

তারপর সেখান থেকে দৌড়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে।

ওখানকার ছেলেরা তখন মাইক লাগিয়ে জোর গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে। হোস্টেলের ভেতর লাল সুরকি ছড়ান রাস্তার উপর ইতস্তত ছড়িয়ে সবাই। পুলিশ অফিসারও ততক্ষণে ভার্সিটি এলাকা ছেড়ে দলবল নিয়ে মেডিকেলের চারপাশে জড়ো হয়েছে এসে। একটু পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোস্টেলের ভেতরে কয়েকটি কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে মারলো ওরা। মেডিকেলের ছেলেরা বোকা নয়। তারা সব জানে। কাঁদুনে গ্যাসগুলো ফাটবার আগে সেগুলো তুলে নিয়ে পরক্ষণে পুলিশের দিকে ছুঁড়ে মারলো তারা। রাস্তার ওপাশে কতগুলো ছোট ছোট রেস্তোরাঁ আর হোটেল ছিলো। পুলিশের কর্তারা তার পেছনে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিলো। মেডিকেলের পশ্চিম পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এ্যাসেম্বেলি হাউস ছুঁয়ে রেসকোর্সের দিকে চলে গেছে সে রাস্তার মোড়ে, জীপগাড়িসহ জনৈক এম. এল. এ-কে তখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে একদল ছেলে। বেচারা এম. এল. এ তাদের হাতে পড়ে জলে ভেজা কাকের মতো ঠকঠক করে কাঁপছিলো আর অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলো এদিক সেদিক। আশেপাশে যদি একটা পুলিশও থাকতো। ছেলেরা জীপ থেকে নামালো তাকে। একটা ছেলে তার আচকানের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললো পকেটটা। আরেকটা ছেলে চিলের মত ছোঁ মেরে তার মাথা থেকে টুপিটা তুলে রাস্তায় ফেলে দিলো। লোকটা মনের ক্ষোভ মনে রেখে বিড়বিড় করে বললো, আহা করছেন কি? করছেন কি?

আমি আর বরকত মাইকের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ বরকত বললো, দাঁড়াও আমি একটু আসি। বলে গেটের দিকে যেখানে ছেলেরা জটলা বেঁধে তখনো শ্লোগান দিচ্ছিলো, সেদিকে এগিয়ে গেলো সে। সূর্য তখন হেলে পড়েছিলো পশ্চিমে। মেঘহীন আকাশে দাবানল জ্বলছিলো। গাছে গাছে সবুজের সমারোহ। ডালে ডালে ফাল্গুনের প্রাণবন্যা। অকস্মাৎ সকলকে চমকে দিয়ে গুলির শব্দ হলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। একটা ছেলের মাথার খুলি চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। আরেকটি ছেলে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো মুহূর্তে সেখানে লুটিয়ে পড়লো। আরেক প্রস্থ গুলি ছোঁড়ার শব্দ হলো একটু পরে।

আরেক প্রস্থ।

একটা ছেলে তার পেটটাকে দু'হাতে চেপে ধরে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো বার নম্বর ব্যারাকের বারান্দায়। চোখজোড়া তার ফ্যাকাসে হতবিহবল। আরো তিনটি ছেলে বুকে হেঁটে হেঁটে সে বারান্দার দিকে এগিয়ে এলো। তাদের কারো হাতে লেগেছে গুলি। কারো হাটুতে।

বরকতের গুলি লেগেছিলো উরুর গোড়ায়। রক্তে সাদা পাজামাটা ওর লাল হয়ে গিয়েছিলো। আমরা চারজনে ধরাধরি করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। পথে সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছিলো। বলেছিলো, তোমরা ঘাবড়িয়ো না, উরুর গোড়ায় গুলি লেগেছে, ও কিছু না। আমি সেরে যাবো। সে রাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গিয়েছিলো সে।

অনেকক্ষণ পর কবি রসুল থামলো। কি গভীর বিষাদে ছেয়ে গেছে তার মুখ। একটু পরে বিষাদ দূর হয়ে সে মুখ কঠিন হয়ে এলো।

এনাটমির ক্লাশটা শেষ হতে নার্সেস কোয়ার্টারে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে গেলো সালমা। মালতী তখন স্নান সেরে মাথায় চিরুনি বুলোচ্ছিলো বসে বসে। আসতে দেখে মৃদু হেসে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, বোসো।

সালমা বসলো।

মালতী বললো, ক্লাস থেকে এলে বুঝি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালমা সায় দিলো, হ্যাঁ। তারপর বললো, এ মাসের টাকাটা নিতে এলাম। মালতী বললো, বোসো দিচ্ছি। চিরুনিটা নামিয়ে রেখে সুটকেসটা খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করলো মালতী। তারপর নোটটা সালমার হাতে তুলে দিয়ে মালতী চাপা গলায় আবার বললো, আজকে তোমরা রোজা রাখ নি?

রেখেছি।

সবাই?

হ্যাঁ সবাই। তুমি রেখেছো?

হ্যাঁ। চিরুনিটা আবার তুলে নিয়ে বিছানায় এসে বসলো মালতী। আস্তে করে বললো, তোমরা তো তবু ভোর রাতে খেয়েছো। এখানে আমরা যে ক'জনে রেখেছি, ভোর রাতে খেতে পারিনি। জানতো ভাই, চাকরি করি। রোজা রেখেছি শুনলে অমনি চাকরি নট হয়ে যাবে।

বলতে গিয়ে ম্লান হাসলো সে। রওশনের কোন চিঠি পেয়েছো?

পেয়েছি।

কেমন আছে সে?

ভালো।

তোমার দাদা?

গ্যাস্ট্রিক আলসারে ভুগছে।

এখন কোন্ জেলে আছেন তিনি?

রংপুর।

একটু পরে মালতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নার্সেস কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো সালমা।

মেডিকেলের গেটে ওর জন্য অপেক্ষা করছে আসাদ। দূর থেকে ওকে দেখলো সে। ওর সঙ্গে একদিনের মেলামেশায় অনেক কিছু জানতে পেরেছে সালমা। ঘরে মা নেই, বাবা আছেন। তিনি খুব ভালো চোখে দেখেন না তাকে। রাজনীতি করা নিয়ে সব সময় গালাগালি দেন। একবার তাকে সাজা দেবার জন্য ইউনিভার্সিটির খরচপত্র বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একদিনে তার কাছে অনেক কিছু জানতে পেরেছে সালমা। ছেলেটি জানেশোনে বেশ। কাল ভোর রাতে ভাত খেতে বসে অনেকক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলো ওর সঙ্গে। ওর কথা বলার ভঙ্গিটা অনেকটা রওশনের মত। তবে বড় লাজুক। চোখজোড়া সব সময় মাটির দিকে নামিয়ে রেখে কথা বলে।

কাছাকাছি এসে সালমা বললো, আসতে একটু দেরি হয়ে গেলো, কিছু মনে করবেন না।

না, মনে করার কি আছে। পরক্ষণে জবাব দিলো আসাদ।

সালমা বললো, সেই ইস্তেহারগুলো মুনিম ভাইকে পৌঁছে দিয়েছেন তো?

আসাদ বললো, দিয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সালমা আবার বললো, কাল রাতে পেট ভরে খান নি। এখন খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়।

খাই নি কে বললো? পেট ভরেই তো খেয়েছি। শুধু শুধু আপনি। চোখজোড়া তখনো মাটিতে নামানো। কথা বলতে গেলে হঠাৎ রওশনের মত মনে হয়, বিশেষ করে ঠোঁট আর চিবুকের অংশটুকু। সালমা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে হাতে তুলে দিলো আসাদ। নিন। যে জন্যে এসেছিলাম। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক কালো ব্যাজ আছে এর ভেতরে। এতে হবে তো?

হ্যাঁ, হবে। সালমা ঘাড় নাড়লো।

তাহলে আপনার সঙ্গে কাজ আমার আপাতত শেষ। এখন চলি।

রাতে আবার দেখা হবে।

কালো পতাকার কি হলো? পেছন থেকে প্রশ্ন করলো সালমা।

এখনো দর্জির দোকানে। রাতে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তখন পাবেন। বলে দ্রুতপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে গেল আসাদ।

নীলা, বেনু আর ওদের সঙ্গে একটি অপরিচিত মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখে, ওদের জন্যে দাঁড়ালো সালমা।

নীলা বললো, কি সালমা, কাল আমাদের হোস্টেলে যাবি বলেছিলে। কই গেলে নাতো? চলো এখন যাবে।

সালমা বললো, যাবার ইচ্ছে ছিলো, সময় করতে পারিনি। ওদের সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে ওর নজরে পড়লো নীলা আর বেনুর পরনে দুটো কুচকুচে কালো শাড়ি। বাতাসে শাড়ির আঁচলগুলো পতাকার মত পতপত করে উড়ছে। বাহ্ চমৎকার।

নীলা অবাক হয়ে তাকালো, কি?

ইশারায় দেখিয়ে সালমা জবাব দিলো, তোমাদের শাড়ি।

হ্যাঁ, নীলা মৃদু হাসলো। কালো ব্যাজ পরা ব্যাণ্ড করেছে। আর তাই আমরা কালো শাড়ি পরেছি। দেখি ওরা আমাদের শাড়ি পরা ব্যাণ্ড করতে পারে কিনা।

বেনু এতক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবছিলো। আসাদ সাহেবকে আপনি কত দিন ধরে চেনেন?

সালমা ঠিক এ ধরনের কোন প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না। ইতস্তত করে বললো, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা তাও পুরো হয় নি। কিন্তু কেন বলুন তো?

না এমনি। বেনু দৃষ্টিটা অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে দেখলাম কিনা, তাই।

কথা বলতে বলতে চামেলী হাউসের কাছে এসে পৌছলো ওরা। দূর থেকে দেখলো গেটের সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে।

সালমা বললো, কেউ এল বোধ হয়।

বেনু বললো, আসে নি, যাচ্ছে।

নীলা বললো, গতকাল অনেকে চলে গেছে হোস্টেল ছেড়ে। কারা রটিয়ে দিয়েছে একুশের রাতে পুলিশ হোস্টেলে হামলা করবে, সে খবর শুনে।

সালমা অবাক হলো, তাই নাকি?

দু'টো সুটকেস আর একটা বেডিং তোলা হলো ছাদের ওপর।

যে মেয়েটা চলে যাচ্ছিলো তার দিকে এগিয়ে নীলা বললো, তুইও চললি বিলকিস?

মেয়েটার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো, চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাতে পারলো না সে। শুধু ইশারায়, অদূরে দাঁড়ান ভদ্রলোককে দেখিয়ে আস্তে করে বললো, চাচা এসেছে নিয়ে যেতে। বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো তার অসহায়ভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিভার্সিটিতে এসে প্রথমে মুনিমের খোঁজ করল আসাদ। ভার্সিটির ভেতরটা কালকের চেয়ে আজকে আরো সরগরম। চারপাশে ছেলেরা জটলা বেঁধে ধর্মঘটের কথা আলোচনা করছে।

এমনি একটা জটলার পাশে এসে দাঁড়ালো আসাদ।

একটা ছেলে বললো, তুমি যা ভাবছো, কিছু হবে না, দেখবে কাল রাস্তায় একটা ছেলেকেও বেরুতে দেবে না ওরা।

আরেকজন বললো, অবাক হবার কিছু নেই। কাল হয়তো কারফিউ দেবে।

তৃতীয়জন বললো, আজকেও কি কম পুলিশ বেরিয়েছে নাকি রাস্তায়।

পল্টনের ওখানে চার-পাঁচ লরী পুলিশ দেখে এলাম।

প্রথম জন ওকে শুধরে দিলো। তুমি যে একটা আস্ত গবেট তাতো জানতাম না মাহেরা আরে, ওগুলো পুলিশ নয়, মিলিটারি। ওখানে তাঁবু ফেলেছে। কাল এতক্ষণে দেখবে পুলিশ আর মিলিটারি দিয়ে পুরো শহরটা ছেয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় জন গভীরভাবে রায় দিলো এবার।

মুনিমের দেখা পেয়ে আসাদ আর দাঁড়ালো না সেখানে।

মধুর রেস্তোরাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আরেক দল ছেলেকে কি কি যেন বোঝাচ্ছে মুনিম।

তেলবিহীন চুলগুলো দস্যি ছেলের মত নেচে বেড়াচ্ছে কপালে ওপর। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ।

আসাদ বললো, তোমায় খুঁজছিলাম মুনিম।

কেন? কি ব্যাপার? পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো সে।

আসাদ বললো, শুনলাম কাল রাতে তোমাদের বাসায় পুলিশের হামলা হয়েছিলো।

হ্যাঁ, ঠিক শুনেছ। মুনিম মৃদু হাসলো। অবশ্য ব্যর্থ অভিসার, রাতে বাসায় ছিলাম না আমি।

অদূরে দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ শুনছিলো সবুর। বললো, তোমার কপাল ভালো, ধরা পড়লে কি আর এ জন্মে ছাড়া পেতে? জেলখানায় পচে মরতে হতো। রাতে কোথায় ছিলে?

বাইরে অন্য এক বাসায় ছিলাম।

বাসায়, না হলে– সবুর মৃদু হাসলো।

না, বাসাতেই ছিলাম। মুনিম ঘাড় নাড়লো।

সবুর বললো, আমাকেও দেখছি আজ রাতে বাইরে কোথাও থাকতে হবে। বাসার আশেপাশে গত ক'দিন ধরে টিকটিকির উপদ্রব বড় বেড়ে গেছে। মুনিম কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। সহসা সামনের লন দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়তে ডলির কথা মনে পড়লো ওর। ডলির সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও দেখা করা প্রয়োজন।

সবুরের হাত ঘড়িটার দিকে এক পলক তাকালো মুনিম। এর মধ্যে দুটো বেজে গেলো, আমাকে একটু ভিক্টোরিয়া পার্ক যেতে হবে।

পাগল নাকি? আসাদ রীতিমত চমকে উঠলো। এখন তুমি ইউনিভার্সিটি এলাকা ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। বাইরে পা দিলেই ধরবে।

ঠিক বলছো আসাদ। রাহাত সমর্থন জানালো তাকে। এখন এ এলাকার বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না আপনার। তাছাড়া নবকুমার আর নবাবপুর হাইস্কুলের ছেলেরা একটু পরে দেখা করতে আসবে। আপনি না থাকলে চলবে কি করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগত্যা ডলির সঙ্গে দেখা করার চিন্তাটা মূলতবি রাখলো মুনিম। কিন্তু জাহানারাকে একখানা চিঠি না লিখলে নয়। রাহাতের হাত থেকে খাতাটা আর আসাদের পকেট থেকে কলমটা টেনে নিয়ে মধুর রেস্তোঁরার এককোণে এসে চিঠি লিখতে বসলো মুনিম। গতকাল রাতে আমাদের বাসা সার্চ হয়েছে। খবরটা হয়তো ইতিমধ্যে পেয়েছো। এখন থেকে কিছুদিনের জন্যে বাসায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। শুনলাম মা খুব কান্নাকাটি করছেন। মাকে সব কিছু বুঝিয়ে সান্ত্বনা দেবার ভার তোমার উপরে রইলো। আশা করি এ চিঠি পেয়ে তুমি একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। আজ রাতে আর তোমাদের ওখানে যাবো না। হোস্টেলে থাকবো।

এখানে এসে চিঠিটা শেষ করেছিলো মুনিম।

পুনশ্চ দিয়ে আবার লিখলো। কাল রাতে ডলির খবর জানতে চেয়েছিলে, ডলি ভালো আছে।

চিঠিখানা একটা ছেলের মারফত জাহানারার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলো মুনিম। মধুর রেস্তোঁরায় এখন ভিড় অনেকটা কমে গেছে। কিছু ছেলে এদিকে সেদিকে বসে।

সদরঘাটের মোড়ে কবি রসুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো লেখক বজলে হোসেনের। পরনে একটা ট্রপিক্যাল প্যান্ট, গায়ে লিলেনের সার্ট, পায়ে একজোড়া সদ্য পালিশ করা চকচকে জুতো। লেখক বজলে হোসেন যান্ত্রিক হাসি ছড়িয়ে বললো, আরে রসুল যে, কি খবর, কোথায় যাচ্ছো?

রসুল বললো, এখানে এক দর্জির দোকানে কিছু কালো কাপড় সেলাই করতে দিয়েছিলাম। নিতে এসেছি। তুমি কোথায় চলছো?

আমি? আমার ঠিকানা আছে নাকি। বেরিয়েছি, কোথাও একটু আড্ডা মারা যায় কিনা সেই খোঁজে। এসো না রিভারভিউতে বসে এক কাপ চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

চা আমি খাব না, রোজা রেখেছি। গভীর গলায় জবাব দিলো রসুল।

তারপর ওর জুতো জোড়ার দিকে কটমট করে তাকালো সে।

বজলে ভ্রু কুঁচকে বললো, রোজা আবার কেন? যতদূর জানি এটা তো রোজার মাস নয়। পরক্ষণে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। ও হ্যাঁ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে, তাই না? বলে শব্দ করে হেসে উঠলো সে। কিন্তু পর মুহূর্তে কবি রসুলের রক্তলাল চোখ জোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তে মুখটা পাংশুটে হয়ে গেলো তার। ভয়ে ভয়ে বললো, কি ব্যাপার, অমন করে তাকিয়ে রয়েছো কেন, কি ভাবছো?

তোমার ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

ওর কথা শুনে মুখটা কালো হয়ে গেলো বজলে হোসেনের।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো, দেখ রসুল, আমরা হলাম সাহিত্যিক। সমাজের আর দশটা লোক, মিছিল কি শোভাযাত্রা বের করে, পুলিশের লাঠি গুলি খেয়ে প্রাণ দিলে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমাদের মৃত্যু মানে দেশের এক একটা প্রতিভার মৃত্যু। নিজের জ্ঞানগর্ভ ভাষণে অশেষ তৃপ্তি বোধ করলো বজলে হোসেন।

ওর কথাটা শুনে সমস্ত দেহটা জ্বালা করে উঠলো কবি রসুলের। আশ্চর্যভাবে রাগটা সামলে নিয়ে বললো, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই নে বজলে। আমার এখন কাজ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারও অনেক কাজ, বলে আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালো না বজলে, চায়ের নেশা পেয়েছে ওর। রিভারভিউতে যাবে।

রিভারভিউতে বসে এক কাপ চা আর একটা চপ খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো সে। ডলির সঙ্গে এনগেজমেন্ট আছে। ভাবতে এখনো অবাক লাগে বজলের, কাল হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ডলি ওর কাছে ধরা দিলো কেন? একি ওর ক্ষণিক দুর্বলতা না বজলেকে সে অনেক আগে থেকে ভালবাসতো? হয়তো কোনটা সত্য নয়। হয়তো প্রথমটা সত্য। কাল রাতে সিনেমা দেখে ফেরার পথে ডলি যেন বড় বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। ঈষৎ কাত হয়ে মাথাটা রেখেছিলো ওর কাঁধের ওপর।

বজলে ওকে আলিঙ্গন করতে চাইলে ডলি বাধা দিয়ে বলেছিলো, না।

এখন আমায় এমনি থাকতে দাও বজলে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলো, কাল যদি তোমাকে ডাকি। বেড়াতে বেরুবে তো আমার সঙ্গে?

একটু ভেবে নিয়ে ডলি জবাব দিয়েছিলো, হ্যাঁ, বেরুবো, বিকেলে যদি পারো বাসায় এসো।

বাসায় এসে বজলে দেখলো ডলি আগে থেকে সেজেগুঁজে বসে আছে।

পরনে একটা মেরুন রঙের শাড়ি। গায়ে একটি সাদা ব্লাউজ। চুলে আজ খোঁপা বাঁধে নি ডলি, বিনুনী করে ছেড়ে দিয়েছে পিঠের উপর।

বজলেকে দেখে মৃদু হাসলো ডলি।

বজলে বললো, তুমি দেখছি তৈরি হয়ে বসে আছ। চলো।

ডলি বললো, চা খাবে না?

বজলে বললো, খাবো, তবে ঘরে নয় বাইরে।

রাস্তায় নেমে ডলি জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে?

হাতের ইশারায় একখানা রিক্সা থামিয়ে জবাব দিলো, একবার রিক্সায় ওঠা যাক তো।

তারপর দেখা যাবে।

রিক্সায় উঠে কিছুক্ষণ লক্ষ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালো লাগলো ওদের। রেস্তোঁরায় বসে দু'কাপ কফি আর কিছু প্যাস্ট্রি খেলো।

বজলে সিনেমা দেখার পক্ষে ছিলো। ডলি নিষেধ করলো, রোজ সিনেমা দেখতে ভাল লাগেনা ওর। তার চেয়ে শহরতলীতে কোথাও বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না।

বজলে বললো, দি আইডিয়া। চলো যাওয়া যাক।

ডলি বললো, চলো।

খানিকক্ষণ পর বজলে আবার বললো, সন্ধের পর মাহমুদের ওখানে যাবার কথা আছে। তুমি যাবে তো?

ডলি বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলো, আমি কেন ওর ওখানে যাবো?

বজলে ওর একখানা হাত ধরে নরম গলায় বললো, ওখানে কেউ থাকবে না ডলি। আমরা নিরিবিলিতে গল্প করবো।

ডলি ঈষৎ লাল হয়ে বললো, না।

বিকেলে চা খেতে বসে শাহেদ প্রশ্ন করলো, কাল রাতে আমার বিছানায় যে শুয়েছিলো, লোকটা কে-রে আপা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ সাহেব। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

তোমাদের দলের লোক বুঝি?

না।

ইস, না বললেই হলো। আমি দেখলে চিনি নে যেন।

চিনেছো, ভাল করেছো। এখন চুপ করো।

কেন চুপ করবো? শাহেদ রেগে উঠলো। লোকটার জ্বালায় কাল রাতে একটুও ঘুমোতে পেরেছি নাকি? ঘুমের ভেতর অমন হাত-পা নাড়তে আমি জন্মেও দেখি নি কাউকে। মাঝ রাতে ইচ্ছে করছিলো জানালা গলিয়ে, বাইরে ফেলে দিই লোকটাকে।

ওর কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো সালমা।

শাহেদ বললো, তুই হাসছিস? আমার যা অবস্থা হয়েছিলো তখন, শুধু কি হাত-পা ছুঁড়ছিলো লোকটা? ঘুমের ঘোরে কি যেন সব বলছিলো বিড় বিড় করে। আর মাঝে মাঝে চিৎকার উঠছিলো, উহ্ কেমন করে যে রাতটা কেটেছে আমার।

হাসতে গিয়ে মুখে আঁচল দিলো সালমা। বললো, দাঁড়াও না, আজ রাতেও তোমার ওখানে থাকবে সে।

আজকেও থাকবে বুঝি? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শাহেদ। তুই কি আমায় ঘর থেকে তাড়াতে চাস আপা?

কেন, তোমার যদি ওখানে ঘুম না আসে তাহলে আলাদা বিছানা করে দেবো সেখানে থেকো।

তাহলে তাই করে দিস। শাহেদ শান্ত হলো।

ওর মাথার চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়ে সালমা একটু পরে জিজ্ঞেস করলো,

হ্যাঁরে, আমার কোন চিঠিপত্র এসেছে?

সাহেদ সংক্ষেপে ঘার নাড়লো, না।

শুনে বিমর্ষ হয়ে গেলো সালমা। রওশনের শেষ চিঠি পেয়েছে সে অনেক দিন। এতো দেরি তো কোনবার হয় না। সালমার মনে হলো হয়তো তার অনেক অসুখ করেছে। না হলে চিঠি লিখছে না কেন?

ভাবতে গিয়ে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো ওর।

তখন না বলেও মাহমুদের ওখানে যেতে হলো ডলিকে।

সাহানাকে নিয়ে মাহমুদ তখন বাইরে বেরুবার তোড়জোড় করছিলো।

ওদের দেখে খুব খুশি হলো সে। বললো, তোমরা এসেছো বেশ ভাল হলো। চলো এক সঙ্গে বেরোন যাবে।

বজলে শুধালো, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

মাহমুদ বললো, সাহানা যাবে ওর এক বান্ধবীর বাসায় আর আমি একটা অফিসিয়াল কাজে।

মাহমুদকে ঈশারায় এক পাশে ডেকে নিয়ে এলো বজলে। তারপর ধমকের সুরে বললো, তুমি একটা আস্ত গবেট। ডলিকে নিয়ে এখানে এসেছি কেন এ সামান্য ব্যাপারটা বোঝ না? বলে মুচকি হাসলো সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষণকাল ওর দিকে তাকিয়ে মাহমুদ কাঁধ ঝাঁকালো। মৃদু হেসে হেসে বললো, বুঝেছি। তারপর ডলির দিকে এগিয়ে গেলো সে। আপনারা এখানে বসে গল্প করুন। আমি সাহানাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি। বলে আড়চোখে বজলের দিকে তাকালো সে।

ডলি ব্যস্ততার সঙ্গে বললো, আপনারা কতক্ষণে ফিরবেন?

মাহমুদ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো, এইতো যাবো আর আসবো।

সাহানা অকারণে হাসলো একটু।

ডলি সে হাসির কোন অর্থ খোঁজে পেলো না।

ওরা চলে গেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো বজলে।

ঘরে এখন ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। এখন ইচ্ছে করলে নির্বিঘ্নে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পারবে ওরা।

ডলির পাশে এসে বসলো বজলে। তারপর দু'হাতে ওকে কাছে টেনে নিলো। ডলি বিরক্তির সঙ্গে বললো, একি হচ্ছে?

বজলে ওর কানের কাছে মুখ এনে বললো, এখন আর আমায় বাধা দিয়ো না ডলি।

ডলি কপট হেসে বললো, এই জন্যে বুঝি আসা হয়েছে এখানে?

বজলে বললো, হ্যাঁ, এই জন্যে। ডলিকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলো সে। ডলি এবার আর বাধা দিলো না।

রাত আটটা বাজবার তখনো কিছু বাকি ছিলো। আকাশের ক্যানভাসে সোনালি তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। কুয়াশা ঝরছে। উত্তরের হিমেল বাতাস বইছে ধীরে ধীরে।

শাহেদের হাত ধরে ছাদে উঠে এলো সালমা।

ছোট্ট ছাদ।

আরো অনেকে তখন আশেপাশের ছাদে উঠে গল্প করছিলো বসে বসে। সালমা শুনলো, রাজ্জাক সাহেব তার গিন্নীকে বলছেন, দেখো আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি কাল ছেলেমেয়েদের কাউকে বাইরে বেরুতে দিয়ো না। না, না, যেমন করে হোক ওদের আটকে রেখো ঘরের মধ্যে। কে জানে কাল কি হয়। হয়তো সেবারের মত গুলি চালাবে ওরা।

শুধু রাজ্জাক সাহেব নন। সবার মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। কাল নিশ্চয় কিছু একটা ঘটবে। কি ঘটবে কে জানে। হয়তো রক্তপাত হবে। প্রচুর রক্তপাত। সালমা শুনলো, রাজ্জাক সাহেবের গিন্নী প্রশ্ন করলেন, আর কত এসব চলবে বলতো? রাজ্জাক সাহেব জবাব দিলেন, জানি না।

কেউ জানে না কতকাল এমনি উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে ওদের থাকতে হবে। এমনো সময় এসেছে মাঝে মাঝে, যখন মনে হয়েছে, এবার বুঝি তারা শান্তির নাগাল পেলো। কিন্তু পরক্ষণে তাদের সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। হিংসার নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ওরা। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছে, আর পারি না।

সালমা শুনলো, রাজ্জাক সাহেব বলছেন, কতকাল চলবে সে কথা ভেবে কি হবে। তুমি ছেলেমেয়েগুলোকে কাল একটু সামলে রেখো।

গিন্নী বললেন, রাখবো।

আর এমনি সময় অকস্মাৎ সমস্ত শহর কাঁপিয়ে অজুতকণ্ঠের শ্লোগানের শব্দে চমকে উঠলো সবাই। যারা ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলো, কি হলো, ওরা কি গুলি চালালো আবার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশে মেঘ নেই। তবু ঝড়ের সংকেত।

বাতাসে বেগ নেই। তবু তরঙ্গ সংঘাত।

কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহীদের খুন ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না।

যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে। পৃথিবী কাঁপছে। ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে দিগ্বিদিক।

শুধু উত্তর নয়। দক্ষিণ নয়। পূর্ব নয়। পশ্চিম নয়। যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র যুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে, শহীদ স্মৃতি অমর হোক।

সবাই বুঝলো। বুঝতে কারো বেগ পেতে হলো না। রাস্তায় শ্লোগান দেয়া নিষেধ। মিছিল শোভাযাত্রা বেআইনী করেছে সরকার। আর তাই ঘরে ঘরে ছাতের উপরে সমবেত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে ওরা, ছাত্ররা। মুসলিম হল, মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল, চামেলী হাউস, ফজলুল হক হল, বান্ধব কুটির, ইডন হোস্টেল, নূরপুর ভিলা। সবাই যেন এককণ্ঠে আশ্বাস দিচ্ছে, দেশ আমার, ভয় নাই।

সালমার হাতে একটা টান দিয়ে শাহেদ বললো, গত ইলেকশনের সময় তোরা শ্লোগান দিয়েছিলি ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে তাই না আপা?

হ্যাঁ। সালমা সংক্ষেপে জবাব দিলো।

শাহেদ বললো, কি লাভ হয়েছে তোদের। যাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছিস তারা তো এখন কিছুই বলছে না।

উত্তরে সালমা কিছু বলবে ভাবছিলো। শুনলো রাজ্জাক সাহেব তাঁর স্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন, সবাই তো আর মীরজাফর নয়। ভাল লোকও আছে।

আসল কথা হলো, কে ভালো আর কে মন্দ সেটা যাচাই করে নেয়া, বুঝলে?

অনেকক্ষণ একঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা করছিলো মাহমুদের। একটা চেয়ার খালি হতে তাড়াহুড়া করে বসে পড়লো সে। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলো ন'টা বেজে গেছে প্রায়।

এতক্ষণ কিউ. খানের একটানা প্রলাপ শুনতে হয়েছে। বড় কর্তার ধমক খেয়ে লোকটা রেগেছে ভীষণ। এইতো একটু আগে ইন্‌সপেক্টারদের সবাইকে ডেকে অবস্থা জানালেন তিনি। আমি জানতাম আপনাদের দিয়ে কিছু হবে না। আপনারা শুধু গায়ে বাতাস দিয়ে বেড়াতে পারেন।

বড় কর্তা বললেন, কি আশ্চর্য। আপনাদের কাজের নমুনা দেখলে আমার গা জ্বালা করে ওঠে। এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, অথচ আপনারা কিছুই করতে পারছেন না।

একজন পুলিশ অফিসার হাত কচলে বললো, আমরা কি করবো স্যার?

ওরা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। আমরা হুকুমের দাস। আমরা কি করবো স্যার?

আপনারা কি করবেন মানে? বড় কর্তা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আপনারাই তো সব কিছু করবেন। আপনারা হচ্ছেন সাচ্চা দেশপ্রেমিক। দেশ তো আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

বড় কর্তার কথা শুনে মাহমুদ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো তাঁর দিকে। আর ভাবছিলো, সত্যি লোকটা একটা জিনিয়াস। মানুষকে কি শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। আমাদের প্রতি তাঁর কি গভীর মমতাবোধ। বড় কর্তা আবার বললেন, আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন, গুটিকয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশের দালাল আমাদের সোনার দেশটাকে একেবারে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বনাশ করছে আমাদের।

তাঁর কথায় একজন অফিসার উৎসাহিত হয়ে বললো, ইয়ে হয়েছে স্যার। কি যে বলবো। যেখানে যাই, সেখানে দেখি ছেলে-ছোকরারা সব জটলা বেঁধে কি সব ফুসুরফাসুর করছে। জানেন স্যার, লোফার এই খবরের কাগজের হকার বলুন, রিক্সাওয়ালা বলুন, এমন কি সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও কেমন একটা সন্দেহের ভাব দেখলাম। আমাদের বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্র করছে ওরা।

ওহে। দেশটা একেবারে রাষ্ট্রদ্রোহীতে ভরে গেছে। কিউ. খানের চোখে মুখে হতাশার ছাপ।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ।

সাহানা ওর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে গুলিস্তানের সামনে। তাকে নিয়ে বাসায় ফিরতে হবে। বজলে আর ডলি এখনো অপেক্ষা করছে।

স্লোগান দিবার চোঙাগুলো একপাশে এনে জড়ো করে রাখলো ওরা। এতক্ষণ ছাদের ওপরে উঠে একটানা অনেকক্ষণ স্লোগান দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। এই শীতের মরশুমেও গা বেয়ে ঘাম ঝরছে। গলা ফেটে গেছে। স্বরটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেরুচ্ছে গলা দিয়ে।

মুনিম বললো, গরম পানিতে নুন দিয়ে গার্গেল করো, ভালো হয়ে যাবে। নইলে ব্যথা করবে গলায়। কাল আর কথা বেরুবে না।

কয়েকজন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। ওরা বিছানায় এলিয়ে পড়লো।

কেউ কেউ কাল দিনে কি ঘটতে পারে তাই নিয়ে জোর আলোচনা শুরু করলো করিডোরে। কেউ ডাইনিং হলে খেতে গেলো। খাবার টেবিলেও তর্ক-বিতর্ক আর আলোচনার শেষ নেই।

মাঝখানের মাঠটায়, যেখানে সুন্দর ফুলগাছের সার থরে থরে সাজানো, ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসলো মুনিম। অনেক চিন্তার অবসরে ডলির কথা মনে পড়লো ওর। ডলির সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হতো। মুনিম ভাবলো। কিন্তু পরক্ষণে আরেক চিন্তায় ডলি হারিয়ে গেলো মন থেকে। রাত শেষে ভোর হবে। আর পুলিশ এসে হয়তো ঘিরে ফেলবে পুরো হলটাকে। এমনি ঘিরেছিলো আরেকবার। বায়ান্ন সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারিতে। তখন এই হলটাই ছিলো আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। সেদিনের কথা ভাবতে অবাক লাগে মুনিমের। রীতিমত একটা সরকার চালাতে হয়েছিল ওদের। বজলুর পঁচিশ নম্বর রুমটা ছিলো অর্থ দপ্তরের অফিস। দোরগোড়ায় লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা ছিলো– অর্থ দপ্তর। ছেলেরা টাকা সংগ্রহের জন্যে কৌটা হাতে বেরিয়ে যেতো ভোরে ভোরে। রাস্তায় আর বাসায় বাসায় চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াতো ওরা। দুপুরে কৌটো ভরা আনি দুয়ানি আর টাকা এনে জমা দিতো অফিসে। আন্দোলনের যাবতীয় খরচপত্র সেখান থেকে চালানো হতো। বজলু ছিলো এই দপ্তরের কর্তা। অর্থনীতিতে খুব ঝানু ছিলো বলে ওই পদটা দেয়া হয়েছিলো ওকে। নণ্ড ছিলো ওর হেড কেরানী। কেরানীর মতই মনে হতো ওকে।

অর্থ দপ্তরের পাশে ছিলো ইনফরমেশন ব্যুরো। ওদের কাজ ছিলো কোথায় কি ঘটছে তার খবর সংগ্রহ করা। ভোর হতে সাইকেলে চড়ে এই ক্ষুদে গোয়েন্দার দল বেরিয়ে পড়তো শহরের পথে। কোথায় ক'জন গ্রেপ্তার হলো, কোথায় অধিক সংখ্যক পুলিশ জমায়েত হয়েছে, কোন জায়গায় এখন হামলা চলার সম্ভাবনা আছে এসব খোঁজ নিতো ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কোন খোঁজ পেলে তক্ষুণি হেড অফিসে এসে খবরটা পৌঁছে দিতো। এছাড়া আরো কয়েকটা কাজ ছিলো ওদের। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খবর আদান-প্রদান করা, সরকারী গোয়েন্দাদের ওপর নজর রাখা, আর নিজেদের মধ্যে কোন স্পাই আছে কিনা, সেখানে দৃষ্টি রাখা। ইনফরমেশন ব্যুরোর কর্মকর্তা ছিলো আরজান ভাই। বড় ধুরন্ধর ছিলো লোকটা। দু'জন সরকারী গোয়েন্দাকে হলের মধ্যে ধরে কি মারটাই না দিয়েছিলো সে। ইনফরমেশন ব্যুরোর পাশে ছিলো প্রচার বিভাগের অফিস। তার পাশে খাদ্য দপ্তর। ওদের কাজ ছিলো জেলখানায় আটক বান্দিদের খাবার সরবরাহ করা। কেন্দ্রীয় দপ্তরটা ছিলো মনসুর ভাইয়ের রুমে। যেখানে বসে আন্দোলন সম্পর্কে মূলনীতি নির্ধারণ করা হতো। সেই মতে চলতো সবাই।

বিকেলে অফিস-আদালত থেকে কারখানা আর বস্তি থেকে হাজার হাজার লোক এসে জমায়েত হতো হলের সামনে। প্রচার দপ্তর থেকে মাইকের মাধ্যমে আগামী দিনের কর্মসূচি জানিয়ে দেয়া হতো ওদের।

তারপর তারা চলে যেতো। বসে বসে সে দিনগুলোর কথা ভাবছিলো মুনিম। ভাবতে বেশ ভাল লাগছিলো ওর। একটা ছেলে এগিয়ে এসে বললো, এখানে কুয়াশার মধ্যে বসে আছেন কেন, উঠুন মুনিম ভাই। আপনার জন্যে ভাত নিয়ে এসেছি রুমে। মুনিম উঠে দাঁড়ালো। চলো।

সাহানাকে নিয়ে বেশ রাত করে বাসায় ফিরে এলো মাহমুদ। প্রায় রাতে এমনি দেরি হয় ওর। কোনদিন কাজ থাকে। কোনদিন ক্লাবে যায় আর রেস্তোঁরায় বসে আড্ডা মারে। জীবনটা হলো একটা সুন্দর করে সাজানো বাগানের মত। যেদিকে খুশি ইচ্ছেমত উড়ে যেতে পারো তুমি। কিম্বা কখনো ভ্রমর হয়ে উড়ে বেড়াতে পারো এক ফুল থেকে অন্য ফুলে।

সাহানার বাহুতে স্পর্শ করে মাহমুদ বললো, সাহানা তুমি আমাকে খুব ভালবাস, তাই না?

সাহানা চোখ তুলে শুধু একবার তাকালো ওর দিকে। তারপর সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ। মাহমুদ জানতো, কি উত্তর দেবে সাহানা। অতীতে এমনি আরো অনেককে প্রশ্ন করে ওই একই জবাব পেয়েছে সে। আগে রোমাঞ্চিত হতো। আজকাল আর তেমন কোন সাড়া জাগে না মনে। তবু, আবার জিজ্ঞেস করলো মাহমুদ, সত্যি ভালবাস।

সাহানা হেসে জবাব দিলো, জানি না।

আমি জানি, মাহমুদ কেটে কেটে বললো। আমি জানি, একদিন তুমি বাবুই পাখির মত পলকে উড়ে চলে যাবে।

সাহানা রক্তাভ হলো। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো, তাই যাবো। একজনের কাছে বেশি দিন থাকতে ভালো লাগে না আমার।

গলার স্বরে তার শ্লেষ আর ঘৃণা।

মাহমুদের মনে হলো মেয়েটি বড় নির্লজ্জ। ঠোঁটের কোণে কথাটা একটুও বাধলো না ওর। কি নির্বিকার ভাবেই না বলে গেলো।

মাহমুদ নিজেও ওকথা বলেছে অনেককে।

সালেহাকে মনে পড়ে। টালি ক্লার্কের মেয়ে সালেহা। মেয়েটা রীতিমত ভালবেসে ফেলেছিলো ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোকা মেয়ে।

ওর কথা ভাবলে দুঃখ হয় মাহমুদের। অমন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা না করলেও পারতো সে।

কিন্তু সাহানা ওর মত বিষ খাবে না। খুব স্বাভাবিকভাবে সব কিছু নিতে পারবে সে। তবু মাহমুদের কেন যেন আজ মনে হলো মেয়েটা বড় নির্লজ্জ।

ভেতরে বাতি নেভানো ছিলো। কড়া নাড়তে গিয়ে দু'জনের চোখে চোখ পড়লো। মুখ টিপে এক টুকরো অর্থপূর্ণ হাসি ছড়ালো সাহানা। মাহমুদও না হেসে পারলো না। খানিকক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। তারপর বাতি জ্বলে উঠলো। শব্দ হলো কপাট খোলার। খোলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে বজলে। পরিপাটি চুলগুলো এলোমেলো। মুখে ঈষৎ বিরক্তির আমেজ। ওদের দেখে বললো, কি ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?

মাহমুদ হাত ঘড়িটা ওর মুখের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে আস্তে করে বললো, খুব তাড়াতাড়ি ফিরি নি কিন্তু।

বজলে লজ্জা পেয়ে বললো, একি, দু'ঘণ্টা! আমার মনে হচ্ছিলো–।

আমারো তেমনি মনে হলো। ডলির দিকে আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে শব্দ করে হাসলো মাহমুদ।

নীল আলো ছড়ানো ঘরের দেয়ালে একটা টিকটিকি টিক টিক শব্দে ডেকে উঠলো।

কৌচের উপর বসে দেহটা এলিয়ে দিল মাহমুদ।

আলনা থেকে তোয়ালেটা নাবিয়ে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো সাহানা।

ডলি দাঁড়িয়েছিলো উত্তরমুখো আলমারিটার পাশে, জানালার ধার ঘেঁষে ওদেরকে পেছন করে।

মাহমুদ বললো, কাল সকালে কি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে বজলে?

বজলে প্রশ্ন করলো, কেন বলতো?

মাহমুদ বললো, কিছু আলাপ ছিলো।

বজলে শুধালো, গোপনীয় কিছু?

মাহমুদ ঘাড় নাড়লো। না, ঠিক গোপনীয় কিছু নয়।

বজলে এগিয়ে এসে বসলো তার সামনে। কাল কেন, এখন বল না।

মাহমুদ বললো, না, এখন না। কাল সকালে বরং একবার এখানে এসো তুমি, কেমন?

জানালার পাশে দাঁড়ানো ডলি ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছিলো বাইরে।

সার সার বাতি। গাড়ি আর লোকজন। সবকিছু বড় অস্বস্তিকর মনে হলো তার। যেন এমন একটা নিরিবিলি অন্ধকার কোণে গিয়ে লুকোতে পারলে সে বেঁচে যায়। পেছন ফিরে তাকাতে ভয় হচ্ছে ওর। যদি মাহমুদের চোখে চোখ পড়ে তাহলে? সত্যি ওরা কি ভাবছে, কে জানে। ডলি রীতিমত ঘামতে শুরু করলো।

বাইরে বেরিয়ে যখন রিক্সায় উঠলো ওরা, তখন ইলশেগুঁড়ির মত বৃষ্টি ঝরছে। ডলি অনুযোগের সুরে বললো, আজ আমাকে এতবড় একটা লজ্জা না দিলে চলতো না?

বজলে অপ্রস্তুত হয়ে বললো, কোথায় লজ্জা দিলাম তোমায়?

ডলি ঈষৎ রক্তাভ হয়ে বললো, জানি না।

ডলির হাতটা মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিলো বজলে। চোখজোড়া ওর মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বাইরে গাড়ি ঘোড়া আর লোকজন দেখতে লাগলো ডলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তায় তেমন ভিড় নেই, যানবাহন চলাচল অনেক কম। পথের দু'পাশে দোকানগুলোতে খদ্দিরের আনাগোনা খুব বেশি নয়। সহসা ডলি চমকে উঠলো। মনে হলো ওদের রিক্সার পাশ ঘেঁষে মুনিম সাইকেল নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। কোথায় গেলো সে?

কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো ডলি। এমনো হতে পারে যে, আজ বাসায় ফিরে দেখবে মুনিম তার অপেক্ষায় বসে আছে। ডলিকে কাছে পেয়ে হয়তো বলবে, অনেক ভেবে দেখলাম ডলি, তোমাকে বাদ দিলে জীবনে আর কিছুই থাকে না। তাই সব ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে ফিরে এলাম। আমাকে ক্ষমা করে দাও। বলে কাতর চোখজোড়া তুলে ওর দিকে তাকাবে সে। ডলি তখন কি উত্তর দেবে?

ভাবতে গিয়ে ঘেমে উঠলো ডলি। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো এ তার উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। মুনিমকে সে দেখেনি, ওটা চোখের ভুল। এ তিনদিন ওরা খালি পায়ে হাঁটাচলা করছে। সাইকেলে নিশ্চয় চড়বে না মুনিম। ভাবতে গিয়ে কেন যেন বড় হতাশ হলো ডলি।

বজলে ওর হাতে একটা নাড়া দিয়ে বললো, কি ব্যাপার চুপচাপ কি ভাবছো?

ডলি আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো, না, কিছু না। তারপর অনেকটা পথ চুপ থেকে সহসা প্রশ্ন করলো, ওরা স্বামী-স্ত্রী তাই না?

ওরা কারা? কাদের কথা বলছো? বজলে অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে। ডলি বললো, সাহানা আর মাহমুদ।

বজলে কি ভেবে বললো, হ্যাঁ, ওরা স্বামী-স্ত্রী। এই তো মাস কয়েক হলো বিয়ে হয়েছে তাদের। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

না, এমনি। বজলের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো ডলি।

সারারাত এক লহমার জন্যে ঘুমোল ওরা।

মেডিকেল হোস্টেল, মুসলিম হল, চামেলী হাউস, ইডেন হোস্টেল, ফজলুল হক হল, সতর্ক প্রহরীর মত সারারাত জেগে রইল ওরা।

কেউবা জটলা বেঁধে কোরাসে গান গাইলো, ভুলবো না, ভুলবো না, একুশে ফেব্রুয়ারি।

কেউ গাইলো, দেশ হামারা।

ফজলুল হক হলটাকে বাইরে থেকে দেখতে মোঘল আমলের দুর্গতদের মত মনে হয়। আস্তরবিহীন ইটের দেয়ালগুলো রক্তের মত লাল।

তিনতলা দালানটা চৌকোণো, মাঝখানে দুর্বাঘাস পাতা প্রশস্ত মাঠ।

দু'পাশে বাগান।

মাঠের ওপর ছেলেরা কাগজের স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে বসলো। বাঁশের কঞ্চি এলো। কাগজ এলো। রঙ তুলি সব কিছু নিয়ে কাজে লেগে গেলো ওরা। অদূরে কালো পতাকা আর কালো ব্যাজ বানাতে বসলো আরেক দল ছেলে। ঘন অন্ধকারে ছায়ার মত মনে হলো ওদের।

তিনতলা থেকে কে একজন ডেকে বললো, একটু অপেক্ষা করো, আমরা আসছি।

অপেক্ষা করার সময় নেই, নিচে থেকে কবি রসুল জবাব দিলো।

রাতারাতি শেষ করতে হবে সব। তোমরা তাড়াতাড়ি এসো।

আরেকজন বললো, আসতে আঠার টিনটা নিয়ে এসো মাহের।

এমনি, আরো একটা রাত এসেছিলো বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে।

পরিকল্পনাটা প্রথমে আলীম ভাই-এর মাথায় এসেছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতারাতি একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়বো আমরা।

চমৎকার। শুনে সায় দিয়েছিলো সবাই।

মেডিকেল হোস্টেলের চারপাশে তখন জমাট নিস্তব্ধতা। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার চলাচল নেই। আকাশমুখী গাছগুলো কুয়াশার ভারে আনত।

একে একে ছেলেরা সবাই বেরিয়ে এলো ব্যারাক ছেড়ে।

প্রথমে একটা জায়গা ঠিক করে নিলো ওরা।

শহীদ রফিকের গুলিবিদ্ধ খুলিটা চরকীর মত ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে ছিটকে পড়েছিলো, যেখানে দাঁড়িয়ে বরকত তার জীবনের শেষ কথাটা উচ্চারণ করেছিলো, ঠিক হলো সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ গড়বে ওরা।

সেখান থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরে, মেডিকেল কলেজের একটা বাড়তি ঘর তোলার জন্যে ইট রাখা হয়েছিলো স্তূপ করে। এই তিনশ' গজ পথ সার বেঁধে দাঁড়াল ছেলেরা। তারপর হাতে হাতে, এক ঘণ্টার মধ্যে চার হাজার ইট সেখান থেকে বয়ে নিয়ে এলো ওরা। স্টোর রুমের তালা খুলে তিন বস্তা সিমেন্ট বের করা হলো। দু'জন গিয়েছিলো রাজমিস্ত্রী আনতে। চকবাজারে। সেই শীতের রাতে অনেক তালাশ করে মিস্ত্রী নিয়ে ফিরে এলো ওরা।

সারারাত কাজ চললো।

পরদিন সমস্ত দেশ অবাক হয়ে শুনলো সে খবর।

তারপর।

তারও দিন চারেক পরে আরো একটা খবর শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো সবাই। সরকারের মিলিটারি এসে স্মৃতিস্তম্ভটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু, ছেলেরা দমেনি। ধুলোয় মেশানো ইটের পাঁজরগুলোকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলো ওরা। কয়েকটা গন্ধরাজ আর গাঁদা ফুলের চারা লাগিয়ে দিয়েছিলো ভেতরে।

এসব তিন বছর আগের কথা।

সে রাতে মেডিকেলের ছেলেরা কাপড় দিয়ে কঞ্চির ঘেরটা ঢেকে নিলো সযত্নে। বাগান থেকে ফুল তুলে এনে অজস্র ফুলে ভরিয়ে দিলো বেদী।

তারপর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইলো ওরা, শহীদের খুন ভুলবো না।

বরকতের খুন ভুলবো না।

কাগজ দিয়ে গড়া স্মৃতিস্তম্ভের কাজ শেষ হলে পরে ছেলেরা অনেকে কবি রসুলের রুমে বিশ্রাম নিতে এলো। রাহাত আর মাহের হাত-পা ধুয়ে ধপ করে শুয়ে পড়লো বিছানার ওপর। উঃ এই শীতের ভেতরেও গায়ে ঘাম বেরিয়ে গেছে। রাহাত হাই তুললো।

মাহের বললো, একটা সিগারেট খাওয়ানা রসুল ভাই। আছে?

না, নেই। কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বের করে জবাব দিলো রসুল।

বিকেল থেকে শরীরটা জ্বর জ্বর করছিলো ওর। এখন আরো বেড়েছে। কিন্তু সেটা ও জানতে দেয় নি কাউকে। ওর ভয়, যদি জ্বরের খবরটা সবাই জেনে যায় তাহলে ঘর ছেড়ে এক পাও বাইরে বেরুতে দেবে না ওকে। উহ! এমন দিনেও কেউ ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে পারে।

নড়েচড়ে শুতে গিয়ে ওর গায়ে হাত লাগতে রাহাত চমকে উঠলো।

একি রসুল ভাই, তোমার জ্বর এসেছে?

এই সামান্য জ্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস! গা দেখছি পুড়ে যাচ্ছে, আর তুমি বলছো সামান্য। রাহাত উঠে বসে কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে দিল ওর।

মাহের বললো, আমি ঘুম দিলাম রাহাত। ভোর রাতে ব্লাক ফ্ল্যাগ তোলার সময় আমায় জাগিয়ে দিয়ো।

এখন আবার ঘুমোবো কি? রাহাত কোন উত্তর দেবার আগে আরেকজন বললো। একটু পরেই পতাকা তোলার সময় হয়ে যাবে। তারচে' এসো গল্প করি।

সেই ভালো। মাহের উঠে বসলো, কিন্তু একটু ধুঁয়ো না পেলে জমছে না। আছে নাকি কারো কাছে, থাকলে এক-আধটা দাও।

আহ, তুমি জ্বালিয়ে মারলে। কে একজন বলে উঠলো, নাও টানো।

সিগারেটটা ধরিয়ে একটা তৃপ্তির টান দিলো মাহের। তারপর একটা গল্প বলতে শুরু করলো সে।

ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছিলো সালমা। এলার্মের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ওর। গায়ের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলো।

বাতিটা জ্বালিয়ে কলগোড়া থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এলো। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘন চুলগুলোর মধ্যে মৃদু চিরুনি বুলিয়ে নিলো সালমা। খাটের তলা থেকে স্টোভটা টেনে নিয়ে আগুন ধরালো। ঠাণ্ডায় হাত-পা কাঁপছিলো। আগুনের পাশে বসে গা-টা একটু গরম করে নিলো সে। তারপর চায়ের কেতলিটা আগুনে তুলে দিয়ে আসাদকে ডাকতে গেলো।

দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতে বড় সঙ্কোচ হচ্ছিলো সালমার। দরজা খুলে দেখলো, কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে আসাদ। বালিশের ওপর থেকে মাথাটা গড়িয়ে পড়েছে বিছানার ওপর। চোখে তার গাঢ় ঘুম। কি নাম ধরে ডাকবে, সালমা ভাবলো। আসাদ সাহেব, না আসাদ ভাই।

অবশেষে ডাকলো, এই শুনছেন। চারটা বেজে গেছে, শুনছেন?

শোনার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

সালমা ভাবলো শাহেদকে দিয়ে জাগাবে ওকে। কিন্তু এতো রাতে শাহেদকে জাগানো বিপদ। যেমন রগচটা ছেলে, রেগে গিয়ে আবার একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।

সালমা আবার ডাকলো, এই যে, শুনছেন। চারটে বেজে গেছে।

শুনছেন?

আহ্ কি হচ্ছে এই রাতের বেলা। সহসা রেগে গেলো আসাদ। তার চোখেমুখে বিরক্তি।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুলো সে।

সালমা মুখ টিপে হাসলো।

আচ্ছা বিপদ তো লোকটাকে নিয়ে। এই যে শুনছেন? কাঁধের পাশে জোরে একটা ধাক্কা দিলো সালমা।

ধড়ফড় করে এবার বসলো আসাদ। কি ব্যাপার ক'টা বাজে?

চারটা। সালমা ঈষৎ ঘাড় নেড়ে বললো, আপনি তো বেশ ঘুমোতে পারেন? উঠুন, চটপট হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি যাই চায়ের পানিটা নামাই গিয়ে।

কেমন? মিষ্টি করে হাসলো সালমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যান, আমি আসছি। আসাদের চোখেমুখে তখনও ঘুমের অবসাদ। জড়ানো গলায় বললো, উহ্ কি শীত। হাত-পা সব ঠকঠক করে কাঁপছে।

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিন। নইলে ঠাণ্ডা লাগবে। যাবার সময় বলে গেলো সালমা।

ঘুমে তখনো চোখজোড়া বার বার জড়িয়ে আসতে চাইলো তার। তবু চাদরটা গায়ে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো আসাদ। চটিজোড়া খাটের তলা থেকে বের করে নিয়ে পরলো।

বারান্দায় বালতি ভরা পানি ছিলো।

পানিতে হাত দিতে গিয়ে ঠাণ্ডায় শিউরে উঠলো সে।

উত্তর থেকে আসা ঈষৎ ভেজা বাতাস দেয়ালের গায়ে প্রতিহত হয়ে অদ্ভুত একটা শব্দের সৃষ্টি করছে। সে শব্দ অনেকটা যেন হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে কানে।

ও ঘর থেকে সালমা শুধালো, আপনার হাত-মুখ ধোয়া হলো আসাদ সাহেব? এইতো হলো।

ঘরের মধ্যে আর কোন আলো নাই। অন্ধকারে শুধু স্টোভটা জ্বলছে, মাঝখানে। তার পাশে বসে স্থির চোখে কেতলিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সালমা। দেয়ালে বড় হয়ে একটা ছায়া পড়েছে তার। দোরগোড়ায় মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো আসাদ। হঠাৎ দেয়ালের ছায়াটাকে অদ্ভুত সুন্দর বলে মনে হলো ওর।

নিঃশব্দে স্টোভটার কাছে এসে বসলো আসাদ।

আপনার কি খুব শীত লাগছে? এক সময় আস্তে করে সালমা শুধালো।

স্টোভের আরো একটু কাছে সরে এসে আসাদ বললো, সত্যি ভীষণ শীত পড়েছে। হাতজোড়া বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখুন। বলে হাত দুটো ওর দিকে এগিয়ে দিলো আসাদ।

অন্ধকারে মৃদু হাসলো সালমা। হাত বাড়িয়ে ওর হাতের তাপ অনুভব করতে গেলে হাতজোড়া মুঠোর মধ্যে আলতো ধরে রাখলো আসাদ।

সালমা শিউরে উঠলো।

প্রথমে রীতিমত ঘাবড়ে গেলো সে। ঈষৎ বিস্মিত হলো।

তারপর চুপচাপ মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইলো জ্বলন্ত স্টোভের দিকে। বুকটা দুরু দুরু কাঁপছে তার। এই শীতের ভেতরেও মনে হলো সে যেন ঘামতে শুরু করেছে। কয়েকটি মুহূর্ত, বেশ ভালো লাগলো সালমার।

সে ওর মুখের দিকে তাকাবার সাহস পেলো না। হাতজোড়া টেনে নেবার কোন চেষ্টা করলো না। শুধু আধফোটা স্বরে বললো, পানি গরম হয়ে গেছে। বলতে গিয়ে গলাটা অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠলো।

তারপর এক সময় আস্তে হাতজোড়া টেনে নিলো সালমা।

নিঃশব্দে চা তৈরি করতে লাগলো সে।

চায়ের কাপে চামচের টুংটাং শব্দ।

আসাদ বললো, আমার কাপের চিনি একটু কম করে দেবেন।

সালমার মনে হলো আসাদের গলাটাও যেন কাঁপছে। যেন একটু আড়ষ্ট আর জড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর।

অন্ধকারে বার কয়েক ওর শক্ত সবল হাতজোড়ার দিকে তাকালো সালমা। না। রওশন তার হারানো হাত দুটো কোনদিনও ফিরে পাবে না। একটা অশান্ত দীর্ঘশ্বাস বাতাসে শিহরণ জাগিয়ে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকক্ষণ নীরবে চায়ের পেয়ালায় চুকুম দিলো ওরা। মিছিল, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, মুহূর্তের জন্য সবকিছু অনেক দূরে সরে গেলো।

তারপর।

তারও অনেক পরে।

আগে থেকে রিক্সা ঠিক করা ছিলো, দোরগোড়ায় তার ডাক শোনা গেলো। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আসাদ বললো, কাপড় পরে নিন, সময় হয়ে গেছে।

সালমা অস্ফুট স্বরে কি যে বললো, বোঝা গেলো না।

বাইরে কনকনে শীত।

রিক্সায় এসে চুপচাপ বসলো ওরা।

সালমাকে মেয়েদের হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসাদ তখন ছেলেদের ব্যারাকে এসে ঢুকলো। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ টাইফুনের শব্দে স্লোগানের তরঙ্গ জেগে উঠলো চারদিকে। অন্ধকারের বুক চিরে ধ্বনির বজ্র ইথারে কাঁপন সৃষ্টি করলো।

মুসলিম হল, নূরপুর ভিলা, চামেলী হাউস, ফজলুল হক হল, বান্ধব কুটির, মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো এক সাথে। সে শব্দ তরঙ্গে অভিভূত হয়ে কে একজন ব্যারাকের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে।'

ছেলেরা তখন কালো পতাকা উত্তোলন করছিলো।

সরু সিঁড়িটা বেয়ে ছাদের উপর উঠে এলো একদল ছেলে। মুনিম জিজ্ঞেস করলো, মই এনেছ তো?

হ্যাঁ।

দেখো মইটা খুব মজবুত নয়। সাবধানে উঠো; কালো পতাকাটা উড়িয়ে দাও।

পতাকাটা উড়িয়ে দেয়া হলে পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্লোগান দিলো ওরা। তারপর কেউ কেউ নিচে নেবে গেলো। আর কয়েকজন ছাদের ওপর পায়চারী করতে লাগলো নিঃশব্দে।

একপাশে, যেখানে কার্নিশটা বেশ চওড়া, সেখানে এসে বসলো মুনিম। কুয়াশা ছাওয়া আকাশে তখন তারারা নিভতে শুরু করেছে একটা একটা করে। রমনার আকাশে ধলপহর দিচ্ছে। মৃদু উত্তরা বাতাসে শীতের শেষ সুর। দু'একটা পাখি শাল, দেবদারু গাছের ফাঁকে কিচিরমিচির করে ডাকছে।

কার্নিশের উপর থেকে দেখলো মুনিম। তিন লরী পুলিশ এসে নাবলো মুসলিম হলের গেটে। সাথে একটা জীপ। জীপ থেকে নাবলেন পুলিশ অফিসাররা। গাট্টাগোট্টা চেহারা। চোখগুলো লাল লাল।

গেটটা বন্ধ ছিলো বলে বাইরে দাঁড়াতে হলো ওদের। দারওয়ানকে ডাকলো, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেলো না। ফ্লাগ ষ্ট্যাণ্ডে কালো পতাকাটা পত পত করে উড়ছিলো। সে দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষলো ওরা। ছেলেরা তখন স্লোগান দিতে শুরু করেছে। 'দমন নীতি চলবে না'। ছাদের উপর থেকে দ্রুত নিচে নেবে এলো মুনিম।

একটা ছেলে ওকে দেখতে পেয়ে বললো, আপনি ওদিকে যাবেন না মুনিম ভাই। আপনি পেছনে থাকুন।

আরেকটি ছেলে হাত ধরে পেছনের দিক টেনে নিয়ে গেলো তাকে।

খবরটা পেয়ে ইতিমধ্যে প্রভোষ্ট সাহেব এসে হাজির। মোটাসোটা দেহটা নিয়ে রীতিমতো হাঁফিয়ে উঠেছিলেন তিনি, বুকটা দুরু দুরু করছিলো। শুকনো ঠোঁটজোড়া নেড়ে বারবার বিড়বিড় করছিলেন তিনি, কি আপদ, কি আপদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে দেখে দারওয়ান সালাম ঠুকে গেট খুলে দিলো। গেট খুলতে পুলিশ অফিসাররা হুড়মুড় করে ঢুকতে যাচ্ছিলো, ছেলেরা চিৎকার করে উঠলো, আপনারা ভেতরে ঢুকবেন না বলছি।

আহাহা কি হয়েছে, কি হয়েছে। হাত-পা নেড়ে একবার পুলিশ অফিসারদের দিকে আরেকবার ছাত্রদের দিকে তাকালেন তিনি।

গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তাঁর দেহটা কাঁপছে।

ছেলেরা বললো, ওদের বাইরে দাঁড়াতে বলুন স্যার, ভেতরে এলে ভালো হবে না।

আহাহা, আপনারা ভিতরে আসছেন কেন, বাইরে দাঁড়ান একটু।

প্রভোষ্ট সাহেবের কথায় অপ্রস্তুত হয়ে গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো পুলিশ অফিসাররা।

ছেলেদের সঙ্গে এরপর কিছুক্ষণ বচসা হলো প্রভোষ্ট সাহেবের। প্রভোষ্ট সাহেব বললেন, কি আপদ, কালো পতাকাটা এবার নাবিয়ে ফেললেই তো পারো তোমরা। নাবিয়ে ফেলো না।

বাজে অনুরোধ আমাদের করবেন না স্যার। নাবাবার জন্যে ওটা তুলি নি। ছেলেরা একস্বরে বলে উঠলো।

নিরাশ হয়ে বার কয়েক মাথা চুলকালেন প্রভোষ্ট সাহেব। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, কি আপদ, কি আপদ।

পুলিশ অফিসারগুলোর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিলো। তাই হুড়মুড় করে আরেক প্রস্থ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো তারা। ছেলেরা এগিয়ে এসে বাধা দিলো। আমরা ঢুকতে দিবো না বলছি, দেবো না।

তবু খাকি পোষাক পরা অফিসারদের সামনে এগুতে দেখে পরক্ষণে অপরিসর বারান্দাটার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। তারপর চিৎকার করে বললো, যেতে হলে বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাও, এমনিতে যেতে দেবো না আমরা।

পুলিশ অফিসারগুলো পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। একজন অফিসার আরেকজনের কানে ফিসফিসিয়ে বললো, আমাদের অত কোমল হলে চলবে কেন স্যার, শুনলে কিউ. খান সাহেব বরখাস্ত করে দেবেন আমাদের। কিন্তু কেউ সাহস করলো না এগুতে।

মেডিকেলে মেয়েদের হোস্টেলের বাঁ দিককার রুমটায় তিন-চারজন মেয়েকে নিয়ে বসে আলাপ করছিলো সালমা। বাইরে বারান্দায় বসে তখন কয়েকটি মেয়ে গান গাইছিলো, ওদের ভুলিতে পারি না, ভুলি নাই রে–। একটু আগে কালো পতাকা তুলেছে ওরা। এখনো সেই পতাকা তোলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলো। এমন সময়, হঠাৎ একটা বিরাট শব্দে চমকে উঠলো সালমা। বারান্দা থেকে একটি মেয়ে চিৎকার করে বললো, পুলিশ।

কোথায়? সালমা ছিটকে বেরিয়ে এলো বারান্দায়।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দেখালো ওই দেখো।

সালমা চেয়ে দেখলো পুলিশ বটে। ছাত্রদের ব্যারাক ঘেরাও করেছে ওরা। সামনে দাঁড়িয়ে কিউ. খান নিজে। রাতে বড় কর্তার পাল্লায় পড়ে মাত্রাতিরিক্ত টেনেছে। তার আমেজ এখনো যায় নি। মাথাটা এখনো ভার ভার লাগছে। চোখজোড়া জবা ফুলের মত লাল টকটকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেডিকেল ব্যারাকের গেটটা পেরুতে কালো কাপড় দিয়ে ঘেরা শহীদ বেদীটা চোখে পড়লো কিউ. খানের। লাল চোখে আগুন ঠিকরে বেরুলো তার। আধো আলো-অন্ধকারে শহীদ বেদীটার দিকে তাকালে গা'টা ছমছম করে ওঠে। আলকাতরার মত কালো কাপড়টা অন্ধকারকে যেন বিভীষিকাময় করে তুলেছে। আর তার ওপর যত্নে সাজিয়ে রাখা অসংখ্য ফুলের মালা হিংস্র পশুর চোখের মত জ্বলছে ধিকিধিকি করে।

কিউ. খানের ঈশারা পেয়ে একদল পুলিশ অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো শহীদ বেদীটার ওপর। কঞ্চির ঘেরাটা দু'হাতে উপরে অদূরে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো তারা। কালো কাপড়টা টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলো একপাশে। ফুলগুলো পিষে ফেললো বুটের তলায়। হঠাৎ একটা রক্ত গোলাপ মারাতে গিয়ে কিউ. খানের মনে পড়লো, যৌবনে একটি মেয়েকে এমনি একটি ফুল দিয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলো সে।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে পিশাচের মত হেসে উঠলো কিউ. খান। হৃদয়ের কোমলতা তার মরে গেছে বহুদিন আগে।

ছেলেরা ইতিমধ্যে ব্যারাক ছেড়ে বেড়িয়ে জমায়েত হয়েছে বাইরে।

আর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছে উত্তেজিত গলায়। কারো গায়ে গেঞ্জি, কারো লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই পরনে। কেউ কেউ গায়ে কম্বল চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। সকলে উত্তেজিত। ক্রোধে আর ঘৃণায় হাত-পাগুলো কাঁপছিলো। যেন পুলিশগুলোকে হাতের মুঠোয় পেলে এক্ষুণি পিষে ফেলবে ওরা।

হঠাৎ কিউ. খানের বন্য গলায় আওয়াজ শোনা গেলো 'চার্জ'।

মুহূর্তে পুলিশগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো ছাত্রদের উপর।

ওসমান খান সীমান্তের ছেলে। ভয়ংকাকে বলে জানে না সে। ছাত্রদের বেপরোয়া মারতে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশের মাঝখানে। ইয়ে সব ক্যায়সে হোতা হ্যায়, হামলোগ ইনসান নাহি হ্যায়? দু'জন পুলিশকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো ওসমান খান। ছেলেরা সব পালাচ্ছিলো, ওসমান খান চিৎকার করে ডাকলো ওদের, আরে ভাগতা হায় কিউ। ক্যায়া হামলোগ ইনসান নাহি হ্যায়? কিন্তু পরক্ষণে একজন লালমুখো ইন্সপেক্টর ছুটে এসে গলাটা টিপে ধরলো তার। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিলো ওসমান খানের মুখের ওপরে। প্রথম কয়েকটা ঘুষি কোন রকমে সয়ে নিয়েছিলো সে।

তারপর হুঁশ হারিয়ে টলে পড়লো মাটিতে।

রশীদ চৌধুরী এতক্ষণ লেপের তলায় ঘুমোচ্ছিলো। এসব হট্টগোল আর স্লোগান দেয়া ওর ভাল লাগে না। যারা এসব করে তাদের দু'চোখে দেখতে পারে না সে। ও জানে শুধু দুটো কাজ। এক হলো সিনেমা দেখা আর দুই হলো সারারাত জেগে ফ্লাশ খেলা। এ দুটো নিয়ে মশগুল থাকে সে।

বাইরে হট্টগোল শুনে ব্যাপার কি দেখার জন্যে দরজা দিয়ে উঁকি মারছিলো সে। অমনি একটা পুলিশ হাতের ব্যাট দিয়ে গুঁতো মারলো ওর মুখের ওপর। অস্ফুট আর্তনাদ করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে চাইছিলো রশীদ চৌধুরী। ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলেই পুলিশটা ওর গেঞ্জি চেপে ধরলো। ভাগতে হে কাঁহা, চালিয়ে।

রশীদ চৌধুরী বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগলো, আমি কিছু করি নি।

আরে–আরে এ কি হচ্ছে?

খামোস – ভয়ঙ্কর স্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো পুলিশটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রশীদ চৌধুরী আবার তাকে বোঝাতে চাইলো যে, সে নির্দোষ। আমি কিছু করি নি, কসম খোদার বলছি। কিন্তু ওতে কোন ফল লাভ হলো না দেখে এবার রীতিমত গরম হয়ে উঠলো রশীদ চৌধুরী। চিৎকার করে সে তার বন্ধুদের ডাকলো। ভাইসব– তারপর স্লোগান দিতে লাগলো উত্তেজিত গলায়।

ভোরে আসার কথা ছিলো। আসতে বেলা হয়ে গেলো ওর। ছাইদানের ওপর রাখা সিগারেট থেকে শীর্ণ ধোঁয়ার রেখা সাপের মত এঁকেবেঁকে উঠে বাতাসে মিইয়ে যাচ্ছে। বিছানা শূন্য। কৌচেও কেউ বসে নেই।

বাথরুমে ঝপঝপ শব্দ হচ্ছে পানি পড়ার। বজলে চারপাশে তাকিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটি ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে ছবি দেখতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর পানি পড়ার শব্দ বন্ধ হলে, তোয়ালে দিয়ে মাথার পানি মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ। এই যে তুমি এসে গেছ, তাহলে। ও হেসে বললো, ওই পত্রিকার নিচে সিগারেটের প্যাকেট আছে নিয়ে একটা ধরাও।

বজলে শুধালো,সাহানাকে দেখছি না, ও কোথায় গেলো?

চুলে তেল মাখছিলো মাহমুদ, মুখ না ঘুরিয়েই বললো, আর বলো না, ওর সঙ্গে কাল রাতে একটা বিশ্রী রকমের ঝগড়া হয়ে গেছে আমার!

হঠাৎ?

না, ঠিক হঠাৎ নয়। ক'দিন থেকে সম্পর্কটা বড় ভালো যাচ্ছিলো না।

ক্ষণিক বিরতি নিয়ে মাহমুদ আবার বললো, তুমিতো জান, ওর ব্যাপারে কোনদিন কোন কার্পণ্য করি নি আমি। যখন যা চেয়েছে দিয়েছি, কিন্তু কি জানো, মেয়েটা এক নম্বরের নিমকহারাম, বড় নির্লজ্জ, আর– ওসব কথা শুনে তোমার কাজ নেই। থেমে আবার নতুন কিছু বলতে যাচ্ছিলো মাহমুদ। বজলে বাধা দিয়ে বললো, কিন্তু সে গেলো কোথায়?

মাহমুদ ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললো, চলে গেছে, ভোরে উঠে ওর মালপত্র নিয়ে বুঝলে বজলে, একটা কথা না বলে চলে গেছে।

যাক, মরুকগে, আমার কি? চুলের ওপর চিরুনি বুলোতে বুলোতে মুখটা বিশ্রীভাবে বাঁকালো মাহমুদ।

সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে ম্যাগাজিনের ওপর আবার চোখ নাবালো সে।

হ্যাঁ, যে কথা বলার জন্য ডেকেছিলাম বজলে–।

হুঁ, বলো। পত্রিকাটা টেবিলের ওপর নাবিয়ে রাখলো সে।

দেয়ালে টাঙানো ওর নিজের ছবিটার দিকে তাকিয়ে মাহমুদ মৃদু গলায় বললো, মুনিম তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই না?

এ ধরনের প্রশ্ন আশা করে নি বজলে। তাই প্রথমে সে কিছুক্ষণের জন্যে বোবা হয়ে গেলো। তারপর আস্তে করে বললো, না, ঠিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয় তবে তার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের আলাপ। কিন্তু, কেন বল তো?

না, এমনি। থেমে আবার বললো মাহমুদ, ওর সম্পর্কে তোমার ধারণাটি কি বলতো, মানে ছেলেটা কেমন?

সিগারেটে একটা জোর টান দিলো বজলে, তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, দেখো ব্যক্তি হিসেবে ওকে বেশ ভাল লাগে আমার। তবে ওর রাজনৈতিক আদর্শকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আজ হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন করছো আমায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ সহসা কোন জবাব দিলো না। তারপর যখন সব কিছু খুলে বললো তখন আর কিছু অস্পষ্ট রইলো না বজলের কাছে। বজলের উচিত মুনিমের সঙ্গে খুব সদ্‌ভাব রাখা। ওর আস্থাভাজন হওয়া। তারপর ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে ভেতরের খবরগুলো সব অতি সাবধানে বের করে নেয়া। কোথায় থাকে সে, কি করে, কাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, এসব জেনে মাহমুদকে বলা। এর বিনিময়ে তার কর্তাদের কাছ থেকে ওকে একটা মোটা টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারে মাহমুদ। কোন খাটুনী নেই অথচ ফিয়াসেকে নিয়ে আমোদস্ফূর্তিতে থাকার মত অনেক টাকা পাবে সে।

অর্থাৎ তুমি আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বলছ, তাই না? অল্প একটু হেসে গম্ভীর হয়ে গেলো বজলে।

না, ঠিক তা নয়, বুঝলে বজলে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মাহমুদ ইতস্তত করছিলো।

প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে নিয়ে বজলে ধীরে ধীরে কেটে কেটে বললো, দেখো মাহমুদ, তুমিতো আমাকে জান, জীবন সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা দর্শন আছে, সেটা হলো, কারো ক্ষতি না করা, কাউকে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া। ঝামেলা আমার ভাল লাগে না। আমি চাই নিরুপদ্রব অথচ সুন্দর জীবন। আমাকে ওসব জটিলতার ভেতর না টানলে ভালো হয় না?

একটু আগের হালকা আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন একটু গুমোট বলে মনে হলো মাহমুদের। উভয়ে খানিকক্ষণের জন্যে মৌন হয়ে রইলো। অবশেষে মৌনতা ভেঙ্গে বজলে বললো, তুমি কি এখন বেরুবে কোথাও?

দেয়ালে একটা টিকটিকি খাবারের তালাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, সেদিকে চেয়ে থেকে মাহমুদ বললো, না, এ বেলা কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই, ঘরেই থাকবো।

একটু পরে বজলে উঠে দাঁড়ালো, দুপুরের দিকে ডলি হয়তো আসতে পারে এখানে, এলে বসতে বলো, আমি আবার আসবো– বলে আর অপেক্ষা করলো না।

ও চলে গেলে কিছুক্ষণ চোখ মুদে চুপচাপ বসে রইলো মাহমুদ। হাত ঘড়িটা দেখলো বার কয়েক। ন'টা বাজতে মিনিট কয়েক বাকি।

এতক্ষণে তার এসে যাবার কথা। মাহমুদ বিড়বিড় করে বললো, এখনো এলো না যে? উঠে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো সে। জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যেতে শিকারি কুকুরের মত কানজোড়া খাড়া হয়ে গেলো তার।

হ্যাঁ, তারই পায়ের শব্দ। মুখখানা প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেলো। একটু পরে পর্দার ফাঁক দিয়ে তার চেহারা দেখা গেলো। মাহমুদ মৃদু হেসে ডাকলো, এসো।

চারপাশে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে ভেতরে এসে কৌচের উপর বসলো সবুর।

মাহমুদ উৎকণ্ঠা নিয়ে বললো, এত দেরি হলো যে?

সবুর একটা ক্লান্তির হাই তুলে বললো, হলে কয়েকটি ছেলে এ্যারেষ্ট হয়েছে, ওদেরে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা তাই আসতে দেরি হয়ে গেলো। বলে আরেকবার চারপাশে তাকালো সে।

মাহমুদ সিগারেটের প্যাকেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, তারপর কি খবর বলো।

সবুর মৃদু হেসে বললো, গতকাল যে রিপোর্টটা পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন তো?

মাহমুদ মাথা সামনে একটু ঝুঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ পেয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুর বললো, আমাকে এখুনি আবার ফিরে যেতে হবে হলে। আজকের রিপোর্টটা বিকেলে পাঠিয়ে দেবো। আমাকে ডেকেছিলেন কেন বলুন তো?

হ্যাঁ, তোমাকে ডেকেছিলাম, বলতে গিয়ে কি যেন ভাবলো মাহমুদ।

তোমাকে ডেকেছিলাম, হ্যাঁ, শোন, একটু সাবধানে থেকো আর তোমার রিপোর্টগুলো খুব ভাসা ভাসা হয়ে যাচ্ছে, আরো একটু বেশি করে ইনফরমেশন দেবার চেষ্টা করো।

সবুর আহত হলো। কেন, ইনফরমেশন কি আমি কম দিই।

না না, সে কথা আমি বলছি নে। শব্দ করে হেসে পরিবেশটা হাল্কা করে দিতে চাইলো মাহমুদ। বললো, আরো ইনফরমেশন থাকা দরকার। আমি সে কথা বলছিলাম।

আচ্ছা ভবিষ্যতে তাই চেষ্টা করবো। সবুর উঠে দাঁড়ালো। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এলো সে।

মাহমুদ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বললো, কি?

সবুর বললো, আমার এ মাসের বিলটা এখনো পাইনি।

ও হ্যাঁ, তোমার বিল তৈরি হয়ে আছে,. দু'-একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের ওপর রাখা ম্যাগাজিনটার পাতা উল্টাকে লাগলো মাহমুদ। সবুরের পায়ের শব্দটা একটু পরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো সিঁড়ির ওপর।

বেলা ন'টা দশটা থেকে ছেলেরা বিভিন্ন হল, কলেজ আর স্কুল থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে লাগলো। রাস্তা দিয়ে দলবদ্ধভাবে না এসে একজন দু'জন করে আসছিলো ওরা। কারণ শহরে তখনো একশ' চুয়াল্লিশ ধারা পুরোপুরিভাবে বহাল রয়েছে। জীপে চড়ে পুলিশ অফিসাররা ইতস্তত ছুটোছুটি করছে রাস্তায়। কয়েকটি রাস্তার মোড়ে স্টেনগান আর ব্রেনগান নিয়ে রীতিমত ঘাঁটি পেতে বসেছে ওরা।

শহরের চারপাশ থেকে ছেলেরা যেমন আসছিলো তেমনি সাথে করে নতুন নতুন খবর নিয়ে আসছিলো ওরা। একদল ছেলে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করতে করতে মধুর স্টলে এসে ঢুকলো। আসাদ কাছেই বসেছিলো ওদের। ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

আমরা নবকুমার স্কুল থেকে।

আর আপনারা?

আমরা জগন্নাথ কলেজ।

ও দিককার খবর কি?

সাতজনকে এ্যারেস্ট করেছে।

আরে, ডাঃ জামান যে, তোমাদের হোস্টেলে নাকি পুলিশের হামলা হয়েছিলো। ব্যাপার কি?

তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মোট সতেরোজন গ্রেপ্তার হয়েছে, তার মধ্যে সাতজন মেয়ে। ওর কথায় চমকে উঠলো আসাদ।

সালমার কথা মনে পড়লো। ক্ষণিক নীরব থেকে আগ্রহের সাথে সে প্রশ্ন করলো, মেয়েদের হোস্টেলেও হামলা হয়েছিলো বুঝি?

হয়েছিলো মানে, রীতিমত কুরুক্ষেত্র। জামান হেসে জবাব দিলো।

মেয়েরা অবশ্য একহাত দেখিয়েছে এবার। সেই পঞ্চাশ সালের কথা মনে নেই? তখন স্টাইকের সময় আমরা দোরগোড়ায় শুয়ে পড়েছিলাম আর মেয়েরা সব আমাদের গায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর দিয়ে টপকে ক্লাশে গিয়েছিলো। সেই পাজী মেয়েগুলো এখন আর নেই। ওগুলো প্রায় সব বেরিয়ে গেছে। এখন নতুন যারা এসেছে তারা বেশ ভালো।

জামান থামলো।

আসাদ ভাবছিলো সালমা গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু কি ভেবে প্রশ্ন করলো না সে।

পাশের টেবিলে তখন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো আরেক দল ছেলে।

একজন ডাকলো, বলাই এদিকে এসো। মধু, কোথায় মধু?

এদিকে দু'কাপ চা দাও মধুদা।

খাবার আছে কিছু? যা আছে নিয়ে এসো, ভাল করে খেয়ে নিই। যদি এ্যারেস্ট হয়ে যাই তো ক্ষিধেয় মরবো।

কি ব্যাপার, একটা সন্দেশ চেয়ে চেয়ে হয়রান হয়ে গেলাম, এখনি কালো পতাকা তুলতে যেতে হবে, কইরে বলাই, একটা সন্দেশ কি দিবি জলদি করে?

ব্যাটা অপদার্থ, তাড়াতাড়ি কর।

মুনিমকে এদিকে আসতে দেখে আসাদ উঠে দাঁড়ালো। মুনিমের হাতে দুটো কালো পতাকা আর এক বান্ডিল কালো ব্যাজ। বান্ডিলটা টেবিলের ওপর নাবিয়ে রেখে মুনিম বললো, আর দেরি করে কি লাভ। ছেলেরা প্রায় সব এসে গেছে। এখন কালো পতাকাটা তুলে দিই, কি বল আসাদ?

আসাদ কোন জবাব দেবার আগেই বাইরে থেকে কে যেন একজন চিৎকার করে ডাকলো, মুনিম ভাই, আসুন, আর কত দেরি।

পাশ থেকে রাহাত বললো, দাঁড়ান মুনিম ভাই, একটু দাঁড়ান। এক কাপ চা খেয়ে নিই।

সবুর দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে। ওর কথা শুনে সে জ্বলে উঠলো ভীষণভাবে, তোমাদের শুধু খাওয়া আর খাওয়া, কেন, একদিন না খেলে কি চলে না।

তোমার চলতে পারে আমার চলে না। রাহাত রেগে উঠলো। মুনিম বললো, হয়েছে তোমরা এখন ঝগড়া বাঁধিয়ো না, কালো পতাকা তুলতে কারা কারা যাবে এসো আমার সঙ্গে।

কয়েকজন ছেলে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সিঁড়ি বেয়ে একটু পরে উপরে উঠে গেলো মুনিম।

নিচে, মধুর স্টলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সংঘবদ্ধ হলো বাকি ছেলেরা, সংখ্যায় হয়তো শ'চার-পাঁচেক হবে ওরা। বয়সের তারতম্যটা সহজে চোখে পড়ে। কারো বয়স ষোল সতেরোর বেশি হবে না। কারো চব্বিশ পেরিয়ে গেছে। কারো গায়ের রঙ কালো। কারো গৌরবর্ণ। করো পরনে পায়জামা, কারো প্যান্ট। কিন্তু সংকল্পে সকলে এক। প্রতিজ্ঞায় অভিন্ন।

একটু পরে মুনিম আর তার সাথীদের ছাদের উপর দেখা গেলো। ওরা কালো পতাকা তুলছে। পূবালি সুর্যের সোনালি আভায় চিকচিক করছে ওদের মুখখানা। কালো পতাকা উড়ছে আর শ্লোগানের শব্দে ফেটে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

সার বেঁধে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি এসে থামলো অদূরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে। গাছের ছায়ায়।

রাহাত মুখে গুনলো এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত। সাত গাড়ি পুলিশ এসেছে রে, ওই দেখ, সাত গাড়ি পুলিশ এসেছে। সবুর ঠোঁট বাঁকালো। এতেই ঘাবড়ে গেলে বুঝি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব পিঁপড়ে, পিঁপড়ে; একেবারে কাপুরুষের দল। এর চাইতে মায়ের কোলে বসে চুকচুক করে দুধু খাওয়া উচিত ছিলো তোমাদের।

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলো বলছি, নইলে–। রাহাত ঘুষি বাগিয়ে উঠেছিলো, দৌড়ে এসে ওর হাতটা চেপে ধরলো আসাদ। একি হচ্ছে, একি করছো তোমরা। ছি–ছি। ঘৃণায় দেহটা রি–রি করে উঠলো। তারা ওদের দিকে কিছু কালো ব্যাজ আর আলপিন এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও, কালো ব্যাজ পরাও সকলকে, তোমরাও পরো।

ছেলেরা তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইতস্তত দল বেঁধে বেঁধে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত। কেউ আলোচনা করছে পুলিশ নিয়ে। কেউ ভাবছে যদি জেলে যেতে হয়। কেউ ভাবছে, যারা জেলে গেছে তাদের কথা।

কয়েকটি ছেলেকে ঘুরে ঘুরে কালো ব্যাজ পরাচ্ছিলো। কারো শার্টের পকেটে, কারো কাঁধের ওপর। আসাদ এগিয়ে গেলো তাদের দিকে। আপনারা অমন ঘুরঘুর করছেন কেন? সবাই এক জায়গায় জমায়েত হোন, ওদের ডাকুন। তারপর সে নিজেই ডাক দিলো, ভাইসব–। তার ডাকে ছেলেরা এসে ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো আম গাছতলায়। মেয়েরাও এসে পৌঁছেছে এতক্ষণে। বারোজন মেয়ে। পরনে সবার কালো পাড় দেয়া শাড়ি। চোখেমুখে সবার আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি। রাহাত বললো, আপনাদের আর সবাই কোথায়?

নীলা বললো, ওরা আসবে না।

কেন?

ওদের ভয় করে। আম গাছতলায় ছেলেদের পাশে ওর সাথীদের বসিয়ে রেখে নীলা সোজা মুনিমের কাছে এলো। কই ব্যাজ দিন, আমরা এখনো ব্যাজ পাইনি।

আমার কাছে তো নেই, আসাদের কাছে। হাত দিয়ে অদূরে দাঁড়ানো আসাদকে দেখিয়ে দিলো সে। পুলিশ অফিসাররা তখন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রক্টারের সঙ্গে কি যেন আলাপ করছিলো অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে।

ছেলেরা ওদের দিকে তাকিয়ে আলাপ করছিলো।

তুমি কি মনে করো, পুলিশেরা ভেতরে আসবে।

আসবে মানে, দেখছো না ওরা ভেতরে আসার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

হলেই হলো নাকি, আমরা ওদের ভেতরে ঢুকতে দেবো না।

আমরা এখানে শুয়ে পড়বো তবু ঢুকতে দেবো না ওদের।

আমরা এখানে জান দিয়ে দেবো, তবু–।

আহ, আপনারা থামুন, এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, একটু চুপ করুন।

মুনিমের গলা শোনা গেল একটু পরে। কিন্তু সোরগোল থামানো গেলো না। কে একজন চিৎকার করে উঠলো। ওই যে আরো দু' লরী পুলিশ আসছে, দেখো দেখো।

দু' লরী নয়, তিন লরী, তাকে শুধরে দিলো আরেকজন। দেখেছো মাথায় লোহার টুপি লাগিয়েছে ওরা, যেন যুদ্ধ করতে এসেছে।

প্রক্টার সাহেবকে সাথে নিয়ে তিনজন পুলিশ অফিসার লনটা পেরিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো ছেলেদের দিকে। ইন্‌সপেক্টর রশীদের বুকটা কাঁপছিলো ভয়ে। কে জানে ছাত্রদের ব্যাপার, কিছু বলা যায় না। কাছে গেলে কেউ যদি একটা ইট ছুঁড়ে মারে মাথার ওপর, তাহলে?

উহ্ কেন যে এই পুলিশ লাইনে এসেছিলাম। অস্পষ্ট গলায় বিড়বিড় করে ওঠে ইন্‌সপেক্টর রশীদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ থেকে কিউ. খান জিজ্ঞেস করেন, কি বললেন?

বড় সাহেবের প্রশ্নে রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে যায় ইন্‌সপেক্টর রশীদ।

সামলে নিয়ে বললেন, না না, ও কিছু না স্যার। বলছিলাম কি, এই ছেলেগুলো বড় বেশি বেড়ে গেছে, এদের আচ্ছা করে ঠেঙ্গানো উচিত।

হুম, ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসি খেলে গেলো কিউ. খানের।

ওদের এদিকে এগুতে দেখে ছেলেরা এমন বিকটভাবে চিৎকার জুড়ে দিলো যে, কে কি বলছিলো ঠিক বোঝা গেল না। আসাদ এগিয়ে এসে থামাতে চেষ্টা করলো ওদের। কিন্তু কেউ থামলো না।

ইন্‌সপেক্টর রশীদ বার কয়েক ইতস্তত করে বললো, আমাদের কথাটা আপনারা একটু শুনবেন কি?

আপনাদের কথা আমরা শুনতে চাই না।

আপনারা এখান থেকে চলে যান।

এটা কি পুলিশ ব্যারাক নাকি?

এটা বিশ্ববিদ্যালয়।

এখানে কে ঢুকতে দিয়েছে আপনাদের?

বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে।

রাগে চোখমুখ লাল হয়ে গেলো কিউ. খানের। বার কয়েক দাঁতে দাঁত ঘষলেন তিনি।

তারপর ইশারায় সাথীদের ফিরে আসতে বলে, নিজেও ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। কপালে তার ভাবনার ঘন রেখা। কি করা যেতে পারে এখন?

এদিকে ছেলেরা তখন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে।

ওদের কিছুতে এদিকে আসতে দেবো না আমরা।

না মুনিম ভাই, আপনি না বললে কি হবে। আমরা ওদের বাধা দেবোই। ইট মেরে ওদের মাথা ফাটিয়ে দেবো আমরা। সবার গলা ছাপিয়ে সবুরের গলা শোনা গেলো, ভাইসব, তোমরা ইট জোগাড় কর। আমরা জান দেবো তবু মাথা নোয়াবো না। আমরা বীরের মতো লাগবো– ইট জোগাড় করো।

ওর কথাটা শেষ না হতে কে একজন চিৎকার করে উঠলো, পুলিশ।

আরেকজন বললো, পালাও, পালাও।

অদূরে, শ'খানেক পুলিশ অর্ধ বৃত্তাকারে ছুটে আসছে ছাত্রদের দিকে।

মাথায় ওদের হেলমেট, হাতে একটা করে লাঠি। লোহার নাল লাগানো বুট জুতো দিয়ে শ্যামল দুর্বাঘাসগুলো মাড়িয়ে ছুটে আসছিলো ওরা।

ছুটে আসছিলো দু'চোখে বন্য হিংস্রতা নিয়ে। পালাও, পালাও–।

পুলিশ।

এর মাঝে আরেকটি কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, ভাইসব, পালিও না, রুখে দাঁড়াও। সে কণ্ঠস্বর আসাদের। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর চাপা পরে গেলো চারদিকের উন্মত্ত কোলাহলে।

ভাইসব পালিও না। সমস্ত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো আসাদ।

সামনে তাকিয়ে দেখলো পুলিশগুলো প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে তার। পেছনে একটা ছেলেও দাঁড়িয়ে নেই, সকলে পালাচ্ছে। শুধু পাঁচটি মেয়ে ভয়ার্ত চোখ মেলে বসে আছে ওর পেছনে– আম গাছতলায়। ভাইসব.....। শেষ বারের মত ডাকতে চেষ্টা করলো আসাদ। পরক্ষণে একটা লাঠি এসে পড়লো ওর কোমরের ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর একটা।

আরো একটা আঘাত।

টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলো আসাদ। পাশ থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় বললো, এ্যারেস্ট হিম। আর সঙ্গে সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল তাদের ইস্পাত দৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলো তাকে।

আসাদের মনে পড়লো বায়ান্ন সালের এমনি দিনে প্রথম যে দশজন ছেলে চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিলো তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলো সে।

সেদিনও সবার আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো তাকে।

আর আজ তিন বছর পর সেই দিনটিতে সে আবার সবার আগে বন্দি হলো। বাণিজ্য ভবনের দিকে যারা পালাচ্ছিলো, তাদের মধ্যে মেয়েও ছিলো একজন। শাড়িতে পা জড়িয়ে কংক্রিটের রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেয়েটা। জীবনে কোনদিন পুলিশের মুখোমুখি হয়নি তাই ভয়ে মুখখানা সাদা হয়ে গেলো তার। কলজেটা ধুকধুক করতে লাগলো গলার কাছে এসে। মনে মনে সে খোদাকে ডাকলো। খোদা বাঁচাও। পরক্ষণে চেয়ে দেখলো একটা কনস্টেবল লাঠি উঁচিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। অস্ফুট আর্তনাদ করে মেয়েটা চোখজোড়া বন্ধ করলো।

পুলিশ ভ্যানে উঠে দাঁড়াতে আসাদ পেছনে তাকিয়ে দেখলো, আম গাছতলায় বসে থাকা সে পাঁচটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হচ্ছে এদিকে। নীলা আছে, রানু আর রোকেয়াও আছে ওদের দলে।

ওরা হাত তুলে অভিবাদন জানালো ওকে। তারপর এগিয়ে গেলো আরেকটি পুলিশ ভ্যানের দিকে। ওদের দিক থেকে চোখজোড়া সরিয়ে আনতে আসাদ চমকে উঠলো রাহাতও গ্রেপ্তার হয়েছে। কপাল চুইয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে ওর। সাদা জামাটা ভিজে লাল হয়ে গেছে রক্তে। কাছে আসতে দু'হাতে ওকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিলো আসাদ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর ক্ষতস্থানটা চেপে ধরলো সে। মেয়েরা তখন পাশের ভ্যান থেকে স্লোগান দিচ্ছিলো, বরকতের খুন ভুলবো না। শহীদের খুন ভুলবো না।

আরো জন কয়েক ছেলেকে এনে তোলা হলো প্রিজন-ভ্যানের ভেতরে। তাদের মধ্যে একজনের কাঁধের ওপর লাঠির ঘা পড়ায় হাড়টা ভেঙ্গে গিয়েছে। তাই ব্যথায় সে কাতরাচ্ছিলো আর ফিসফিস করে বলছিলো, হাতটা আমার ভেঙ্গে গিয়েছে একেবারে, মাগো ব্যথায় যে মরে গেলাম।

কি, তোমরা চুপ করে কেন স্লোগান দাও।

আসাদ স্লোগান দিলো, শহীদের স্মৃতি।

আর সকলে বললো, অমর হোক।

ছাত্রদের কাছ থেকে প্রথম প্রতিরোধ এলো লাইব্রেরির ভেতরের দরজায়, দুটো টেবিল টেনে এনে দরজার ওপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করলো ওরা। একটি ছেলে চিৎকার করে ডাকলো, আরো টেবিল আন এদিকে, আরো, আরো। দরজা আটকে ফেলো, যেন ওরা ঢুকতে না পারে।

ওদের এখানে ঢুকতে দেবো না আমরা।

না কিছুতে না।

ওরা যখন প্রতিরোধ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করছিলো তখন কিছু সংখ্যক ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সেলফ থেকে কয়েকটা বই নাবিয়ে সুবোধ বালকের মত পড়তে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলো। বাইরে যে এত কিছু ঘটে গেলো যেন ওসবের সাথে কোন যোগ ছিলো না ওদের। যেন অনেক আগে থেকে এমনি পড়ছিলো ওরা। এখনো পড়ছে।

ওদের দিকে চোখ পড়তে ঘৃণায় দেহটা বার কয়েক কেঁপে উঠলো বেনুর। চোখজোড়া জ্বালাপোড়া করে উঠলো। একটা ছেলের হাত থেকে ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে তীব্র গলায় বেনু তিরস্কার করে উঠলো, আপনার লজ্জা করে না এখন বই পড়ছেন, ওদিকে আপনার বন্ধুদের কুকুরের মত মারছে। আপনার লজ্জা করে না।

কয়েকটি ছেলে লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু কয়েকজন উঠলো না। আগের মতো বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করলো তারা।

একজন ছেলে গলা চড়িয়ে বললো, থাক, ওদের পড়তে দাও। কাপুরুষদের শান্তিতে থাকতে দাও। তোমরা সকলে এদিকে এসো। পুলিশগুলোকে এখানে কিছুতে ঢুকতে দেবো না আমরা। কিন্তু পেছনের দরজা দিয়ে পুলিশগুলো ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে সেখানে। শুধু সেখানে নয়, মেয়েদের কমনরুমে, অধ্যাপকদের ক্লাবে, বাণিজ্য ভবনে, দোতলার করিডোরে, সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে পুলিশের।

ঘুমঘুম চোখে পায়ের শব্দটা কানে আসছিলো তার। ভেজানো দরজাটা ঠেলে কে যেন ঢুকলো ভেতরে। পায়ের শব্দ ঘরের মাঝখানে এসে শ্লথ হয়ে গেলো, তারপর থেমে গেলো এক সময়।

মাহমুদ চোখ মেলে তাকালো এতক্ষণে।

চোখেমুখে অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ডলি।

ও আপনি? বসুন। শুয়েছিলো, উঠে বসলো মাহমুদ।

ওর দিকে ভালো করে তাকাতে সাহস হলো না ডলির। গত রাতের কথা মনে হতে অকারণে আরক্ত হলো সে। টিয়ে রঙের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সামনের কৌচটিতে বসে পড়লো ডলি। পরনে তার হলদে ডোরা কাটা শাড়ি । গায়ে সিফনের ব্লাউজ। চুলগুলো সুন্দর বেণি করা। কপালে চন্দনের একটা ছোট্ট ফোটা আর কানে একজোড়া সাদা পাথরের টব। ডলিকে বেশ লাগছিলো দেখতে।

বার কয়েক ইতস্তত করে ওর দিকে না তাকিয়েই ডলি জিজ্ঞেস করলো, বজলের আসার কথা ছিলো, ও কি এসেছিলো এখানে?

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওপাশের বড় জানালাটা খুলে দিলো মাহমুদ, তারপর বললো, এসেছিলো, আপনাকে বসতে বলে গেছে।

ডলি হতাশ হলো। আসবে তো বলে গেছে, কিন্তু কখন আসবে তার কি কোন ঠিক আছে। এতক্ষণ কি করে এখানে অপেক্ষা করবে ডলি?

দু'জনে চুপ করে ছিলো।

মাহমুদ নীরবতা ভেঙ্গে একটু পরে বললো, শহরের কোন খবর জানেন?

ডলি প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলো না। পরে বুঝতে পেরে বললো, না। কিছু জানে না সে।

মাহমুদ বললো, ইউনিভার্সিটি থেকে কয়েকশ' ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। কার কাছ থেকে শুনলেন?

কণ্ঠস্বরে ওর ব্যগ্রতা দেখে একটু অবাক না হয়ে পারলো না মাহমুদ।

বললো, সারা শহর জানে আর আপনি জানেন না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথার পর চুপ করে গেলো ডলি। আর কোন প্রশ্ন তাকে করলো না। মাহমুদ লক্ষ্য করলো ডলি যেন বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে। কিছু ভাবছে সে, কিন্তু অত গভীরভাবে কি ভাবতে পারে ডলি?

একটু পরে ডলি জিজ্ঞেস করলো, কেন গ্রেপ্তার করা হলো ওদের?

মাহমুদ না হেসে পারলো না। হেসে বললো, বড় বোকার মত প্রশ্ন করলেন আপনি, বিনে কারণে কি ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে? ওরা আইন অমান্য করেছিলো। ক্ষণকাল থেকে মাহমুদ আবার বললো, ওদের নেতা কি যেন নাম ছেলেটার, হ্যাঁ, মুনিম, ওকে নিশ্চয় চিনেন আপনি? ডলি চমকে উঠে বললো, কই নাতো, আপনি কার কাছে শুনলেন? মাহমুদ মৃদু হেসে বললো, বজলের বন্ধু কিনা, তাই ভাবলাম সে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে।

ডলি মাটিতে চোখজোড়া নাবিয়ে রেখে ঈষৎ ঘাড় নাড়লো, না বজলে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় নি ডলির।

আলোচনার ধারাটা হয়তো অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যেই একটু পরে ডলি জিজ্ঞেম করলো, উনি কোথায়, ওনাকে দেখছি না যে?

মাহমুদ বুঝতে না পেরে বললো, কার কথা বলছেন?

ডলি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললো, কেন আপনার ওয়াইফ?

ওয়াইফ? মাহমুদ যেন চিৎকার করে উঠলো, আমার ওয়াইফ?

তারপর হো হো করে হেসে উঠে বললো। ও সাহানার কথা বলছেন?

কে বলেছে ও আমার ওয়াইফ, ও নিজে বুঝি?

ডলি ঘাড় নেড়ে বললো, না, অন্যের কাছ থেকে শুনেছি।

কে সে?

বজলে।

বজলে? মাহমুদ আবার শব্দ করে হেসে উঠলো। তাহলে আপনি ভুল শুনেছেন। সাহানা আমার বোন। বলে হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলো সে।

ডলির ভালো লাগলো না। সব কিছু যেন কেমন অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিলো তার কাছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে এক সময় উঠে দাঁড়ালো সে।

মাহমুদ সচকিত হয়ে বললো, একি আপনি চললেন নাকি?

ডলি ওর দিকে না তাকিয়েই বললো, বজলে এলে বলবেন, শরীরটা আমার খুব ভালো লাগছিলো না তাই চলে গেলাম।

আচ্ছা তাই বলবো। ও চলে যেতে চাওয়ায় যেন স্বস্তি পেলো। কে জানে, সাহানা সম্পর্কে যদি আরো কিছু জিজ্ঞেস করে বসতো? ডলি চলে গেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে বজলেকে গালাগালি দিলো মাহমুদ। আস্ত একটা ইডিয়ট। তারপর গুনগুন করে একটা ইংরেজি গানের কলি ভাজতে লাগলো সে। একটু পরে তাকেও বেরুতে হবে বাইরে।

লালবাগে যখন প্রথম পুলিশ ভ্যানটা এসে পৌছলো বেলা তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। শুকনো ধুলো উড়ছে বাতাসে। হলদে রোদ চিকচিক করছে লালবাগের মাঠের ওপর। যেখানে এককালে সেই একশো বছর আগে দেশী সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিলো বিদেশী বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সেই মাঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ ভ্যানটা গেটের সামনে এসে থামতে, কবি রসুলকে দেখতে পেলো আসাদ। পরনে তার একটি লুঙ্গি। গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এলো কবি রসুল। কোত্থেকে ধরেছে তোমাদের?

ইউনিভার্সিটি থেকে।

এখানে ক'জন?

এখানে আমরা আঠারো জন। আরো অনেককে ধরেছে। ওদেরও এখনি নিয়ে আসবে। সকালে যারা ধরা পড়েছিলো, তারা সকলে ঘিরে দাঁড়ালো নতুন অভ্যাগতদের। হাতে হাত মেলালো ওরা। তারপর রাহাতের দিকে চোখ পড়তে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, একি, ওর মাথা ফাটলো কেমন করে?

আসাদ বললো, ইউনিভার্সিটিতে লাঠি চার্জ করছে ওরা।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

পাশে একজন দারোগা দাঁড়িয়েছিলো। কবি রসুল তার দিকে তাকিয়ে রেগে উঠলো। কি সাহেব তামাশা দেখছেন বুঝি? ছেলেটা তো মারা যাবে। একটা ডাক্তার ডাকুন না।

এখানে ডাক্তার ডাকার কোন নিয়ম নেই। দারোগা জবাব দিলো। বলেন তো তাকে হাসপাতালে পাঠাই।

হয়েছে, আপনাকে অত দরদ দেখাতে হবে না। মেবুর মাটিতে থু থু ছিটিয়ে বললো। লোকগুলোকে দেখলে ঘেন্নায় বমি আসে আমার। যান যান সাহেব, এখান থেকে দূরে সরে যান।

এমন অপ্রত্যাশিত অপমানের কথা শুনে রাগে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো লোকটার। কিন্তু কিছু বলতে সে সাহস করলো না। চুপচাপ সরে গেলো একপাশে। মেডিকেলের ছেলেরা বললো, আপনারা ঘাবড়াবেন না, জখমটা তেমন মারাত্মক নয়, আমরা ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি। বলে ওরা এগিয়ে এসে রাহাতকে ধরাধরি করে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসালো। ওসমান খান বললো, একটু গরম পানি আর কিছু আয়োডিন দরকার।

দাঁড়ান দেখি জোগাড় করতে পারি কিনা। ওকে আশ্বাস দিয়ে থানা ইনচার্জের কাছ থেকে আয়োডিন আর গরম পানি আনার বন্দোবস্ত করতে গেলো কবি রসুল।

পুলিশ ভ্যান থেকে নামবার আগ পর্যন্ত আসাদ ভেবেছিলো সালমার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে সে কি আগের মত সহজভাবে কথা বলতে পারবে।

গত রাতের কথা বারবার করে মনে পড়ছিলো তার।

থানা অফিসের পাশে লম্বা ব্যারাকটার সামনে আরো সাত-আটটা মেয়ের মাঝখানে বসে ওদের কি যেন বোঝাচ্ছিল সালমা। দেখে আসাদ বুঝলো ওরা মেডিকেলের মেয়ে। সকালের হোস্টেল থেকে ধরা পড়েছে ওরা। কারো পরনে সেলওয়ার, কারো পরনে শাড়ি।

আসাদকে দেখে ফিক করে হেসে দিলো সালমা। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, বেশ আপনিও ধরা পড়েছেন তাহলে?

কি করবো বলুন, আপনাদের ছেড়ে থাকতে পারলাম না।

আসাদের কথায় মুখখানা ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠলো সালমার। চোখজোড়া মাটির দিকে নাবিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলো সে। কে জানে হয়তো গত রাতের কথা মনে পড়েছে তার, আসাদ ভাবলো।

একটু পরে সালমা ইতস্তত করে বললো, আমরা ভোর রাতেই এ্যারেস্ট হয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, আমি তা শুনেছি।

কার কাছ থেকে শুনলেন? ভ্রূজোড়া স্বল্প বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলো সালমা। আসাদ বললো, আপনার সহপাঠীদের কাছ থেকে।

ও, সালমা মৃদু হেসে মুখখানা অন্য দিকে ঘুরিয়ে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। না। গতরাতের কথা এখন আর মনে নেই তার। সব ভুলে গেছে মেয়েটি, আসাদ ভাবলো। ভেবে কেন যেন মনটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো তার।

ভার্সিটির মেয়েদের নিয়ে তখন দ্বিতীয় প্রিজন-ভ্যানটা এসে পৌঁছেছে লালবাগে। ওদের দেখতে পেয়ে শিশুদের মত আনন্দে হাততালি দিতে দিতে সেদিকে এগিয়ে গেলো মেডিকেলের মেয়েরা। এই যে নীলা যে, এসো এসো। ছুটে এসে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো সালমা।

রানু বললো, বাহ্ সালমা আপা তুমি? বেশ ভালোই হলো একসঙ্গে থাকা যাবে।

সালমা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা ক'জন?

নীলা জবাব দিলো, পাঁচ।

তাহলে পাঁচ আর আট মিলে আমরা তেরোজন হলাম।

হ্যাঁ, তেরোজন মেয়ে আমরা। সালমা বললো।

আসাদ কাছে দাঁড়িয়েছিলো। ফোঁড়ন কেটে বললো, আমাদের তুলনায় কিন্তু সমুদ্রে বারিবিন্দু।

হয়েছে, হয়েছে অত বড় বড় কথা বলবেন না। নীলা ঠোঁট বাঁকালো।

দেখেছি আপনাদের সাহস। পুলিশ দেখে সব বেড়ালের মত পালিয়েছেন আবার কথা বলেন। আমরা পালাই নি, হুঁ।

উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো আসাদ। এমন সময় আরো একটা পুলিশ ভ্যান এসে থামলো সেখানে।

আরো এক দল ছেলে।

আরো একদল মেয়ে।

তারপর বেলা যত পড়তে লাগলো, গ্রেপ্তার করে আনা ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও তেমনি বাড়তে লাগলো ধীরে ধীরে।

কাঁটা তার আর পুলিশ ঘেরা মাঠটার মধ্যে গোল হয়ে বসলো ছেলেরা মেয়েরা। আর তারা প্রতীক্ষা করতে লাগলো কখন জেলখানায় নিয়ে যাবে। তাদের সকলের মুখে হাসি, চোখে শপথের কাঠিন্য।

হঠাৎ একসময় সবার মাঝখান থেকে অপূর্ব দরদ নিয়ে নীলা গান গেয়ে উঠলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে –।

তারপর সে গাইলো, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

ওর গান শুনে কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন বোবা হয়ে গোলো। কি এক গভীর মৌনতা চারপাশ থেকে এসে গ্রাস করলো ওদের।

খানিকক্ষণ পরে আবার কলকল করে কথা বলে উঠলো ওরা। কবি রসুল একজন দারোগাকে ডেকে বললো, কি ব্যাপার, আমাদের কি এখানে ফেলে রাখবেন নাকি?

আর একজন জিজ্ঞেস করলো, জেলখানায় কখন নেবেন?

এখানে আর ভালো লাগছে না। জেলে নিতে হয় নিয়ে চলুন। উহ্ এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ বসে থাকা যায়। দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন না আপনারা। ওদের হৈ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হট্টগোলের একপাশে চুপচাপ বসেছিলো মুনিম। লাঠির আঘাত লেগে বাঁ চোখটা ফুলে গেছে তার। নীলার গান শুনে বারবার ডলির কথা মনে পড়ছে, ডলিও তো নীলার মত আসতে পারতো এখানে। কেন সে এলো না? ভাবতে গিয়ে বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো মুনিমের।

ওকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বেনু বললো, কি ভাবছেন মুনিম ভাই?

না, কিছু না। চোখ তুলে বেনুর দিকে তাকালো মুনিম। দেহের গড়নটা একটু ভারি গোছের। চেহারাখানা সুন্দর আর কমনীয়। সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে বেনু। কোন আবিলতা নেই, কলুষতা নেই আর কাজ পেলে কি খুশিই না হয় মেয়েটা। দু'হাতে কাজ করে, ওর দিকে তাকিয়ে মুনিমের আবার মনে হলো, ডলি কেন বেনুর মত হলো না। বেনু ওর পাশে বসলো।

ফোলা চোখটার দিকে দৃষ্টি পরতে বললো লাঠির আঘাত লেগেছিলো , তাই না মুনিম ভাই?

মুনিম সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ।

বেনু বললো, মেডিকেলের ছেলেদের বললে ওরা সুন্দরভাবে ব্যান্ডেজ করে দেবে।

বলবো ওদের? বেনুর উৎকণ্ঠা দেখে অবাক হলো মুনিম। বেনু আবার বললো, বলবো?

মুনিম সংক্ষেপে ঘাড় নাড়লো। না।

বেনু আর কিছু বললো না। চুপচাপ রোদে চিকচিক করা অসমতল মাঠটার দিকে চেয়ে রইলো।

অদূরে বসা সালমা আসাদকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এর আগে কোনদিন জেলে যান নি?

গেছি।

ক'বার?

তিনবার।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আসাদ মৃদু হাসলো। চেয়ে দেখলো মাটির দিকে চোখ নাবিয়ে কি যন ভাবলো সালমা। কে জানে, হয়তো গত রাতের কথা ভাবছে সে। কিম্বা ভাবছে তার কারারুদ্ধ স্বামীর কথা। কি ভাবছে জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না আসাদের।

মাঠের ও পাশটায় এরা বসেছিলো।

ওপাশটায় তখন কবি রসুল একজন পুলিশ অফিসারের ওপর রেগে গিয়ে বলছে, এই রোদের ভিতের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবেন এখানে। জেলে কি নেবেন না নাকি?

নেবো, নোবো, এত ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন। এখনি নেবো। জবাবটা তাড়াতাড়ি সেরে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেলো পুলিশ অফিসারটা। সবুর মাটিতে থুথু ছিটিয়ে বললো, লোকগুলোকে দেখলে ঘেন্নায় বমি আসে আমার, তোমরা কেমন করে যে ওদের সঙ্গে কথা বলো। বলে আবার মাটিতে থুথু ছিটালো সে।

কেউ কিছু বললো না।

পরপর তিন চারখানা পুলিশ বোঝাই গাড়ি উত্তর থেকে দ্রুত দক্ষিণ দিকে চলে গেলো। এক নজর সেদিকে তাকিয়ে দেখলো বজলে তারপর মৃদুপায়ে আবার হাঁটতে লাগলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিরেন্ডারে বসে এক কাপ চা খাবে।

কাচের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে সাহানাকে একা বসে থাকতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলো বজলে।

ওকে দেখতে পেয়ে সাহানা ম্লান হাসলো, চা খেতে এলেন বুঝি?

বজলে ওর সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে বললো, হ্যাঁ। আপনি খেয়েছেন?

হ্যাঁ।

আরেক কাপ খান আমার সঙ্গে।

সাহানা হ্যাঁ না কিছু বললো না। বয় এসে দাঁড়িয়েছিলো। বজলে দু'কাপ চা আনতে বললো তাকে।

বয় চলে গেলে বজলে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, এখন কোথায় আছেন আপনি?

সাহানা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বজলের দিকে। তারপর বললো, মাহমুদের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিলো, এর মধ্যে?

বজলে বললো, হ্যাঁ সকালে ওর ওখানে গিয়েছিলাম আমি।

সাহানা মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললো, আমি এখন সেগুন বাগানে আমার এক বান্ধবীর বাসায় আছি।

ও! বজলে মৃদু স্বরে বললো।

বয় এসে চা রেখে গেলো টেবিলের উপর।

পটের ভেতর এক চামচ চিনি ঢেলে দিয়ে সাহানা বললো, ও নিশ্চয় আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে আপনাকে।

বজলে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবশেষে বন্ধুর পক্ষ নিয়ে বললো, না ও কিছু বলে নি আপনার সম্পর্কে।

নিশ্চয় বলেছে, আপনি লুকোচ্ছেন আমার কাছ থেকে। অদ্ভুতভাবে হাসলো সাহানা। পেয়ালার চা ঢালতে ঢালতে আবার বললো, জানেন, লোকটা বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলো আমায়। আর এখন বলে, না আমি ও রকম কোন কথাই দিই নি। ক্ষণকাল থেমে আবার সে, তখন কত অনুনয়, তোমার ভালবাসা পেলে স্বর্গ মর্ত্য এক করে দেবো, আর এখন? জোচ্চোর কোথাকার।

বজলে মাথা নিচু করে ছিলো। চোখ তুলে এবার তাকালো ওর দিকে।

পরনে একখানা কলাপাতা রঙের পাতলা শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগনো। চুলগুলো গোলাকার খোঁপা করা। ডলির চেয়ে কম সুন্দরী নয় সাহানা। চায়ের কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে সাহানা আবার বললো, ও ভেবেছে চিরকাল আমি করুণার ভিখিরি হয়ে থাকি। উর্বর চিন্তা বটে। বলে অদ্ভুতভাবে হাসলো সাহানা।

তারপর চায়ের পেয়ালায় মৃদু চুমুক দিয়ে বললো, থাক ওসব কথা, আপনার কি খবর বলুন! চা খেয়ে বেরিয়ে কোথায় যাবেন।

বজলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, কিছু ঠিক নেই, এমনি একটু ঘুরে বেড়াবো।

সাহানা বললো, আমার ওখানে চলুন না।

বজলে শুধালো কোথায়?

সেগুন বাগানে। ওকে অবাক করে দিয়ে অপূর্ব গলায় সাহানা বললো। ওরা সবাই দেশের বাড়িতে গেছে। বাসাটা খালি। রাতের বেলা একা থাকতে বড় ভয় করবে আমার। চলুন না, আপনিও থাকবেন। সাহানার দু'চোখে আশ্চর্য আমন্ত্রণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুল থেকে পা পর্যন্ত ওর পুরো দেহটার দিকে এক পলক তাকালো বজলে। ডলিকে মনে পড়লো। ও যদি জানতে পারে? না ও মোটেই জানতে পারবে না। সিগারেটে একটা জোর টান দিলো বজলে। তারপর কাঁপা গলায় বললো। আচ্ছা যাবো।

ওর চোখে চোখ রেখে ঠোঁটের কোণে সুক্ষ্ম হাসি ছড়ালো সাহানা।

মিরেন্ডার থেকে বেরিয়ে একখানা রিক্সা নিলো ওরা। ওর কানের কাছে মুখ এনে বজলে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। সাহানা বললো, ডলি গেলো।

ডলি? বজলে আঁতকে উঠলো। কোথায় দেখলেন তাকে?

সাহানা বললো। এইতো রিক্সা করে গেলো ওদিকে।

মুহূর্তে মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেলো বজলের।

ওকি দেখেছে আমাদের?

সাহানা হেসে দিয়ে বললো, তা কেমন করে বলবো। বলে ওর হাতে একটা মৃদু চাপ দিলো সাহানা। ওর হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো বজলে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্যাকাশে দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে ধুকধুক করছে।

আকাশের পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছিলো ধীরে ধীরে।

দিনের ক্লান্তি শেষে, রাত আর স্নিগ্ধতা নিয়ে আসছিলো পৃথিবীর বুকে। কর্মচঞ্চল শহর রাত্রির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই বিষন্ন বিকেলে হঠাৎ মৌনতার গভীর সমুদ্রে ডুব মেরেছিলো যেন।

AMARBOI.COM

জেল গেটের সামনে বন্দি ছাত্র-ছাত্রীদের জড়ো করা হলো এনে। একজন নয় দু'জন নয়। আড়াইশ'র ওপর সংখ্যা ওদের।

খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজন খোঁজ নিতে এসেছেন। কার কি প্রয়োজন কাগজে টুকে নিচ্ছেন চটপট।

সালমার বিছানাপত্তর আর কাপড়-চোপড় নিয়ে শাহেদ এসেছিলো।

হোল্ডল আর সুটকেসটা সামনে নাবিয়ে রেখে সে বললো, নে আপা তোর জিনিসপত্রগুলো সব দেখে নে, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে, জলদি কর।

কেন, তুই কোথায় যাবি? সালমা উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

শাহেদ বললো। বারে, তোদের যে ধরে এনেছে তার প্রতিবাদ ধর্মঘট করবো না বুঝি?

সালমা মনে মনে খুশি হলো। বললো, দেখো তুমি যেন দুষ্টুমি করো না। তাহলে কিন্তু খুব রাগ করবো।

তুই আমায় কি মনে করিস আপা? আমি দুষ্টুমি করি? শাহেদ আহত হলো। এইতো এখন গিয়ে পোস্টার লিখতে বসবো। পাড়ার ছেলেদের সব বলে রেখেছি। আজ রাতের মধ্যে দু'শ পোস্টার লাগানো চাই, কি মনে করেছিস তুই? বলে চলে যাচ্ছিলো শাহেদ।

কি মনে পড়তে ফিরে এসে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে এগিয়ে দিলো সালমার দিকে।

দিতে ভুলেই যাচ্ছিলাম, নে দুলাভাইয়ের চিঠি।

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলো সালমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ বললো, কার চিঠি?

সালমা ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো, ও লিখেছে, রাজশাহী জেল থেকে। আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। নীলা ডাকলো।

সালমা এসো আমাদের নাম ডাকছে।

অস্ফুট কণ্ঠে আসি বলে, চলে গেলো সালমা।

গত রাতের কথা সে একেবারে ভুলে গেছে। স্বামীর চিঠিখানা কত যত্ন করে রেখেছে হাতের মধ্যে, আসাদ ভাবলো।

আর ভাবতে গিয়ে মনটা কেন যেন ব্যথা করে উঠলো তার।

সাহানাকে দেখে তেমন অবাক হয় নি মুনিম, জানতো সে আসতে পারে।

অবাক হলো ওর সঙ্গে ডলিকে দেখে।

সাহানা বললো, ডলি এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

প্রথমে কিছুক্ষণ একটা কথাও মুখ দিয়ে সরলো না মুনিমের। অপ্রত্যাশিত আনন্দে বোবা হয়ে গেছে সে।

ডলি এগিয়ে এসে এক মুঠো ফুল গুঁজে দিলো ওর হাতের মধ্যে। কিছু বললো না।

মাটিতে চোখ নাবিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

মুনিম মৃদু গলায় বললো, হয়তো দীর্ঘদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না ডলি।

ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে।

স্বল্প অন্ধকারেও মুনিম দেখলো ডলির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে। আনন্দে মনটা নেচে উঠছিলো বারবার। আর সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিলো ডলিকে। ডলির এমন রূপ আর কোনদিন চোখে পড়ে নি মুনিমের।

আসাদ এসে ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলো। তোমার বাসা থেকে কেউ আসেনি মুনিম?

আমেনা এসেছিলো। মুনিম জবাব দিলো। কাপড়-চোপড়গুলো ওই দিয়ে গেছে। মা নাকি খবর শুনে কাঁদতে শুরু করেছেন। মাকে নিয়ে আমার এক জ্বালা। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো মুনিম।

আসাদ সরে গেলো অন্য দিকে। ওর কেউ আসেনি। মা যার নেই দুনিয়াতে কেউ বুঝি নেই তার। হঠাৎ মরা মায়ের কথা মনে পড়ায় মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো আসাদের।

নাম ডেকে ডেকে তখন একজন করে ছেলেমেয়েদের ঢোকান হচ্ছিলো জেলখানার ভেতরে।

নাম ডাকতে ডাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ডেপুটি জেলার সাহেব। এক সময়ে বিরক্তির সাথে বললেন, উহ্ এত ছেলেকে জায়গা দেবো কোথায়। জেলখানাতো এমনিতে ভর্তি হয়ে আছে।

ওর কথা শুনে কবি রসুল চিৎকার করে উঠলো, জেলখানা আরো বাড়ান সাহেব। এত ছোট জেলখানায় হবে না।

আর একজন বললো, এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরফ গলা নদী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহারের আগে

উত্তরের জানালাটা ধীরে ধীরে খুলে দিলো লিলি। এক ঝলক দমকা বাতাস ছুটে এসে আলিঙ্গন করলো তাকে। শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়লো হাতের উপর। নিকষকালো চুলগুলো ঢেউ খেলে গেলো। কানের দুল জোড়া দোলনার মত দুলে উঠলো। নীল রঙের পর্দাটা দু'হাতে টেনে দিলো সে। তারপর, বইয়ের ছোট আলমারিটার পাশে, যেখানে পরিপাটি করে বিছানা, বিছানার ওপর দু'হাত মাথার নিচে দিয়ে মাহমুদ নীরবে শুয়ে, সেখানে এসে দাঁড়ালো লিলি। আস্তে করে বসলো তার পাশে। ওর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে মাহমুদ বললো, 'আমি যদি মারা যেতাম, তাহলে তুমি কি করতে লিলি?'

'আবার সেকথা ভাবছো?' ওর কণ্ঠে ধমকের সুর।

মাহমুদ আবার বললো, 'বল না তুমি কি করতে?'

'কাঁদতাম। হলতো?' একটু নড়েচড়ে বসলো লিলি। হাত বাড়িয়ে মাহমুদের চোখ জোড়া বন্ধ করে দিয়ে বললো, 'তুমি ঘুমোও, প্লিজ ঘুমোও এবার। নইলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। আজ ক'রাত ঘুমোও নি সে খেয়াল আছে?'

মাহমুদ মুখের ওপর থেকে হাতখানা সরিয়ে দিলো ওর, 'কি বললে লিলি, তুমি কাঁদতে, তাই না?'

'না কাঁদবো কেন, হাসতাম।' কপট রাগে মুখ কালো করলো লিলি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাকঘরের দিকে চলে গেলো সে। মাহমুদ নাম ধরে বারকয়েক ডাকলো, কিন্তু কোন সাড়া পেলো না। পাকঘর থেকে থালা-বাসন নাড়ার শব্দ শোনা গেলো। বোধ হয় চুলায় আঁচ দিতে গেছে লিলি।

AMARBOI.COM

চোখ জোড়া বন্ধ করে ঘুমোতে চেষ্টা করলো সে। ঘুম এলো না। বারবার সেই ভয়াবহ ছবিটা ভেসে উঠতে লাগলো ওর স্মৃতির পর্দায়। যেন সব কিছু দেখতে পাচ্ছে সে। সবার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে। মা ডাকছেন তাকে, 'মাহমুদ, বাবা বেলা হয়ে গেলো, বাজারটা করে আন তাড়াতাড়ি।' চমকে উঠে চোখ মেলে তাকালো সে। সমস্ত শরীর শিরশির করে কাঁপছে তার।

বুকটা দুরুদুরু করছে। ভয় পেয়েছে মাহমুদ। তবু আশেপাশে তাকালো সে। মাকে যদি দেখা যায়। কিন্তু তার নজরে এলো না। এলো একটা আরশুলা, বইয়ের আলমারিটার ওপর নিশ্চিন্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে সেটা। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল মাহমুদ।

একটু পরে পাকঘর থেকে এক গ্লাস গরম দুধ হাতে এ ঘরে এলো লিলি। ওকে দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো মাহমুদ। একটুকাল নীরব থেকে বললো, 'আমি মরলাম না কেন, বলতে পারো লিলি?'

সে কথার জবাব দিলো না। বিছানার পাশে গোল টিপয়টার ওপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো।

মাহমুদ আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কই আমার কথার জবাব দিলে না তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিলি বললো, 'দুধটা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'কি প্রশ্ন?'

'আমি মরলাম না কেন?'

লিলি ফিক্ করে হেসে দিয়ে বললো, 'আমার জন্যে।' বলে আবার গম্ভীর হয়ে গেলো সে। দুধের গ্লাসটা ওর মুখের কাছে এগিয়ে ধরে বললো, 'নাও, দুধটা খেয়ে নাও।' কয়েক ঢোক খেয়ে মাহমুদ সরিয়ে দিলো গ্লাসটা, 'আমার বমি আসছে।'

'লেবু দেবো?' সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

মাহমুদ মাথা নাড়লো, 'না।'

লিলি ওর চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'বড় বেশি চিন্তা করো তুমি, ওসব ভেবে কি কোন কুল-কিনারা পাবে? এখন ঘুমাও লক্ষ্মীটি।' ধীরে ধীরে চোখ বুজলো মাহমুদ।

একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লো সে। ওর হাতখানা কোলের ওপর থেকে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে উঠে পড়লো লিলি। কল-গোড়ায় গিয়ে হাতমুখ ধুলো। পা টিপে টিপে ঘরে এসে আলনা থেকে তোয়ালেটা নাবিয়ে নিয়ে মুখ মুছলো। আয়নাটা সামনে রেখে ঘন কালো চুলগুলো আঁচড়ে নিলো। পরনের শাড়িটার দিকে একবার তাকালো সে। না, এতেই চলবে। বাইরে বেরুবার আগখান দিয়ে একবার এসে নিঃশব্দে মাহমুদকে দেখে গেলো লিলি। তারপর টেবিলের উপর থেকে তালাটা তুলে নিয়ে হাল্কা পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিলো দরজায়। টেনে দেখলো ভালোভাবে লেগেছে কিনা। তারপর চাবিটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো লিলি। কাছাকাছি কোন রিক্সা চোখে পড়লো না।

আশেপাশে কোন রিক্সাস্ট্যান্ডও নেই। বেশ কিছুদূর হেঁটে গিয়ে তারপর পাওয়া যেতে পারে একটা।

ব্যাগটা খুলে, পয়সা নিয়েছে কিনা দেখলো লিলি। নিয়েছে সে। কিছু খুচরো আর দুটো এক টাকার নোট।

এই দুপুর রোদে বেশিদূর হাঁটতে হলো না। খানিক পথ আসতে একটা রিক্সা পাওয়া গেলো। হাত বাড়িয়ে তাকে থামালো লিলি, 'ভাড়া যাবে? আজিমপুর গোরস্থানে যাবো। কত নেবে?'

'আট আনা, মেমসাব।'

কোন দ্বিরুক্তি না করে রিক্সায় উঠে বসলো লিলি।

বিকেলে বাসায় ফিরে এসে তালাটা খুলতে গিয়ে হাত কাঁপছিলো তার। সাবধানে দরজাটা খুললো। এখনো ঘুমুচ্ছে মাহমুদ। কপালে মৃদু ঘাম জমেছে তার। কাছে এসে শাড়ির আঁচল দিয়ে সস্নেহে তার কপালটা মুছে দিলো সে। তারপর অতি ধীরে ধীরে নিজের মুখখানা নামিয়ে এনে ওর মুখের ওপর রাখলো লিলি। গভীর আবেগের অস্পষ্ট স্বরে বললো, 'এর বেশি কিছু আমি চাই নে তোমার কাছে। চিরকাল এমনি করে যেন তোমাকে পাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ নড়েচড়ে উঠে ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে বললো, 'মরলে মানুষ কোথায় যায় লিলি?'

লিলি মুখ তুলে সভয়ে তাকালো ওর দিকে। ঘুমের মধ্যেও সেই একই চিন্তা করছে লোকটা। দিনে রাতে এভাবে যদি মৃত্যুর কথা ভাবতে থাকে তাহলে হয়তো একদিন পাগল হয়ে যাবে মাহমুদ। না, তার এই ভয়াবহ পরিণতির কথা কল্পনা করতে পারে না লিলি। এ পরিণাম প্রতিহত করতে হবে। ভালবাসার বাঁধ দিয়ে ধ্বংসের প্লাবন রোধ করবে সে। বিছানার পাশে বসে অনেকক্ষণ তার গায়ে, মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে দিলো লিলি। যেন হাতের স্পর্শে ওর হৃদয়ের সকল ব্যথা আর সমস্ত যন্ত্রণার উপশম করে দিতে পারবে। তার ভেতরে বেদনার সামান্য চিহ্নটিও থাকতে দেবে না লিলি। থাকবে শুধু আনন্দ। অনাবিল হাসি। তৃপ্তিভরা শান্ত-স্নিগ্ধ সুন্দর জীবন। যেখানে অশ্রু নেই। বিচ্ছেদ নেই। হাহাকার নেই। প্রেম প্রীতি আর ভালবাসার একচ্ছত্র আধিপত্য সেখানে।

লিলি ভাবছিলো।

দুয়ারে মৃদু কড়া নাড়ার শব্দে উঠে দাঁড়ালো সে। সাবধানে দরজাটা খুলতেই দেখলো মনসুর দাঁড়িয়ে।

'উনি এখন কেমন আছেন?' ভেতরে এসে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো মনসুর।

লিলি চাপা কণ্ঠে বললো, 'ভালো।'

'ঘুমুচ্ছেন দেখছি।' বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো মনসুর, 'কখন ঘুমিয়েছেন?

'অনেকক্ষণ হলো।' মাহমুদের গায়ের কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে লিলি বললো, 'আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।'

মনসুর বললো, 'না, এখন বসব না। উনি কেমন আছেন দেখতে এসেছিলাম। কাল সকালে আবার আসবো আমি। রাতে অবস্থা যদি খারাপের দিকে যায় তাহলে আমাকে খবর দিবেন।'

'আচ্ছা।' লিলি ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

যাবার আগে, টাকা-পয়সার কোন প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইলো মনসুর। লিলি সংক্ষেপে বললো, 'না।'

'প্রয়োজন হলে সঙ্কোচ না করে চাইবেন।' লিলির চোখে চোখ রেখে মনসুর কাতর কণ্ঠে বললো, 'দয়া করে আমাকে পর ভাববেন না।'

'না না সে কি কথা।' দ্রুত মাথা নেড়ে লিলি বললো, 'ওকে, 'প্লিজ ভুল বুঝবেন না আপনি।'

মনসুর চলে গেলে আবার বিছানার পাশে এসে বসলো লিলি ।

ছোট্ট শিশুর মত ঘুমুচ্ছে মাহমুদ। নির্লিপ্ত প্রশান্তির কোলে আত্মসমাহিত সে। ভবিষ্যতের দিনগুলো এমনি কাটুক।

অর্থের প্রাচুর্য সে চায় না। এই ছোট্ট ঘরে, নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের আলিঙ্গনে নির্বাক প্রবাহে কেটে যাক দিন। এই শুধু তার চাওয়া। কিন্তু এ যেন একটা অতি সুন্দর কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। লিলি ভাবে, মাহমুদের সঙ্গে বিয়ে হলে পর, এই যে একটা অনাবিল জীবনের কথা ভাবছে সে, সে জীবন কি বাস্তবে রূপায়িত হবে?

তবু মানুষ তাই চায়।

লিলিও চাইছে।

কে জানে মরিয়মও হয়তো তাই চেয়েছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সেই দুষ্টু মেয়ে হাসিনা। সেও কি এমনি অন্ধকার ঘন সন্ধ্যায় বসে, এমনি কোন কল্পনার জাল বুনেছিলো?

সরু গলিটা জুড়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলো রিক্সাটা। কিছুদূর এলে, মরিয়ম বললো, 'এবার নামতে হবে লিলি । সামানে আর রিক্সা যাবে না।' বলতে বলতে রিক্সা থেকে নেমে পড়লো সে। তার পিছু পিছু লিলিও নামল নিচে।

চারপাশে নোঙরা আবর্জনা ছড়ানো। কলার খোসা, মাছের আমিষ, মরা ইঁদুর, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পায়খানা, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। দুর্গন্ধে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

আঁচলে নাক ঢেকে লিলি বললো, 'এই তো আর অল্প একটু' বলে সামনে হাত দিয়ে দেখালো সে। এদিকে গলিটা আরো সরু হয়ে গেছে। একজনের বেশি লোক পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে না। মরিয়ম আগে লিলিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে। নাকে ওর শাড়ি দিতে হয় নি, রোজ দু'বেলা এ পথে আসা যাওয়া করতে করতে এসব দুর্গন্ধ ওর নাক-সহ্য হয়ে গেছে। আরো খানিকটা পথ হেঁটে এসে একটা আস্তর উঠা লাল দালানের সামনে দাঁড়ালো মরিয়ম।

লিলি বললো, 'এটা বুঝি তোমাদের বাসা?'

মরিয়ম মাথা নেড়ে সায় দিলো 'হ্যাঁ।'

দোরগোড়ায় একটা নেড়ি কুকুর বসে বসে গা চুলকাচ্ছিলো। ওদের দেখে এক পাশে সরে গেলো সে। এতক্ষণে নাকের উপর চেপে রাখা আঁচলটা নামিয়ে নিলো লিলি ।

দরজাটা পেরুলে একটা সরু বারান্দা। দু'পাশে দুটো কামরা। একটিতে মাহমুদ থাকে। আরেকটিতে মরিয়ম আর হাসিনা। বারান্দার শেষ প্রান্তে আরো একটি কামরা আছে। ওটাতে মা আর বাবা থাকেন। দুলু আর খোকনও থাকে ওখানে। ও ঘরটার পেছনে পাকঘর আর কুয়োতলা। কুয়োতলায় যেতে হলে মা-বাবার কামরার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। অন্য কোন পথ নেই।

ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলো লিলি।

মরিয়ম বললো, 'এসো'। ওর নিজের কামরাটায় লিলিকে এনে বসালো মরিয়ম। একপাশে চওড়া একখানা চৌকির ওপর বিছানা পাতা। দুটো বালিশ পাশাপাশি সাজানো। একটা হাসিনার আর একটা মরিয়মের। দেয়ালে ঝোলান আলনার সাথে তাদের কাপড়গুলো সুন্দর করে গোছানো। তার নিচে একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল। টেবিলে বই-খাতা রাখা। আর কোন আসবাব নেই ঘরে। আছে একটা মাদুর। ওটা মেঝেতে বিছিয়ে পড়ে ওরা।

বিছানার ওপর এসে বসলো লিলি, 'এটা বুঝি তোমার ঘর?'

হাতের বই-খাতাগুলো টেবিলের ওপর রেখে মরিয়ম জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, হাসিনা আর আমি থাকি এখানে।'

এ ঘরে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে দুলু এসে উঁকি মারছিলো ভেতরে! ওকে দেখে মরিয়ম বললো, 'দুলু, মা কোথায় রে?'

দুলু ভাঙ্গা গলায় বললো, 'পাকঘরে।'

মরিয়ম বললো, 'আমার ছোট বোন দুলু, সবার ছোট ও।'

লিলি কাছে ডাকলো ওকে, 'এস, এদিকে এস।'

ওর ডাক শুনে গুটিগুটি পায়ে পিছিয়ে গেলো দুলু। তারপর ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়ম বললো, 'তুমি বসো লিলি, আমি এক্ষুণি আসছি।' বলে আলনা থেকে গামছাটা নামিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

মায়ের ঘরটা খালি। বাবা অফিস থেকে ফেরেন নি এখনো। খোকন আর হাসিনা স্কুলে। মাহমুদ বোধ হয় এখনো ঘুমুচ্ছে ওর ঘরে। সারা রাত ডিউটি দিয়ে এসে সারাদিন ঘুমোয় ও।

কুয়ো থেকে এক বালতি পানি তুলে, মুখ হাত ধোবার জন্যে কাপড়টা গুটিয়ে নিয়ে ভালো করে বসলো মরিয়ম।

পাকঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে মা শুধালেন, 'কে এসেছে রে মরিয়ম?' মরিয়ম মুখে পানি ছিটোতে ছিটোতে জবাব দিলো, 'আমার এক বান্ধবী।'

মা জানতে চাইলেন , 'এক সঙ্গে পড়তো বুঝি?'

মরিয়ম বললো, 'হ্যাঁ।'

মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। ভাতগুলো মজে এসেছে, এখনি নামিয়ে ফেন ঢালতে হবে। তারপর জলের কড়াটা চড়িয়ে দিতে হবে চুলোর উপর। মরিয়ম পাকঘরে এসে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'এক কাপ চা দিতে পারবে, মা?'

সালেহা বিবি বললেন, 'দেখি, চা পাতা আছে কিনা', বলে চুলোর পেছনে রাখা কৌটোগুলোর দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। অনেকগুলো কৌটা রাখা আছে সেখানে। কোনটাতে মরিচ, কোনটায় হলুদ, রসুন কিংবা পেয়াজ। মাঝখান থেকে একটা তুলে নিয়ে খুলে দেখলেন সালেহা বিবি। তারপর বললেন, 'দু'কাপ আন্দাজ আছে। তুই যা আমি করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' হঠাৎ কি মনে হতে পেছন থেকে তাকে আবার ডাকলেন সালেহা বিবি, 'শুধু চা দেবো?'

'কিছু আছে কি?' মরিয়ম প্রশ্ন করলো, 'থাকলে দাও'।

মা ঘাড় নাড়লেন, নেই। থাকবার কি উপায় আছে ওই দুলু আর খোকনটার জন্যে। কাল মাহমুদ কিছু বিস্কুট এনেছিলো, সাধ্য কি যে লুকিয়ে রাখবো। আজ সকালে বের করে দু'জনে খেয়ে ফেলেছে।

'যদি পার, বাইরে থেকে কিছু আনিয়ে দিও মা।' যাবার সময় বলে গেলো মরিয়ম। মায়ের ঘর থেকে সে শুনতে পেলো, ও ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছে লিলি। বোধ হয় হাসিনা ফিরেছে স্কুল থেকে। বাংলাবাজারে পড়ে সে ক্লাস এইটে। লম্বা দোহারা গড়ন। রঙটা শ্যামলা। সরু নাক। মুখটা একটু লম্বাটে ধরনের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে চেহারা একটু ভিন্ন রকমের ওর। চোখ জোড়া বড় হলেও তার মণিগুলো কটা কটা। বাঁ চোখের নিচে একটা সরু কাটা দাগ। ছোটবেলায় দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে বঁটির ওপর পড়ে গিয়ে কেটে গিয়েছিলো। সে চিহ্নটা এখনো মুছে যায় নি।

এ ঘরে এসে মরিয়ম দেখলো লিলির পাশে বসে গল্প জমিয়েছে হাসিনা। 'আপনার শাড়িটা কত দিয়ে কিনেছেন?'

লিলি বললো, 'মনে নেই, বোধ হয় আঠারো টাকা।'

হাসিনা বললো, 'কি সুন্দর, আমিও কিনবো একখানা। কোত্থেকে কিনেছেন আপনি?

লিলি জবাব দিলো 'নিউ মার্কেট থেকে।'

হাসিনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শাড়িটা দেখতে লাগলো। ওর ওই স্বভাব– কারো পরনে একটা ভালো শাড়ি কিংবা ব্লাউজ দেখলে অমনি তার দাম এবং প্রাপ্তিস্থান জানতে চাইবে এবং সেটা কেনার জন্য বায়না ধরবে। কিনে না দিলে কেঁদেকেটে একাকার করবে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ রাখবে হাসিনা। মরিয়ম এসে বললো, 'ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে কি লিলি; ও আমার ছোট বোন হাসিনা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিলি হেসে বললো, 'নতুন করে পরিচয় দিতে হবে না, ও নিজেই আলাপ করে নিয়েছে। হাসিনা বললো, 'আপার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।' বলে হঠাৎ কি মনে হতে ওর দিকে ঘুরে বসে সে আবার বললো, 'আচ্ছা আপনি বলুন তো, আপা সুন্দর না আমি সুন্দর।'

ওর প্রশ্ন শুনে হেসে দিলো লিলি। মরিয়ম বললো, 'নতুন কেউ এলেই ওই এক প্রশ্ন ওর। আপা সুন্দর, না আমি সুন্দর। ক'দিন বলেছি তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর। আমি কুৎসিত, হলো তো?' গলার স্বর শুনে মনে হলো ও রাগ করেছে। আসলে মনে মনে হাসছে মরিয়ম। কারণ সে জানে যে, হাসিনার চেয়ে ও অনেক বেশি সুন্দর। রঙটা ওর ফর্সা, ধবধবে। মায়ের দেহ -লাবণ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছে সে। চেহারাটাও মায়ের মত সুশ্রী। আর চোখজোড়া খুব বড় না হলেও হাসিনার মত কটা নয়।

মা বলেন, 'ও ঠিক আমার মত হয়েছে, স্বভাবটাও আমারই পেয়েছে সে, আর তোরা হয়েছিস তোদের বাবার মত ছন্নছাড়া।'

এ নিয়ে রোজ মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধায় হাসিনা। বলে, 'তুমি তো সব সময় ওর প্রশংসাই করো, আমরা যেন কিছু না।'

শুনে মা হাসেন।

লিলিও হাসলো আজ। হেসে বললো, 'মরিয়ম ঠিকই বলেছে। ও দেখতে কুৎসিত। তুমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর হাসিনা।'

শুনে হাসিনা বড় খুশি হলো।

লিকলিকে বেণী জোড়া দুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। বললো, 'আপনি বসুন, আমি এক্ষুণি আপনার জন্য চা বানিয়ে আনছি।' বলে ঘর থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় বারান্দায় মাহমুদের তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেলো, 'ক'দিন বলেছি আমার বইপত্র ঘাঁটাঘাটি করিস নে, তবু রোজ তাই করবি। এরপর আমি তোকে মাথার ওপরে তুলে আছাড় মারবো হাসিনা।'

হাসিনার খোঁজে এ ঘরে এসে মুহূর্তে চুপসে গেলো মাহমুদ। লিলির দিকে অপ্রস্তুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিলো, তেমনি দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

ও চলে যেতে আঁচলে মুখ চেপে ঘরময় লুটোপুটি খেলো হাসিনা। মরিয়ম ধমকের সুরে বললো, 'আবার হাসছে দেখ না, লজ্জা-শরম বলে কিছু যদি থাকতো। ক'দিন দাদা নিষেধ করে দিয়েছে ওর বইপত্র না ঘাঁটতে তবু–' কথাটা শেষ করলো না মরিয়ম।

একদিন মাহমুদের বই ঘাঁটতে গিয়ে একটা এক টাকার নোট পেয়েছিলো হাসিনা। আরেক দিন একটা আট আনি। সেদিন থেকে যখনি মাহমুদ বাইরে বেরিয়ে যায় তখনি ওর বইপত্র ওলটায় গিয়ে সে। মরিয়মের ধমক খেয়ে চুপ করে গেলো হাসিনা। পরক্ষণে কি মনে হতে লিলির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'আপনার ক্যামেরা আছে লিলি আপা?'

লিলি বললো, 'কেন ক্যামেরা দিয়ে কি করবে তুমি?'

হাসিনা বললো, ছবি তুলবো।'

'তাই নাকি?' লিলি মৃদু হেসে বললো, 'না ভাই, ক্যামেরা আমার নেই।' বিমর্ষ হয়ে লিলির জন্য চা আনতে গেলো হাসিনা।

একটা পিরিচে দুটো সন্দেশ আর দুটো রসগোল্লা। পাশে রাখা দু'কাপ গরম চা। দেখে চোখজোড়া বিস্ফারিত হলো হাসিনার। নাচের তালে জোড় ঘুরনী দিয়ে টুপ করে বসে পড়লো সে, 'মা আমি একটা খাবো।' বলে এক মুহূর্তও দেরি না করে পিরিচ থেকে একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলো সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালেহা বিবি কড়াইতে পানি ঢেলে ডাল চড়াচ্ছিলেন, পেছনে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে হাসিনা।' রসগোল্লা গিলে ফেলে হাসিনা বললো, 'অমন করছো কেন, একটা তো খেয়েছি, আরো তিনটে আছে।'

সালেহা বিবির ইচ্ছে হলো চুলের গোছা ধরে মুখে একটা চড় বসিয়ে দিতে ওর, 'শুধু তিনটে ইয়ে মেহমানের সামনে কেমন করে দেয়, অ্যাঁ? তোদের নিয়ে আর পারি নে আমি। খাওয়ার জন্য এত হা-হা কেন তোদের, রসগোল্লা কি দেখিস নি জীবনে?'

মায়ের ভর্ৎসনা শুনে মুখ কালো করলো হাসিনা। চোখ জোড়া ছলছল করে উঠলো ওর। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আমায় যে তুমি দেখতে পারো না তা আমি জানি। আপার মেহমান এসেছে বলে আজ মিষ্টি আনিয়েছো। আমার কেউ এলে এক কাপ চা-ও দিতে না।' আঁচলে চোখ মুছে ধুপধাপ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলো সে। এখন ছাদে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে হাসিনা। শুধু একটা সন্দেশ খেলো লিলি।

দুলু এসে উঁকি দিচ্ছিলো দোর গোড়ায়। তার হাতে একটা সন্দেশ তুলে দিলো সে। অবশিষ্ট একটা রসগোলা পড়ে রইলো প্লেটের ওপর। সালেহা বিবি অনুরোধ করলেন, 'কি হাত তুলে বসে রইলে যে, ওটা খেয়ে নাও।'

লিলি বললো, 'না, আর খাবো না। মিষ্টি বেশি খাই নে আমি। মরিয়ম তুমি খাও। হাসিনা গেলো কোথায়?'

মরিয়ম কিছু বলার আগে সালেহা বিবি জবাব দিলেন, 'কোথায়, ছাদে গিয়ে দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছে।' বলে আর সেখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলেন না তিনি। চুলোর ওপর ডাল চড়িয়ে এসেছেন সে কথা মনে পড়তে দুলুর হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন সালেহা বিবি। দুলুর চোখজোড়া তখনো পিরিচে অসহায়ভাবে পড়ে থাকা রসগোল্লাটার দিকে নিবদ্ধ ছিলো। যাবার পথেও বার কয়েক সেদিকে তাকিয়ে গেলো সে।

শহরে সন্ধ্যা নামার অনেক আগে এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বাইরে যখন বিকেল এ গলিতে তখন রাত। আর বাইরে যখন ভোর হয় তখনো এ গলিতে তমসায় ঢাকা থাকে। অনেক বাধা ডিঙিয়ে, অনেক প্রাসাদের চুড়ো পেরিয়ে তবে এখানে প্রবেশের অধিকার পায় সূর্য। এ পাড়ার বাসিন্দাদের বড় সাধনার ধন সে। তাই বেলা দুপুরে যখন এক চিলতে রোদ এসে পড়ে এই হীন দালানগুলোর ওপর তখন তার বাসিন্দারা বড় চঞ্চল হয়ে উঠে। ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো রোদে বিছিয়ে দেয় তারা। খানিক পরে ধীরে ধীরে আবার সূর্যটা নেমে যায় পশ্চিমে। কে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যায় তাকে। তখন এখানে অন্ধকার। অন্ধকার শুধু। বাইরে চোখ পড়তে লিলি বললো, 'চলো, এবার উঠা যাক মরিয়ম, রাত হয়ে এলো।'

মরিয়ম বললো, 'একটু বসো, মাকে বলে আসি।'

গলির মাথায় এসে লিলিকে বিদায় দিলো মরিয়ম। ও বাসায় যাবে এখন। মরিয়ম যাবে নারিন্দায়, ছাত্রী পড়াতে। রিক্সায় উঠে লিলি বললো, 'কাল আবার দেখা হবে ম্যারি।'

আদর করে মাঝে মাঝে মরিয়মকে ম্যারি বলে সম্বোধন করে সে।

রোজ পায়ে হেঁটে ছাত্রীর বাড়ি যায় মরিয়ম।

পায়ে হেঁটে ফিরে আসে।

রিক্সায় যদি আসা-যাওয়া করে তাহলে হিসেব করে দেখেছে সে যা পায় তার অর্ধেকটা ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া হাঁটতে যে খুব খারাপ লাগে ওর, তা নয়। মাসের শেষে ত্রিশটা টাকা পাওয়ার আনন্দ হাঁটার ক্লান্তির চেয়ে অনেক বেশি অনেক সুখপ্রদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'পাশের দোকানপাট, লোকজন দেখতে দেখতে এমনি পায়ে চলার পথে অনেক কিছু ভাবে মরিয়ম। বাবার কথা। মায়ের কথা। মাহমুদের কথা। আর নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই বিপর্যয়ের কথা। অনেক কিছু ভাবে মরিয়ম। ইদানীং সেলিনার বড় বোনের দেবর মনসুরের কথাও মাঝে মাঝে ভাবনার মধ্যে এসে যায়।

সেলিনা ওর ছাত্রীর নাম।

মনসুর আজকাল বড় বেশি আসা-যাওয়া করছে ওদের বাসায়। প্রায় বিকেলেই আসে। বিশেষ করে মরিয়ম যখন সেলিনাকে পড়াতে যায় তখন। মরিয়ম ভাবে এবার থেকে লোকটা এলে তার সাথে আর কথা বলবে না সে। কে জানে মনে কি আছে লোকটার। কোন বদ উদ্দেশ্যও তো থাকতে পারে। মানুষের মনের খবর জানা সহজ নয়। জাহেদকে কত কাছ থেকে দেখেছিলো মরিয়ম তবুও কি তার মনের গোপন কথাটি জানতে পেরেছিলো কোনদিন? যদি এক মুহূর্ত আগেও জানতে পারতো তাহলে এমন একটা বিপর্যয় ঘটতে দিতো না মরিয়ম। দোরগোড়ায় পা দিতেই ভেতরে মনসুরের গলার স্বর শোনা গেলো। আজ আগে থেকেই এসে বসে আছে লোকটা।

ওর সামনে দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে চলে এলো মরিয়ম।

সোজা সেলিনার ঘরে।

ওর ঘরটা বড় সুন্দর করে সাজানো আর বেশ পরিপাটি। একপাশে নতুন কেনা একখানা খাটের উপর সেলিনার বিছানা। নীল রঙের একখানা বেডকভার দিয়ে ঢাকা। মাথার কাছে একটা গোল টিপয়, তার উপর ফুলদানিতে বহু বর্ণের ফুল সাজানো। দেখে মনে হয় তাজা ফুল। আসলে কাগজের তৈরি।

দেয়ালে কয়েকখানা ছবি টাঙ্গানো। কোন এক শিল্পীর আঁকা একখানা পোর্ট্রেট।

এ ঘরে ছিলো না সেলিনা। খবর পেয়ে এসে কপালে হাতের তালু ঠেকিয়ে বললো, 'আজ পড়বো না আপা, শরীরটা ভালো লাগছে না।'

মরিয়ম সহানুভূতির সাথে বললো, 'কি হয়েছে?'

ধপ করে বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সেলিনা জবাব দিলো, 'মাথাটা ভীষণ ধরেছে আপা।'

মরিয়ম জানে এটা মিথ্যে কথা। যেদিন পড়ায় ফাঁকি দেবার ইচ্ছে থাকে সেদিন একটা কিছু ছুতো বের করে বসে সেলিনা। কোনদিন মাথা ব্যথা। কোনদিন পেট কামড়। কোনদিন বমি বমি ভাব। মরিয়ম কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি তোমার মাথা ব্যথা করছে সেলিনা?' সেলিনা পাশ ফিরে শুয়ে বললো, 'তুমি সব সময় আমায় সন্দেহ কর আপা।' মরিয়ম বললো, 'এতদূর হেঁটে এসে না পড়িয়ে ফিরে যেতে আমার খারাপ লাগে কিনা, তাই।' 'ওই যা।' হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সেলিনা, 'তুমি বসো আপা, আমি এক্ষুণি আসছি।' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে। খানিকক্ষণ পরে আবার ফিরে এলো। হাতে তিনখানা দশ টাকার নোট। মরিয়মের হাতে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো সেলিনা, 'সত্যি বলছি আপা, মাথাটা আজ ভীষণ ধরেছে।'

মরিয়ম জানে হাজার বুঝালেও, ওকে আর এখন পড়াতে বসানো যাবে না। এখানে বুঝি হাসিনার সঙ্গে মিল আছে ওর। হাসিনাও এমনি ফাঁকি দেয় লেখাপড়ায়। গালাগাল করেও বইয়ের সামনে বসানো যায় না। এঘর থেকে ওঘরে পালিয়ে বেড়ায়। ছাদে গিয়ে বসে থাকে। বাবা বলেন, 'ছোট বেলায় তোমরাও এমন ছিলে। এখনও কম বয়স ওর, বুদ্ধি হয় নি, বুদ্ধি হলে তখন আর বকাবকি করতে হবে না; আপনা থেকেই পড়তে বসবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বলেন, 'ওর বুঝি অল্প বয়স? আসছে মাসে তেরো পেরিয়ে চৌদ্দয় পড়বে। ও বয়সে মরিয়মকে দেখি নি। ওকে পড়তে বলতে হতো? আসলে তুমি ওকে বড় বেশি লাই দিচ্ছো। দেখবে ওর কিছু হবে না জীবনে।' বাবা সব সময় হাসিনার পক্ষ নেন।

মা মরিয়মের।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কথাই ভাবছিলো মরিয়ম।

সেলিনা জিজ্ঞেস করলো, 'কি ভাবছো আপা?'

'না, কিছু না।' হাতের নোটগুলো ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে মরিয়ম বললো, 'তাহলে আমি চলি সেলিনা, তোমার মাকে বলো আমি এসেছিলাম। কাল আবার দেখা হবে, কেমন?'

সেলিনা পাশ ফিরে শুয়ে অস্পষ্ট স্বরে বললো, 'আচ্ছা।'

যাবার জন্যে পা বাড়াতে গতি যেন শ্লথ হয়ে এলো তার। বৈঠকখানা ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনসুর। লম্বা গড়ন। সরু দেহ। পরনে একটা ঢোলা পায়জামা আর গায়ে ঘি রঙের মিহি পাঞ্জাবি। পায়ের শব্দে ওর দিকে ফিরে তাকালো মনসুর। একেবারে ওর মুখোমুখি। চোখজোড়া মাটিতে নামিয়ে নিয়ে ওর পাশ কেটে চলে যাবে ভাবছিলো মরিয়ম।

'একি এসেই ফিরে চললেন যে?' চলার পথে তার প্রতিরোধ করলো মনসুর।

'সেলিনা আজ পড়বে না।' ছোট্ট উত্তরটা দিয়ে চলে যাচ্ছিলো মরিয়ম।

মনসুর বললো, 'চলুন' আমিও যাবো ওপথে।'

ওর নিজের তরফ থেকে কোন আমন্ত্রণ না জানালেও, কিছুদূর পিছুপিছু তারপর পাশাপাশি রাস্তায় নেমে এলো মনসুর। আজ প্রথম নয়। এর আগেও এ ধরনের প্রস্তাব সে পেয়েছে মনসুরের কাছ থেকে। শুধু প্রস্তাব নয়, মরিয়মকে বাসার কাছাকাছি এগিয়ে দিয়েও গেছে সে।

মরিয়মের ভালো লাগে নি। বড় বিরক্তিকর মনে হয়েছে এই অনাহূত সঙ্গদান। কথাবার্তা যে খুব হয়েছে রাস্তায় তা নয়। একদিন জিজ্ঞেস করছিলো, মরিয়ম কোথায় থাকে। আর একদিন জানতে চেয়েছিলো, পরীক্ষা কেমন দিয়েছ মরিয়ম। এছাড়া এমনও দিন গেছে, যে দিন সারা পথ নীরবে হেঁটেছে ওরা। বাসার কাছাকাছি তেমাথায় এসে মনসুর বলেছে 'আচ্ছা আসি এবার। আপনি তো ও পথে যাবেন, আমি এ পথে।' কিছুদূর গিয়ে লোকটা রিক্সা নিয়েছে তা ঠিক লক্ষ্য করেছে মরিয়ম। মরিয়ম জানে বেশ টাকা-পয়সা আছে লোকটার, রিক্সা কেন ইচ্ছা করলে মোটরে চড়ে চলাফেরা করতে পারে। তবু এ পথটা মরিয়মের সঙ্গে হেঁটে আসতো মনসুর।

রাস্তায় নেমে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলো মরিয়ম; কেন সে নিষেধ করলো না লোকটাকে? ইচ্ছে করলে তো মুখের ওপর জবাব দিতে পারতো। বলতে পারতো 'আপনি সঙ্গে আসুন তা পছন্দ হয় না আমার। দয়া করে আর পিছু নেবেন না।' ইচ্ছে করলে আরো রূঢ় গলায় আসতে নিষেধ করতে পারতো মরিয়ম। তবু কেন, একটা কথাও বলতে পারলো না সে?

পাশাপাশি আসছিলো মনসুর। ইতিমধ্যে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে আগুন ধরিয়েছে সে। বার কয়েক তাকিয়েছে মরিয়মের দিকে। মৃদু ঘামছিলো মরিয়ম।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে একটা রিক্সা থামালো সে। মনসুরকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অনেকটা তাড়াহুড়ার সাথে রিক্সায় উঠে বসলো মরিয়ম।

বেশ কিছুদূর আসার পর একবার পেছন ফিরে তাকালো সে। দেখলো এদিকে চেয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে মনসুর। দেখে প্রথমে হাসি পেলো তার। হেসে নিয়ে সে ভাবলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন ব্যবহারটা হয়তো উচিত হয় নি। লোকটা তাকে অভদ্র বলে মনে করতে পারে কিংবা অতি দাম্ভিক। এর কোনটিই নয় মরিয়ম। মনসুরের এই গায়েপড়াভাব তার ভালো লাগে না, এটাই হলো আসল কথা। কথাটা মনসুরকে ভদ্রভাবে বলে দিলেও তো পারতো সে। তাই ভালো ছিলো হয়তো। একটু আগের অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্যে মনে মনে অনুতপ্ত হলো মরিয়ম। কিন্তু পরক্ষণে আবার মনে হলো, সে অন্যায় কিছু করে নি। জাহেদের সঙ্গেও এমনি রূঢ় ব্যবহার করা উচিত ছিলো তার। পারে নি বলেই মরিয়মকে তার শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে আজও। সব পুরুষই সমান। ওরা চায় শুধু ভোগ করতে। প্রেমের কোন মূল্যই নেই ওদের কাছে। আর এই দেহটাকে পাবার জন্য কত রকম অভিনয়ই না করতে পারে ওরা।

গলির মাথায় রিক্সাটাকে বিদায় দিয়ে দিলো মরিয়ম।

এ পথটা হেঁটে যেতে হবে তাকে।

অন্ধকার গলিতে বিজলী বাতির প্রসার এখনো হয় নি। কয়েকটা কেরোসিনের বাতি আছে। টিমটিম করে সেগুলো জ্বলে। তাও সব সময় নয়। মাঝে মাঝে দুষ্টু ছেলেরা ঢিল মেরে চিমনিগুলো ভেঙ্গে দেয়। তখন অন্ধকারে ডুবে থাকে গলিটা।

বাঁ হাতে শাড়িটা গুটিয়ে নিয়ে আবর্জনার স্তূপগুলি এড়িয়ে সাবধানে এগুতে লাগলো মরিয়ম। দু'পাশে জীর্ণ দালানগুলোতে এর মধ্যে ঘুমের আয়োজন চলছে। সামনের বারান্দায় বসে কেউ কেউ গল্প করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সুর করে পড়ার আওয়াজও আসছে এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে। বুড়োদের সাংসারিক আলাপ-আলোচনা। আদেশ-উপদেশ। আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তিগুলোও গলি বেয়ে হাঁটতে গেলে সহজেই কানে আসে।

বাসার কাছাকাছি আসতে ও পাশের দোতলা বাড়ি থেকে ঝপ্ করে এক বালতি পানি কে যেন ঢেলে দিলো মরিয়মের গায়ে। সর্বাঙ্গ ভিজে গেলো। প্রথম কয়েক মুহূর্ত একেবারে হকচকিয়ে গেলো মরিয়ম। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকাতে দেখলো, যে পানি ফেললো সে এইমাত্র মুখখানা সরিয়ে নিয়ে গেলো তার। এমনি প্রায় হয়। রাস্তায় কেউ আছে কি নেই দেখে না তারা। ময়লা আবর্জনা এমন কি বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের পায়খানাও জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। কারো মাথায় পড়লো কিনা লক্ষ্য নেই। রাগে সমস্ত দেহ জ্বালা করে উঠলো মরিয়মের। পরক্ষণে রীতিমত কান্না পেলো তার। সবে গতকাল শাড়িটা ধুয়ে পরেছে। কে জানে কিসের পানি। ভাবতে গিয়ে সারা দেহ রিরি করে উঠলো। মনে হলো সে এক্ষুণি বমি করবে।

ওকে দেখে হাসিনা হট্টগোল বাধিয়ে দিলো। 'একি আপা ভিজে চুপসে গেছিস যে? কি হয়েছে অ্যাঁ। উপর থেকে পানি ফেলেছে বুঝি, এ হে হে, কি নোংরা পানি গো।'

মেঝেতে থুথু ফেললো হাসিনা। 'ওমা। মা, দেখে যাও।'

মরিয়ম স্যান্ডেল জোড়া দ্রুত খুলে রেখে কুয়োতলার দিকে যেতে যেতে বললো, 'আমার ছাপা শাড়িটা আর গামছাটা একটু দিয়ে যা হাসিনা।' মা নামাজ পড়ছিলেন।

বাবা হ্যারিকেনের আলোয় বসে খোকনকে পড়াচ্ছিলেন। 'হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।' হাসিনার চিৎকার শুনে এবং মরিয়মের সাবান নিয়ে কুয়োতলার দিকে তাড়াহুড়া করে চলে যেতে দেখে বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন তিনি, কি হয়েছে অ্যাঁ। কি হয়েছে?' মরিয়ম কিছু বললো না।

শাড়ি আর গামছা হাতে চাপা আক্রোশে পাড়ার লোকদের যমের বাড়ি পাঠাতে পাঠাতে একটু পরে এ ঘরে এল হাসিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসমত আলী আবার মুখ তুললেন, বই থেকে, 'কি হয়েছে অ্যাঁ?'

হাসিনা মুখ বিকৃত করে বললো, 'আপার গায়ে কারা নোংরা পানি ঢেলে দিয়েছে।'

'কারা ঢাললো কোথায় ঢাললো?' হাসমত আলী ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। হাসিনা কুয়োতলায় শাড়ি আর গামছাটা রেখে এসে বললো, 'আপা আসছিলো, উপর থেকে কারা এক বালতি পানি ঢেলে দিয়েছে ওর গায়ে।'

হাসমত আলী শুনে বললেন, 'চোখ বন্ধ করে হাঁটে নাকি, দেখে হাঁটতে পারে না।'

'তোমার যত বেয়াড়া কথা।' নামাজের সালাম ফিরিয়ে সালেহা বিবি বললেন , 'উপর থেকে যারা ময়লা পানি ফেলে তাদের চোখ কি কানা হয়েছে? তারা মানুষ দেখে না? খোদা কি তাদের চোখ দেয় নি?'

স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ না করে চুপ হয়ে গেলেন হাসমত আলী। একটুকাল নীরব থেকে সালেহা বিবি বাকি নামাজটা শেষ করবার জন্যে নিয়ত বাঁধলেন। সহজে ঘটনাটার ইতি করে দিয়ে হাসিনা শান্তি পাচ্ছিলো না। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসে পাশের বাড়ির বউটিকে ডেকে সব কিছু শোনালো সে। 'আপা আসছিলেন হঠাৎ তার মাথায় এক বালতি ময়লা পানি ঢেলে দিয়েছে কে। আল্লা করুক, যে হাতে পানি ঢেলেছে সে হাতে কুষ্ঠ হোক তার, কুষ্ঠ হয়ে মরুক।'

উত্তরে, পাশের বাড়ির বউটি জানালো কিছুদিন আগে তার ছোট দেবর আসছিলো এমনি রাতে, তার মাথার উপর এক রাস ছাই ফেলে দিয়েছিলো। 'লোকগুলো সব ইয়ে–।'

নিচে এসে হাসিনা দেখলো মরিয়ম স্নান সেরে ফিরে এসেছে। বসে বসে চুলে চিরুনি বুলাচ্ছে সে। সামনে টেবিলের ওপর তিনখানা দশ টাকার নোট। দেখে চোখজোড়া বড় বড় করে ফেললো হাসিনা। তারপর ছোঁ মেরে নোটগুলো তুলে নিয়ে বললো, 'তুই বুঝি আজ টাকা পেয়েছিস আপা?' আমাকে লিলি আপার মত একটা শাড়ি কিনে দিতে হবে, নইলে আমি এগুলো আর দেবো না,–সত্যি দেবো না বলছি, কিনে দিবি কিনা বল না আপা।' দু'হাতে মরিয়মকে জড়িয়ে ধরলো হাসিনা। মরিয়ম বললো, 'এখন না, স্কুলের চাকরিটা যদি পেয়ে যাই তাহলে কিনে দেবো, কথা দিলাম।'

'তার কোন ঠিক-ঠিকানা আছে? 'অনিশ্চয়-নির্ভর হতে রাজী হলো না হাসিনা। 'কবে যে চাকরি হবে –হয় কি না তাই কে জানে। শাড়ি যদি না কিনে দিস, একটা ব্লাউজ পিস কিনে দিবি বল?'

মরিয়ম কথা দিলো, একটা ব্লাউজ পিস সে কিনে দেবে। আশ্বস্ত হয়ে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে রাজী হলো হাসিনা। কিন্তু তক্ষুণি দিলো না, ওগুলো কিছুক্ষণ থাকে ওর কাছে। হাতে নিয়ে, আঁচলে বেঁধে ব্লাউজের মধ্যে রেখে এবং আবার বের করে নানাভাবে নোটগুলোর উষ্ণতা অনুভব করলো সে।

ভাত খেতে বসে সালেহা বিবি বললেন, 'দে ওগুলো ট্রাঙ্কে রেখে দি, তোর কোন ঠিক আছে, কোথায় হারিয়ে ফেলবি। দে এদিকে।'

এক লোকমা ভাত মুখে তুলে দিয়ে হাসিনা সরোষ দৃষ্টিতে তাকালো মায়ের দিকে, তারপর নীরবে ভাতগুলো চিবোতে লাগলো।

গোল হয়ে তারা বসেছিলো খেতে। বুড়ো হাসমত আলী, আর তার দুই মেয়ে মরিয়ম আর হাসিনা। সালেহা বিবিও খাচ্ছিলেন এবং পরিবেশন করছিলেন সকলকে। খোকন আর দুলু খেয়েদেয়ে অনেক আগে শুয়ে পড়েছে। মাহমুদ রোজ সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায় ডিউটিতে, ফেরে সেই ভোর রাতে। আজ তার অফ ডে। তবু রাত এগারোটার আগে ফিরবে না সে। অফিসে, রেস্তোঁরায় বন্ধুদের বাড়িতে আড্ডা দিয়ে তবে ফিরবে বাসায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবারটা ওর ঘরে ঢেকে রেখে দেন সালেহা বিবি। ফিরে এসে খেয়ে ঘুমোয় মাহমুদ।

মরিয়মের পাতে এক চামচ ঝোল পরিবেশন করে সালেহা বিবি বললেন, 'কাল গিয়ে খানা শাড়ি কিনে এনো নিজের জন্যে। একটা বাড়তি শাড়ি নেই–।'

মরিয়ম কিছু বলবার আগে হাসিনা জবাব দিলো, 'আর আমার জন্যে একটা ব্লাউজ ।।'

সালেহা বিবি ধমকে উঠলেন, 'ওসব বাজে আবদার করো না।'

হাসিনা সরোষ দৃষ্টিতে আরেকবার তাকালো মায়ের দিকে।

হাসমত আলী এতক্ষণ নীরবে ভাত খাচ্ছিলেন, সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে বহু গ, উপর পাটির দাঁতগুলো বড় নড়বড়ে, যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে, তাই র্কতার সাথে ভাত খান খুব আস্তে আস্তে। দাঁতের ফাঁকে আটকে যাওয়া একটা সরু কাঁটা ুল দিয়ে বের করে নিয়ে হাসমত আলী বললেন, 'তোমার স্কুলের চাকরিটার কি হলো? াটা মরিয়মকে উদ্দেশ্য করে।

মুখের কাছে তুলে আনা হাতের গ্লাসটা থালার ওপর নামিয়ে রেখে বাবার দিকে াকালো মরিয়ম। বাবার প্রশ্নটা যেন ঠিক বুঝতে পারে নি সে। ওকে চুপ থাকতে দেখে নেনা বললো, 'তোর স্কুলের চাকরিটার কি হলো জিজ্ঞেস করছেন বাবা। এতক্ষণ কি ছিলি আপা?'

মরিয়ম অপ্রতিভ গলায় জবাব দিলো, 'তিন-চার দিনের মধ্যে জানা যাবে।' বলে ভাতের ায় মুখ নামালো সে। এতক্ষণ সেই অবাঞ্ছিত ঘটনাটির কথা ভাবছিলো মরিয়ম। সত্যি সুরের সঙ্গে অমন বিশ্রী ব্যবহার না করলেই ভালো হতো। কে জানে, লোকটার হয়তো ন অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। নেইও। মরিয়ম মিছামিছি সন্দেহ করছে তাকেই নিজের শাভনতার জন্যে, মনে মনে লজ্জিত হলো সে।

খাওয়া হলে পরে, রোজ এঁটো থালা-বাসনগুলো ধুয়ে-মুছে গুছিয়ে রাখার কাজে মাকে ায়তা করে মরিয়ম। সালেহা বিবি মেয়ে-ভাগ্যে সুখ অনুভব করলেও মাঝে মাঝে বাধা ন, বলেন, 'থাক না, এগুলো আমিই করবো, তুই ঘরে যা।'

মরিয়ম বলে, 'তুমি সারাদিন খাটো মা, তুমি যাও। ওগুলো আমি গুছিয়ে রাখবো।'

আনন্দে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সালেহা বিবির। মেয়ে তাঁর দুঃখ কষ্ট বোঝে। তাঁর ঘর স্বীকৃতি দেয়। এতেই তাঁর আনন্দ। তারা সুখী হোক। মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রাখুক, এই চান তিনি। আর বেশি কিছু নয়।

খেয়েদেয়ে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলো মরিয়ম।

হাসিনা বসে বসে পড়ছিলো, নিচে মাদুর পেতে। বুকের নিচে একটা বালিশ রেখে ড় হয়ে শুয়ে পড়ে সে। পড়ার ফাঁকে, মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে নেয়। জেগে আবার ড়। আবার ঘুমোয়। এ তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এ জন্যে ওকে ধমকায় মরিয়ম। আজও ধমকালো, 'ওকি হচ্ছে, উঠে সিধে হয়ে বসে ।। শুয়ে শুয়ে পড়তে নেই ক'দিন বলেছি তোমায়?' বই থেকে মুখ না তুলেই হাসিনা াব দিলো, 'আমার যেভাবে ভালো লাগবে সেভাবে পড়বো, তোমার তাতে কি?'

মরিয়ম বললো, 'এভাবে পড়লে বুকে ব্যথা করবে।'

'করুক, তাতে তোমার কি?' বইটা বন্ধ করে রেখে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে লশে মাথা রাখলো হাসিনা।

মরিয়ম কি যেন বলতে যাচ্ছিলো। দুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দ হতে কথাটা আর বললো না । উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো। মাহমুদ এসেছে বাইরে থেকে 'বগলে কতকগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই। হাতে একটা কাগজের মোড়ক। মোড়কটা ওর হাতে তুলে দিয়ে মাহমুদ বললো, 'নাও, এটা তোমাদের জন্যে এনেছি।'

মরিয়ম সকৌতুকে তাকিয়ে বললো, 'এর মধ্যে কি?'

'কি, তা আলোতে নিয়ে গিয়ে দেখতে পার না?' বিরক্ত গলায় জবাব দিলো মাহমুদ।

'যাও একটা বাতি নিয়ে এসো চটপট করে।'

ও ঘর থেকে সব শুনতে পেয়ে বাতি হাতে দৌড়ে এলো হাসিনা, 'কি এনেছেরে আপা, দেখি দেখি।'

'দাঁড়াও দেখবে, অমন আদেখলেপনা করো না। এসব ভালো লাগে না আমার।' নিজের ঘরে এসে বইগুলো মেঝেতে নামিয়ে রাখলো মাহমুদ। তার ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। একটা কাপড় রাখার আলনাও নয়। মেঝেতে পাশাপাশি তিনটে মোটা মাদুর বিছানো। এক পাশে তার স্তূপীকৃত খবরের কাগজ। তায়ে তায়ে রাখা। বাকি তিন পাশে শুধু বই, মাঝখানে ওর শোবার বিছানা। বিছানা বলতে একটা সতরঞ্জি, একটা চাদর আর একটা বালিশ।

মরিয়মের হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে ওদের বসতে বললো মাহমুদ। নিজেও বসলো। তারপর আস্তে করে বললো, 'এর ভেতরে কি আছে তা দেখবার আগে তোমাদের কিছু বলতে চাই আমি।'

হাসিনা ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, 'বলো।'

মরিয়ম গম্ভীর।

মাহমুদ ওদের দু'জনের দিকে ক্ষণকাল স্থিরচোখে তাকিয়ে থেকে বললো, 'দুর্ঘটনাবশত হোক আর যেমন করেই হোক, তোমরা আমার বোন। তাই নয় কি?

হাসিনা আঁচলে মুখ টিপে বললো, 'হ্যাঁ।'

মরিয়ম কিছু বললো না। নীরবে মাথা নাড়লো।

মাহমুদ আবার বললো, 'তোমাদের প্রতি আমার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে, তা বিশ্বাস করো?'

দু'জনে ঘাড় নোয়ালো, ওরা। 'হ্যাঁ।'

মোড়কটা খুলতে খুলতে মাহমুদ বললো, 'তোমাদের জন্য কিছু চুলের ফিতা আর মাথার কাঁটা এনেছি আমি। দেখো পছন্দ হয় কিনা?'

ফিতাজোড়া মাহমুদের হাত থেকে ছুঁ মেরে তুলে নিয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে হাসিনা বললো, 'কি সুন্দর' নাচতে নাচতে মাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলো সে।

মরিয়ম উঠলো, মাহমুদ বললো, 'বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।' মরিয়ম বললো, 'তুমি ভাত খাবে না?'

'না, এক বন্ধুর বাসা থেকে খেয়ে এসেছি আমি।' মাথা নেড়ে ওকে নিষেধ করলো মাহমুদ। 'তোমার সঙ্গে যে মেয়েটি আজ এসেছিলো সে কে জানতে পারি কি? অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

মরিয়ম বললো, 'ওর নাম লিলি, আমার সঙ্গে পড়তো কলেজে।'

মাহমুদ বললো, 'থাক তার নাম আমি জানতে চাই নি। জানতে চেয়েছিলাম ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি, জেনে খুশি হলাম।'

সহসা দু'জন ওরা নীরব হয়ে গেলো।

পাশের ঘর থেকে মা, বাবা আর হাসিনার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মৌনতা ভেঙ্গে মাহমুদ বললো, 'তুমি কি করবে ঠিক করেছো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়ম বললো, 'এখনো কিছু ঠিক করি নি, দেখি স্কুলের চাকরিটার কি হয়।'

মাহমুদ বললো, 'তোমার বান্ধবী লিলি না কি নাম বললে, সে কি করে শুনি?'

মরিয়ম দাদার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'সেও একটা চাকরির খোঁজে আছে।'

'হু।' মাহমুদ ক্ষণকাল চুপ থেকে বললো, 'যাও, এখন ঘুমোবো আমি।' কাগজে মোড়ানো চুলের কাঁটাগুলো তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো মরিয়ম। ও চলে গেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো মাহমুদ। হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে রাখা হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিলো সে।

এখন সমস্ত ঘরটা অন্ধকারে ঢাকা।

চারপাশে তাকালে এই অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

সিগারেটের মাথায় শুধু এক টুকরো আলো। বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে। ভাষা নামক মানুষের আদিম প্রবৃত্তিও বোধ হয় চিরন্তন এমনি করে জ্বলে। পাশ ফিরে শুয়ে মাহমুদ ভাবলো। প্রধান সম্পাদক আজ কথা দিয়েছেন, আসছে মাস থেকে দশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে তার। যদি তিনি তার কথা রাখেন তাহলে, এই বাড়তি দশ টাকা প্রতি মাসে ভাই বোনদের জন্যে খরচ করবে মাহমুদ। আর যদি ছলনার নামান্তর হয় তাহলে?

আর ভাবতে ভালো লাগে না মাহমুদের। সিগারেটটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু সহসা তার ঘুম আসে না। সহস্র চিন্তা এসে মনের কোণে ভিড় জমায়। মাঝে মাঝে মনে হয় রোজ রাতে এমনি এমনি ভাবনার জাল বুনতে বুনতে হয়তো জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যাবে তার। জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে যাওয়া মোমবাতির মত ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাবে সব কিছু।

নিউজ সেক্সনের লম্বা ঘরটা এখন চোখের ওপর ভাসে।

অনেক আশা নিয়ে একদিন 'মিজান' পত্রিকায় চাকরি নিয়েছিলো মাহমুদ। সাব-এডিটরের চাকরি। মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন। অর্থের চেয়ে আদর্শ সাংবাদিক হওয়ার বাসনাই ছিলো প্রবল। কালে কালে একদিন লুই ফিশার হবে।

শুনে সিনিয়ার সাব-এডিটর আমজাদ হোসেন শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন সেদিন। 'লুই ফিশার হবে? বেশ বেশ। অতি উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বটে। বছর খানেক কাজ করো। তারপর লুই ফিশার কি চিংড়ি ফিশার দুটোর একটা নিশ্চয় হতে পারবে।'

বুড়োটার ওপর চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছিলো মাহমুদের। গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছিলো তাকে।

'আহা, শুধু শুধু বেচারাকে অমন হতাশ করে দিচ্ছেন কেন?'

আরেকজন বলেছিলো, টেবিলের ওপাশ থেকে।

তারপর।

তারপর আর ভাবতে পারে না মাহমুদ। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

সকালে ঘুম ভাঙতে মুখ-হাত ধুয়ে বাইরে বেরুবে বলে ভাবছিলো মাহমুদ। এক টুকরো পাউরুটি আর এক কাপ চা এনে ওর সামনে নামিয়ে রেখে সালেহা বিবি বললেন, 'তুই কি বেরুবি এখন?'

'হ্যাঁ, দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা জামা নাবিয়ে নিয়ে মাহমুদ বললো, 'আমায় একটা কাজে যেতে হবে।'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সালেহা বিবি বললেন, 'তোর বাবার শরীরটা আজ ভালো নেই। বাজারটা একটু দিয়ে যা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ কোন জবাব দিলো না তাঁর কথার। যেন শুনতে পায় নি এমনি ভাব করে নীরবে পাউরুটির টুকরোটা ছিঁড়ে খেতে লাগলো সে। মা আবার বললেন, 'কিরে কিছু বলছিস না যে? টাকা আনবো?'

'না।' মাহমুদ নির্বিকারভাবে জবাব দিলো, 'আমার কাজ আছে বললাম তো।' 'কোনদিন তোর কাজ না থাকে ?' সালেহা বিবি গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'বুড়োটা রোজ বাজার করে এনে খাওয়ায়, এ বুড়ো বয়সে তাকে কষ্ট দিতে লজ্জা হয় না তোদের?'

রুটির টুকরোটা পিরিচের উপর নামিয়ে রেখে মাহমুদ বললো, 'আর আমি আহলাদে ঘুরে বেড়াই তাই না মা? রাতের পর রাত যে আমায় তোমাদের জন্য জেগে কাজ করতে হয় তার কোন মূল্য নেই, না?' চায়ের পেয়ালাটা সামনে থেকে সরিয়ে দিলো মাহমুদ।

রুটির পিরিচটাও দূরে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে গেলো সালেহা বিবির। উষ্ণ গলায় তিনি জবাব দিলেন, 'তুই সারারাত জেগে কাজ করিস আর বুড়োটা কি বসে খায়? সারা জীবনে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে রোজগার করে এনে খাইয়েছেন–।'

'হয়েছে, এবার থামো তুমি মা।' জামাটা গায়ে দিতে দিতে জবাব দিলো মাহমুদ, 'ও কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে তবু রোজ এক বার শোনাবে তুমি।' 'ওকি চা-টা কি অপরাধ করলো? খেয়ে নে না ওটা।' বাজারের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে ছেলেকে চা খাওয়ানোর প্রতি লক্ষ্য দিলেন সালেহা বিবি। 'ওকি, চলে যাচ্ছিস কেনো, চা-টা খেয়ে যা।'

'থাক, ওটা তুমি খাওগে।' হনহন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো মাহমুদ। ও চলে যেতে ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে কান্না এলো সালেহা বিবির। আঁচলে চোখ মুছে ব্যথা জড়ানো স্বরে নিজেকে ধিক্কার দিলেন তিনি, 'কোন দুঃখে পেটে ধরেছিলাম তোদের।'

কথাটা কানে এলো হাসমত আলীর। ও ঘর থেকে গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে নীরব হয়ে গেলেন সালেহা বিবি। এসব কথা স্বামীকে জানতে দিতে চান না তিনি। তাহলে তিনি মনে আঘাত পাবেন।

হাসমত আলীও কোন উত্তর না পেয়ে চুপ করে গেলেন।

মরিয়ম এসে বললো, 'একটু পরে আমি বাইরে বেরুবো মা। বাজারের টাকাটা দিয়ে দিও।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'তুই যাবি?'

মরিয়ম বললো, 'তাতে কিছু এসে যাবে না, খোকনকে সঙ্গে দিও।'

হাসমত আলী এতক্ষণ মা-মেয়ের আলাপ শুনছিলেন, শেষ হলে বললেন, 'ও কেন, আমি যাবো বাজারে।'

সালেহা বিবি বললেন, 'তোমার শরীর খারাপ লাগছে, বলেছিলে না?'

'ও, কিছু না।' আস্তে আস্তে জবাব দিলো হাসমত আলী।

ঘর থেকে সেই যে হন হন করে বেরিয়ে এলো মাহমুদ; তারপর অনেকপথ মাড়িয়ে এ গলি ও গলি পেরিয়ে, 'বিশ্রামাগারের' সামনে এসে দাঁড়ালো সে। দু'টো বাই লেন এসে যেখানে মিলেছে তারই সামনে একটি ছোট্ট রেস্তোঁরা। ভেতরে ঢুকতে কেরোসিন কাঠের কাউন্টারের ওপার থেকে ম্যানেজার খোদাবক্স বলে উঠলো, 'ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

কোণের টেবিলে তিনটে ছেলে গোল হয়ে বসেছিলো, তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মাহমুদ জবাব দিলো, 'না, আজকের কাগজ তো আমি পড়িনি।' ওর গলার স্বরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুক্ষ। খোদাবক্স বুঝতে পারলো আজ মেজাজটা ভাল নেই ওর। তাই গলাটা আরো একটু মোলায়েম করে বললো, 'একটা ভালো চাকরির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আজ।'

মাহমুদ কিছু বলার আগেই বাকি তিনজন একসঙ্গে কথা বলে উঠলো, 'তাই নাকি, দেখি দেখি পত্রিকাটা।'

কোলের ওপর থেকে পত্রিকাটা নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলো খোদাবক্স। তার খদ্দেরদের বেকারত্ব ঘুচুক, তারা ভালো চাকরি পাক এটা সে আন্তরিকভাবে কামনা করে। অবশ্য ভালো চাকরি পেলে হয়তো এ রেস্তোঁরায় আর আসবে না, অভিজাত রেস্তোঁরায় গিয়ে চা খাবে। এদিক থেকে ওদের হারাবার ভয়ও আছে খোদাবক্সের। কিন্তু বাকি টাকাগুলো ওদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে, এই তার সান্ত্বনা। তাছাড়া ভালো চাকরি পেলেই যে ওরা তাকে ত্যাগ করবে সেটা ভাবাও ভুল। হাজার হোক চক্ষু লজ্জা বলে একটা প্রবৃত্তি আছে মানুষের। দুর্দিনে ওদের বাকিতে খাইয়েছে খোদাবক্স, সে কথা কি এত সহজে ভুলে যাবে ওরা? অবশ্য না ছেড়ে যাবার আরেকটা কারণ আছে।

সেটা হলো শ'খানেক হাত দূরের মেয়ে স্কুলের ওই লাল দালানটা। ওখানকার সব খবরই রাখে খোদাবক্স। কোন্ মেয়েটি বিবাহিতা, আর কোন্‌টি কুমারী। কোন্ মেয়েটির বাবা বড় চাকুরে আর কোন্‌টির বাবা কেরানী। সব খবর রাখে খোদাবক্স। উৎসাহী খদ্দেরদের পরিবেশন করে সে। তাদের অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করে।

পত্রিকাটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো। তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর বিছিয়ে চারজন এক সঙ্গে ঝুঁকে পড়লো ওরা।

একটা প্রাইভেট ফার্মে পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্টের চাকরি।

মাসে দেড়শ' টাকা বেতন।

খোদাবক্সের কাছ থেকে কাগজ-কলম নিয়ে, নাম-ঠিকানা টুকে নিল মাহমুদ।

খোদাবক্স একগাল হেসে বললো, 'কেমন বলি নি, খুব ভালো চাকরি?

মাহমুদ বললো, হবে না, শুধু শুধু কাগজ-কালি খরচ করা।'

রফিক বললো, 'তবু দেখা যাক্ না একবার কপাল ঠুকে।'

নঈম বড় রোগাটে, চেহারাখানাও তার বড় ভালো নয়, বললো, 'আমার মুখ দেখেই ব্যাটারা বিদায় করে দেবে।'

খোদাবক্স বললো, 'সব খোদার ইচ্ছে, চারজন একসঙ্গে চেষ্টা করে দেখুন না, একজনের হয়েও যেতে পারে।'

এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে মাহমুদ চুপচাপ পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগলো। চা খাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ এখানে বসে থাকবে সে। এটা সেটা নিয়ে তর্ক করবে। আর মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভাববে, আশা নামক প্রবৃত্তিটি কত দুর্দমনীয়। পুরো একটা বছর 'মিলন' পত্রিকার চাকরি করার পর আশার ক্ষীণ অস্তিত্বও লোপ পাওয়া উচিত ছিলো। তবু এখনো যে কেমন করে তার রেশ জেগে আছে মনে, ভেবে বিস্মিত হয় মাহমুদ। লুই ফিশার হওয়ার কল্পনায় যে একদিন বিভোর ছিলো সে আজ আর তেমনি স্বপ্ন দেখতে পারে না।

প্রাত্যহিক ঘটনার অভিজ্ঞতায় স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে তার। একদিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন রাতে ডিউটি ছিলো তার। নিউজ সেক্সনের লম্বা টেবিলটায় সকলে কর্মব্যস্ত। এ সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি পৌছায় এসে। তাই কাজের ভিড় বেড়ে যায়। হাতের কাছে একটা ছোট্ট সংবাদ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো মাহমুদ। পঁচিশ বছরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন শিক্ষিত যুবক বেকাত্বরের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। 'খবরটা কি ছাপতে দিবো?' নিউজ এডিটরের দিকে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো মাহমুদ।

কাগজটা হাতে নিয়ে খবরটা পড়লেন নিউজ এডিটর। তারপর ওটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'বাদ দিন, স্পেস নেই।'

'কেন স্পেস তো অনেক আছে?' কথাটা হঠাৎ বলে ফেললো মাহমুদ। সরোষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে নিউজ এডিটর গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্পেস আছে কি নেই সেটা আপনার জানবার কথা নয়'। তারপর নীরব হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না তার।

এমনি ঘটনা প্রায়ই ঘটতো।

একদিন কোন একটা জনসভায় লোক সমাবেশ নিয়ে তর্ক বেধে গেলো স্টাফ রিপোর্টারের সঙ্গে।

রিপোর্টার বলেছিলেন, 'সভায় পাঁচ হাজারের বেশি লোক হয় নি।'

মাহমুদ বললো, 'মিথ্যে কথা। পঞ্চাশ হাজারের উপরে এসেছিলো লোক।

রিপোর্টার বললেন, 'আপনি চোখে বেশি দেখেন।'

মাহমুদ বললো, 'আমি যদি বেশি দেখে থাকি আপনি তাহলে কম দেখেন।'

'কম দেখতে হয় বলেই দেখি।' দু'ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ছড়িয়ে চুপ করে গেলেন স্টাফ রিপোর্টার।

সিনিয়র সাব-এডিটর আমজাদ হোসেন এতক্ষণ নীরবে ঝগড়া শুনছিলেন ওদের। দু'জনে থামলে একটা পান মুখে পুরে দিয়ে বললেন, 'মাহমুদ সাহেব এখনো একেবারে বাচ্চা রয়ে গেছেন আপনি। লোক যে কেমন করে বাড়ে আর কেমন করে কমে তার কিছুই বোঝেন না।' বলে শব্দ করে এক প্রস্থ হেসে উঠলেন তিনি।

বয় এসে সামনে চা নাবিয়ে রাখতে ভাবনায় ছেদ পড়লো।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মাহমুদ বললো, 'তুমিও ঘাবড়িয়ো না খোদাবক্স, সামনের মাস থেকে দশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে আমার, তার থেকে কিছু কিছু করে এক বছরে সব পাওনা পরিশোধ করে দেবো তোমার। বুঝলে?'

খোদাবক্স একমুখ হেসে বললো, 'তাই নাকি? বড় ভালো কথা, বড় ভালো কথা, শুনে বড় খুশি হলাম।'

নঈম বললো, 'এর পরে আমাদের এক কাপ করে চা খাওয়ান উচিত তোমার মাহমুদ।'

মাহমুদ নির্বিকার গলায় বললো, 'খাও' বলে বয়কে ওদের তিন কাপ চা দেবার জন্যে আদেশ করলো সে। খোদাবক্সকেও এক কাপ দিতে বললো। বয় চা নিয়ে এলে পর সামনে ঝুঁকে পড়ে মাহমুদ বললো, 'দশ টাকা যদি বাড়ে আমার, তাহলে রোজ একটা করে সিগারেট খাওয়াবো তোমাদের।'

নঈম খুশি হয়ে বললো, 'আমার যদি এ চাকরিটা হয়ে যায়, তাহলে রোজ এক কাপ করে চা খাওয়াবো।'

রফিক কিছু বললো না। ও একটু অন্যমনস্ক আজ।

'তাহলে এ চাকরিটার জন্য তুমি দরখাস্ত করছো?' মাহমুদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

'হ্যাঁ। তুমিও করো।' নঈম জবাব দিলো।

রফিক উঠে যাচ্ছিলো। নঈম চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওকি যাচ্ছো কোথায়, বসো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিক বললো, 'আর কতো বসবো, ও বোধ হয় আসবে না আজ।'

মাহমুদ জিজ্ঞেস করবে ভাবছিলো, সে কে?

নঈম বললো, 'আরেকটু বসো, এই এসে পড়বে আজ বোধ হয় ঘোড়ার গাড়িটা কোথাও আটকে পড়েছে; কে জানে হয়তো রেলওয়ে ক্রসিং-এর ওখানে হবে।'

মাহমুদ এতক্ষণে বুঝলো একটি মেয়ের অপেক্ষা করছে রফিক। ঘোড়ার গাড়িতে করে আসবে মেয়েটি। এখান থেকে রফিক দেখবে তাকে। শুধু চোখের দেখা।

মেয়ের কথা উঠতে খোদাবক্স বললো, 'আপনাকে কত করে বলেছিলাম মাহমুদ সাহেব, সেই মেয়েটার সঙ্গে ঝুলে পড়ুন, তাহলে কি আজকে আপনার এই অবস্থা হতো? এতদিনে হ্যাট-টাই পরে মোটর গাড়ি হাঁকতেন।

তার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করলো মাহমুদ। কিছু বললো না। নঈম বললো, 'হ্যাঁ, তাইতো আজকাল যে মেয়েটিকে আর দেখি নে' তো, বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি?

খোদাবক্স মুখখান বিকৃত করে বললো, 'বিয়ে হয়ে যাবে না তো কি। ওরা হলো বড় লোকের মেয়ে, বড় মহার্ঘ বস্তু। ও কি ফেলনা, যে পড়ে থাকবে? কত ছেলে লাইন বেঁধে থাকে বিয়ে করার জন্য। হয়েছেও তাই– এইতো গেলো মাসে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে এক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে। ছেলেটির বড় জোড় বরাত, বিয়ের কিছুদিন পরই স্কলারশিপ বাগিয়ে আমেরিকায় চলে গেছে।'

নঈম প্রশ্ন করলো, 'আর মেয়েটি।'

'মেয়েটিকে কি রেখে যাবে নাকি?' খোদাবক্স জবাব দিলো, 'সঙ্গে করে নিয়ে গেছে আমেরিকায়।'

পত্রিকার উপর ঝুঁকে পড়ে মাহমুদ একটা খবর পড়ায় মনোযোগী হবার চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুতে মন বসাতেই পারলো না সে। কাগজটা মুড়ে রেখে অনেকটা বিরক্তির সাথে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর আকস্মিক ভাবে 'চলি' বলে 'বিশ্রামাগার' থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ। বেরুবার পথে সে শুনতে পেলো নঈম বলছে, 'আহা, যাবে আর কি, বসো না। ঘোড়ার গাড়িটা আসতে আজ বড় দেরি হচ্ছে, এসে পড়বে এক্ষুণি। বসো, আরেক কাপ চা খাও।'

বুঝতে কষ্ট হলো না মাহমুদের, রফিককে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছে নঈম।

'বিশ্রামাগার' থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে ভাবছিলো মাহমুদ, পেছনে কে যেন নাম ধরে ডাকলো। ফিরে তাকিয়ে দেখে শাহাদাত দাঁড়িয়ে।

পরনে একটা পায়জামা, গায়ে পাঞ্জাবি আর হাতে গুটিকয় বই।

'কিহে, এখানে কোথায় এসেছিলে?' পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে মনটা ভালো হয়ে গেলো মাহমুদের।

শাহাদাত বললো, 'প্রেসের কিছু টাকা পাওনা ছিলো একজনের কাছে। দু'বছর আগের টাকা, হেঁটে হেঁটে সারা হলুম, আজ দেবো কাল দেবো করে ব্যাটা শুধু ঘুরুচ্ছে আমায়।'

মাহমুদ গম্ভীর হয়ে বললো, 'বাকি দাও কেন?'

শাহাদাত বললো, 'আগে কয়েকটা কাজ করিয়েছিলো তাই দিয়েছি।'

'হুঁ।' মাহমুদ চুপ করে গেলো।

খানিকক্ষণ পর শাহাদাত আবার বললো, 'তুমি তো, আজকাল আর ওদিকে আসো না, আমেনা প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। আসো না একদিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ বললো, 'সে দেখা যাবে পরে, এসো তোমাকে এক কাপ চা খাওয়াই।'

পুরোনো বন্ধুকে সাথে নিয়ে আবার 'বিশ্রামাগারে' ফিরে এলো মাহমুদ।

কোণের একখানা টেবিলে এসে দু'জনে বসলো ওরা।

নঈম আর রফিক ঝুঁকে পড়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করছে। খোদাবক্স কাউন্টার থেকে মুখ তুলে মাহমুদকে এবং বিশেষ করে শাহাদাতকে লক্ষ্য করলো উৎসুক চোখে। নতুন খদ্দের। এর আগে কখনো দেখে নি তাকে। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলো মাহমুদ।

শাহাদাত বললো, 'তুমি খাবে না?'

'না। এই একটু আগে এক কাপ খেয়ে বেরিয়েছি।' পকেট হাতড়ে বিড়ি আছে কিনা দেখলো মাহমুদ। বিড়ি নেই। মুখখানা গুমোট করে বসে রইলো সে। শাহাদাত শুধালো, 'কি হয়েছে?'

মাহমুদ বললো, 'না, কিছু না। চুপ করে কেন, কথা বলো, ছেলে-মেয়েরা সব কেমন আছে?'

'ওদের কথা আর বলো না', হতাশ গলায় বললো শাহাদাত, 'বড়টার পেটের অসুখ আর ছোটটা সর্দি-কাশিতে ভুগছে।'

'হুঁ।' টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে হাতের তালুতে মুখ রাখলো মাহমুদ।

বয় এসে সামনে চা নামিয়ে রাখতে বললো, 'নাও চা খাও।'

শাহাদাত নীরবে চা খেতে লাগলো।

মাহমুদ চুপচাপ।

AMARBOI.COM

পরদিন শঙ্কিত মন নিয়ে ছাত্রীর বাড়িতে এলেও একটা ব্যাপারে মরিয়ম নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। মনসুরের সঙ্গে অমন দুর্ব্যবহার করা উচিত হয় নি। আজ যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, এবং দেখা হবে তা জানতো। তাহলে তার ক্ষমা চাইবে সে। ক্ষমা যদি নাও চায় তবু ভালোভাবে–ভদ্রভাবে কথা বলবে মনসুরের সঙ্গে। যতদিন তার কাছ থেকে কোন অশোভন প্রকাশ না পায় ততদিন সহজ সম্পর্ক বজায় রাখবে মরিয়ম।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেলিনা কি যেন করছিলো। ওকে আসতে দেখে মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানালো।

মরিয়ম বললো, 'আমার আজ একটু দেরি হয়ে গেছে সেলিনা।'

সেলিনা বললো, 'আমি ভাবছিলাম আজ তুমি আসবে না আপা?'

অহেতুক চমকে উঠলো মরিয়ম। সেলিনাকে কিছু বলে নি তো মনসুর? পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, 'কেন বলতো?'

সেলিনা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জবাব দিলো, 'রোজ ঠিক সময়টিতে আসো কিনা, তাই।'

ওর কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হলো মরিয়ম। কিন্তু মনসুরকে আজ না দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার একটা অস্বস্তি জেগে উঠলো ওর ভেতরে। পড়াতে বসে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো মরিয়ম। বাইরের ঘরে কোন গলার আওয়াজ পেলেই কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলো কার গলা। আর যখন বুঝলো এ মনসুরের নয় তখন হতাশ হলো সে।

সেলিনা পড়ার ফাঁকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি শরীরটা আজ ভালো নাই আপা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো মরিয়মের। ইতস্তত করে বললো, 'কই নাতো। কেন আমায় দেখে কি অসুস্থ মনে হচ্ছে?'

সেলিনা বললো, 'হ্যাঁ।'

'না আমার কিছু হয়নি, তুমি পড়ো' ছাত্রীকে বইয়ের প্রতি মনোযোগী হতে আদেশ করলো মরিয়ম। তারপর সে ভাবলো, না এসবের কোন অর্থ হয় না। যা ঘটে গেছে তার জন্যে অনুতাপ কেন করবে মরিয়ম। অন্যায় সে কিছু করে নি। লোকটার যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই তার নিশ্চয়তা আছে? উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ারও কোন কারণ খুঁজে পেলো না সে। যেভাবে রোজ রোজ পিছু নেয় তাতে তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগাটা স্বাভাবিক। কিন্তু লোকটাকে নিয়ে এত মাথা ঘামাতেই বা শুরু করেছে কেন মরিয়ম?

পড়ানো শেষ করে সবে বিদায় নেবে এমন সময় মনসুরকে হঠাৎ দোরগোড়ায় দেখে প্রথমে অবাক হলো, পর মুহূর্তে ফ্যাকাশে এবং তারপর রক্তাভ হলো মরিয়ম।

মনসুর এগিয়ে এসে বললো, 'কি খবর, কেমন আছেন?'

ওর গলার স্বরে কোন জড়তা নেই, গতকালের ঘটনার কোন রেশ নেই, শুনে ঈষৎ বিস্মিত হলো মরিয়ম। পরক্ষণে সে মৃদু হেসে বললো, 'ভালো, আপনি কেমন?' এতটুকু কথায় এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ নিজের কাছেই ভালো লাগলো না মরিয়মের।

মনসুর একটুকাল সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। কণ্ঠস্বরটা ওর কাছেও বড় নতুন ঠেকছে আজ।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত।

কি যে হলো, বড় ভয় করতে লাগলো মরিয়মের। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে সাহস হলো না। 'চলি সেলিনা।' এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে দ্রুত রাস্তায় বেরিয়ে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো মরিয়ম।

কিছুদূর এসে একবার পেছনে ফিরে দেখলো সে।

না। আজ আসছে না মনসুর।

প্রথমে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেও, খানিক পরে মরিয়মের মনে হতে লাগলো, বোধ হয় লোকটা অসন্তুষ্ট হয়েছে ওর ব্যবহারে তাই আজ এলো না এগিয়ে দিতে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো মরিয়মের।

বাসায় ফিরতে একটা মিহি কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো মরিয়ম।

খোকনকে সামনে পেয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে রে খোকন? কাঁদছে কে?'

খোকনের চোখজোড়া ছলছল করছিলো। ভাঙ্গা গলায় বললো, 'ছোট আপাকে বাবা মেরেছে ভীষণ।'

'কেন?' প্রশ্নটা খোকনকে করলেও, তার উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো না মরিয়ম। অন্ধকার ঘরে পা দিতে হাসিনার কান্নাটা আরো জোরে শোনা গেলো। বিছানায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে সে, আবছা দেখা যাচ্ছে তাকে।

ওর গায়ের ওপর একখানা হাত রেখে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো মরিয়ম, 'কি হয়েছেরে হাসি?'

এক ঝটকায় ওর হাতখানা দূরে সরিয়ে দিলো হাসিনা।

খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে স্যান্ডেলটা চৌকির নিচে রেখে দিলো মরিয়ম। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ব্লাউজটা ধীরে ধীরে খুললো সে। বডিসটা খুলে রাখলো আলনার ওপরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাড়িটা পাল্টে নিলো। তারপর নিঃশব্দে মায়ের ঘরে এলো সে। 'কি হয়েছে মা, হাসিনা কাঁদছে কেন?' বলে মায়ের দিকে চোখ পড়তে রীতিমত আর্তনাদ করে উঠল মরিয়ম, 'একি! কি হয়েছে মা?' চওড়া চৌকিটার ওপর শুয়ে মা। মাথাটা আগাগোড়া ব্যাণ্ডেজ করা।

বাবা পাশে বসে মৃদু পাখা করছেন তাকে। হাসমত আলী হাতের ইশারায় মরিয়মকে জোরে কথা বলতে নিষেধ করলেন। সালেহা বিবি ঘুমোচ্ছেন এখন। তাঁকে জাগানো ঠিক হবে না।

একটু পরে বাবার কাছ থেকে সব জানতে পেলো মরিয়ম। কতদিন তিনি বারণ করেছেন সকলকে, ছাদে দৌড়-ঝাপ না দিতে। পুরোনো বাড়ি নড়বড়ে ছাদ। কখন ভেঙ্গে পড়ে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তবু রোজ ছাদে উঠে খেলবে হাসিনা। আজও বিকেল বেলা খেলছিলো সে। 'নিচে তোর মা বসে বসে চাল বাছছিলেন, বাইরে ওই কুয়োতলায় রাখা আছে গিয়ে দেখে আয় তুই। পোয়াখানেক ওজনের একটা ইট, ছাদ থেকে খসে তার মাথার উপর এসে পড়লো। ঘরের কোণে আলো নিয়ে দেখ কত রক্ত জমে আছে সেখানে।' হাসমত আলী থামলেন।

তিনি তখন বাসায় ছিলেন। আয়োডিন আনিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন সালেহা বিবির মাথায়। রাতের রান্না-বান্না কিছুই হয় নি। দুলুটা কাঁদতে কাঁদতে এই একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। খোকনটারও ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়। যদিও মুখ ফুটে সে কিছু বলে নি এখনো। হারিকেনের মৃদু আলোতে বসে বসে পড়ছে সে। মাঝে মাঝে উস্‌খুস্ করছে, চোখ তুলে তাকাচ্ছে ওদের দিকে।

হারিকেনের আগুনে কুপিটা ধরিয়ে নিয়ে পাকঘরে চলে গেলো মরিয়ম।

হাসিনার কান্নাটা এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। রাগের মাথায় ভীষণ মেরেছেন তাকে বাবা।

একটা তরকারি আর দুটো ভাত সিদ্ধ করে নামাতে বেশ রাত হয়ে গেলো।

ঘুম থেকে তুলে দুলুকে নিজ হাতে খাইয়ে দিলো মরিয়ম। খোকনকে খাওয়ালো। তারপর সবার জন্য ভাত সাজিয়ে হাসিনাকে ডাকতে এসে মরিয়ম দেখলো, কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে হাসিনা।

প্রথমে দূর থেকে ডাকলো মরিয়ম, তারপর ওর গায়ে হাত রেখে জোরে নাড়া দিয়ে বললো, 'হাসি উঠ, বাবা বসে আছেন তোর জন্যে।' বড় ক্লান্তি লাগছিলো ওর। হাত ধরে টেনে বললো, 'কইরে ওঠ্।'

হাসিনা নড়েচড়ে আবার চুপ করে রইলো।

'হাসি ভাত খাবি ওঠ্।'

'আমি খাব না', হাসিনা জবাব দিলো 'তোমরা খাওগে যাও।'

'ওঠ্ মিছিমিছি রাগ করে না।' নরম গলায় বললো মরিয়ম। তারপর দু'হাতে ওকে বিছানা থেকে তোলার চেষ্টা করলো সে।

'এই ভালো হবে না বলছি, এই–এই।' ওর হাতে একটা কামড় বসিয়ে দিলো হাসিনা। 'উহ' বলে ছেড়ে দিলো মরিয়ম। হাসিনা আবার চুপচাপ। ওকে একা ফিরে আসতে দেখে হাসমত আলী শুধালেন, 'কি, হাসিনা এলো না?'

মরিয়ম আস্তে করে জবাব দিলো, 'ও খাবে না।'

হাসমত আলী মাটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবলেন, মুখখানা গম্ভীর এবং বিরক্তিপূর্ণ। একটু পরে 'নিজেকে শোনাচ্ছেন যেন' এমনি করে বললেন, 'বয়স কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম হয়েছে ওর? তবু একটু কাণ্ডজ্ঞান হলো না। বিয়ে হলে ও স্বামীর ঘর করবে কেমন করে?'

মরিয়ম বললো, 'ভাত খাবে এসো বাবা।'

হাসমত আলী বললো, 'তুমি খাওগে আমার ক্ষিধে নেই।' স্ত্রীর পাশে বালিশটা টেনে কাৎ হয়ে শুলেন তিনি। মরিয়মকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে।'

আরো অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মরিয়ম।

তারপর পাকঘরে গিয়ে ভাত-তরকারিগুলো চাপা দিয়ে দু'গ্লাস জল খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলো। থাক, সেও খাবে না আজ।

হাসিনা ঘুমোচ্ছে। মৃদু নাক ডাকছে ওর।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করা হয়েছে কিনা দেখে এসে শুয়ে পড়লো মরিয়ম। শুধু এই বাড়িতে নয়, পুরো পাড়াটায় ঘুম নেবেছে এখন। দু'একটা বাড়ি থেকে অন্ধকার কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে দু'একটা গলার স্বর। গলির হ্যাংলা কুকুরগুলো ডাকছে কখনো কখনো। আর কোন শব্দ নেই। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না হাসমত আলী। রাতে ঘুম না হওয়া বড় বেদনাদায়ক। বিশেষ করে এই নিরবতার মাঝখানে এক রাত জাগতে গেলে, অনেক চিন্তা এসে জমাট বাঁধে মাথায়। একান্তভাবে কোন কিছু চিন্তা করার এটাই বোধ হয় প্রকৃত সময়।

অতীত। ভবিষ্যৎ। বর্তমান।

ছুরি দিয়ে কেটে কেটে জীবনটাকে বিশ্লেষণ করার মত প্রবৃত্তি না হলেও, জীবনের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তগুলো টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো স্মৃতি হয়ে দেখা দেয় মনে। সেখানে আনন্দ আছে, বিষাদ আছে। ব্যর্থতা আছে, সফলতা আছে, হাসি আছে, অশ্রু আছে। অতীতের মত বর্তমানও যেন ঘড়ির পেন্ডুলামের মত উঠা আর পড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ কেমন হবে কেউ তা বলতে পারে না। তা-কি খুব সুন্দর হবে, না আরো মলিনতায় ভরা হবে ভাবতে ভাবতে একটুখানি তন্দ্রা এসেছিলো। একটা ধাড়ি ইঁদুরের কিচকিচ ডাকে তন্দ্রা ছুটে গেলো তাঁর। চোখ মেলে চারপাশে তাকালেন হাসমত আলী। আবার চোখের পাতাজোড়া বন্ধ করলেন। তারপর ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি।

বড় ছেলে মাহমুদ। সবার বড় ও। কিন্তু ওর ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে পারেন না তিনি। কি যে হবে ওর খোদা জানেন। লেখাপড়া শিখেছে। বছর তিনেক হলো বি. এ. পাশ করেছে। তার এই গ্রাজুয়েট হবার পেছনে নিজের কোন অবদান খুঁজে পান না হাসমত আলী। পত্রিকায় চাকরি করে নিজের টাকায় পড়েছে মাহমুদ। ম্যাট্রিক পাশ করার পর বাবার কাছে বেশি কিছু দাবি করে নি। দাবি করলেও দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। নিম্নপদস্থ কেরানীর পক্ষে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো শুধু কষ্টসাধ্য নয়, দুরূহও বটে। তাই মাহমুদের নিজের ইচ্ছার ওপরে কোন রকম খবরদারী করার সাহস পান না তিনি। জোর করে কিছু নির্দেশ দেবার পিতৃসুলভ ইচ্ছে থাকলেও তাকে দমন করেন হাসমত আলী। নিজেকে অপরাধী মনে হয় ছেলের কাছে। মরিয়মের কাছেও অপরাধী হাসমত আলী।

ম্যাট্রিক পর্যন্ত ওর পড়ার খরচ জুগিয়েছেন তিনি, তারপর এ বাড়ি ও বাড়ি ছাত্রী পড়িয়ে কলেজে পড়েছে মরিয়ম। এই তো মাস দুয়েক হলো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে সে।

তারপর হাসিনা–

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েন হাসমত আলী। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই যে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলো মাহমুদ তারপর দু'দিন তার কোন দেখা নেই।

এমনি হয়।

মাঝে মাঝে বাসার সবার সঙ্গে ঝগড়া করে কয়েক দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায় মাহমুদ। বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় গিয়ে থাকে। হোটেলে রেস্তোরাঁয় খায়। পকেটে পয়সা না থাকলে উপোসে কাটায়।

সকালে তখনও মাথার যন্ত্রণায় গায়ে জ্বর ছিলো সালেহা বিবির।

মরিয়মকে ডেকে শুধোলেন তিনি, 'হ্যাঁরে, মাহমুদ ফিরেছে?'

মায়ের পাশে এসে বসে মরিয়ম সংক্ষেপে বললো 'না'।

মা যন্ত্রণায় কাতর গলায় বললেন , 'কার যে স্বভাব পেলো ও। কিছু বলবার উপায় নেই, অমনি রাগ করবে। ওকে নিয়ে আমি কি করি বলতো?' মায়ের দু'চোখে জল।

মরিয়ম কিছু বলতে যাবার আগে হাসমত আলী উষ্ণ গলায় বললেন, 'কি দরকার ছিলো ওকে রাগাবার। জানতো ও ওরকম, তবু ওসব কথা বলতে গেলে কেন।'

খোকনের কাছ থেকে মাহমুদের বাড়ি না আসার কারণটা জানতে পেরেছিলেন তিনি। তখন থেকে স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন হাসমত আলী। মাহমুদকে কোন কারণে রাগাবার পক্ষপাতী তিনি নন।

স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা দোষ থাকলেও সে নিশ্চয় খাঁটে ছেলে নয় তা বোঝেন হাসমত আলী। সংসারে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রতিমাসে সাহায্য করছে সে। লেখাপড়া আর জানাশোনার দিক থেকেও বাবার চেয়ে সে অনেক বড়। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের সকলের ভবিষ্যৎ ওর হাতে নির্ভর করছে। নিজে যে কোন সময় মারা যেতে পারেন সে জ্ঞান রাখেন হাসমত আলী।। তখন মাহমুদ না থাকলে কে দেখবে ওদের? মরিয়ম-মেয়ে, ওর ওপর কতটুকু ভরসা করা যেতে পারে? দিন সব সময় এক রকম যায় না। মাহমুদ একদিন একটা ভালো চাকরি পেয়ে যেতে পারে সে আশাও রাখেন হাসমত আলী।

হাসমত আলীর কথার জবাবে উচ্চবাচ্য করলেন না সালেহা বিবি। নীরবে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মরিয়ম উঠে যেতে যেতে বললো, 'তুমি এ নিয়ে বেশি ভেবো না মা। দুপুরে অফিসে গিয়ে ওর খোঁজ নেবো আমি।'

হাসমত আলী অফিসে গেলে, মায়ের পাশে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করলো হাসিনা। ইট পড়ে তাঁর মাথা ফেটে গেছে সেজন্য মনে মনে অনুতপ্ত সে।

সালেহা বিবির চোখে তন্দ্রা ছিলো তাই প্রথমে নজরে আসে নি। পরে দৃষ্টি পড়তে ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন তিনি। ইতস্তত করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলো হাসিনা।

সালেহা বিবি আবার ডাকলেন, 'এদিকে আয় হাসি।'

এবারে গুটি গুটি পায়ে পাশে এলো হাসিনা। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে মা বললেন, 'তোর মুখখানা এত শুকনো কেন রে?'

মায়ের বুকে মুখ গুঁজে হঠাৎ কেঁদে উঠলো হাসিনা। 'মা, আর উঠবো না মা। আর ছাদে উঠবো না।'

সালেহা বিবি তার চুলে সিঁথি কেটে দিয়ে বললেন, 'ও মা, এতে কাঁদবার কি আছে। কাঁদে না মা। ছাদে যাবি না কেন, একশ' বার যাবি।' হাসিনা তবুও বললো, 'না আর যাবো না মা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাকে কাঁদতে দেখে, গালে আঙ্গুল পুরে দুলু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। ওর দিকে চোখ পড়তে সালেহা বললেন, 'দেখ হাসি, দুলুটা কেমন নোঙরা হয়ে আছে। ওকে একটু কুয়োতলায় নিয়ে ভালো করে চান করিয়ে দে না মা।'

অন্য সময় হলে ঠোঁট বাঁকিয়ে সেখান থেকে দূরে সরে যেতো হাসিনা। এখন গেলো না। মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে একটু হাসলো। তারপর খুশি মনে দুলুকে কুয়োতে চান করাতে নিয়ে গেলো হাসিনা।

রাতে পত্রিকা অফিসে এসে দারওয়ানের হাতে একখানা চিঠি পেলো মাহমুদ। দারোয়ান বললো, 'এক মেমসাব দে গিয়া।'

চিঠিখানা খুলে পড়লো সে। মরিয়ম লিখেছে।

'ভাইয়া,

আজ দু'দিন তুমি বাসায় এলে না। মার ভীষণ অসুখ। বারবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। মাকে এভাবে কেন কষ্ট দিচ্ছো তুমি?

'আশা করি আজ নিশ্চয় বাসায় ফিরবে।'

নিচে নিজের নাম সই করেছে।

চিঠিটা পড়ে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো মাহমুদ। 'মা ভীষণ অসুস্থ, ইয়ার্কির আর জায়গা পায়নি', মনে মনে বললো মাহমুদ। এ শুধু ওকে বাসায় ফিরিয়ে নেবার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে একটা মিথ্যে কথার আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি বাসায় যাবার জন্যে লিখলেই তো পারতো মরিয়ম। মাহমুদ ভাবলো, রাতে বাসায় ফিরে মরিয়মকে এক প্রস্থ গালাগাল দিতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলে, সামনে একফালি সরু বারান্দা। ডান হাতে ম্যানেজারের দপ্তর। বাঁ হাতে নিউজ সেকসনের লম্বা ঘর। টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ। আলপিনের বাক্স। শূন্য চায়ের পেয়ালা। পেপার কাটার আর দোয়াত কলম। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো মাহমুদ। প্রথম প্রথম এ ঘরটিতে এসে ঢুকতে আশ্চর্য রোমাঞ্চ অনুভব করতো সে। এখন কোন অনুভূতিই জাগে না। বরঞ্চ বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে মন। সাংবাদিক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে আজ সে লজ্জা বোধ করে। সে তো সাংবাদিক নয়, মালিকের হাতের একটি যন্ত্রবিশেষ। কর্তার ইচ্ছেমতো সংবাদ তৈরি করতে হয় তাকে। তাঁরই ইচ্ছেমত বিকৃত খবর পরিবেশন করতে হয় । মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে মন। তখন সে ভাবে, যদি তার টাকা থাকতো তা হলে নিজে একখানা পত্রিকা বের করতো মাহমুদ। সুস্থ সাংবাদিকতা হতো যার আদর্শ। কিন্তু এসব উদ্ভট কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যহ প্রয়োজন মেটানোর যার সামর্থ্য নেই, সে স্বপ্ন দেখে দৈনিক পত্রিকা বের করবার। 'দুত্তোর আদর্শ'–পিনের বাক্সটা একপাশে ঠেলে রেখে, কলমটা হাতে তুলে নিলো মাহমুদ।

মাসখানেক পরে, একদিন সেলিনাকে পড়াতে আসার পথে দূর থেকে ওদের বাসার সামনে একটা চকলেট রঙের নতুন গাড়ি দেখতে পেলো মরিয়ম। ভাবলো, বোধ হয় নতুন কোন অতিথি এসেছে বাসায়।

এ এক মাসে বৈচিত্র্যের দিক থেকে না হলেও, ঘটনার দিক থেকে অনেক নতুন কিছু ঘটেছে তার জীবনে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে সে। যে চাকরিটা হবে আশা করেছিলো তা হয়নি। আরো দু' একটা নতুন টিউশনি পাবার আশ্বাস পেয়েছে মরিয়ম। মনসুরের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক বজায় রেখেছে সে। গত এক মাসের মেলামেশার মধ্য দিয়ে লোকটাকে কখনো খারাপ মনে হয় নি। অন্তত সে রকম কোন ধারণা জন্মাবার মত ব্যবহার করে নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর। যে ক'দিন এখানে এসেছে, যাবার পথে গলির মাথা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে মরিয়মকে। একদিন তো সে নিজেই আমন্ত্রণ করেছিলো তাকে, আসুন না আমাদের বাসায় একটু বসে যাবেন।

'না, আজ থাক আরেকদিন যাবো।' উপেক্ষা নয়, বরং সলজ্জ সংকোচে আমন্ত্রণ এড়িয়ে গেছে মনসুর।

মরিয়ম তাতে দুঃখ পেয়েছে তা নয়। সে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করায়, নিজের দৈন্য আর প্রতিপক্ষের স্বচ্ছলতার কথা ভেবে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে মরিয়ম। যদি সে আসতো তাহলে তাকে কোথায় বসতে দিতো মরিয়ম। কি খাওয়াতো তাকে?

যে কোনদিন মনসুর বাসায় যাওয়ার কথা তুলতে পারে এই আশঙ্কায় সুন্দর দেখে দুটো চায়ের কাপ দুটো পিরিচ কিনে রেখেছে সে বাসায়। এলে আর কিছু না হোক এক কাপ চা তো দিতে হবে। মরিয়ম আরো ভেবেছে, দুটো চেয়ার আর একটা গোল টিপয় যদি কিনতে পারে তাহলে হয়তো ভদ্রভাবে সাজানো যাবে ঘরটাকে। বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে বসানো যাবে। দূর থেকে মটরটাকে দেখছিলো মরিয়ম, পাশ কাটিয়ে ভেতরে যাবার সময় আরেক বার চোখ বুলিয়ে নিলো সে।

বৈঠকখানায় সবার সাথে এক সঙ্গে দেখা। বাইরে বেরুবার তোড়জোড় করছিলো ওরা। সেলিনা, তার আম্মা আর মনসুর। সেলিনার বাবাকে দেখা গেলো না সেখানে। একটা ছাই রঙের প্যান্ট পরেছে মনসুর। গায়ে একটা সিল্কের সাদা সার্ট। সেলিনার পরনে আকাশ রঙের শাড়ি, গায়ে বাদামি ব্লাউজ।

ওকে দেখতে পেয়ে সেলিনা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো, 'এই যে আপা এসে গেছে, কি মজা, এবার সবাই একসঙ্গে বেড়াতে বেরুবো আমরা।'

মনসুর হাসলো। সেলিনার আম্মাও।

অপ্রস্তুত মরিয়ম তিনজনের দিকে তাকালো একবার করে।

মনসুর হেসে বললো, 'আপনার অপেক্ষা করছিলাম আমরা। সেলিনা আজ পড়বে না। চলুন বেরিয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে।'

সেলিনার আম্মা-আনিসা বেগমের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মরিয়ম জানতে চাইলো, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?'

সেলিনা আর আনিসা বেগম দু'জনে এক সঙ্গে বলে উঠলো, 'নিউ মার্কেট।'

উপলক্ষটা তেমন কিছু নয় আসার পথে বাইরে যে গাড়িটা দেখে এসেছে মরিয়ম কিছুদিন হলো মনসুর কিনেছে ওটা। ওর নতুন গাড়িতে করে ওদের একটু ঘুরিয়ে আনতে চায় সে।

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও পারবে না মরিয়ম, তা জানতো সে।

তাই রাজী হয়ে বললো, 'আমায় একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হয় আজ।' মনসুর বললো, 'ঘাবড়াবেন না। ঠিক সময়ে বাসায় পৌঁছে দেবো আপনাকে।'

সেলিনা অহেতুক ফিক করে হাসলো একটু। আনিসা বেগম কেন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গাড়িতে মনসুর আর সেলিনা সামনের সিটে বসলো। মরিয়ম আর আনিসা বেগম পেছনে। হ্যাঁ, গত এক মাসে আরো একটি সত্য আবিষ্কার করেছে মরিয়ম।

একদিন কথায় কথায় আনিসা বেগম হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেছিলেন তাকে 'মনসুরকে কেমন মনে হয় তোমার মরিয়ম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ধরনের প্রশ্ন আশা করে নি মরিয়ম, তাই মুহূর্ত কয়েক বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো। সহসা কোন জবাব দিতে পারে নি। ক্ষণকাল নীরব থেকে বলেছে, 'কেন, বেশ ভালোই তো।'

আনিসা বেগমের মুখখানা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার উত্তর শুনে। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে চাপা স্বরে বলেছেন, 'সেলিনার সঙ্গে ওকে কেমন মানাবে বলতো?'

প্রশ্নের হেতুটা এতক্ষণে বুঝতে পেরে খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে মরিয়ম। কিন্তু এরকম কিছু মুহূর্ত আগেও ভাবে নি সে। পরন্তু অন্য একটি সম্ভাবনার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলো।

উত্তরটা দিতে আবার বিলম্ব হয়েছিলো মরিয়মের, 'মন্দ কি? বেশ ভালোই মানাবে ওদের।'

'আমারো তাই মনে হয়,' আনিসা বেগম বলেছিলেন, 'কিন্তু কথাটা কোথাও আলোচনা করো না তুমি, কেমন?'

মরিয়ম মাথা নত করে কথা দিয়েছিলো তাকে। না, এ কথা কাউকে জানাবে না সে?

গাড়িটা তখন নবাবপুর রোড ধরে এগুচ্ছিলো। দু'ধারে সার সার বাতিগুলো একে একে পেছনে রেখে আসছিলো ওরা। বাইরে দৃষ্টি গলিয়ে দেখছিলো মরিয়ম। আঁচলে টান পড়তে মুখ ফিরিয়ে তাকালো সে। আনিসা বেগম কিছু বলতে চান তাকে। কাছে সরে আসতে ফিসফিসিয়ে তিনি বললেন, 'পাশাপাশি ওদের কেমন লাগছে বলতো?'

শুনে হাসি পেলো মরিয়মের। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে জবাব দিলো 'বেশ ভালো।'

আনিসা বেগম গলাটা আরো খাটো করে বললে, 'দু'জনের গায়ের রঙ এক রকম, তাই না?'

মরিয়ম বললো, 'হ্যাঁ।'

স্বভাবের দিক থেকেও বেশ মিলবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

আনিসা বেগম মুখখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন বাইরের দিকে। রমনা এলাকাটা অনেকটা নির্জন। দু'পাশে দোকানপাট, লোকজনের ভিড় নেই। কোলাহল নেই।

জানালার পাশে ঘেঁষে বসতে এক ঝলক বাতাস এসে সারা মুখখানা শীতল করে দিয়ে গেলো মরিয়মের।

নিউমার্কেটে এসে অনেক কেনাকাটা করলো ওরা। সেলিনা আর আনিসা বেগম। দু'খানা শাড়ি কিনলো সেলিনা। একখানা ব্লাউজ পিস। এক টিন পাউডার, একটা টুথপেস্ট, কয়েকখানা সাবান কিনলো ওরা। এ দোকান সে দোকান ঘুরে।

মনসুর এক ফাঁকে গলাটা নামিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কিছু কিনবেন না?'

মরিয়ম অন্যমনস্কভাবে একটা সেন্টের শিশি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বললো, 'না।'

কথাটা কানে গেলো আনিসা বেগমের। সেলিনাসহ একটা নকল পাথরের তৈরি মালার দর করছিলেন তিনি। ওর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'ওকি, তুমি তো কিছুই কিনলে না, একটা কিছু কেনা উচিত তোমার।' মরিয়ম নিষেধ করতে যাচ্ছিলো। এক জোড়া মালা কিনে একটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন আনিসা বেগম, 'লজ্জা করছো কেন, তুমিতো আমার মেয়ের মত।'

এ কথার পর মালাটা ফিরিয়ে দিতে পারলো না মরিয়ম। আনিসা বেগম হয়তো মনে আঘাত পাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর চুপচাপ কেনাকাটা দেখছিলো ওদের। মাঝে মাঝে মন্তব্য করছিলো। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে দু'শিশি সেন্ট কিনলো সে। একটা সেলিনার জন্যে আরেকটা মরিয়মের জন্যে। মরিয়মকে সরাসরি দিতে হয়তো সাহস হচ্ছিলো না। সেলিনার হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'আমার তরফ থেকে এ দুটো দিলাম তোমাদের।'

তারপর আনিসা বেগমের দিকে তাকিয়ে বললো, 'খালাম্মা, আপনাকে কি দেয়া যেতে পারে বলুন তো?'

আনিসা বেগম হেসে বললেন , 'না বাবা, আমাকে দিতে হবে না, আমি বুড়ো মানুষ।'

সেলিনা পরক্ষণে বললো, 'মাকে একটু চুল না ওঠার তেল কিনে দিন, মাথার চুলগুলো উঠে যাচ্ছে ও'র।'

মেয়ের প্রতি কুপিত দৃষ্টি হানলেন আনিসা বেগম।

মরিয়মের মুখখানা অনেক আগেই কালো হয়ে গেছে।

মার্কেট থেকে বেরুবার পথে মাহমুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। বোধ হয় কোন কাজে এসেছে সে, মরিয়ম ভাবলো। চোখে চোখ পড়তে মৃদু হাসলো সে। মাহমুদের কোন ভাবান্তর হলো না। বাকি সকলের দিকে একটি সন্ধানী দৃষ্টি হেনে, ওর খুব কাছে এগিয়ে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো, 'এরা কারা?'

ওরা তখন সামনে এগিয়ে গেছে। মরিয়ম পেছনে পড়ে ছিলো। একবার ওদের দিকে আরেকবার মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এসো না, ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তোমার।'

'আমি আলাপ করতে চাইনে মরিয়ম। ওরা কারা, তাই জানতে চেয়েছি।'

মরিয়ম গম্ভীর গলায় বললো, 'একজন আমার ছাত্রী সেলিনা, আরেকজন তার মা।

'আর লোকটা কে?'

' সেলিনার বড় বোনের দেওর।'

'যাও, ওরা অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

মরিয়ম তাকিয়ে দেখলো গাড়িতে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। গাড়িতে উঠতে গিয়ে সে লক্ষ্য করলো মনসুরের মুখখানা কেমন ভার ভার।

বালিশে উপুর হয়ে পড়ছিলো হাসিনা। ষান্মাসিক পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে ওর। রোজ পাঠ্য বই নিয়ে বসে প্রথমে একবার, লেখাপড়ার সূচনা যারা করেছিলো তাদের একপ্রস্থ গালাগাল আর অভিশাপ দিয়ে নেয় হাসিনা। তারপর পড়তে শুরু করে।

বাসায় ফিরে এসে গাড়িটা বদলে নিয়ে, ওর কাছে এসে মরিয়ম বললো, 'তোমার জন্যে আজ একটা জিনিস এনেছি হাসিনা।'

'কি, কি আপা?' বই ফেলে উঠে বসলো হাসিনা।

মরিয়ম মৃদু হাসলো 'তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমায়।'

'কি প্রতিজ্ঞা?' হাসিনা ব্যগ্র গলায় জিজ্ঞেস করলো।'

মরিয়ম বললো, 'ভালো করে লেখাপড়া করবে।'

অন্য সময় হলে এত বড় প্রতিজ্ঞায় রাজী হতো না হাসিনা। কিন্তু, কিছু একটা পাবার লোভে বিনা দ্বিধায় রাজী হয়ে গেলো। বললো, 'ঠিক পড়বো দেখো, এই গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি তোমার। কি এনেছো আমার জন্যে দেখাও না আপা।' আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছিলো না হাসিনার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের ওপর থেকে পাথরের মালাটা এনে, হাসিনার হাতে গুঁজে দিলো মরিয়ম। চোখের সামনে মালাটা তুলে ধরে আনন্দে ফেটে পড়লো হাসিনা। আপাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'কি সুন্দর আপা, কি সুন্দর।'

মরিয়ম বললো, 'দাও আমি গলায় পড়িয়ে দেই।'

মালাটা গলায় পরিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে কোনা ভাঙা আয়নাটা এনে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখলো হাসিনা। খুশিতে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। আপার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'দাঁড়াও মাকে দেখিয়ে আসি, কি সুন্দর লাগছে তাই না?'

নাচতে নাচতে মাকে মালাটা দেখাতে চলে গেলো সে।

সেন্টের ছোট্ট শিশিটা টেবিলের ওপর রাখা ছিলো। হাসিনার চোখ পড়ে নি ওর ওপর। তাহলে এতক্ষণে বাড়িটা মাথায় তুলতো। উঠে গিয়ে শিশিটা চৌকির তলায় রাখা ওর টিনের বাক্সটার মধ্যে যত্ন করে রেখে দিলো মরিয়ম। হাসিনাকে ওটা দেবে না সে। পথে আসতে আকাশে মেঘ দেখে এসেছিলো, মনে হয়েছিলো যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। এতক্ষণে বুঝি নামলো। প্রথমে কয়েক ঝলক দমকা বাতাস জানালার কবাট, ঘরের দেয়ালে বাধা পেয়ে করুণ বিলাপের মত শব্দ করলো। তারপর ঝিরঝির এবং অবশেষে ঝম্‌ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নেমে এলো। উঠে গিয়ে জানালার কবাট জোড়া বন্ধ করে দিলো মরিয়ম। গলির আর সব বাড়িগুলোতেও জানালা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বউ-ঝিদের হাঁক-ডাক।

'আপা-আপা' ও ঘর থেকে হাসিনার ডাক শোনা গেলো।

মরিয়ম জবাব দিলো, 'আসছি।'

সবেমাত্র রান্নাবান্না সেরে এসেছেন সালেহা বিবি। হাসমত আলী খোকনকে পড়াচ্ছেন বসে বসে। দুলুটা ওঁর পিঠের ওপর উপুড় হয়ে আছে গলা জড়িয়ে। মাকে মালাটা দেখাচ্ছিলো আর কি যেন বলছিলো হাসিনা। মরিয়ম অসতে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'এটা কত দিয়ে কিনেছিসরে আপা?'

মরিয়ম বললো, 'বিনে পয়সায়।'

মা-বাবা, তাকালো ওর দিকে।

মরিয়ম আবার বললো. 'সেলিনার আম্মা আমাকে কিনে দিয়েছে এটা।'

'ও' হাসিনা ভ্রু কুঁচকে বললো, 'তাহলে তুই কিনিস নি?'

সালেহা বিবি বললো, 'তোকে কিনে দিয়েছেন উনি, তুই আবার হাসিনাকে দিয়ে দিয়েছিস কেন?

মালা হারাবার ভয়ে হাসিনার মুখখানা ম্লান হয়ে গেলো।

মরিয়ম বললো, 'কি আছে, ও পরুক না।'

শুনে আবার উজ্জ্বলতা ফিরে এলো হাসিনার চিবুকে।

বৃষ্টি তখন আরো বেড়েছে। বাইরে শুধু একটানা ঝুপঝাপ শব্দ। কে যেন জোরে কড়া নাড়ছে সদর দরজায়। সালেহা বিবি বললেন, 'দেখতো হাসিনা, বোধ হয় মাহমুদ এলো?'

একটু পরে ছুটতে ছুটতে হাসিনা এসে হেসে লুটোপুটি খেলো 'দেখে এসো মা, ভাইয়া একেবারে ভিজে চুপসে গেছে।'

সালেহা বিবি ধমকালেন, 'দাঁত বের করে হাসছিস কেন, এতে হাসার কি আছে?'

মরিয়মের মনে পড়লো মাহমুদের ঘরে আলো নেই। দ্রুত পায়ে নিজের ঘর থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে ওঘরে রাখলো সে। ভিজে কাপড়গুলো বদলে মাহমুদ তখন গামছায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গা মুছছিলো । কাগজের স্তূপের ওপাশে রাখা হ্যারিকেনটা নিয়ে ওতে আলো জেলে দিলো মরিয়ম।

'কেমন করে ভিজলি, একটু কোথাও দাঁড়াতে পারলি না?' মা এসে দাঁড়িয়েছেন দোরগোড়ায়।

মাহমুদ বললো, 'সখ করে নিশ্চয় ভিজি নি।'

সালেহা বিবি বললেন, 'বছরের প্রথমে বৃষ্টি, এ বড় খারাপ। একটু গায়ে পড়লেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। মাথার চুলগুলো মুছে নে ভালো করে।'

মরিয়ম উঠতে যাচ্ছিলো। মাহমুদ বললো, 'কোথায় চললে, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার, বস।'

মরিয়ম বসলো।

ভেজা কাপড়গুলো নিয়ে সালেহা বিবি চলে গেলেন একটু পরে।

পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে ধরালো মাহমুদ। তারপর বিছানার মাঝখানে আস্তে করে বসলো, 'রোজ সন্ধ্যায় তুমি কোথায় যাও তা জানতে পারি কি আমি?

মরিয়ম ক্ষণকাল নীরব থেকে বললো, 'ওরা নিউ মার্কেটে যাচ্ছিলো, সঙ্গে করে নিয়ে গেলো আমায়–'

'তুমি গেলে কেন?' ওর মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে মাহমুদ রূঢ় গলায় জবাব দিলো, 'ওদের সঙ্গে সম্পর্ক হলো মালিক আর মাস্টারনীর সম্পর্ক। ওদের মেয়েকে পড়াও আর বিনিময়ে টাকা পাও। নিউ মার্কেটে ওদের সঙ্গে দেবার জন্য নিশ্চয় কোন বাড়তি টাকা তোমাকে দেয়া হয় না।' মাথা নত করে চুপচাপ বসে রইলো মরিয়ম।

ওকে চুপ থাকতে দেখে হাতের বিড়িটা এক পাশে সজোড়ে ছুঁড়ে মেরে মাহমুদ আবার বললো, 'কতদিন বলেছি বড়লোকের বাচ্চাগুলোকে আমি দেখতে পারি না, আর তুমি সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোও?' ছেলের চিৎকার শুনে সালেহা বিবি ছুটে এসে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে, অমন চেঁচাচ্ছিস কেন তুই?'

হাসিনা এতক্ষণ দুয়ারের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলো সব। সে ফিসফিসিয়ে বললো, 'আপা সেলিনাদের সঙ্গে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলো, তাই ভাইয়া বকছে তাকে।'

সালেহা বিবি মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিউ মার্কেটে গেছে তাতে হয়েছে কি, এমন কি অন্যায় করেছে যে তুই বকছিস ওকে।'

'তুমি যা বুঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না মা,' কিছুটা সংযত হতে চেষ্টা করলো মাহমুদ। 'নিউ মার্কেটে ও যাবে না কেন, একশো বার যাবে কিন্তু ওই বড়লোকদের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে নয়।'

'কেন ওরা কি মানুষ না নাকি', সালেহা বিবি ছেলের অহেতুক রাগের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে নিজেই রেগে গেলেন 'ওরা যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাহলে–'

'কই ওরা তো আমাকে নিয়ে যায় না?' মায়ের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে মাহমুদ জবাব দিলো 'নিউ মার্কেট কেন সদরঘাট পর্যন্ত ওরা মোটরে করে নিয়ে যাবে না আমায়। তোমার মেয়েকে দেখবে বুড়িগঙ্গার ওপারেও নিয়ে যাবে।' স্বরটা নামিয়ে নিয়ে মাহমুদ আবার বললো, 'কই দশ টাকা বেতন এ মাসে বাড়িয়ে দিবে বলে কথা দিয়েছিলো, বাড়িয়েছে? ওদের আমি চিনি নি ভাবছো? সব ব্যাটা বেঈমান।'

মরিয়ম তখনো মাথা নুইয়ে চুপচাপ বসেছিলো। হ্যারিকেনের আলোয় ভালো করে মুখ দেখা যাচ্ছিলো না ওর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালেহা বিবি ধীর গলায় বললেন, 'সব বড়লোক এক রকম হয় না।'

'যা জানো না তা নিয়ে কথা বলো না।' এত জোরে চিৎকার করে উঠলো মাহমুদ যে ওরা সকলে চমকে তাকালো ওর দিকে। 'সব বড়লোক সমান না, কটা বড়লোক তুমি দেখেছো শুনি? কোনো বড়লোকের ছেলেকে দেখেছো বি. এ. পাশ করে পঁচাত্তর টাকার চাকরির জন্যে মাথা খুঁড়ে মরতে? কই, একটা বড়লোক দেখাও তো আমায়, যার মেয়ে অন্যের বাড়িতে ছাত্রী পড়িয়ে যে টাকা পায় তা দিয়ে কলেজের বেতন শোধ করে? দুপুর রোদে এক মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ক্লাশ করতে যায়? ওরা সমান না বললেই হলো। সব শালা বেঈমান, চামার। বিনে পয়সায় মানুষকে খাটিয়ে মারতে চায়। দিয়েছি শালার চাকরি ছেড়ে। জাহান্নামে যাক–' বলতে গিয়ে কাশি এলো তার। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে ভয়ানকভাবে কাশতে লাগলো মাহমুদ।

পাথরের মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে সালেহা বিবি।

'মরিয়ম নীরব।'

মাহমুদ তখনও কাশছে একটানা।

ওর কাছে এগিয়ে এসে শঙ্কিত গলায় সালেহা বিবি বললো, 'ঠাণ্ডা লাগে নি তো? একটু সরষের তেল গরম করে এনে বুকে মালিশ করে দেবো?'

উঠে দাঁড়িয়ে বোধ হয় তেল গরম করে আনার জন্যে বেরিয়ে গেলো মরিয়ম। কাশি থামলে মাহমুদ বললো, 'আমাকে নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না তোমাদের মা, এত সহজে আমি মরবো না।' বলে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো মাহমুদ।

সালেহা বিবি বললেন , 'শুয়ে পড়লি কেন, ওঠ। যাই, আমি নামাজ পড়ে ভাত দেই তোদের।'

হাসমত আলী পুরোপুরি ওর আলোচনাটা না শুনতে পেলেও মাঝে মাঝে টুকরো কথাগুলো কানে আসছিলো তার। বিশেষ করে যখন নিজের দৈন্যের কথা, সাথীহীনতার কথা বলছিলো মাহমুদ। শুনেছিলেন আর মনে মনে নিজেকে বারবার অপরাধী বলে মনে হচ্ছিলো তাঁর। ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখানোর গুরুভার বহন করতে পারেন নি তিনি। পারেন নি তাদের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে মানুষ করতে। তাদের শৈশব-যৌবনের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চরিতার্থ করতে। মনে মনে পীড়িত হচ্ছিলেন হাসমত আলী। স্ত্রীকে আসতে দেখে চাপা স্বরে শুধালেন, 'কি বলছিলো মাহমুদ।'

সালেহা বিবি নামাজের জোগাড়যন্ত্র করতে করতে জবাব দিলেন, 'চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ও।'

অনেক কথা শুনলেন, এ খবরটি ইতিপূর্বে কানে আসে নি তাঁর। স্ত্রীর মুখে শুনে, খানিকক্ষণ একটা অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ভ্রূজোড়া ঈষৎ কুঁচকে এলো তার। চোখজোড়া সরু হয়ে এলো। কেউ যেন শুনতে না পায় এমনি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো হাসমত আলী।

বাইরে তখনো একটানা বৃষ্টি ঝুপঝুপ শব্দে।

সালেহা বিবি সবে নামাজের নিয়ত বেঁধেছেন। হাসিনার উঁচু স্বরের ডাক শোনা গেলো ওঘর থেকে 'আপা, জলদি আয় পানি পড়ে বিছানাটা যে একেবারে ভিজে গেলো।'

পাকঘরে বোধ হয় মাহমুদের জন্যে তেল গরম করতে এসেছিলো মরিয়ম। কান খাড়া করে ওর ডাক শুনতে পেলো সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু জোরে বৃষ্টি হলে ফাটল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে থাকে ঘরে। প্রতি বর্ষায় তাই বাড়িওয়ালাকে বলে মিস্ত্রী আনিয়ে ফাটলগুলো মেরামত করতে হয়। তা না হলে বর্ষার মরশুমে ঘরে থাকা দায় হয়ে পড়ে।

মরিয়ম এসে দেখলো টপটপ করে পানি পড়ে বিছানাটা বেশ ভিজে গেছে। দু'বোনে দুমাথায় ধরে চৌকিটা একপাশে নিয়ে এলো। যেখানে পানি পড়ছিলো সেখানে একটা পানির পাত্র এনে বসিয়ে দিলো মরিয়ম।

হাসিনা বললো, 'আজ রাতে থাকবি কেমন করে?'

মরিয়ম কোন জবাব দিলো না। চৌকির এক কোণে বসে পড়ে সে ভাবতে লাগলো কবে তাদের এমন দিন আসবে যখন এ বাড়ি ছেড়ে একটা ভালো বাসায় উঠে যেতে পারবে তারা, যেখানে ছাদটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে না মাথার উপর আর বৃষ্টির পানি তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নেবে না। কিন্তু তেমন কোন দিন অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পেলো না মরিয়ম। হাতজোড়া কোলের উপর গুটিয়ে রেখে অসহায়ভাবে বসে রইলো সে। মা যখন ভাত খেতে ডাকলেন সকলকে, বৃষ্টি তখন থেমে আসছে। খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেলো।

বিছানায় শুয়ে বারবার এপাশ-ওপাশ করছিলেন হাসমত আলী।

সালেহা বিবি শুধালেন, 'কি ব্যাপার, অমন করছো কেন?'

'না, কিছু না।' আবার পাশ ফিরে শু'লেন হাসমত আলী।

কিছুক্ষণ পরে তার গলার আওয়াজ শোনা গেলো। 'মাহমুদ হঠাৎ চাকরিটা ছেড়ে দিলো কেন?'

'ওকে জিজ্ঞেস করলেই পার।' সালেহা বিবি উত্তর দিলেন, 'অত খামখেয়ালী হ'লে চলে? মাসে মাসে পঁচাত্তরটা টাকা কম ছিলো কিসে।' কণ্ঠস্বরে তার আক্ষেপ ধ্বনিত হলো।

'হুঁ।' আবার নড়েচড়ে শুলেন হাসমত আলী। তারপর মৃদু গলায় বললেন, 'ছেড়ে না দিলেই ভালো করতো।'

একটু পরে নীরব হয়ে গেলেন দু'জন।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মরিয়মের মনে হলো, মাথাটা বড় বেশি ভার ভার লাগছে ওর। গা-হাত-পা ব্যথা করছে। চোখের ভেতরটা জ্বলছে অল্প অল্প। হাত বাড়িয়ে হাসিনা আছে কিনা দেখলো মরিয়ম। ও উঠে গেছে, এতক্ষণে পাশের বাড়ির বউটিকে হয়তো গলার মালাটা দেখাতে গেছে সে। মরিয়ম পাশ ফিরে শুলো।

একটু পরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ভালো করে আকাশটা ফর্সা হবার আগেই উঠে পড়েছিলো মাহমুদ; মুখ-হাত ধুয়ে চা নাস্তা খাবার আগে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লো সে। পরিচিত দু'চার জনের বাসায় গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের চাকরি ছেড়ে দেয়ার খবরটা জানালো, কোথাও কোন কাজের সুযোগ থাকলে যেন তাকে জানানো হয় সে অনুরোধটাও তাদের করতে ভুললো না সে। বেশি টাকার আশা করে না মাহমুদ, শ'খানেক টাকা পাওয়া যেতে পারে এ রকমের একটা চাকরি পেলে আপাতত চলে যাবে তার। এখানে সেখানে ঘুরে বিশ্রামাগারের চৌকাঠে যখন পা রাখলো সে, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

কেরোসিন কাঠের কাউন্টারের ওপাশে বসে হাতজোড়া সামনে প্রসারিত করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে নঈমকে কি যেন বলছিলো খোদাবক্স। 'হ্যাঁ, নতুন আসছে মেয়েটা;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইতো হপ্তাকানেক হলো। একশ' টাকার মাষ্টারনী–এই যে, মাহমুদ সাহেব যে, কাল কেমন ভিজলেন? কত করে বললাম, আরেকটু বসে যান, আকাশটা একটু ধরে আসুক।' মাহমুদকে নীরব থাকতে দেখে খোদাবক্স তার পুরনো কথায় ফিরে গেলো। 'হ্যাঁ যা বলছিলাম। নতুন মাষ্টারনী হয়েছে মেয়েটা। দেখতে কেমন বলছো? একেবারে আগুনের শিখা। গায়ের রংটা– কাঁচা হলুদ দেখছো কোনদিন? –ঠিক তার মত। অনেক মেয়ে তো দেখলাম, অমনটি দেখি নি।' একটা ঢোক গিয়ে খোদাবক্স আবার বললো, 'শরীরটা ছিপছিপে, চুলগুলো কোঁকড়ানো আর চোখ দু'টো–।'

'দেখি আজকের খবরের কাগজটা এদিকে দাও তো।'

মাহমুদের ডাকে কথার মাঝখানে হোঁচট খেলো খোদাবক্স। কাউন্টারের এক কোণে রাখা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো সে। তারপর আবার বললো, 'বসো না, চা খাও। একটু পরেই তো আসবে দেখাবো তোমায়।'

পত্রিকাটি খুলে চাকরির বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলোতে লাগলো মাহমুদ। খোদাবক্সকে এখনো সে তার বেকারত্বের কথা শোনায় নি। তাহলে আর বাকিতে খেতে দেবে না। বলবে, 'এমনিতে এত টাকা জমা হয়ে আছে আপনার।'

'হ্যাঁ, মাহমুদ সাহেব ইয়ে হয়েছে, দশটা টাকা কি এ মাস থেকে বাড়লো আপনার?'

খোদাবক্স প্রশ্ন করছে।

পত্রিকা থেকে মুখ না তুলে মাহমুদ জবাব দিলো, 'বাড়বে, এখনো বাড়ে নি।' মিথ্যে কথা বলে আশু আক্রমণ থেকে মুক্তি পেলেও মনে শান্তি পাচ্ছিলো না সে।

'তা হলে এ মাসে কিছু টাকা শোধ করছেন আপনি?' খোদাবক্সের গলা। 'তোমার কি হয়েছে বলতো। দিনে দিন একটা চামার হয়ে যাচ্ছো। সকালবেলা সবে এসেছি, অমনি টাকা টাকা বলে চিৎকার শুরু করেছো?' মাহমুদের গলা তিক্ততায় ভরা, 'টাকা শোধ করবো না বলে ভয় হচ্ছে নাকি তোমার? গরিব হতে পারি, নীচ নই, বুঝলে? যা খেয়েছি তা পাই পাই করে শোধ করে দেবো। বেঈমান ভেবো না আমাদের, বেঈমান নই।' পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে রাস্তার পাশে পান দোকানে ঝোলান দড়িটা থেকে আগুন ধরিয়ে এসে আবার বসলো মাহমুদ।

'আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন মাহমুদ সাহেব। আমি বলছিলাম কি–।

'থাক, থাক, এবার চুপ করো। ওসব কথা শুনতে ভাল লাগে না আমার।'

বিড়িতে একটা জোর টান দিয়ে আবার পত্রিকার উপর ঝুঁকে পড়লো মাহমুদ। খদ্দেরদের রাগাতে মোটেই প্রস্তুত নয় খোদাবক্স। তা'হলে ব্যবসার ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ছোটখাটো রেস্তোঁরা যারা চালায় তাদের পক্ষে এটা একটা অভিশাপস্বরূপ।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে গলাটা একবারে কাদে নামিয়ে খোদাবক্স বললো, 'আপনাদের সেই ইন্টারভিউটার কি হলো মাহমুদ সাহেব?'

বিড়ির ছাই ফেলতে ফেলতে মাহমুদ জবাব দিলো, 'কিছু হয় নি- হবে না যে জানতাম।' তার গলার স্বরটা শান্ত।

শুনে আশ্বস্ত হলো খোদাবক্স। একটা খদ্দেরের কাছ থেকে চা আর টোস্টের দামটা নিয়ে ক্যাশ বাক্সে রাখলো সে। তারপর সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলো খোদাবক্স। রাতে বৃষ্টি হবার পর আজকের সকালটা অন্য দিনের চেয়ে আরো বেশি উজ্জ্বল লাগছে। মেয়ে স্কুলের লাল দালানটার গায়ে চিকচিক করছে এক টুকরো রোদ। গেটের সামনে মেয়েদের বয়ে নিয়ে আসা ঘোড়ার গাড়িগুলো একটা দু'টা করে জমা হচ্ছে এসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সময়ে ক্ষুদ্র চোখজোড়া বড় হয়ে এলো খোদাবক্সের। 'ওই যে আসছে-আসছে।' চাপা উত্তেজিত গলায় বললো সে। চোখজোড়া তখনো রাস্তার উপর নিবদ্ধ তার।

ওর দৃষ্টি ধরে, মাহমুদ আর নঈম দু'জনে তাকালো সেদিকে।

খোদাবক্স মিথ্যে বলে নি। গায়ের রংটা ওর কাঁচা হলুদের মত। চুলগুলো ঘন কালো আর কোঁকড়ানো। দেহটা ছিপছিপে। সরু কটী। চোখজোড়া ভালো করে দেখতে পেলো না মাহমুদ। খোদাবক্স মৃদু হেসে বললো, 'এর কথা বলছিলাম, নতুন মাস্টারনী।' লাল দালানটার ভেতরে একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেলো মেয়েটা। মাহমুদের মনে হলো কোথায় যেন তাকে দেখেছে সে। কোনো বাসায়? কোনো অফিসে? কোনো রাস্তার মোড়ে?

খোদাবক্স বললো, 'ওর নাম লিলি।'

মাহমুদের মনে হলো, নামটাও এর আগে কোথায় শুনেছে সে। কার মুখে যেন শুনেছিলো? দূর তোর জাহান্নামে যাক মেয়েটা। দু'হাতে মুখখানা ঢেকে নীরবে ভাবতে লাগলো মাহমুদ, কোথায় গেলে সে আশু একটা চাকরি পেতে পারে।

দুপুরের গনগনে রোদে চোখমুখ জ্বালা করছিলো ওর। আকাশে একটুও মেঘ নেই। রাস্তার পাশে একটি দু'টি পাতা ঝরা গাছ। ছায়াহীন মতিঝিলের চওড়া রাস্তাটা পেরিয়ে শান্তিনগরে 'প্রান্তিক' প্রেসে যখন এসে পৌছলো মাহমুদ, তখন সূর্যের প্রখরতা এতটুকু কমে নি।

টিনের ছাপরা দেওয়া ছোট্ট প্রেস।

ছাপরার নিচে একখানা চৌকোণ টেবিলকে সামনে নিয়ে, চেয়ারে বসে শাহাদত তালপাতার পাখায় হাওয়া দিচ্ছিলো গায়ে। ওকে দেখে পাখাটা সামনে নাবিয়ে রেখে ত্রস্তপায়ে উঠে দাঁড়ালো সে। 'আরে, মাহমুদ যে, এসো এসো।'

মাহমুদ বললো, 'উতলা হয়ো না, বসো।' কোনায় রাখা গোল টুলটা টেনে এনে বন্ধুর মুখোমুখি বসলো সে। তারপর একটা লম্বা হাই ছেড়ে জামার বুতামগুলো একে একে সব খুলে নিলো। পাখাটা হাতে নিয়ে জোরে বাতাস করতে করতে শুধালো, 'তারপর কেমন আছ বলো।'

'কেমন আছি জিজ্ঞেস করছো?' অদ্ভুতভাবে হাসলো শাহাদাত, 'সুখে আছি, দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছি।'

মাহমুদ বিরক্তির সাথে বললো, 'হেঁয়ালি রাখো, আমেনা কেমন আছে?'

শাহাদাত সংক্ষেপে বললো, 'ভালো।'

'ছেলেমেয়ে?'

'ভালো।'

বাইরে গনগনে রোদের দিকে তাকিয়ে পাখাটা আরো জোরে নাড়তে লাগলো মাহমুদ। উপরের টিন তেতে গিয়ে গরমটা আরো বেশি করে লাগছে এখানে।

হঠাৎ শাহাদাত শুধালো, 'তোমার কি খবর?'

পাখা থামিয়ে মাহমুদ বললো, 'চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছো?' শাহাদাত অবাক হলো, 'এতদিনে পারলে ছাড়তে?'

মাহমুদ বললো, ধৈর্যের একটা সীমা আছে বুঝলে?' বলে চাকরি ছাড়ার ইতিবৃত্তটা ওকে শুনালো মাহমুদ। 'সাংবাদিক হবার স্বপ্ন ছিলো, সে তো চুরমার হয়ে গেছে। সাংবাদিকতার নামে গণিকাবৃত্তি করেছি এ ক'বছর। মালিকের হুকুম তামিল করেছি বসে বসে। তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেটারা বেঈমানী করলো।' জামার কলারটা তুলে ধরে জোরে বুকের মধ্যে বাতাস করতে লাগলো মাহমুদ।

কিছুক্ষণ পর শাহাদাত আবার প্রশ্ন করলো, 'এখন কি করবে তুমি?' সহসা কোন জবাব দিতে পারলো না মাহমুদ। কি ভেবে বললো, 'যে কোন একটা চাকরি পেলে করবো। তাইতো এসেছি তোমার কাছে। যদি কোথাও কোন প্রেসে কিছু একটা জুটিয়ে দিতে পারো।'

শাহাদাত বিব্রত গলায় বললো, 'আমার অবস্থা খুলে না বললেও তুমি বুঝতে পারো। কম্পিটিশনের বাজারে ভালো ক্যাপিটাল না থাকলে বিজনেসে টিকে থাকা যায় না। প্রেসটা বোধ হয় বিক্রি করে দিতে হবে।' ক্ষণকাল থেমে আবার বললো, 'থাকগে, নিজের দুঃখের কথা বলে তোমার দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাই নে। আমার সাধ্যিমত চেষ্টা করে দেখেবো–যদি কিছু জুটিয়ে দিতে পারি।'

শেষের কথাগুলো মাহমুদের কানে গেলো কিনা বোঝা গেলো না। সামনে ঝুঁকে পড়ে অবাক কণ্ঠে সে শুধালো, 'প্রেসটা কি বিক্রি করে দেবে তুমি?'

শাহাদাতের প্রেস বিক্রি করে দেবার খবরে যেন ভীষণ আঘাত পেয়েছে সে। শাহাদাত ম্লান হেসে বললো, 'কিছু টাকা যদি দিতে পারো তা হলে এ যাত্রা ঠেক দিয়ে রাখা যায়। টাইপগুলো সব পুরনো হয়ে গেছে। ওগুলো দিয়ে আর কাজ চালানো যাচ্ছে না। নতুন টাইপ না কিনলে লোকে এখানে ছাপতে আসবে কেন? তা ছাড়া শহরে এখন অনেক অভিজাত ছাপাখানা হয়ে গেছে– তাদের পাশে আমার টিনের ছাপরাটা কি হাস্যকর নয়?' কথা শেষে আবার হাসলো শাহাদাত।

মাহমুদ এতক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেছে। মাস কয়েক আগে বউয়ের অলংকার বিক্রি করে টাইপ কেনার টাকা সংগ্রহ করেছিলো শাহাদাত। সে খবর মাহমুদের অজানা নয়। সে টাকা তবে কি করেছে সে? 'জুয়োর আড্ডায় সব উড়িয়েছো বুঝি?'

শাহাদাত চমকে বললো 'কি?'

'আমেনার অলংকার বেচার টাকাগুলো?'

শুনে বিমর্ষ হলো শাহাদাত। ইতস্তত করে বললো, 'পাগল হয়েছো?' জুয়োর আড্ডায় উড়াবো, পাগল হয়েছো?

'থাক, আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত চাই নি' পাখাটা টেবিলের উপর নাবিয়ে রেখে মাহমুদ বললো, 'আমেনা আছে কি ভিতরে?'

প্রসঙ্গটা আপনা থেকে ঘুরিয়ে নেয়ায় খুশি হলো শাহাদাত। বললো 'না, ও ওর এক খালার বাড়ি গেছে, এইতো কমলাপুর। বসো এক্ষুণি এসে যাবে।'

মাহমুদ বললো, 'না, আমি আর বসবো না। বেলা অনেক হয়ে গেছে, এবার উঠি।'

শাহাদাত বললো, 'কোথায় যাবে?'

'বাসায়।'

'আরেকটু বসো না, 'এক কাপ চা খেয়ে যাও।'

'না, এখন চা খাবো না।'

আবার সেই গনগনে রোদের সমুদ্রে নেমে এলো মাহমুদ। পেছন থেকে শাহাদাতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল 'আবার এসো কিন্তু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই যে সকালে মাথা ধরেছিলো মরিয়মের তারপর দুটো দিন বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারলো না সে। সারা গা কাঁপিয়ে জ্বর এলো। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা।

এখনো গায়ে জ্বর আছে অল্প অল্প। ডাক্তারের কাছ থেকে মিক্‌শ্চার এনে খাইয়েছে হাসমত আলী। মাথার পাশে বসে কপালে জলপট্টি দিয়েছেন সালেহা বিবি, হাসিনা গা-হাত পা টিপে দিয়েছে ওর। শরীরটা ভয়ানক দুর্বল বোধ হলেও এখন অনেকটা সুস্থ মরিয়ম।

জানালা গলিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে ঘরের কোণে, যেখানে একটা মাকড়সা জাল বুনছে আপন মনে। সুরকি ঝরা লাল দেয়ালটা জুড়ে সাদা পাতলা আলোর জাল। চোখের পাতাজোড়া বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইলো মরিয়ম। সালেহা বিবি কখন এ ঘরে এসেছেন টের পায় নি সে। কপালে একখানা হাত রেখে দেহের উত্তাপ নিলেন তিনি। তারপর মৃদুস্বরে বললেন 'এক বাটি বার্লি বানিয়ে দিই, কেমন?'

মায়ের হাতের ওপর ওর ডান হাতখানা রেখে অস্পষ্ট স্বরে মরিয়ম বললো, 'খেতে ইচ্ছে করে না মা।'

'না খেলে যে শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়বে।' সালেহা বিবির কণ্ঠে কোমলতায় ভরা, 'বানিয়ে আনবো।'

'আনো মা।' ক্ষীণ গলায় জবাব দিলো মরিয়ম।

একটু পরে ওর গায়ের কাপড়টা ভালোভাবে টেনে দিয়ে চলে গেলেন মা। তার পায়ের লঘু শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো দূরে।

কোথায় একটা কাক ডাকছে কা কা করে। এই মাত্র একটি চিল ডেকে গেলো। গলিতে বুঝি কোন ছেলে টিন পিটিয়ে খেলা করছে। কারা কথা বলছে ও বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনছিলো মরিয়ম।

'আপা!' দোরগোড়ায় হাসিনার গলা, 'একটা লোক আসছে তোর কাছে, দেখা করতে চায়।'

জ্বরের মধ্যেও চমকে উঠলো মরিয়ম।

হাসিনা কাছে এসে বললো, 'ভেতরে নিয়ে আসবো?'

হাতের ইশারায় ওকে আরো কাছে ডেকে মরিয়ম শুধালো, 'নাম জিজ্ঞেস করেছিস লোকটার।'

হাসিনা মাথা নাড়লো, 'না' তারপর নাম জিজ্ঞেস করার জন্য বোধ হয় আবার ফিরে যাচ্ছিলো হাসিনা।

মরিয়ম ক্ষীণ গলায় ডাকলো 'এই শোন!'

হাসিনা ফিরে দাঁড়ালো।

মরিয়ম বললো, 'মায়ের ঘর থেকে চেয়ারটা এনে এখানে রাখ। টেবিলের উপরে বইগুলো বড্ড আগোছালো হয়ে আছে। হ্যাঁরে হাসিনা, বাবা আছেন ঘরে?'

হাসিনা ঘাড় নাড়লো, 'না'।

'ভাইয়া?

'না'।

ইশারায় লোকটাকে ভেতরে নিয়ে আসতে বলে কাঁথাটা সারা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিলো মরিয়ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে মায়ের ঘর থেকে চেয়ারটা এ ঘরে রেখে গেলো হাসিনা। তারপর লোকটাকে নিয়ে এলো।

মরিয়ম যা আশঙ্কা করেছিল– মনসুর।

একি? ঘরে ঢুকে ওর চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়লো মনসুর।

'আপনার অসুখ করেছে নাকি?' ওর কণ্ঠস্বরের এই ব্যগ্রতায় বিব্রত বোধ করলো মরিয়ম। দৃষ্টিটা ওর পায়ের পাতার কাছে নাবিয়ে এনে আস্তে করে বললো, 'বসুন।'

মনসুর বসলো।

হাসিনা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলো। মাকে একটা নতুন লোক আসার খবর দেবার জন্য বোধ হয় চলে গেলো সে।

মরিয়ম তাকালো ওর দিকে।

একজোড়া গম্ভীর সহানুভূতি ভরা চোখ চেয়ে দেখছে তাকে।

মরিয়ম বললো, 'তারপর কেমন আছেন?'

ওর প্রশ্ন খুশির আবির ছড়িয়ে দিলো মনসুরের চোখেমুখে। ডান হাতের তর্জনি দিয়ে বাম হাতের তালুটা ঘষতে ঘষতে সে জবাব দিলো, 'আমি ভালো আছি। আপনার অসুখ হয়েছে জানতে পেলে আরো আগে দেখতে আসতাম। দু'দিন ও বাসায় আপনি গেলেন না, ভাবলাম কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে। 'মনসুর থামলো। শান্ত, স্নিগ্ধ ও গভীর দৃষ্টি নিয়ে সে তাকালো মরিয়মের দিকে।

মরিয়ম ইতস্তত করে বললো, 'এখন জ্বর প্রায় ছেড়ে গেছে। দু'একদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবো।'

মনসুর বললো, 'দু'দিনের জ্বরে আপনি ভীষণ শুকিয়ে গেছেন।'

রোগপাণ্ডুর মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হলো মরিয়মের। ইচ্ছে হচ্ছিলো, গায়ের কাঁথাটা দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলতে তার। হাসিনা এসে এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মুক্তি দিলো তাকে।

মরিয়ম বললো, 'ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার? আমার ছোট বোন হাসিনা।'

মনসুর ফিরে তাকালো ওর দিকে। মৃদু হাসলো, তারপর বললো, 'উনিই তো ভেতরে এনেছেন আমায়।'

হাসিনা চুপচাপ হাতের নখ খুঁটতে লাগলো। মরিয়ম দেখলো, মা দূর থেকে উঁকি মেরে একবার মনসুরকে দেখে চলে গেলেন। হাসিনাও গেলো তাঁর পিছু পিছু। শায়িত অবস্থায়, ওর দিকে তাকিয়েও মরিয়ম বুঝতে পারছিলো, একজোড়া সহানুভূতিভরা শান্ত চোখ গভীর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। অকারণে আরেক বার আরক্ত হলো মরিয়ম। কিছু না বলে নীরব থাকাটাও অস্বস্তিকর মনে হলো। অথচ কি যে আলোচনা করা যেতে পারে কিছু খুঁজে পেলো না। 'হ্যাঁ, সেলিনা কেমন আছে?' একটা কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু পেয়ে আসন্ন বিপদমুক্ত হলো মরিয়ম।

মনসুর বললো, 'ভালো।'

তারপর আবার নীরবতা।

'এবার উঠি তাহলে।' নীরবতা গুঁড়িয়ে বললো মনসুর, 'একটা কাজ আছে যাই এখন। আবার আসবো।'

'না না, যাবেন আর কি, আরেকটু বসুন,' ক্ষীণ গলায় বললো মরিয়ম। দরজা লক্ষ্য করে তাকালো সে– যদি হাসিনাকে দেখা যায়। মনসুরকে চা-নাস্তা করানো উচিত এবং মা নিশ্চয়ই তার যোগাড়যন্ত্র করছে। মরিয়মের অনুমান মিথ্যে নয়। একটু পরে, কিছুদিন আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেনা চায়ের কাপে চা আর একটা পিরিচে দু'টো পান্তুয়া আর দু'টো সন্দেশ সাজিয়ে নিয়ে এলো হাসিনা। টেবিলের উপর ওগুলো নামিয়ে রাখলো সে। মরিয়ম বললো, 'এক গ্লাস পানি দিয়ে যাও হাসি।'

মনসুর একবার টেবিলের দিকে আরেকবার মরিয়মের দিকে তাকিয়ে নীরব রইলো।

মরিয়ম ওর দিকে কাৎ হয়ে শুয়ে বললো, 'আমরা গরীব। বিশেষ কিছু খাওয়াতে পারবো না আপনাকে,–এক কাপ চা খান।' বলতে গিয়ে আবার আরক্ত হলো মরিয়ম।

কিন্তু মনসুর গম্ভীর হয়ে গেছে, মুখখানা কালো হয়ে আসছে তার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে এসেছে। চা-নাস্তা খেয়ে আবার আসবো বলে চলে গেলো মনসুর।

ও চলে গেলে অনেকক্ষণ কেন যেন ভালো লাগলো মরিয়মের। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর যে ক্লান্তি বোধ করছিলো তা আর এখন নেই। বাইরে কোন পরিবর্তন হয় নি। গায়ে জ্বর এখনো আছে, মাথাটা ধরে আছে এখনো। তবু একটা আনন্দের আভা জেগে উঠেছে তার দু'গালে। বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। গায়ের উপর থেকে কাঁথাটা সরিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে মনসুরের কথা ভাবতে লাগলো মরিয়ম।

'কে এসে ছিলোরে মরিয়ম?' মায়ের কণ্ঠস্বর। হাতে এক গ্লাস বার্লি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

মরিয়ম বললো, 'সেলিনার বড় বোনের দেবর।' বার্লির গ্লাসটার জন্য হাত বাড়িয়ে জবাব দিলো মরিয়ম। সে ভেবেছিলো, মা কিছু বলবেন, কিন্তু সালেহা বিবি আর কোন প্রশ্ন করলেন না। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মরিয়ম বুঝতে পারলো সালেহা বিবি লোকটার আগমনে সুখী হতে পারেন নি। কে জানে, হয়তো জাহেদের কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর। কিন্তু সব পুরুষ কি এক রকম? বার্লির গ্লাস হাতে ভাবলো মরিয়ম।

মনসুরকে জাহেদের মত বলে ভাবতে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো সে।

'লোকটা করে কি?' এতক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন সালেহা বিবি।

বার্লিটা খেয়ে নিয়ে মরিয়ম জবাব দিলো, 'ব্যবসা করে।'

কিসের ব্যবসা?'

'জানি না।'

মা চলে গেলে অনেকক্ষণ মরিয়ম ভাবলো, মনসুরকে বলে দিলেই হতো সে যেন আর না আসে।

বিকেলে আবার এলো মনসুর।

এক বোতল হরলিক্স আর এক ঠোঙ্গা আঙ্গুর-বেদানা হাতে। সসঙ্কোচে ওগুলো টেবিলের উপর নাবিয়ে রাখলো সে। মরিয়মের দিকে সরাসরি তাকাতে সাহস পেলো না।

মরিয়ম অস্ফুট স্বরে বললো, 'ওখানে কি?'

মনসুর সলজ্জ গলায় বললো, 'একটা হরলিক্স আর কিছু ফ্রুটস।'

'কেন এনেছেন শুধু শুধু।' আর বেশি বলতে পারলো না মরিয়ম। মনে মনে ওর প্রতি ভীষণ রাগ হচ্ছিলো তার। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারলো না। একজোড়া সহানুভূতিপূর্ণ লজ্জাবনত চোখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেলো সে। সকালে এনে রাখা চেয়ারখানা দেখিয়ে বললো, 'বসুন।'

বাসায় বাবা আর মাহমুদ দু'জন আছেন এখন। তাদের কথা ভেবে শঙ্কিত হলো মরিয়ম। তারা নিশ্চয় মনসুরের এই আসা-যাওয়া শুভ চোখে দেখবে না। জাহেদকে এত সহজে ভুলতে পারে না ওরা। মরিয়মও ভুলে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন কেমন আছেন?' গলার স্বরে উৎকণ্ঠা।

কনুই-এর উপর ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলো মরিয়ম। ক্ষীণ গলায় বললো, 'ভালো।'

মনসুরকে এখন বিদায় দিতে পারলে বাঁচে সে। রোগাক্লিষ্ট দেহে কোন রকমে অপঘাত সহ্য করতে পারবে না। বাবা মনে মনে রাগ করলেও মুখে কিছু বলবে না। কিন্তু মাহমুদ হয়তো প্রকাশ্যে অপমান করে বসবে আর তা খুব সুখপ্রদ হবে না মরিয়মের কাছে।

'কেমন আছিস মা?' বাবা এখন আসবেন তা জানতো মরিয়ম। মুহূর্তে সারা গাল রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তার। হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে যেন শ্বাসরোধ করে দাঁড়ালো।

মনসুরকে দেখে বিব্রত বোধ করলেন হাসমত আলী।

মরিয়ম অস্ফুটস্বরে বললো, 'বাবা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, ওদের দু'জনকে চমকে দিয়ে হাসমত আলীর পা ধরে সালাম করলো মনসুর। ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে ইতস্তত করে হাসমত আলী বললেন, 'থাক।'

নিজের নাম আর পরিচয় শেষে শূন্য চেয়ারটা হাসমত আলীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মনসুর বললো, 'বসুন।' যেন ঐ বাড়ির কর্তা। হাসমত আলী মেহমান হিসেবে এসেছেন।

মনসুরের ব্যবহারে দু'জনে ওরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেলো।

হাসমত আলী বললো, 'না, না, আমি বসব না, আপনি বসুন।'

মনসুর বসলো না, দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর অত্যন্ত সহজভাবে হাসমত আলীর সঙ্গে মরিয়মের চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করলো সে। একটা ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত। কিছু টনিক খাওয়ালে শারীরিক দুর্বলতা আর থাকবে না, তাও বললো মনসুর। বিব্রত বোধ করলেও অপ্রসন্ন যে হন নি হাসমত আলী, সেটা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো মরিয়ম। একটু আগের সকল শঙ্কা দূর হয়ে গিয়ে হাল্কা বোধ করলো সে।

পরদিন আবার এলো মনসুর।

পরদিন।

তার পরদিনও।

তারপর থেকে নিয়মিত ওদের বাসায় আসতে লাগলো মনসুর। বাবা, হাসিনা, সালেহা বিবি, খোকন, সকলকে কি এক অদ্ভুত যাদুবলে আপনার করে নিল সে। মরিয়ম নিজেও বুঝতে পারলো না, কেমন করে এটা সম্ভব হলো। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত সমস্ত পরিবারকে দুর্বার বেগে তার কাছে টেনে নিয়ে এলো মনসুর। হাসমত আলীকে বাবা বলে সম্বোধন করলো সে, সালেহা বিবিকে মা। খোকনকে একটা ফুটবল কিনে দিলো, দুলুকে একটা প্লাস্টিকের পুতুল। হাসিনার জন্য ওর পছন্দ মত একটা শাড়ি কিনে আনলো– আর মরিয়মের জন্য নানা রকম টনিক, ফ্রুটস্ আর হরলিক্স। দারিদ্র্য-বিধ্বস্ত পরিবারে খোদার ফেরেস্তা হিসেবে আবির্ভূত হলো মনসুর। কোনদিন ও না এলে মা চিন্তিত হয়ে শুধায়, 'কিরে, মনসুরটা তো আজ এলো না। অসুখ-টসুখ করে নি তো ওর?'

বাবা বলেন, 'আসবে, বোধহয় কোন কাজে-টাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আহা বড় ভালো ছেলে। জীবনে কত মানুষ দেখলাম, এমন নম্র আর ভদ্র ছেলে আমি দেখি নি।' খোকন ফুটবলটা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করে, 'মনসুর ভাই আজ আসবে না আপা?'

হাসিনা বলে–'সত্যি, উনি না এলে কিছু ভালো লাগে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন মন্তব্য করে না, শুধু একজন। সে মাহমুদ। ভোরে ঘুম থেকে উঠে নির্বিকার নির্লিপ্ততায় বাইরে বেরিয়ে যায় সে। সারাদিন আর ফেরে না। ফেরে রাত বারোটায়। কোনদিন খায়, কোনদিন না খেয়ে শুয়ে থাকে। বাসায় কাউকে মুখ দেখাতে যেন লজ্জা বোধ করে সে। তাই সকলের ঘুম ভেঙ্গে ওঠার আগে বেরিয়ে যায়– আবার সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তবে বাসায় ফেরে। মনসুর দু'একদিন জিজ্ঞেস করছিলো ওর কথা।

সালেহা বিবি হতাশ গলায় বলেছেন, 'ওর কথা আর বলো কেন বাবা? বাসায় খোঁজ খবর কি রাখে ও? সারাটা দিন কি চিন্তায় যে ঘুরে বেড়ায়, খোদা জানে।'

হাসিনা বলে, 'ভাইয়া দিন দিন বাউণ্ডুলে হয়ে যাচ্ছে।'

'হাসিনা'। মরিয়ম শাসালো দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে।

হাসিনা বলে, বাউণ্ডুলে নয় তো কি, ভাইবোনগুলোর একটু খোঁজ-খবর নেয় কোনদিন?'

মরিয়ম বলে, 'ও কথা বলতে নেই হাসিনা।'

হাসিনা চুপ করে যায়।

মরিয়ম এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। বিছানা ছেড়ে এ ঘরে ও ঘরে চলাফেরা করে সে। বাইরে বেরুতে চেয়েছিলো। কিন্তু মনসুরের কড়া নিষেধ। জ্বর ছাড়লে কি হবে, আবার আসতে পারে। শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে বাইরে বেরুনো চলবে না।

মরিয়ম বলে, 'এখন তো কোন অসুখ নেই। সত্যি ভালো হয়ে গেছি।'

মনসুর বলে, 'আরো ক'টা দিন যাক।'

মরিয়ম বলে, 'সেলিনার নিশ্চয় পড়ার খুব ক্ষতি হচ্ছে?'

মনসুর বলে, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, আপনার চাকুরি যাবে না। ওদের বলে দিয়েছি আমি, আপনার অসুখ।'

মরিয়ম বলে, 'সত্যি আপনার কাছে অনেক ঋণী হয়ে রইলাম।'

একটু ইতস্তত করে মনসুর বলে, 'ভালো হয়ে নিন, এক দিন না হয় এ ঋণ শোধ করার সুযোগ দেয়া যাবে আপনাকে।'

বুকটা ধড়াস করে ওঠে মরিয়মের। চোখ তুলে ওর দিকে আর তাকাতে পারে না সে। বুকের কাছে কোথায় যেন একটু ভয়, একটু আনন্দ মিশে গিয়ে এক অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি করে।

একদিন হাসিনা আর খোকনকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো মনসুর। মাকেও যেতে বলেছিলো। মা বললেন, 'আমি বুড়ো মানুষ, তোমরা যাও।' মনসুরের কিনে দেওয়া শাড়িখানা পরে, গলায় সেই পাথরের মালাটা জড়িয়ে বেরিয়ে যাবার সময় মরিয়মকে লক্ষ্য করে বলে গেছে হাসিনা, 'তুই বিছানায় শুয়ে থাক আপা, আমরা চললাম বেড়াতে। কি, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?' মুচকি হেসে খোকনের হাত ধরে মনসুরের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সে।

ফিরে এসে উল্লাসে ফেটে পড়েছে হাসিনা।

মনসুর মোটরে করে পুরো রমনাটা ঘুরিয়েছে ওদের। রেসকোর্স, সারপেন্টাই লেক, আজিমপুর, মতিঝিল, কত জায়গায় গেছে। 'কি সুন্দর মনসুর ভাইয়ের মোটরটা। মাঝে মাঝে খুব জোড়ে চালাচ্ছিল আর এমন ভয় হচ্ছিলো আমার আপা!'

হাসিনা বললো, 'খোকন বারবার পিগ পিগ করে হর্ণ দিছিলো, এত ভালো লাগছিলো আমার,' বলতে গিয়ে সারা চোখ-মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিলো তার, 'কসবা রেস্টুরেন্টে' কোনদিন গেছিস আপা? বাইরে কি গরম, আর ওখানে ঢুকলে ঠাণ্ডায় গা কাঁপে। মনসুর ভাই ওখানে নিয়ে গিয়ে পরটা-কাবাব খাওয়ালেন। তারপর গলির মাথায় আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামিয়ে বললেন, তোমার আপা ভালো হলে সবাইকে নিয়ে আরেক দিন বেড়াতে বেরুবো। কি মজা, তাই না আপা?' মরিয়মকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে লুটিপুটি খেলো হাসিনা।

শুধু তখন নয়, পড়তে বসে, খাওয়ার সময়, শোবার আগখান দিয়েও কোথায় কোথায় গিয়েছিলো আর কি কি দেখেছে– সে সব কথা সকলকে শুধালো হাসিনা। বারবার মনসুরের প্রশংসা করলো। ওর মত এত ভালো লোক এ জীবনে সে দেখে নি আর মনসুর ভাই দেখতে খুব সুন্দর–তাই না আপা? চমকে হাসিনার দিকে তাকালো মরিয়ম। কটাকটা চোখজোড়া স্বপ্নময়। আনন্দে চিকচিক করছে যেন।

তোমার কি হয়েছে হাসিনা? মনে মনে বললো মরিয়ম। জাহেদের কথা এ মুহূর্তে মনে পড়লো তার আর নিজের যৌবনের কথা। খানিকক্ষণ সে শুধু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলো তাকে। এক প্রগল্‌ভতা কেন হাসিনার?

নিজেকে প্রশ্ন করলো মরিয়ম। হাসিনার প্রতিটি গতিবিধি, কথাবার্তা, আশঙ্কাজনক বলে মনে হলো তার।

রাতে ভালো ঘুম হলো না মরিয়মের।

পরদিন সকালে অন্য দিনের মত বেরিয়ে গেলো না মাহমুদ। বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠলো। কুয়োতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজলো, মুখ হাত ধুলো। তারপর মায়ের ঘরে চা-নাস্তা করতে বসে খবরটা জানালো সে। নতুন একটা চাকরি হয়েছে তার। প্রেসে প্রুফ রীডারের চাকরি।

মাসে নব্বই টাকা করে দেবে।

মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে গোল হয়ে বসে চা খেতে বসেছিলো সবাই। মুখ তুলে একবার করে তাকালো ওর দিকে।

সালেহা বিবি প্রথম কথা বললেন, রাত জেগে কাজ করতে হবে নাতো?

মাহমুদ বললো, 'রাত দিন ঠিক নেই, যখন দরকার হবে তখনি করতে হবে কাজ।'

সালেহা বিবি বললেন, 'এ আবার কেমনতর চাকরি।'

আর কেউ কোন মন্তব্য করলো না।

এক মুখ মুড়ি চিবোতে চিবোতে হাসিনা বললো, 'মনসুর ভাইকে বললে উনি আরো একটা ভালো চাকরি যোগাড় করে দিতেন তোমায়।'

'মনসুর ভাইটা আবার কে?' যেন কিছু জানে না এমনিভাবে সবার দিকে তাকালো মাহমুদ।

'মরিয়ম যে মেয়েটাকে পড়ায় তার বড় বোনের দেবর।' সালেহা বিবি জবাব দিলেন ক্ষণকাল পরে। 'তোমার সঙ্গে কি আলাপ হয় নি তার? হবেই বা কেমন করে তুমি কি আর বাসায় থাকো?'

এ ফাঁকে সেখান থেকে সরে পড়লো মরিয়ম।

হাসিনা ডাকলো, 'চা না খেয়ে চলে যাচ্ছিস কেন আপা?'

মরিয়ম বললো, 'আসছি' কিন্তু সে আর এলো না।

মুখেপোরা মুড়িগুলো গিলে নিয়ে মাহমুদ বললো, 'বাসায় না থাকলে কি হবে, কোথায় কি হচ্ছে সে খোঁজ আমি রাখি মা। টাকার জন্যে যে তোমরা আত্ম বিক্রি করছো তা আমি জানি।'

সকলে চুপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও ছেলের কথার জবাবে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না হাসমত আলী।

হাসিনা অবাক হয়ে তাকালো মাহমুদের দিকে। এ কথার কোন অর্থ বোধগম্য হয় নি তার।

সালেহা বিবি ইতস্তত করে বললেন, 'যা মুখে আসে তা পট করে বলে বসিস না, বুঝলি? একটু চিন্তা করিস।'

মাহমুদ পরক্ষণে জবাব দিলো, 'চিন্তা করার কথা আর কেন বলছ মা। লোকটার যদি টাকা পয়সা না থাকতো, সে যদি তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে এটা সেটা কিনে না দিতো তাহলে কি আর তাকে অমন মাথায় তুলে নাচতে তোমরা?' মায়ের কাছ থেকে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ। নিজের ঘরে চলে যাবার আগ মুহূর্তে বলে গেলো, 'চা-টা আমার ঘরে দিয়ে যাস তো হাসিনা।'

ও চলে গেলে হাসিনা মুখ বিকৃতি করে বললো, 'ভাইয়াটা যে কি মিছিমিছি অন্য লোককে গালাগাল দেবে, নিজে যেন কত বড় হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত একটা শাড়ি কিনে দিতে পারলো না আমায়, মুখে শুধু বড় বড় কথা।'

'ওই কথা বলে বলেই তো গেলো' যোগ করলেন সালেহা বিবি।

খোকন বললো, 'মনসুর ভাই কখন আসবেন?

'সে কখন আসবে তাতে তোমার কি?' হাসমত আলী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ওদের বাজে কথা ছেড়ে বই নিয়ে পড়তে বসো।' উষ্মা বিরক্তি বিতৃষ্ণা।

সালেহা বিবি বললেন, 'ও কি করেছে যে ওকে অমন ধমকাচ্ছো তুমি?'

হাসমত আলী বললেন, 'আজকাল পড়ালেখা কিছু করে ও? সারাদিন তো ঐ ফুটবলটা নিয়ে আছে।'

'ছেলেমানুষ একটু খেলাধুলো করবে নাতো কি?' সালেহা বিবি জবাব দিলেন, 'তুমি শুধু ওকে অমন করে ধমকিও না।' চায়ের বাটি আর মুড়ির থালাগুলো হাতে নিয়ে পাকঘরে চলে গেলেন তিনি।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলো মাহমুদ। চায়ের কাপটা পাশে নাবিয়ে রাখতে বইটা বন্ধ করে বললো, 'হ্যাঁরে হাসি, ধর আমি যদি একটা বড় চাকরি করতাম, মাসে মাসে যদি শ'পাঁচেক টাকা আয় হতো আমার, আর তোদেরকে যতি রোজ বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতাম, এটা সেটা কিনে দিতাম তাহলে তোরা আমাকে খুব ভালবাসতি তাই না?' হাসিনা বুঝলো না। অবাক হয়ে মাহমুদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে। তারপর ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, 'তুমি পাঁচ শো টাকা আয় করতে পারলে তো।' বলে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো সে।

অপমানিত বোধ করলো মাহমুদ। সে পুরুষ। পাঁচশো টাকা আয় করার মতো সামর্থ কোনদিন তার হবে না। হবে না এ জন্য নয় যে তার শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই, যোগ্যতা নেই। হবে না এ জন্য যে তার কোন বড়লোক হিতৈষী নেই, মন্ত্রী আত্মীয় নেই, অসৎ পথে অর্থ রোজগারের প্রবৃত্তি নেই।

'মরিয়ম।' হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলো সে 'মরিয়ম'। প্রথম তার কোন জবাব এলো না। দ্বিতীয় ডাকের একটু পরে মরিয়ম সশরীরে এসে হাজির 'আমায় ডাকছো?'

'হ্যাঁ বসো, এক চুমুকে চায়ের কাপটা শূন্য করে একটা বিড়ি ধরালো মাহমুদ। 'তুমি কি করবে ঠিক করেছো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়ম ইতস্তত করে বললো, 'এখনো কিছু ঠিক করি নি।'

মাহমুদ বললো, 'কেন, ওই বড়লোকটার গলায় ঝুলে পড়লেই তো পারো, মন্দ কি?'

তীর্যক কণ্ঠস্বর।

মরিয়মের ইচ্ছে হচ্ছিলো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে। ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় চোখমুখে জ্বালা করে উঠলো তার। এ সময় হাসিনা না এলে হয়তো কেঁদে ফেলতো মরিয়ম।

হাসিনা দরজার ওপাশ থেকে বললো, 'কে এসেছে দেখে যা আপা।'

ওর উচ্ছ্বাস দেখে প্রথমে মরিয়মের মনে হয়েছিলো মনসুর। আর তাই মনে হতে ভীষণ বিব্রত বোধ করছিলো সে।

হাসিনা বললো, 'লিলি আপা এসেছে।' মরিয়ম হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মাহমুদ বললো, 'তোমার সঙ্গে কথা কিন্তু শেষ হয় নি আমার। বান্ধবীকে বিদায় দিয়ে আবার এসো।'

লিলি একা আসে নি, সঙ্গে তার একটা সতেরো আঠারো বছরে ছেলে। হাতে একটা ক্যামেরা। লিলি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার মামাতো ভাই তসলিম. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। হাসিনা ফটো তুলবে বলেছিলো তাই ওকে নিয়ে এসেছি।'

হাসিনা খুশিতে ডগমগ হলো।

মরিয়ম বললো, 'তোমাকে আরো আগে আশা করেছিলাম লিলি। এতদিন আস নি কেন?'

লিলি বললো, 'সারাদিন ছাত্রী পড়িয়ে বিকেলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

মরিয়ম বললো, 'আমার অসুখ করেছিলো। যদি মরে যেতাম।'

লিলি অবাক হলো 'অসুখ হয়েছিলো? আমাকে একটু খবর দিলেই তো পারতে, আমি কিছু জানি না।'

মরিয়ম বললো, 'কার হাতে খবর পাঠাবো?'

লিলি বললো, 'তোমার দাদাকে তো প্রায়ই দেখি, আমাদের স্কুলের সামনে একটা রেস্তোরায় বসে বসে আড্ডা দেন। তার হাতে খবর পাঠালে পেতাম।' মাহমুদ সম্পর্কে লিলির মন্তব্যটা ভালো লাগলো না মরিয়মের।

হাসিনা বললো, 'দেখলি তো আপা, ভাইয়া সারাদিন রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা মারে, তাইতো বাসায় বেশি খায় না।'

'বাজে বকো না হাসিনা।' মরিয়ম ধমকে উঠলো।

মুহূর্ত কয়েক আবহাওয়াটা গুমোট হয়ে রইলো।

অবশেষে পরিবেশটা হাল্কা করে দিয়ে লিলি বললো, 'চলো ফটো তুলবে।' হাসিনা হাততালি দিয়ে বললো, 'চল আপা, ভাইয়াকে ডাকবো?' তারপর তসলিমের দিকে চেয়ে বললো, 'আমার একটা ভালো ফটো তুলে দিতে হবে কিন্তু।'

'আপনারা কি গ্রুপ ফটো তুলবেন, না প্রত্যেকে আলাদা করে।' তসলিম এতক্ষণে কথা বললো, 'আমার কাছে কিন্তু বেশি ফিল্ম নেই।'

'ফিল্ম না থাকলে এসেছেন কেন?' হাসিনা পরক্ষণে জবাব দিলো, 'না এলেই পারতেন।'

'এই হাসিনা।' ওর চুলের গোছা ধরে টান দিলো মরিয়ম।

তসলিমের কচি মুখখানা লাল হয়ে গোলো।

লিলি হেসে বললো, 'রাগ করো না হাসিনা, আরেক দিন ভর্তি ফিল্ম নিয়ে আসবে ও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়ম বললো, 'বড় বেশি ফাজিল হয়ে গেছে।'

ফটো তোলার জন্যে মাহমুদকে ডাকতে গেলে ও বললো, 'আমার অত সখ নেই।'

মরিয়ম বললো, 'সবাই তুলছি আমরা।'

মাহমুদ জবাব দিলো, 'তোমরা তোলগে।'

মা এসে বললো, 'কেন কি হয়েছে। ভাইবোন সবাই মিলে ওরা একটা ফটো তুলতে চাইছে, তাতে তোর এত আপত্তি কেন শুনি? তুই এমন হলি কেন অ্যাঁ।'

উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো মাহমুদ। দোরগোড়ায় লিলিকে উঁকি মারতে দেখে থেমে গেলো সে। উঠে দাঁড়াতে মৃদু গলায় বললো, 'চলো তোমাদের যখন এত সখ হয়েছে।'

কিন্তু কোথায় বসে ফটো তুলবে তা এক সমস্যা দাঁড়িয়ে গেলো। ছাদে বসে তুলবে বলে আগে ভেবেছিলো ওরা। মাহমুদ বললো, 'পাগলামো আর কি।' এক সঙ্গে সবাই ওখানে উঠলে ছাত্র ভেঙ্গে পড়বে।'

হাসিনা বললো, 'একজন করে উঠলে তো হয়।'

কিন্তু গ্রুপ ফটো তুলতে হলে সকলকে একসঙ্গে বসতে হবে। অবশেষে ঠিক হলো কুয়োর পাশে পাক ঘরের সামনে যে অপরিসর আঙ্গিনাটা আছে সেখানে বসবে ওরা।

ফটো তোলার ব্যাপারে হাসমত আলী কোন আপত্তি করলেন না। ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার সাহস তাঁর নেই। শুধু একবার মাথা চুলকে বললেন, 'আমায় কেন?' বলতে বলতে কুয়োতলায় নেমে এলেন তিনি। সালেহা বিবি বেঁকে বসলেন। বললেন, 'তোমরা তোলো, আমি দেখি।'

মরিয়ম বললো, 'এসো না মা।'

লিলি বললো, 'আসুন খালা আম্মা।'

সালেহা বিবি বললেন, 'আমি বুড়ো মানুষ, আজ বাদে কাল মরবো, ফটো তুললে গুনাহ হয়।' মনে তাঁরও ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু ধর্মীয় সংস্কার বারবার বাধা দিচ্ছিলো এসে।

মাহমুদ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো এতক্ষণ। বিরক্ত হয়ে এবার বললো, 'ফটো তোলার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে এসো মা তোমাদের অত ধানাইপনাই আমার ভালো লাগে না, আমি চললাম।' ও চলে যেতে উদ্যত হলো। ওর রাগ দেখে ফিক করে হেসে দিলো লিলি।

দাঁড়িয়ে, পেছন ফিরে ওর দিকে তাকালো মাহমুদ। একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মেয়েটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলো না বোধ হয়। চোখ নাবিয়ে নিলো। মা এতক্ষণে রাজী হলেন।

পাকঘরের সিঁড়ির ওপর পাশাপাশি বসলো।

মা-বাবা মাঝখানে। বাবার পাশে মাহমুদ। মায়ের পাশে মরিয়ম। সামনে বসলো হাসিনা, দুলু আর খোকন।

তসলিম বললো, 'একটু অপেক্ষা করতে হবে; রোদ ঢাকা পড়ে গেছে। মেঘটা সরে যাক।'

এ ফাঁকে খোকনের মনে পড়লো তার ফুটবলটার কথা। দৌড় দিয়ে খাটের তলা থেকে ওটা বের করে এনে কোলে নিয়ে বসলো সে। ওর ফুটবল নিয়ে বসতে দেখে, দুলুর মনে পড়লো ওর পুতুলটার কথা। ছুটে গিয়ে পুতুলটা নিয়ে এলো সে। ওর মুখে হাসি, খোকন একবার নিজের ফুটবল আর ওর পুতুলটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ বাঁকালো, আর আস্তে করে বললো, 'আমার দেখা-দেখি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘ সরে গেছে, সকলেই ক্যামেরাটার দিকে তাকালো এবার।

গ্রুপ ফটো তোলা হয়ে গেছে। মাহমুদ চলে যাচ্ছিলো। হাসিনা পেছন থেকে হাত টেনে ধরলো ওর। 'ভাইয়া পালাচ্ছো কেন, আমি তুমি আর আপা একখানা তুলবো।'

মাহমুদ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'বাজে আবদার করো না।'

মরিয়ম ডাকলো, ভাইয়া।'

'নাও, তুলতে হলে তাড়াতাড়ি তোল।' মাহমুদ আবার এসে বসলো পাকঘরের সিঁড়ির ওপর। মরিয়ম আর হাসিনা ওর দু'পাশে।

লিলি মৃদু মৃদু হাসছিলো আর দেখছিলো ওদের। ওর দিকে চোখ পড়তে মরিয়ম বললো, 'এসো না লিলি তুমিও এসো।'

হাসিনা ডাকলো, 'আসুন লিলি আপা, আসুন না।' ওর গলায় অবদারের সুর।

মাহমুদের দিকে তাকিয়ে মুখখানা রক্তে লাল হয়ে গেলো লিলির। দ্রুত ঘাড় নাড়লো সে। 'না তুলব না।'

মাহমুদ এ প্রথম বললো ওর সঙ্গে, 'এত লজ্জা নিয়ে আপনি শহরে বেরোন কি করে? ফটো তুলতে আসুন।'

লিলি এবার সরাসরি তাকালো ওর দিকে। মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে তার। মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বললো, 'আপনারা তুলুন।'

ফটো তোলা শেষ হলে তসলিমকে ধরে বসলো হাসিনা, 'আমাকে ছবি তোলা শেখাতে হবে।'

তসলিম সুবোধ বালকের মত মাথা নোয়ালো, 'আচ্ছা।'

হাসিনা বললো, 'আচ্ছা তো বুঝলাম, কিন্তু আপনার দেখা পাওয়া যাবে কোথায়?'

তসলিম সঠিক কোন উত্তর না দিতে পেরে ইতস্তত করছিলো।

হাসিনা বললো, 'আপনি আমাদের বাসায় আসবেন, রোজ একবার করে আসতে হবে কিন্তু।'

তসলিম মৃদু হেসে সায় দিলো, 'আসবো।'

হাসিনা সহজে ছেড়ে দিলো না তাকে। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। কি করে ছবি ওঠে তা জিজ্ঞেস করলো। একটা ক্যামেরার দাম কতো জানতে চাইলো। আজকে তোলা ফটোগুলো কবে পর্যন্ত পাবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করলো। তসলিম কবে থেকে শিখেছে, শিখতে তার কতদিন লেগেছে, হাসিনার কতদিন লাগতে পারে, এমনি নানা আলাপের শেষে বললো, 'আমাকে কিন্তু শিখাতে হবে নইলে–।'

কথাটা শেষ না করলেও অপূর্ব ভঙ্গিতে ওকে শাসালো হাসিনা।

এতদিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকলেও আজ লিলির সঙ্গে বাইরে বেরুলো মরিয়ম। দু'টি কারণ ছিলো এর পিছনে। প্রথমত মাহমুদকে এ মুহূর্তে এড়াতে চায় সে। দ্বিতীয়ত নিরালায় বসে মনসুর সম্পর্কে লিলির সঙ্গে আলাপ করবে। একটা সিদ্ধান্ত অবিলম্বে নিতে চায় মরিয়ম।

বাসায় ফিরতে সাঁঝ হয়ে গেলো।

দুপুরে লিলির ওখানে খেয়েছে সে। তারপর গল্প করতে করতে কখন বেলা পড়ে এসেছে সে খেয়াল ছিলো না।

বাইরে থেকে হাসিনার উচ্ছ্বসিত গলার স্বর শুনে বুঝতে পেরেছিলো, মনসুর এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ ঘরে আছে কিনা উঁকি মেরে দেখে, বারান্দায় বার কয়েক হোঁচট খেয়ে যখন ভেতরে এলো মরিয়ম, তখন সকাল বেলা ফটো তোলার ব্যাপারটা মনসুরকে শোনাচ্ছিলো হাসিনা। তসলিম তাকে ফটো তোলা শেখাবে বলেছে। সে খুব ভালো ছেলে-বড় ভালো এসব কথাও তাকে বলছিলো সে।

মনসুর অন্যমনস্কভাবে শুনছিলো সব। মরিয়মকে দেখে মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ম্লানতায় ফিরে এলো।

'কখন এসেছেন আপনি?' ভেতরে এসে প্রশ্ন করলো মরিয়ম।

'অনেকক্ষণ।' ম্লানমুখে বললো মনসুর, 'আপনি বুঝি আবার বেরুতে শুরু করেছেন?'

মৃদু হেসে ওর পাশ কাটিয়ে এসে বিছানার ওপর বসলো মরিয়ম। ময়লা চাদরটার দিকে চোখ পড়তে, হাসিনার প্রতি একটা কটাক্ষ হানলো সে। হাসিনা আবার ফটো তোলার খবর শোনাতে লাগলো। তারপর বললো, 'আমাকে একটা ক্যামেরা কিনে দিতে হবে মনসুর ভাই।'

মনসুর হেসে দিয়ে বললো, 'কিনে দেবো।'

মরিয়ম উসখুস করছিলো। অকস্মাৎ হাসিনার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি একটু বাইরে যাও হাসি, মনসুর সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে।' গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনালো মরিয়মের।

মনসুর অবাক চোখে তাকালো ওর দিকে।

একবার মরিয়ম, আরেকবার মনসুরের দিকে তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো হাসিনা।

একেবারে চলে গেলো না সে। বারান্দায় আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে রইলো।

দু'জনে নীরব।

মরিয়ম ভাবছিলো কি করে কথাটা বলা যায় ওকে।

মনসুর শঙ্কিত হলো, চরম মুহূর্তটি বুঝি আজ এলো ওর সামনে।

আরো অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে. অদূরে টেবিলটার দিকে তাকিয়ে মরিয়ম বললো, 'আপনি রোজ রোজ এখানে কেন আসেন?'

যা আশঙ্কা করছিলো মনসুর।

সারা দেহে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর এলো।

ক্ষণকাল পরে সে বললো, 'সে কথা কি এ মুহূর্তে শুনতে চান আপনি?'

ওর চোখে চোখ পড়তে দ্রুত চোখজোড়া নাবিয়ে নিল মরিয়ম।

'হ্যাঁ।' গলাটা কেঁপে উঠলো তার।

আবার নীরবতা।

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো মনুসর। বার কয়েক ঢোক গিলে অবশেষে বললো, 'আমি আপনাকে ভালবাসি।'

অপ্রত্যাশিত কিছু ছিলো না, তবু সারা দেহ দুলে উঠলো মরিয়মের। জীবনে আরেকটি ক্ষণ, মুহূর্ত মনে পড়ে গেলো। বুকটা দুরুদুরু কাঁপছে ভয়ে-আনন্দে। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারলো না মরিয়ম। মনে হলো, ওর দৃষ্টির সামনে থেকে যদি নিজেকে এখন কোথাও লুকিয়ে ফেলতে পারতো সে? বিছানার চাদরটাকে ডান হাতে আঁকড়ে ধরলো মরিয়ম। ওকে চুপ থাকতে দেখে অদ্ভুত গলায় মনসুর আবার বললো, 'আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দেবেন আমায়।' আরেক বার ঢোক গিললো সে। 'কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না আমি, আপনি বিশ্বাস করুন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে এই প্রথম একটি মেয়েকে ভালবেসেছি আমি। যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি সেদিন।'

কথার খেই হারিয়ে ফেললো মনসুর।

সমস্ত দেহটা কুঁচকে একটুখানি হয়ে এলো মরিয়মের। ভয় আর আনন্দ। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না সে।

খানিকক্ষণ পরে মনসুর আবার বললো, 'আপনি হয়তো মনে মনে ঘৃণা করতে পারেন আমাকে, কিন্তু যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি সেদিনই ঠিক করেছিলাম আপনাকে বিয়ে করবো।'

মরিয়ম চমকে তাকালো ওর দিকে।

একজোড়া যন্ত্রণাকাতর চোখ।

পরক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মরিয়ম। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'বাবাকে বলবেন, দয়া করে এসব কথা বাবাকে বলবেন। আমি কিছু জানি না।' বলে তার সামনে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো মরিয়ম। আর এলো না।

বিয়ের আনুষঙ্গিক আয়োজনগুলো যত সহজে সারা যাবে বলে মনে করেছিলেন হাসমত আলী, কাজে নেমে দেখলেন সেগুলো তত সহজ নয়। টাকা-পয়সার স্বল্পতা পরিকল্পনাগুলোকে বানচাল করে দেয়। তবু বড় প্রসন্ন হাসমত আলী।

মেয়ের জন্যে এমন পাত্র কোনদিন আশা করেননি তিনি। কল্পনাও ছিলো না। তবে, যেদিন থেকে মনসুর এ বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে সেদিন থেকে সালেহা বিবির সঙ্গে এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন তিনি। আশা নিরাশায় দুলেছেন দু'জনে। স্বপ্ন দেখেছেন । অবশেষে স্বপ্ন তাদের সফল হতে চলেছে।

ভয় ছিলো একটি, সে হলো মাহমুদ। তারা ভেবেছিলেন মাহমুদ এ বিয়েতে বিরোধিতা করবে। ঝগড়া বাঁধাবে। অকারণে হৈ চৈ করবে। বাধা না দিলেও প্রতিবাদ অবশ্য করেছে মাহমুদ। বলেছে 'তোমাদের মেয়ের বিয়ে দেবে সে তোমরা জানো, তোমাদের মেয়ে জানে। আমাকে শুধু শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছো কেন মা?'

সালেহা বিবি বলেছেন 'সে কি, তোকে জিজ্ঞেস করবো নাতো কাকে জিজ্ঞেস করবো, তুই হলি বড় ছেলে।'

মায়ের কথা শুনে হেসেছে মাহমুদ। হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলেছে, 'দেখো মা, আমার মতামত যদি চাও তাহলে বলবো, এ বিয়েতে মত নেই আমার। অবশ্য আমার মতামতের ওপর ওটা নাকচ করে দাও, সেটা আমি চাই নে।'

'এ আবার কেমনতর কথা হলো,' সালেহা বিবি অবাক হয়ে বললেন, 'তোর মত থাকবে না কেন, এর চেয়ে ভালো বর আর কোথায় পাবি ওর জন্যে?' মাহমুদ বললো, 'মা, কেন মিছামিছি আমার মেজাজটা চড়াচ্ছো। ভালো খারাপের কতটুকু তুমি জানো? যে লোকটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে বলে অহলাদে আটখানা হচ্ছো তার চরিত্র বলে কোন পদার্থ আছে কিনা খোঁজ নিয়েছো?'

'দেখ মুখে যা আসে তা বলে দিস না, একটু ভাবিস।' সালেহা বিবি বিরক্তির সাথে বললেন, 'কে বললো তোকে ওর চরিত্র খারাপ?'

মুখ কালো করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো মাহমুদ। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'মা, তুমি বুঝবে না, মরিয়মকে ডেকে জিজ্ঞেস করো এ দেশে ক'টা লোক আছে যে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র ঠিক রেখে বড়লোক হতে পেরেছে? অন্যকে ফাঁকি দিয়ে, ধোঁকাবাজ আর লাম্পট্য করে, শোষণ আর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে সব। তাদের আবার চরিত্র! ও-সব বাজে কথা আমাকে শুনিয়ো না মা। তোমাদের মেয়ে তোমরা বিয়ে দাওগে, আমার কোন মতামত নেই।' পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালো মাহমুদ।

উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবার পথে মা আস্তে করে বললেন, 'তোমার মত থাকুক কি, না থাকুক এ বিয়ে হবে।'

মা চলে গেলে, একটা বই খুলে বসে বার কয়েক বিড়িতে জোর টান দিলো মাহমুদ।

ওর মতামতটা মরিয়মের কাছেও অজানা ছিলো না। তাই, পারতপক্ষে মাহমুদের সামনে আসে না সে। যতক্ষণ মাহমুদ ঘরে থাকে ততক্ষণ খুব সাবধানে চলাফেরা করে মরিয়ম। কখনো সামনে পড়ে গেলে, লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে আসে। পাশ কাটিয়ে একপাশে সরে যায় সে। আরেকটা ব্যাপারে বড় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো মরিয়ম। আনিসা বেগমকে কি করে মুখ দেখাবে সে। সেলিনাকে মনসুরের কাছে বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে মনের বাসনাটা জানিয়েও ছিলেন মরিয়মকে। তাকে বড় বিশ্বাস করতেন তিনি। অবশেষে যেদিন মরিয়মের সঙ্গে বিয়ের কথা শুনবেন সেদিন ওর সামনে কি করে গিয়ে দাঁড়াবে মরিয়ম? ইদানীং সেলিনাকে পড়াতে যায় সে।

সম্পর্কটা আগের মতই আছে। কিন্তু আর কতদিন এভাবে চলবে সেটা জানে না মরিয়ম। একদিন নিশ্চয় খবরটা যাবে ওদের কানে। যাক, সে নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না সে। তার চেয়ে বিবাহিত জীবনের সুন্দর কল্পনা করতে ভালো লাগে। ভয় আর আনন্দ মেশানো এক অপূর্ব অনুভূতি।

হাসিনা সবচেয়ে খুশি।

বিয়ের পর ওকে একটা ক্যামেরা কিনে দেবে কথা দিয়েছে মনসুর। তসলিমের কাছে ও ছবি তোলা শিখছে। তার সঙ্গে বসে আপার বিয়ের সময় ঘরগুলো কিভাবে সাজাবে তা নিয়ে পরিকল্পনা করে সে। একটা বাঁশের গেট তৈরি করতে হবে বাড়ির সামনে। কিছু পটকা বাজী কিনবে ওরা। অর কয়েক দিস্তা লাল নীল কাগজ। হ্যাঁ, একটা উপহার ছাপাতে হবে সবার নামে। 'তোমার নামটাও ওখানে থাকবে তসলিম ভাই, তাই, না?' তসলিম মাথা নুইয়ে সায় দেয় 'হ্যাঁ।'

কিন্তু ঐ সবের জন্য টাকার দরকার। বাবার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না জানতো হাসিনা। মাহমুদ শুনলে রাগ করবে। তাই চুপি চুপি মনসুরের কাছ থেকে দশটা টাকা আদায় করে নিয়েছে সে। কাউকে বলে নি, বলেছে শুধু তসলিমকে। ওকে দিয়ে কেনাবে সব। আর জানিয়েছে মাকে। মা বললেন, 'খবরদার মাহমুদের কানে যেন না যায়। বড় বোনের বিয়ে, একটু আমোদ-ফূর্তি করবি না তো কি?'

হাসিনা বলে, 'আমায় নতুন একটা শাড়ি কিন্তু কিনে দিতে হবে মা।'

মা বললেন, 'বলেছি তো কিনে দেবো।'

হাসিনা খুশিতে ঘরময় নেচে বেড়ায়।

মনসুর আজকাল আসা বন্ধ করেছে। মরিয়ম নিষেধ করেছে তাকে। ও এলে মরিয়ম বিব্রত বোধ করে। ওর সামনে আসতে লজ্জা লাগে মরিয়মের। 'আমার কথা ভেবে, এ ক'টা দিন আর এসো না তুমি।' মনসুরকে বলেছে সে। 'যদি দেখা করতে হয় বাইরে করো, কিন্তু সেলিনাদের ওখানে নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে মাহমুদকে ডেকে বসলেন হাসমত আলী। সালেহা বিবিও একখানা পাখা হাতে বসলেন তাদের পাশে। বিয়ের তারিখটা ঘনিয়ে আসছে। কাদের নিমন্ত্রণ করতে হবে। কি খাওয়ানো যেতে পারে। কত টাকার প্রয়োজন তার একটা হিসেব করলেন হাসমত আলী।

মাহমুদ বললো, 'দলসুদ্ধ লোক নিমন্তন্ন করার দরকার নেই। যাদের না করলে নয় তাদের দাওয়াত করো।'

সালেহা বিবি বললেন, 'কাউকে বাদ দিলে তো চলবে না, বড় মেয়ের বিয়ে।'

'তাই বলে সবাইকে দাওয়াত করতে হবে নাকি। অত লোক খাওয়াবে কি করে?'

হাসমত আলী ছেলের পক্ষ নিলেন। টাকার চিন্তা বারবার বিভ্রান্ত করছিলো তাঁকে। কেরানীর জীবনে সঞ্চয় সম্ভব নয়। হাসমত আলীও কিছু জমাতে পারে নি। অথচ ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে হলে মোটা অঙ্কের না হোক মোটামুটি একটা অঙ্কের প্রয়োজন।

মাহমুদ বললো, 'দেখি এ মাসে বেতনটা যদি অগ্রিম পাওয়া যায় তাহলে পুরোটা দিয়ে দেবো আমি।'

সালেহা বিবি বললেন, 'তাহলে তুই চলবি কেমন করে?'

'সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না মা।' মৃদু গলায় জবাব দিলে মাহমুদ। কাদের দাওয়াত করতে হবে একটা তালিকা তৈরি করলেন হাসমত আলী। কি খাওয়ানো হবে সে সম্পর্কেও আলোচনা হলো, ক্রমে রাত বাড়লে মাহমুদ ঘুমোতে চলে গেলো।

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে শুধু জেগে রইলেন অনেক রাত পর্যন্ত। টাকার কথা ভাবছিলেন ওঁরা।

সালেহা বিবি ফিসফিস করে বললেন, 'মরিয়মকে দিয়ে মনসুরের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চাইলে ও নিশ্চয় দেবে।'

হাসমত আলীও তাই ভাবছিলেন। এমনি হাত পাতা যাবে না। ধার চাইতে হবে। পরে শোধ করতে যে পারবেন না, তা জানেন তিনি। তবু ধার চাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু মাহমুদ যদি জানতে পারে তাহলে বাড়িশুদ্ধ মাথায় তুলবে।

হাসমত আলী চাপা গলায় বললেন, 'চাইলে নিশ্চয় দেবে, কিন্তু মাহমুদ কি জানবে না ভেবেছো?

সালেহা বিবি বললেন, 'জানুক। জানলে কি হবে, ও পারবে অতগুলো টাকা যোগার করে দিতে?'

স্ত্রীর কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না হাসমত আলী। ইতস্তত করে বললেন, 'এক কাজ করলে হয় না, অন্য কারো কাছ থেকে কর্জ নিলে। 'শোধ করবে কেমন করে?'

পরক্ষণে সালেহা বিবি জবাব দিলেন 'তাছাড়া দুটো মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে সে খেয়াল আছে?'

হাসিনা আর দুলুর কথা বলছেন সালেহা বিবি।

ওদের বিয়ে দিতে হবে একদিন।

বাতি নিভিয়ে দিয়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরো অনেকক্ষণ আলাপ করলেন ওরা। টাকা সংগ্রহের বহুবিধ উপায় নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে অবশেষে দু'জনে নীরব হলেন।

রাতে ভাল ঘুম হলো না ওদের।

পরদিন সকালে চা খেতে বসে মাহমুদ বললো, 'দেখো মা, খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা না করে, নাস্তা পানি খাইয়ে সকলকে বিদেয় দেবার বন্দোবস্ত করো। গরিবের অত ভোজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়াবার চিন্তা না করাই ভালো।' মা বললেন, গরিব হয়েছি বলে বুঝি স্বাদ-আহ্লাদ নেই আমাদের?'

মাহমুদ মৃদু হাসলো। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, 'মা, রোজ পাঁচ বেলা যার কাছে মাথা ঠোকো তাকে ভুলেও কি একবার জিজ্ঞেস করতে পারো না; এত স্বাদ আহ্লাদ দিয়ে যদি গড়েছেন তোমাদের, সেগুলো পূরণ করার মত সামর্থ্য কেন দেননি?'

এ কথার তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারলেন না সালেহা বিবি। তাই চুপ করে রইলেন তিনি।

'ও ঠিক বলছে।' ছেলেকে সমর্থন জানালেন হাসমত আলী, অত ভোজ দেবার কি দরকার, আমাদের সামর্থ্য যখন নেই-।' কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

সালেহা বিবি বললেন, 'সামর্থ্য ক'জনের থাকে। তাই বলে কি তারা বড় মেয়ের বিয়েতে নাস্তা পানি খাইয়ে মেহমান বিদায় করে? আমার পোড়া কপাল নইলে-।' দু'চোখে পানি এসে জমা হলো তাঁর। আঁচলে চোখ মুছলেন তিনি।

মায়ের কান্না দেখে আর কোন কথা বলতে সাহস পেলো না মাহমুদ।

চা-টা শেষ করে নীরবে উঠে গেল সে। হাসমত আলী বার কয়েক মাথা চুলকালেন তারপর দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে চুপচাপ কি যেন ভাবতে লাগলেন তিনি।

আজ মরিয়মের বিয়ে।

সকাল থেকে পুরো বাড়িটায় উৎসব। মেহমান, অতিথি, গিজগিজ করছে ঘরগুলো, বারান্দা, কুয়োতলা।

ভোরে ভোরে পাকঘরে ঢুকেছে সালেহা বিবি। সেখান থেকে আর বেরোয় নি। পাড়ার কয়েকজন বয়স্ক মহিলা, যাদের ওরা নেমন্তন্ন করেছিলো কাজের সহায়তা করছে তাঁকে। হাসিনা, খোকন আর তসলিম আগের রাতে সাদা সুতোয় লাল-নীল কাগজ এঁটে ঘরগুলো সাজিয়েছে। সামনে একটা বাঁশের তোরণ তৈরি করেছে তারা। মাহমুদের ঘরটায় বরযাত্রীদের এনে বসানো হবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে, ওর বইপত্র আর কাগজগুলো মায়ের খাটের নিচে একটা চাটাই বিছিয়ে তার ওপর রেখে এসেছে মাহমুদ। কুয়ো থেকে পানি তুলে এনে নিজ হাতে ঘরটা ধুয়ে-মুছে দিয়েছে সে। লিলি এসেছে। সেলিনাও এসেছে আজ। ওকে নিজে গিয়ে আমন্ত্রণ জানাতে সাহস পায়নি মরিয়ম। চিঠি লিখে জানিয়েছে। আনিসা বেগমের মুখোমুখি হতে ভয় ওর। সেলিনাকে দেখে বেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো। মনসুর ভাই-এর সঙ্গে মরিয়ম আপার বিয়ে আনন্দ যেন উপছে পড়ছে ওর চোখেমুখে। মা আসতে নিষেধ করেছিলেন। তবু চুপি চুপি চলে এসেছে সেলিনা। ওরা সব মরিয়মের ঘরে, ঘিরে বসেছে ওকে। গল্প করছে, হাসছে, কৌতুকে ফেটে পড়ছে মাঝে মাঝে।

হাসমত আলী পাকঘরে গিয়ে একবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এলেন দুপুরের মধ্যে সবকিছু তৈরি হওয়া চাই। অপরাহ্নে বর আসবে। মাহমুদ সব আয়োজন শেষ করে ফরাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে বিড়ি ধরালো একটা। অন্য ঘরে আত্মীয়-স্বজনেরা এসে ভিড় জমালেও এখানে সকলকে আসতে নিষেধ করেছে ও। চিৎকারে মাথা ধরে ওর।

লিলি উঁকি মেরে চলে যাচ্ছিলো।

মাহমুদ ডাকলো ওকে, 'শুনুন।'

লিলি ফিরে এসে বললো, 'আমায় ডেকেছেন?' সারা গায়ে ঘাম ঝরছে তার। শাড়ির আঁচল দিয়ে বার বার মুখ মুছছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ বললো, 'ওখানে হৈ হট্টগোলের মধ্যে যদি আপনাদের ভালো না লাগে, এখানে এসে বসতে পারেন। আমি বাইরে বেরুচ্ছি।

লিলি মৃদু হেসে বললো, 'ধন্যবাদ।'

মরিয়ম আর সেলিনাকে নিয়ে এ ঘরে দরজায় খিল এঁটে দিলো লিলি। 'বাব্বাঃ গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। ফরাসের উপর শুয়ে শাড়ির আঁচলে গায়ে বাতাস দিতে লাগলো ওরা।

হাসিনা কড়া নাড়ছিলো।

প্রথমে কেউ সাড়া দিলো না। পরে সে যখন দরজার উপর দুমদাম শব্দে কিল চাপড় দিতে লাগলো তখন উঠে দরজাটা খুলে দিলো সেলিনা।

ভেতরে এসে হাসিনা বললো, 'এখানে শুয়ে শুয়ে কি করছো তোমরা, আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান।' দরজায় খিল এঁটে ওদের পাশে শুয়ে পড়লো সে। লিলি বললো, 'বিয়ের পর আমাদের ভুলে যাবে না তো ম্যারি।'

মরিয়ম হাসলো। কিছু বললো না।

সেলিনা ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞেস করলো, 'বিয়ের পর আমাকে আর পড়াতে যাবে না তুমি, তাই না আপা?'

মরিয়ম ওর চুলে সিঁথি কেটে দিয়ে বললো, 'যেতাম, কিন্তু তোমার মা যে আর ও বাড়িতে ঢুকতে দেবে না আমায় সেলিনা।'

আপার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলো সেলিনা। তারপর বললো, 'আচ্ছা আপা, মা তোমার বিয়ের খবর শুনে অমন রেগে গেছেন কেন?' বারবার শুধু গালাগাল দিচ্ছিলেন তোমাকে। আমাকেও। হাসিনা পরক্ষণে বললো, 'আপনার মায়ের ভীমরতি হয়েছে।'

মায়ের সম্পর্কে কটু মন্তব্য শুনে মুখখানা কালো হয়ে গেলো সেলিনার। মরিয়ম ধমকের সুরে বললো, 'বাজে বকো না হাসিনা, এখান থেকে যাও।' হাসিনা পাশ ফিরে শুলো।

বাইরে বিয়েবাড়ির হাঁক-ডাক, হৈ-হুল্লোড় আর ধুপধাপ শব্দ এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে। পাড়ার প্রবীণেরা বাইরে দাওয়ায় বসে সুখ্যাতি গাইছে বরের। হাসমত আলীর কপাল, নইলে, অমন বড়লোক বর ক'জনের ভাগ্যে জোটে।

লিলি মুখখানা মরিয়মের মুখের কাছে বাড়িয়ে এনে, ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'কার কথা ভাবছিস ম্যারি, বরের কথা বুঝি?'

'ধ্যাৎ' লজ্জায় লাল হয়ে গেলো মরিয়ম। কপট অভিমানে মুখখানা অন্য দিকে সরিয়ে নিলো সে।

দুপুরে, যথা সময়ে বরযাত্রীরা এলো।

গলির মাথায় একসার মোটর থামিয়ে, নোংরা আবর্জনা পেরিয়ে আসতে বেশ কষ্ট হলো ওদের।

ঘরে পাখা নেই, গরমে হাঁসফাঁস করলো তারা।

কলকল শব্দে কথা বললো।

খেলো।

পান চিবোল।

বিয়েটা নির্বিঘ্নে হয়ে গেলো মরিয়মের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যা সম্প্রদানের সময় হু হু করে কেঁদে দিলেন হাসমত আলী। 'সুখী হও মা, সুখে থেকো।'

সালেহা বিবি আঁচলে মুখ মুছলেন, কুয়োতলায় বসে ডুকরে কাঁদলেন। পাড়ার বয়স্কা মহিলারা সান্ত্বনা দিলেন তাঁকে।

'এ সময়ে কাঁদতে নেই বউ। সব মেয়ে কি চিরকাল বাপের বাড়ি থাকে?'

হাসিনার চোখেও অশ্রু। কান্না লুকোতে গিয়ে দরজার আড়ালে মুখ লুকালো সে।

মাহমুদ নির্বাক। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে সে শুধু নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো, কেমন করে একটি মেয়ের জীবন এক ছেলের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেলো এক মুহূর্তে।

রাতের প্রথম প্রহরে কনে নিয়ে চলে গেলো ওরা।

সঙ্গে খোকন গেলো। তসলিম গেলো। কয়েকজন নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও গেলো কন্যাপক্ষ হয়ে।

মাহমুদকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলো সকলে, ও গেলো না। ফরাসের উপর চুপচাপ শুয়ে রইলো সে।

মেহমান অতিথি যারা এসেছিলো তারা বিদায় নিয়ে গেছে অনেক আগে। সেলিনা চলে গেছে। পাড়ার বউ ঝিয়েরাও। লিলিকে যেতে দেয় নি হাসিনা। বলেছে, 'আজ রাতে তুমি থাক লিলি আপা, নইলে একা ভীষণ ভয় করে আমার।'

লিলি বলেছে, 'পাগল, বাসায় না গেলে বকবে সবাই।'

সালেহা বিবি বলেছেন, 'যাবে আর কি, আরো কিছুক্ষণ থেকে যাও না, রাতে খেয়ে যেয়ো।'

লিলি গেলো না।

পাকঘরে সবকিছু গোছাবার কাজে মাকে সহায়তা করলো হাসিনা আর লিলি।

একটু আগে যে বাড়িটা গমগম করছিলো মানুষের কোলাহলে, এখন সেখানে কবরের নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে থালাবাসনগুলো নাড়াচাড়া আর কুয়োতলায় পানি তোলার শব্দ হচ্ছে।

তন্দ্রায় দু'চোখ জড়িয়ে এসেছিলো মাহমুদের।

হাসিনার ডাকে তন্দ্রা ছুটে গেলো।

হাসিনা বললো, 'ভাইয়া খাবে এসো।'

মাহমুদ বললো, 'তুই যা আমি আসছি।' পরক্ষণে কি মনে হতে আবার বললো, 'হ্যারে, সবাই কি চলে গেছে?'

হাসিনা বললো, 'হ্যাঁ, শুধু লিলি আপা আছে।'

মায়ের ঘরে এসে মাহমুদ দেখলো বাবা কাত হয়ে শুয়ে আছেন খাটের ওপর। দুলু ঘুমোচ্ছে। খোকন মেঝেতে বসে দুলুর পুতুলগুলো নিয়ে খেলছে। আজ ওর ছুটি।

হাসিনা আর লিলি কুয়োর পাড়ে বসে গল্প করছে।

খাওয়া শেষ হলে লিলি বললো, 'এবার যাই আমি হাসি।'

সালেহা বিবি বললেন, 'এত রাতে যাবে তুমি?'

লিলি বললো, 'পারবো খালা আম্মা।'

মাহমুদকে পেয়ে সালেহা বিবি বললেন, 'তুই কি বাইরে বেরুবি আজ?'

মাহমুদ বললো, 'হ্যাঁ, এখনি বেরুবো। সারাদিন তো তোমাদের বিয়ের ঝামেলায় কাটলো। এখন সারারাত জেগে প্রুফ দেখতে হবে আমায়। কিন্তু কেন বলতো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালেহা বিবি ইতস্তত করে বললেন, 'লিলি মেয়েটা একা যাচ্ছে, ওকে একটু এগিয়ে দিলে-।' কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

মাহমুদ ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে বললো, 'দিতে পারি ওর যদি আপত্তি না থাকে।'

লিলি ঢোক গিললো, কিছু বললো না।

রাতের এই প্রহরে পথঘাটগুলো বড় নির্জন হয়ে আসে। টিমটিমে বাতিজ্বলা দোকানীরা শেষ খদ্দেরের প্রত্যাশায় তখনো বসে। আশে-পাশে কোন রিক্সা নেই।

লিলি বললো, 'আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয় যেতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই।'

তারপর নীরবে দু'জনে হেঁটে চললো ওরা। কখনো আগে-পিছে। কখনো পাশাপাশি।

মাহমুদ কি যেন ভাবছিলো। হঠাৎ সে বললো। 'কি অদ্ভুত! তাই না?' লিলি চমকে তাকালো ওর দিকে 'কি?'

মাহমুদ বললো, 'এই বিয়েটা।'

লিলির কিছু বোধগম্য হলো না। অবাক হয়ে শুধালো 'বিয়েটা মানে?'

'হ্যাঁ এই বিয়েটার কথা বলছিলাম।' মাহমুদ ধীরে ধীরে বললো, 'কতগুলো লোক এলো, খেলো আর হাত তুলে মোনাজাত করলো, ব্যাস, একটা মেয়ের জীবন আরেকটা ছেলের জীবনের সঙ্গে চিরকালের জন্যে গেঁথে গেলো। এই ফার্সটা না করলেও তো চলে।' লিলি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, 'বিয়ে বুঝি ফার্স বলে মনে হয় আপনার কাছে?'

মাহমুদ মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ওর দিকে। একটা তীক্ষ্ম তীব্র দৃষ্টি। সে দৃষ্টি সব কিছু অস্বীকার করতে চায়। সারা পথ আর একটি কথাও বললো না মাহমুদ। লিলিকে তার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যখন প্রেসে এসে পৌঁছলো তখন রাত সোয়া এগারোটা। টেবিলের ওপর স্তূপাকার প্রুফসিটগুলো রাখা আছে। ওগুলো দেখে শেষ করতে রাত দুটো তিনটে বেজে যাবে। তারপর বাসায় ফিরবে না মাহমুদ। লম্বা টেবিলটার ওপর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেবে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে চেয়ারটা টেনে বসে পড়লো মাহমুদ।

পরদিন ভোরে 'বিশ্রামাগারে' যখন এলো সে, তখন চোখজোড়া ভয়ানক জ্বালা করছে।

রেস্তোঁরায় আর কোন খদ্দের আসেনি এখনো। খোদাবক্স টেবিল চেয়ারগুলো সাজাচ্ছে আর চাকর ছোঁড়াটা আগুন দিচ্ছে চুলোয়। ওকে আসতে দেখে খোদাবক্স বললো, 'ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, আপনাকে যেন বড় কাহিল কাহিল মনে হচ্ছে আজ?'

মাহমুদ একখানা চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লো 'ইয়ে হয়েছে এক কাপ কড়া চা বানিয়ে দাও জলদি করে। থাকলে চায়ের সঙ্গে একটা টোষ্ট দিও।'

ছেলেটা পাখা এনে জোরে বাতাস করতে লাগলো চুলোয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে উপরে, ধীরে ধীরে আগুনের শিখাগুলো উঁকি মারলো। কালো চায়ের কেটলিটা চুলোর উপর তুলে দিলো সে। টেবিল চেয়ারগুলো ঠিকভাবে সাজানো হয়েছে কি না দেখে নিয়ে খোদাবক্স বললো, 'আজ বুঝি নাইট ডিউটি ছিলো?' খোদাবক্স জানতো না যে মাহমুদ ও চাকরিটা অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছে।

মাহমুদ টেবিলের উপর মাথা রেখে বললো, 'তোমার মাথা, চাকরি আমি কবে ছেড়ে দিয়েছি।'

খোদাবক্স অবাক হয়ে বললো 'কই কিছু বলেন নি তো আপনি?'

'তোমাকে সব কিছু বলতে হবে নাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধমক খেয়ে চুপ করে গেলো খোদাবক্স, তাড়াতাড়ি চা বানিয়ে দেবার জন্যে ছেলেটাকে তাড়া দিলো। তারপর দু'ঠোঁটে হাসি টেনে আবার বললো, 'আপনার বন্ধু নঈমের একটা চাকরি হয়েছে, শুনেছেন কি মাহমুদ সাহেব?'

'শুনি নি, এই শুনলাম।' 'দু'বাহুর আড়ালে মুখ লুকালো মাহমুদ।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন খদ্দের এসেছিলো, তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলো খোদাবক্স। খাতাপত্র দেখে কি যেন হিসেব করলো। ড্রয়ারটা খুলে খুচরো পয়সাগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর আবার বললো, 'ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, শুনলাম আপনার বোনের বিয়ে হয়েছে কাল?'

এক চুমুক চা খেয়ে মাহমুদ বললো 'তুমি জানলে কোথা থেকে?'

খোদাবক্স ইতস্তত করে জবাব দিলো, না কাল আপনি আসেন নি কিনা, ওরা সবাই আলোচনা করছিলো।'

'হুঁ।' কাপটা পিরিচের উপর থেকে আবার তুলে নিলো মাহমুদ।

খোদাবক্স মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, 'ইয়ে হয়েছে মাহমুদ সাহেব, শুনলাম ছেলের নাকি গাড়ি আছে।'

'হু।'

'তাহলে তো আপনার আর কোন চিন্তা নেই মাহমুদ সাহেব, এবার একটা চাকরি নিশ্চয় পাবেন।' গদগদ গলায় বললো খোদাবক্স।

একটা টোষ্ট আর এক কাপ চা লিখে রাখুন।

মাহমুদ উঠে দাঁড়ালো। বেরুতে যাবে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো রফিক। 'এই যে মাহমুদ, তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলাম। তুমি কি চলে যাচ্ছো নাকি? একটু বসো প্লিজ বসো, একটু। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে আমার।'

মাহমুদ বললো, 'পরে বলো এখন ভালো লাগছে না আমার, বাসায় যাবো। 'একটু বসে যাও, এই একটু।' ওর গলায় করুণ আকুতি। প্রেমে পড়ার পর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।

মাহমুদ বসলো।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসলো রফিক। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, 'এবার তুমি নিশ্চয় হতাশ করবে না আমায়, মাহমুদ।'

মাহমুদ বললো, 'খোলাসা করে বলো, কিছু বুঝতে পারলাম না।'

'তোমার বোনের বিয়ের খবর আমরা পেয়েছি মাহমুদ। যদিও তুমি কিছুই জানাও নি।'

মাহমুদ জবাব দিলো, 'আমার বোনের বিয়েতে তোমাদের কিছু জানাবার ছিলো বলে তো মনে হয় না।'

'না না, আমি সে কথা বলছি না।' লজ্জা পেয়ে রফিক পরক্ষণে বললো, 'তুমি অল্পতেই সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ো। আমি বলছিলাম কি তোমার ভগ্নিপতির হাতে অনেক চাকরি আছে শুনেছি। তুমি যদি আমার হয়ে তাঁকে একটু বলো; কিম্বা তাকে চিঠি লিখে দাও।'

'ও এই ব্যাপার।' মুখখানা কালো হয়ে গেলো মাহমুদের।

আমার জন্যে অন্তত এইটুকু তুমি করো মাহমুদ। নইলে মেয়েটির ওরা বিয়ে দিয়ে ফেলবে অন্য কোথাও।' মনে হচ্ছিলো সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। ডুকরে গড়িয়ে পড়বে ওর পায়ের ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। তারপর মৃদু গলায় বললো, 'তার চেয়ে একখানা ছুরি নিয়ে আমার গলাটা কেন কেটে দাও না বন্ধু?'

'তোমার কি আমার জন্যে এতটুকু অনুভূতি নেই মাহমুদ?'

'নেই।'

'মেয়েটির কথাও কি তুমি একটু ভাবছো না?'

'না।'

'তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি?' এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললো রফিক।

'হ্যাঁ আমি পাথর দিয়ে তৈরি।' ছুটে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ। ওর জল ছলছল চোখজোড়া আর সহ্য হচ্ছিলো না মাহমুদের।

বাসায় এসে লম্বা একটা ঘুম দিলো মাহমুদ।

ঘুম যখন ভাঙলো দুপুর গড়িয়ে গেছে।

কুয়োতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে গায়ে পানি ঢেলে স্নান করলো সে।

বাসায় এখন মা আর দুলু ছাড়া কেউ নেই। বাবা অফিসে, হাসিনা স্কুলে, খোকন মরিয়মের সঙ্গে গেছে।

স্নান সেরে আসতে সালেহা বিবিও এলেন পিছু পিছু। মাহমুদ বুঝলো মা কিছু বলতে চান। চুলে চিরুনি বুলিয়ে নিয়ে সে তাকালো মায়ের দিকে 'কিছু বলবে কি মা?'

মা বললেন, 'মরিয়ম নেই, বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।'

মাহমুদ কোন মন্তব্য করলো না দেখে ক্ষণকাল পরে আবার বললেন তিনি, 'তুই একটা বিয়ে কর মাহমুদ।' এ কথাটা বলতেই বোধ হয় এসেছিলেন সালেহা বিবি।

মৃদু হাসলো মাহমুদ।

'হাঁসছিস কেন?' মা অবাক হয়ে বললেন, 'বয়স কি কম হয়েছে তোর?'

মাহমুদ হাসি থামিয়ে বললো, 'বিয়ে করে আরেকটা ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি মা?'

'ঝামেলা হতে যাবে কেন?' মা জবাব দিলেন, 'বউ আনলে লক্ষ্মী আসবে ঘরে।'

মাহমুদ ভ্রূ বাঁকিয়ে বললো, 'খাওয়াবে কি?'

সালেহা বিবি বললো, 'কেন আমরা কি উপোস থাকি?'

অনেক জোড়াতালি দেয়া, মায়ের পরনের শাড়িটার দিকে চোখ নামিয়ে এনে আস্তে করে বললো, 'যেভাবে আমরা থাকি, সেভাবে মানুষ থাকে না মা। কি দরকার আরেকটা নিরীহ মেয়েকে অমানুষ বানিয়ে?'

নিজের শতচ্ছিন্ন শাড়িটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন সালেহা বিবি।

আমেনার শাড়িটাও অজস্র ছেঁড়া আর তালিতে ভরা।

সেও মা। তারও ছেলেমেয়ে আছে। স্বামী আছে।

তবু সালেহা বিবির সঙ্গে কোথায় যেন একটা ব্যতিক্রম রয়েছে ওর। চৌকির এক কোণে বসে নীরবে আমেনাকে দেখছিলো আর ভাবছিলো মাহমুদ।

ঘরটা ঝাঁট দিয়ে, টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলো গোছাচ্ছিলো আমেনা। মুখ তুলে বললো, 'প্রেস বিক্রি করে দেবে দাও। বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করো কেন? আমি করবো না বললেই কি আর রেহাই পাওয়া যাবে।' কথাগুলো শাহাদাতকে উদ্দেশ্যে করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদের মুখোমুখি একবার টুলের ওপর বসে ছিলো সে। নড়েচড়ে একবার মাহমুদ আরেকবার আমেনার দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'তাই বলে তোমার বুঝি কোন মতামত থাকবে না?'

অমেনার মতামত ছাড়া শাহাদাত কিছু করে না তা নয়।

এ ক্ষেত্রে আমেনার মতামত চাওয়ার মধ্যে একটা সুপ্ত ইচ্ছে লুকিয়ে রয়েছে, সেটা জানতো মাহমুদ।

আমেনার বড় তিন ভাই বেশ রোজগার করছে ইদানীং। ধানমণ্ডিতে বাড়ি করেছে ওরা। গাড়িও কিনেছে একখানা। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা বেশ সুখে আছে। আমেনা ইচ্ছে করলে এ দুঃসময়ে হাত পাততে পারে ওদের কাছে। রক্তের ভাই, সহজে না করবে না। প্রেসটাকেও তাহলে বিক্রির হাত থেকে বাঁচানো যাবে। কিন্তু, প্রস্তাবটা সরাসরি মুখ ফুটে বলতে ভয় পায় শাহাদাত।

আমেনার স্বভাবটা ওর অজানা নয়।

আমেনা কিছুক্ষণ পরে বললো, 'আমার মতামত আবার নতুন করে কি দিবো। চালাতে না পারলে বিক্রি করে দাও।'

শাহাদাত বললো, 'তারপর চলবে কেমন করে?'

আমেনা গম্ভীর হয়ে বললো, 'আর পাঁচজন যেমন করে চলে।' বলে বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলো আমেনা।

এতক্ষণে মাহমুদ একটি কথাও বলে নি।

সে ভেবেছিলো, মায়ের সঙ্গে আমেনার ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে ওর সঙ্গে রয়েছে একটা আশ্চর্য মিল। না তা নয়। আমেনাকে ওর নিজের চেয়ে বড় মনে হলো আজ।

শাহাদাত মৃদু গলায় বললো, 'দেখলে তো, কি যে স্বভাব পেয়েছে ও বুঝি না। দূরের কেউ তো নয়, আপন মায়ের পেটের ভাই, দরকার পড়েছে তাই হাত পাতবে। ভিক্ষে তো চাইছি না, ধার চাইছি। এতে অসম্মানের কি হলো?'

মাহমুদ চুপ করে রইলো।

ওকে নীরব থাকতে দেখে শাহাদাত আবার বললো, 'আরে ভাই, ওদের হচ্ছে হারামীর টাকা। কন্ট্রাকটারী করে, রাস্তায় রাস্তায় রোজগার করছে। দিতে একটু গায়ে লাগবে না।'

মাহমুদ আস্তে করে বললো, 'ওই হারামী টাকাগুলো এনে তোমার অনেক শ্রমে গড়া প্রেসটাকে কলুষিত করো না শাহাদাত। তারচে বিক্রি করে দাও ওটা।'

ওর কাছ থেকে কোন রকম সমর্থন না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লো শাহাদাত। সবার ইচ্ছে প্রেসটা বিক্রি করে দেয়। কিন্তু বিক্রির কথা ভাবতে গিয়ে নিজের মন থেকে সত্যিকার কোন সাড়া পায় না সে। বুকটা ব্যথায় চিনচিন করে ওঠে। কত কষ্টে গড়া ওই প্রেস। বার কয়েক উসখুস করে ধরা গলায় হঠাৎ শাহাদাত বললো, 'তোমরা কি আমার কথা একবার ভাবো না? ওই প্রেসটার পেছনে সর্বস্ব দিয়েছি আমি, ওটাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে কি করে বাঁচবো, বলো।'

মাহমুদ নীরব।

পর পর কয়েকটা লম্বা শ্বাস নিলো শাহাদাত। তারপর অনেকক্ষণ অভিমানেভরা কণ্ঠে বললো, 'ঠিক আছে, তাই হবে' বলে চুপ করে গেলো সে।

এ সময়ে আবার এ ঘরে এলো আমেনা।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়মের বিয়ে প্রসঙ্গে মাহমুদকে দু'চারটে প্রশ্ন করলো সে। কোথায় বিয়ে হয়েছে, ছেলে দেখতে শুনতে কেমন, কি করে?

পানদানটা সামনে রেখে একটা পান বানিয়ে খেলো আমেনা। তারপর আবার সে গেলো।

অনেকক্ষণ পর মাহমুদ বললো, 'প্রেসটা বিক্রি করে দেবার পর কি করবে? চাকরি-বাকরি।'

কথাটা শেষ করতে পারলো না । শাহাদাত বাধা দিয়ে বললো, 'কি যে বলো তুমি? আমি চাকরি করবো? আমেনা তাহলে গলায় দড়ি দেবে।' বলে হেসে উঠলো সে। হাসতে গিয়ে চিবুকে অনেকগুলো ভাঁজ পড়লো তার।

মাহমুদ কিছু বলবে ভাবছিলো।

আমেনা আবার এলো সেখানে, 'কি হলো, অমন হাসছো যে।' বলতে গিয়ে খুকখুক্ করে বার কয়েক কাশলো সে।

আবার কাশলো।

শাহাদাত শঙ্কিত চোখে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'তোমার কাশটা দেখছি আরো বাড়লো।'

আমেনা পরক্ষণে বললো, 'না কিছু না।'

শাহাদাত বললো, 'কিছু না নয়, তুমি ভীষণ ঠাণ্ডা লাগাও আজকাল।' এ কথার কোন জবাব দিলো না আমেনা। খানিকক্ষণ কেশে নিয়ে ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসলো সে।

ওদের এই দাম্পত্য আলাপের মাঝখানে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো মাহমুদ। কাল বিকেলে এতক্ষণে বর এসে গেছে মরিয়মের। আজ সে শ্বশুরবাড়ি। সঙ্গে খোকনও আছে।

হাসিনা ফিরেছে স্কুল থেকে।

বাসায় এখন বাবা, মা, দুলু আর সে হয়তো বসে বসে বিয়ের গল্প করছে। কাল স্বামীসহ আবার ফিরে আসবে মরিয়ম। হাসিনার ঘরে ওদের থাকার বন্দোবস্ত করা হবে। হাসিনা থাকবে মায়ের সঙ্গে। আর বাবার জন্যে মাহমুদের ঘরে একটা নতুন বিছানা পাতা হবে।

মা হয়তো এতক্ষণে সে বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন বাসায় সবার সঙ্গে।

মাহমুদ উঠে দাঁড়ালো।

শাহাদাত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'ওকি উঠলে কেন?'

মাহমুদ আস্তে করে বললো, 'না, এবার যাই।'

'যাবে আর কি বস না।'

'না, আর বসবো না।'

'কোথায় যাবে?' টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা হাই তুললো শাহাদাত। মাহমুদ বললো, 'প্রেসে, দেখি কোন কাজ আছে কি না।। শরীরটা আজ বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যাবো।

আমেনা পেছন থেকে শুধালো, 'মরিয়ম ফিরছে কখন?'

মাহমুদ সংক্ষেপে বললো, 'কাল।'

আমেনা বললো, 'আবার এসো তুমি, খাওয়ার দাওয়াত রইলো।' মাহমুদ আস্তে বললো, 'আসবো।' তারপর শাহাদাতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে এলো সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকিয়ে অবাক হলো মরিয়ম। বিয়ের পর তিনটে মাস কেটে গেছে। দিনগুলো যেন বাদাম তোলা নৌকোর মতো দেখতে না দেখতে চলে গেলো।

প্রথম প্রথম মনসুর তো ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলো। সারাদিন ঘরে থাকতো। সারাক্ষণ মরিয়মের পাশে।

মরিয়ম রাগ করে বলতো 'ব্যবসাটা কি ডোবাবে নাকি?'

মনসুর বলতো, 'তোমার জন্যে ডোবে যদি ডুবুক। ক্ষতি নেই।' রোজ বিকেলে সাজ-পোশাক পরে, চকোলেট রঙের গাড়িতে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে ওরা। যেখানে যেতে চেয়েছে মরিয়ম, সেখানে নিয়ে গেছে মনসুর। মাঝে বারকয়েক বাবার বাড়িতেও এসেছিলো মরিয়ম। দিন দু'তিনেক করে থেকে গেছে।

আরো থাকতো। মনসুরের পীড়াপীড়িতে থাকতে পারে নি।

নিজের স্বচ্ছল জীবনের পাশে বাবা মা-ভাইবোনের দীনতা মনে আঘাত দিয়েছে মরিয়মকে। যখন যা পেরেছে, টাকা-পয়সা দিয়ে ওদের সাহায্য করছে সে। মনসুর কথা দিয়েছে, একটা ভালো বাড়ি দেখে সেখানে নিয়ে আসবে ওদের। ভাড়াটাও নিজেই দেবে, আর হাসিনা ও খোকনের পড়ার খরচটা চালাবে মনসুর। শুনে প্রসন্ন হয়েছে মরিয়ম। মা-বাবারও খুশির অন্ত নেই। যখন হাত পেতেছেন কিছু না কিছু পেয়েছেন মনসুরের কাছে।

জীবনটা বেশ চলছিলো।

কিন্তু দু'মাস না যেতে, অকস্মাৎ একদিন প্রথম জোয়ারের উচ্ছ্বাসে ভাটা এলো।

খাওয়ার টেবিলে সেদিন বড় উন্মনা মনে হচ্ছিল মনসুরকে। শোবার ঘরে এসে প্রথম বললো, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ম্যারি উত্তর দেবে?'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে মরিয়ম জবাব দিলো, 'কি কথা, বলো।'

'জাহেদ নামে কোন ছেলেকে তুমি চিনতে?' ওর দৃষ্টি মরিয়মের চোখের উপর।

বুকটা বহুদিন পর কেঁপে উঠেছে মরিয়মের। ইতস্তত করে বললো, 'চিনতাম।' মনসুরের মুখখানা কাল হয়ে এলো। ক্ষণকাল পরে সে আবার বললো, 'তার সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিলো তোমার?'

মুখখানা মাটির দিকে নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো মরিয়ম। তারপর মুখ তুলে সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে বললো সে, 'ওকে আমি ভালবাসতাম' বলতে গিয়ে একটা ঢোক গিললো মরিয়ম।

'ভালবাসতে!' যেন আর্তনাদ করে উঠল মনসুর।

মরিয়ম আস্তে করে বললো, 'হ্যাঁ।'

মাথার উপরের পাখাটা আরো জোরে ঘুরিয়ে দিয়ে মনসুর কাঁপা গলায় বললো, 'তারপর?'

মরিয়মের দেহটা পাথরের মত নিশ্চল ঠাণ্ডা। অকম্পিত গলায় সে জবাব দিলো, 'তখন আমি স্কুলে পড়ি। বাবা হঠাৎ পড়া বন্ধ করে দিয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেললেন আমার। জাহেদকে আমি ভালবাসতাম। আমাদের পাড়াতেই সে থাকতো। কলেজে পড়তো। সেও ভালবাসতো আমায়।' মরিয়ম থামলো, থেমে বার কয়েক ঘন ঘন শ্বাস নিলো সে। তারপর আবার বললো, 'বাবা যখন কিছুতেই বিয়ের আয়োজন বন্ধ করলেন না তখন একদিন রাতে ওর সঙ্গে পালিয়ে গেলাম আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পালিয়ে গেলে' দ্বিতীয়বার আর্তনাদ করে উঠলো মনসুর।

মরিয়ম অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। 'ঢাকা থেকে পালিয়ে চিটাগাং চলে গেলাম আমরা। জাহেদ তার মায়ের কিছু অলঙ্কার আর নগদ টাকা সঙ্গে নিয়েছিল। কথা হয়েছিল চাটগাঁ গিয়ে একটা বাসা ভাড়া নেবো আমরা। জাহেদ একটা চাকরি জোগাড় করবে।' মরিয়ম থামলো।

টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা জগ থেকে এক গ্লাস পানি খেয়ে এসে আবার বললো মনসুর, 'তারপর?'

পাখার বাতাসে কালো চুলগুলো বারবার উড়ে উড়ে পড়ছিলো মরিয়মের ফর্সা মুখের ওপর। আস্তে করে সে আবার বললো, 'ওখানে গিয়ে বাসা পাওয়া গেলো না, একটা সস্তা হোটেলে একখানা রুম ভাড়া করেছিলাম আমরা।'

'একসঙ্গে ছিলে?' ওর মুখের দিকে তাকাতে সাহস হলো না মনসুরের। মরিয়ম হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ।'

'তারপর?'পাখার নিচে ঘামতে শুরু করেছে মনসুর।

'তারপর সেখানে দু'মাস ছিলাম আমরা' মরিয়ম মৃদু গলায় বললো, 'টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছিলো, ভীষণ কষ্টে দিন কাটছিলো আমাদের। তারপর একদিন'-বলতে গিয়ে ইতস্তত করলো মরিয়ম, 'তারপর একদিন আমাকে সেখানে একা ফেলে রেখে কোথায় যেন চলে গেলো জাহেদ, আর ফিরলো না।' বলতে গিয়ে এতক্ষণে চোখজোড়া পানিতে টলমল করে উঠলো তার।

মরিয়মের কথা শেষ হয়ে গেলে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ওরা। পাখাটা ঘুরছে মাথার উপর। ঘরের মধ্যে শুধু তার বনবন শব্দ। কারো দিকে কেউ তাকালো না ওরা। কি এক নির্বিকার নীরবতায় দু'জনে ডুবে গেলো। পরস্পরের কাছাকাছি অস্তিত্বটা ধীরে ধীরে যেন দূরে সরে গেলো। মরিয়মের মনে হলো, অনেকক্ষণ পরে, বহুদূর থেকে যেন মনসুর জিজ্ঞেস করছে তাকে, 'জাহেদকে সত্যি ভালবাসতে তুমি?'

মরিয়ম মাথা নোয়ালো 'হ্যাঁ।'

'এখনো ভালবাস?' দ্বিতীয় প্রশ্ন।

মরিয়ম মাথা নাড়লো 'না।'

মনসুরের মনে হলো মিথ্যে কথা বলছে মেয়েটা।

সে রাতে আর কোন কথা হলো না।

মরিয়ম লক্ষ্য করেছে, সারারাত ঘুমোতে পারে নি লোকটা।

পরদিন সকালে, মাঝে মাঝে তাল ভঙ্গ হয়ে গেলেও আগের মত ব্যবহার করলো মনসুর। বাইরে বেরুবার সময় রোজকার মত দু'হাতে ওকে আলিঙ্গন করে মৃদু গলায় বললো, 'কাজটা সেরে আসি, কেমন?' মরিয়ম ওর মুখের কাছে মুখ এনে মিষ্টি হেসে বললো, 'এসো।'

কিন্তু দুপুরে আবার যখন ফিরে এলো মনসুর, তার মুখখানা তখন আবার ভার হয়ে গেছে। সারা মুখে চিন্তার ছায়া। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলো সে। খাওয়ার পরে, বিছানায় বিশ্রাম নেবার সময় বার কয়েক এপাশ ওপাশ করে হঠাৎ সে উঠে বসে বললো, 'তুমি আমাকে ভালবাস মরিয়ম?' গলাটা অদ্ভুত শোনালো ওর।

মরিয়ম পাশে বসেছিলো। চমকে তাকালো ওর দিকে। মৃদু হেসে জবাব দিলো, 'কেন, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর মৃদু গলায় বললো, 'না।' ক্ষণকাল চুপ থেকে আবার প্রশ্ন করলো, 'তুমি জাহেদকেও ভালবাসতে, তাই না?' তার কণ্ঠস্বরে অস্থিরতা। মরিয়ম দৃষ্টিটা ওর ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

অন্যদিন এ সময়ে বেরুতো না মনসুর, সেদিন বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় মরিয়ম জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছো'

মনসুর ইতস্তত করে দু'হাতে কাছে টেনে নিলো ওকে। তারপর বললো, 'কাজ আছে।' বিকেলে সে ফিরলো না, ফিরলো সে অনেক রাত করে। কাপড় চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

মরিয়ম জিজ্ঞেস করলো, 'খাবে না?'

সে বললো, 'মাথা ধরেছে, কিছু ভালো লাগছে না আমার।'

'কপালটা টিপে দেবো?'

'না।'

সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করেছে মনসুর।

পরদিন চায়ের টেবিলে হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, 'সত্যি করে বলতো ম্যারি, তুমি কাকে বেশি ভালবেসেছ? জাহেদকে না আমাকে?'

চায়ের কাপটা মুখের কাছে এনে নামিয়ে রাখলো মরিয়ম। এক ঝলক চা ঢলকে পড়ে গেলো পিরিচের ওপর, মৃদু স্বরে সে জবাব দিলো, 'জানি না।' ভ্রূজোড়া অদ্ভুতভাবে বাঁকালো মনসুর। তারপর আস্তে করে বললো, 'তোমার কি মনে হয়, মানুষ দু'বার প্রেমে পড়তে পারে?'

বিব্রত মরিয়ম বললো, 'পারে।'

'বাজে কথা।' চায়ের কাপটা সামনে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লো মনসুর। লম্বা সোফাটার উপর শুয়ে পড়ে দু'হাতে কপালটা চেপে ধরলো সে। আবার মাথা ধরেছে।

সেদিন বিকেলে লিলি এলো বাসায়।

ভাই আর ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাসা ছেড়ে দিয়েছে সে। শঙ্করটোলা লেনে একটা ঘর নিয়ে থাকবে বলে সে কথা মরিয়মকে জানাতে এসেছিলো লিলি। ওর ম্লান মুখ দেখে অবাক হলো সে। বললো, 'তোমার কি অসুখ করেছিলো ম্যারি?'

'কই না তো।' মরিয়ম ঘাড় নাড়লো।

লিলি বললো, 'তুমি ভীষণ শুকিয়ে গেছ।'

মরিয়ম হাসতে চেষ্টা করলো, 'তাই নাকি?'

লিলি বললো, 'হ্যাঁ।'

সেদিন অনেকক্ষণ দু'জনে গল্প করেছিলো ওরা। বাইরে ছোট লনটিতে দুটো বেতের চেয়ার বের করে মুখোমুখি বসেছিলো।'

লিলি বললো, 'হাসিনা এসেছিলো?'

মরিয়ম বললো, 'মাঝখানে দিন চারেক সে থেকে গেছে এখানে, তারপর আর আসে নি।'

'বাবা এসেছিলেন একদিন। খোকন আসে মাঝে মাঝে।'

'তোমার দাদা?'

'না।' বলতে গিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার। মাহমুদ যে আসবে না সেটা জানতো মরিয়ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো। আকাশে তারারা জ্বলে উঠেছিলো একে একে। স্নিগ্ধ বাতাস বইছে সবুজ লনের উপর দিয়ে। অন্ধকারে ওরা দু'জনে বসে। মরিয়ম ভেবেছিলো লিলিকে কিছু বলবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর সংবরণ করে রাখতে পারলো না সে। দিন কয়েক ধরে যা ঘটেছে সব খুলে বললো লিলিকে।

শুনে লিলি মন্তব্য করলো, 'তুমি এতো বোকা তাতো জানতাম না ম্যারি।'

মরিয়ম শুধালো 'কেন।'

লিলি বললো, 'সব কিছু ওভাবে খুলে বলতে গেলে কেন ওকে?

মরিয়ম বললো, 'মিথ্যে তো বলি নি।'

লিলি হাসলো, 'অত সত্যবাদী হতে নেই ম্যারি। এ সমাজে বাঁচতে হলে মিথ্যের মুখোশ পরে চলতে হয়।'

মরিয়ম অবাক হয়ে বললো, 'কেন?'

'কেন তা টের পাবে ধীরে।' জবাব দিলো লিলি।

ক্ষণকাল চুপ থেকে মরিয়ম বললো, 'মানুষ কি দু'বার প্রেমে পড়তে পারে না? একজনকে হারিয়ে সেকি আরেকজনকে ভালবাসতে পারে না?'

'পারে। দু'বার কেন দশবারও পারে।' লিলি বললো, 'কিন্তু সেটা কেউ স্বীকার করে না। যেমন আমার কথাই বল না। তুমি তো জান, দু'টি ছেলেকে ভালোবাসছিলাম আমি। একজন ছিলো খুব ভালো অভিনেতা আরেকজন ছিলো গায়ক। সেসব অতীতের কথা, তাই বলে ভবিষ্যতে আমি কাউকে ভালবাসবো না, তাতো নয়। হয়তো ভালবাসবো, কিন্তু ওদের কারো কথা আমি বলবো না তাকে।'

অন্ধকারে শব্দ করে হেসে দিলো মরিয়ম।

লিলি বললো, 'তুমি হাসছো ম্যারি। বড় সরল মেয়ে তুমি। এ সমাজের কিছুই জান না।' অনেক রাত হয়ে গেছে বলে উঠে পড়লো লিলি। একদিন তার নতুন ঘরটায় গিয়ে দেখে আসতে অনুরোধ করলো। মরিয়ম খেয়ে যাওয়ার জন্যে ধরেছিলো। লিলি জানালো, অন্য আরেকদিন এসে খাবে সে, আজ নয়।

কয়েকদিন পরে, সেটা হয় রোববার ছিলো।

বারান্দায় বসেছিলো ওরা।

মরিয়ম একটা বই পড়ছিলো আর মনসুর সেদিন ডাকে আসা কয়েকখানা চিঠি দেখছিলো বসে বসে। চিঠিগুলো পড়া শেষ হলে সে বললো, 'আচ্ছা মরিয়ম।'

মরিয়ম চোখ তুলে তাকালো।

'জাহেদের ব্যাপারে তুমি আমাকে আগে বল নি কেন?'

'তুমি জিজ্ঞেস করো নি বলে।' আবার বই-এর মধ্যে মুখ নামালো মরিয়ম। আবার মনসুরের গলা 'লুকোও নি তো?'

মরিয়ম চমকে উঠলো। বইটা বন্ধ করে রেখে সোজা ওর চোখের ওপর দৃষ্টি ফেললো সে। তারপর মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি হয়েছে বলতো?'

'না, কিছু না।' চিঠিগুলো হাতে নিয়ে ভেতরে চলে গেলো মনসুর। একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে গেলো যাবার সময়।

দু'হাতে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললো মরিয়ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের তিনটি মাসের শেষ মাসটি এমনি করে কেটেছে তার। ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে মরিয়ম ভাবছিলো দিনগুলো কেমন করে এত তাড়াতাড়ি কেটে গেলো।

আয়ার ডাকে চমক ভাঙলো তার। 'আপনার ভাই এসেছে গো, দেখুন।'

মরিয়ম তাকিয়ে দেখলো দোরগোড়ায় খোকন দাঁড়িয়ে।

ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো সে। চিবুক ধরে আদর করলো তাকে 'কিরে খোকন, স্কুলে যাসনি আজ?'

খোকন বললো, 'না। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে।'

মরিয়ম বললো, 'মা কেমন আছেরে?'

প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে মরিয়মের হাতে দিলো খোকন।

বললো, 'মা দিয়েছে এটা।'

মরিয়ম খুলে দেখলো হাসিনার হাতের লেখা। দশটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে মা। বড় দরকার। চিঠিটা পড়ে ব্লাউজের মধ্যে রেখে দিলো সে। 'দুপুরে খেয়ে যাবে তুমি, এখন বসো। তোমার দুলাভাই আসুন, তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেবো।'

বসে বসে খোকন অনেকক্ষণ এটা সেটা জিজ্ঞেস করলো মরিয়মকে।

দুলু কি তার কথা বলে? হাসিনা কেমন আছে? আর ভাইয়া? বাবার শরীর ভালতো?

তসলিম কি এখনো হাসিনাকে ছবি তোলা শেখায়?

কাল রাতে কি রান্না হয়েছিলো ওদের? সকালে কি নাস্তা করেছে সে?

খোকনকে কাছে পেয়ে বড় ভালো লাগছিলো মরিয়মের।

দুপুরে মনসুর ফিরে এলে বললো, 'দশটা টাকা দিতে পারো?'

মনসুর ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন বলতো?'

মরিয়ম কোন জবাব দেবার আগেই খোকনের দিকে চোখ পড়লো তার।

ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে সে আবার বললো, 'তোমার বাপের বাড়ি থেকে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে বুঝি?'

ওর কথা বলার ধরন দেখে ক্ষুণ্ন হলো মরিয়ম। ইতস্তত করে বললো, 'ধার চেয়েছেন, মাস এলে শোধ করে দেবেন।'

'ওসব ন্যাকামো করো কেন বলতো,' মনসুরের কণ্ঠে উষ্মা। 'এ তিন মাসে কম টাকা নেয় নি ওরা, এক পয়সা শোধ দিয়েছে?'

বলতে বলতে পকেট থেকে ব্যাগটা হাতে নিয়ে একখানা দশ টাকার নোট বের করলো সে। তারপর নোটখানা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে আবার বললো, 'দশ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে বললেই তো হয়– নাও।'

তার কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর। নোটখানা হাত থেকে উড়ে মাটিতে পড়ে গেলো। মরিয়ম পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর উপুড় হয়ে ওটা তুলে নিলো হাতে।

খোকনকে বিদায় দেবার সময়, কাছে টেনে আদর করলো মরিয়ম। তারপর কানে কানে বলে দিলো 'মাকে কিছু বলো না কেমন? আবার এলে টফি দেবো তোমায়।'

খোকন মাথা নেড়ে সায় দিলো।

এতক্ষণ কিছু বলার জন্যে উসখুস করছিলো মনসুর। ও চলে যেতে বললো 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, উত্তর দেবে? ঈষৎ লাল চোখজোড়া মেলে তাকালো সে।

ছড়ানো চুলগুলো খোঁপায় বন্ধ করতে করতে মরিয়ম বললো, 'বলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর চিন্তা করছিলো বলবে কিনা। অবশেষে বললো, 'তুমি কি আমায় সত্যি ভালবেসেছিলে না আমার টাকার প্রতিই আকর্ষণ ছিলো তোমার?'

চোখজোড়া বড় বড় করে ওর দিকে তাকালো মরিয়ম। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলো সে। 'আমরা গরীব বলে আজ এত বড় কথা বলতে পারলে তুমি। এত অবিশ্বাস যদি মনে ছিলো তবে বিয়ে করলে কেন?'

'তখন কি আমি জানতাম যে তোমার ওই দেহটা তুমি আরেকজন পুরুষের হাতে তুলে দিয়েছিলে?' তিক্ত গলায় ফেটে পড়লো মনসুর, 'সে লোকটা সারা দেহে চুমো দিয়েছে তোমার, রাক্ষসের মত ভোগ করেছে, আর তুমি দু'হাতে তাকে আলিঙ্গন করেছো, গভীর তৃপ্তিতে তার বুকে মুখ গুঁজেছ ভাবতে ঘিন্না লাগে, বমি আসে আমার,' একটুকাল দম নিয়ে সে আবার বললো, 'আমি তোমাকে কুমারী বলে জানতাম আর আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে আমাকে তুমি ঠকিয়েছ।'

'উহ্ আর না; আর বলো না, দোহাই তোমার এবার থামো। আর সহ্য হচ্ছে না আমার।' সারা দেহটা কান্নায় দুলছিলো মরিয়মের। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে দু'হাতে মুখখানা ঢেকে রাখলো সে। খোঁপাবদ্ধ চুলগুলো সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়লো কালো হয়ে।

মনুসর তখনো হাঁপাচ্ছে।

আজ দুপুরে আমেনারা চলে যাবে।

অনেক করে বলে গেছে শাহাদাত, 'কাল সময় করে একবার এসো, এইতো শেষ দিন তোমাদের শহরে। এসো কিন্তু।'

প্রেসটা বিক্রি করে দিয়েছে ওরা। ভৈরবে একটা স্টেশনারী দোকান কিনেছে। প্রেসের মালিক অবশেষে স্টেশনারী দোকানের মালিক হতে চললো। কাউন্টারে বসে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করবে শাহাদাত। তবু কারো চাকরি সে করবে না। আমেনা চায় না তার স্বামী কারো গোলামী করুক।

শুনে মাহমুদ বলেছিলো, 'দোকান দিয়েছো ভালো কথা। কিন্তু ভৈরবে কেন? ঢাকায় কিনতে পারলে না?'

'পেলে নিশ্চয় কিনতাম। জবাবে বলেছে শাহাদাত 'ওখানে সস্তায় পাওয়া গেলো তাই।' কথাটা যে সত্য নয় সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় নি মাহমুদের, ভৈরবে দোকান কেনার পেছনেও রয়েছে আমেনার অদৃশ্য ইংগিত। সে চায় না তাদের এই ক্ষয়ে ক্ষয়ে তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা সকলে দেখুক, উপভোগ করুক, বিশেষ করে তার ভাইয়েরা আর তাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা। ওদের চোখের কাছ থেকে নিজের দীনতাটুকু আড়াল করে রাখতে চায় আমেনা। ভৈরবে পরিচিত কেউ নেই। সেখানকার সকলে নতুন পরিচয়ে জানবে তাকে, জানবে দোকানীর বউ বলে। এককালে সে প্রেস মালিকের বউ ছিলো আর তার ভাইয়েরা এখনো ঢাকার রাস্তায় মোটর হাঁকিয়ে বেড়ায় এ খোঁজ কাউকে দেবে না আমেনা।

মাহমুদ এসে দেখলো জিনিসপত্রগুলো সব ইতিমধ্যে বেঁধে-ছেঁদে নিয়েছে ওরা। একটা পুরানো ট্রাঙ্ক, দু'টো সুটকেস, একটা চামড়ার, আরেকটা টিনের। তিনটে বস্তার মধ্যে টুকিটাকি মাল। কাঠের আসবাবপত্রগুলো পাড়ার একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে শাহাদাত। ওগুলো সঙ্গে নেয়া যাবে না। পথে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। ভৈরব গিয়ে, মিস্ত্রি দিয়ে নতুন করে আবার বানিয়ে নিতে হবে সব।

শাহাদাত বসে বসে একটা বস্তার মুখ সেলাই করছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেনা আঙ্গিনায় ছেলেমেয়েদের গোসল করাচ্ছে।

মাহমুদ বললো, 'আমার আসতে দেরি হয়ে গেলো, তোমরা তৈরি হয়ে আছো দেখছি।'

শাহাদাত মুখ তুলে মৃদু হাসলো। হেসে বললো, 'বসো। একটু পরে ঠেলাগাড়িওয়ালা আসবে। ট্রেনেরও বোধ হয় সময় হয়ে এলো।'

মাহমুদ বসলো।

গত সাত বছর ধরে এখানে আছে ওরা, এই বাসাতে।

আজ ছেড়ে চলে যাবে।

তারপর এ পথে হয়তো আর আসবে না মাহমুদ। এলে ওদের বাসাটার দিকে চোখ পড়লে নিশ্চয় ভীষণ খারাপ লাগবে ওর।

'মিছামিছি তুমি দোকান দিচ্ছ শাহাদাত।' মাহমুদ এক সময়ে বললো, 'একদিন সেটাও বিক্রি করে দিতে হবে।'

'কেন, কেন?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো শাহাদাত।

মাহমুদ বললো, 'সেখানেও সবাইকে ধারে জিনিসপত্র দিতে শুরু করবে তুমি। তারপর যখন কেউ আর ধার শোধ করতে চাইবে না, তখন দেখবে দোকান শূন্য। মাল নাই।'

উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো শাহাদাত।

আমেনা এলো ভেতরে।

মাহমুদ বললো, 'ওর মধ্যে অনেক পরিবর্তন তুমি এনেছো আমেনা, আর এই বিশ্রী স্বভাবটা বদলাতে পারলে না।'

'কি, কোন্ স্বভাবের কথা বলছো?' আমেনার দু'চোখে কৌতুক। মাহমুদ বললো, 'লোককে ও বিশ্বাস করে। বড় বেশি ধার দেয়।' আমেনা কোন উত্তর দেবার আগে শব্দ করে হেসে উঠলো শাহাদাত। বস্তার মুখটা ভালোভাবে বন্ধ করে দিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কার কাছে অভিযোগ করছো মাহমুদ? এ স্বভাবটা আমার ওর কাছে পাওয়া।'

আমেনা ততক্ষণে আবার বাইরে বেরিয়ে গেছে।

মাহমুদ ধীরে ধীরে বললো, 'স্বভাবটা যারই হোক, নিশ্চয় এটা খুব ভালো স্বভাব নয়। দুনিয়াটা হলো কতগুলো স্বার্থপরের আড্ডাখানা। অন্যকে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পার তুমি কিন্তু প্রয়োজনে কারো কাছ থেকে একটা কানাকড়িও পাবে না।

ম্লান হাসলো শাহাদাত। তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমার উক্তির সত্যতা নিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনে মাহমুদ। দুনিয়াটা কতকগুলো স্বার্থপরের আড্ডাখানা একথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আমি রাজী নই। আজ এই বিদায়ের মুহূর্তে আর পাঁচটা কাজ ফেলে তুমি যে এখানে এসেছো, এর পেছনে কোন স্বার্থ আছে বলতে চাও? নেই, জানি। জানি বলেই তো এখনো বেঁচে আছি। নইলে-।' বলতে গিয়ে থেমে গেলো শাহাদাত। গলাটা ধরে এসেছে ওর। চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল মুক্তোর মত চিকচিক করছে। বিব্রত মাহমুদ. বড় ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো।

স্টেশনে এসে ট্রেন ছাড়বার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মাহমুদের হাত ধরে শাহাদাত বললো, 'চিঠিপত্র লিখো মাহমুদ, আর যদি পারো একবার গিয়ে বেড়িয়ে এসো।'

মাহমুদ কিছু বলতে পারলো না। মাথা নেড়ে সায় দিলো শুধু। জানালার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে আমেনা। পাশে তার ছেলেমেয়েরা। পান খেয়ে ঠোঁট জোড়া লাল করেছে সে। কালো ছোট্ট একটা টিপ। গাড়ির আঁচলখানা খোঁপা পর্যন্ত তোলা। আজ হঠাৎ সুন্দর করে সেজেছে আমেনা। সামনে এগিয়ে গিয়ে মাহমুদ বললো, 'আবার দেখা হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেনা।' আমেনা লাল ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে বললো, 'একবার বেড়াতে এসো কিন্তু, নেমন্তন্ন রইলো।'

মাহমুদ আস্তে করে বললো, 'আসবো।'

একটু পরে ট্রেন ছেড়ে দিলো। ওদের মুখগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো চোখের আড়ালে!

খবরটা খোদাবক্সের কাছ থেকে পেয়েছিলো মাহমুদ।

একটা কনট্রাক্টরের সঙ্গে কাজে লেগে গেছে রফিক।

সকাল থেকে সন্ধ্যা মজুরদের সঙ্গে বসে বসে ওদের কাজ তদারক করা। কতদূর কাজ হলো দেখা। হিসেব নেয়া। আর কেউ কাজ না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তাকে ধমকিয়ে কাজ আদায় করা। খোদাবক্স বলেছিলো, 'ওর ইচ্ছে ছিলো, লেখাপড়া জানা মানুষ, লেখাপড়ার চাকরি করবে। তা বেকার বসে থাকার চেয়ে এটাও মন্দ কিসের, কি বলেন মাহমুদ সাহেব?'

মাহমুদ সায় দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, অফিসের কেরানীগিরি করার চেয়ে এ চাকরি ঢের ভালো।'

তারপর থেকে বেশ ক'দিন আর রফিকের দেখা পাওয়া যায় নি। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে ও। রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে এখন।

আজ বিশ্রামাগারে আসার পথে ওর কথা ভাবছিলো মাহমুদ। হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। দেখা হলে বিয়ের কতদূর কি করলো জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু বিশ্রামাগার পর্যন্ত আসতে হলো না। পথেই দেখা হয়ে গেলো, গায়ে আধ ময়লা একটা জামা, পরনে এর চেয়েও ময়লা একটা পায়জামা। পায়ে টায়ারের স্যান্ডেল। কাজ শেষে ফিরছে সে।

দেখা হতে একগাল হেসে বললো, 'মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলাম মাহমুদ।'

'আমার কথা তুমি ইদানীং বড় বেশি ভাবছো।' মাহমুদ জবাব দিলো পরক্ষণে। পথ চলতে চলতে রফিক আবার বললো, 'তুমি ইচ্ছে করলে আমার একটা ভালো চাকরি নিয়ে দিতে পারতে মাহমুদ। যাকগে, চাকরি একটা জুটিয়েছি। মন্দ না, ভালোই।'

টেলিগ্রামের তারে বসে একটা কাক কা-কা শব্দে ডাকছে একটানা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে মাহমুদ বললো, 'তুমি চাকরি চেয়েছিলে, একটা পেয়েছো আবার কি?'

রফিক বললো, 'এবার ওকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবো আমি। তোমরা দেখো, আমি খুব সুখী হবো।' বলতে গিয়ে মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, 'তুমি বিয়ে করছো না কেন? চলার পথে হোঁচট খেলো মাহমুদ 'হঠাৎ আমার সম্পর্কটি ভাবতে শুরু করছো কেন? নিজের কথা ভাবো।'

রফিক চুপসে গেলো।

খানিকক্ষণ নীরবে পথ হাঁটলো ওরা।

নীরবতা ভেঙ্গে রফিক সহসা বললো, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিলো আমার।'

'বলো।'

'এবার তুমি আমায় হতাশ করবে না, কথা দাও।'

'অমন কথা আমি দেই নে।' মাহমুদের গলা বিরক্তিতে ভরা।

রফিক বললো, 'তাহলে আর কি লাভ।'

মাহমুদ বললো, 'না বলাই ভালো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু না বলে থাকতে পারলো না রফিক। না বলার অনেক চেষ্টা করলেও অবশেষে বলতে হলো 'শোন মাহমুদ, মেয়েদের স্কুলের লিলি মাস্টারনীর সঙ্গে শুনেছি তোমার নাকি বেশ আলাপ আছে।'

'কার কাছ থেকে শুনেছো?' ও কথাটা শেষ হবার আগেই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো মাহমুদ।

রফিক ইতস্তত করে বললো, 'কেন সবাই জানে। খোদাবক্স বলেছিলো সেদিন বিকেলে মেয়েটা নাকি স্কুল থেকে বেরিয়ে ওখানে খোঁজ করছিলো তোমায়।'

'বাজে কথা, একেবারে মিথ্যে কথা। মাহমুদ উত্তেজিত গলায় বললো, 'খোদাবক্স বানিয়ে বলেছে তোমাদের।'

'তা না হয় বলেছে।' কপালের ঘাম মুছে নিয়ে রফিক আবার বললো, 'কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে যে তোমার আলাপ আছে, তা কি সত্যি নয়?'

মাহমুদ বললো, 'হ্যাঁ, সত্যি, কিন্তু তোমার সেটা নিয়ে এতো মাথা ঘামানো কেন?'

'আছে বন্ধু, আছে, নইলে কি আর মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছি?' রফিক হেসে দিয়ে বললো। 'ভাই এবার আমার কথাটা রাখ, ভালই হবে তোমার। আজ ক'দিন ধরে ওর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। আগে দাইগুলোর হাতে হাতে চিঠি পাঠাতাম। এই দাইগুলো, বুঝলে, এক নম্বরের বজ্জাত। একটা চিঠির জন্যে দু'টো করে টাকা নিতো। সেও ভালো ছিলো, এখন নেয়াই বন্ধ করে দিয়েছে, বলে 'ডর লাগতী নোকরী চলি যায়গী।'

মাহমুদ বাধা দিয়ে বললো, 'ওসব শুনে কি হবে আমার। আমার কিছু করার থাকলে তাই বলো।'

'তাইতো বলছি মাহমুদ। তুমি বন্ধু, বন্ধুর দুঃখ বুঝবে। সলজ্জ সঙ্কোচের সঙ্গে রফিক বললো, 'তোমার সেই লিলি মাস্টারনীর হাতে যদি আমাদের চিঠিপত্রগুলো'– কথাটা শেষ করতে পারলো না রফিক।

মাহমুদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলো সে। কে যেন আলকাতরা লেপে দিয়েছে ওর চোখেমুখে। একটু পরে মৃদু গলায় সে বললো, 'ওইসব ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না, বুঝলে?'

রফিক কাতর গলায় বললো, 'তোমার কি আমার জন্যে অতটুকু অনুভূতি নেই মাহমুদ?

মাহমুদ জবাব দিলো, 'না।'

রফিক বললো, 'এই বুঝি তোমার বন্ধুত্ব?'

মাহমুদ বললো, 'হ্যাঁ।'

ততক্ষণে ওরা বিশ্রামাগারের চৌকাঠে এসে পা রেখেছে।

আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামবার আগে, শঙ্করটোলা লেনে লিলির নতুন বাসাটা খুঁজে বের করলো মরিয়ম। ওকে বাসায় পাওয়া যাবে কিনা ভাবছিলো সে। এসে দেখলো সবে বাইরে থেকে ফিরেছে লিলি ।

মুখ-হাত ধুয়ে, স্টোভে আগুন জ্বালাচ্ছে। ওকে দেখে কেতলিতে আরেক কাপ আন্দাজ পানি ঢেলে স্টোভের ওপর চড়িয়ে দিলো লিলি।

বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে।

লিলি বললো, 'ঠিক সময়ে এসে পৌছে গেলে তুমি, নইলে ভিজতে হতো।' মরিয়ম বললো, 'আরো আগে এসে পৌছুতাম, তোমার ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে দেরি হয়ে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকের উপর থেকে চায়ের কৌটোটা নামিয়ে নিয়ে লিলি বললো, 'এই একটু আগে তোমার কথা ভাবছিলাম আমি। ভাবছিলাম কাল সকালে তোমার ওখানে যাবো।' ওকে চুপ করে থাকতে দেখে লিলি আবার বললো, 'আজ দুপুরে দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো রাস্তায়।'

'তাই নাকি?' অন্যমনস্ক গলায় বললো মরিয়ম।

লিলি বললো, 'হ্যাঁ। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তিনি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে তাকিয়ে রইলো মরিয়ম।

কেটলির ঢাকনাটা তুলে এক মুঠো চায়ের পাতা ঢেলে দিয়ে লিলি আবার বললো, 'তোমার কি খবর?'

সহসা কোন জবাব দিলো না মরিয়ম।

লিলি উঠে দাঁড়িয়ে সস্নেহে একখানা হাত রাখলো ওর কাঁধের ওপর, 'ও কি এখনো আগের মত ব্যবহার করছে?'

তবু কিছু বললো না মরিয়ম। ডাগর চোখজোড়া ধীরে ধীরে জলে ভরে এলো তার। কান্না চেপে মৃদু গলায় বললো, 'আগের মত হলে ভালোই ছিলো লিলি। আজকাল সে কি আর মানুষ আছে, অমানুষ হয়ে গেছে।' বলতে গিয়ে চোখ উপচে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার।

'ওকি, কাঁদছো কেন?' হাত ধরে বিছানায় এনে ওকে বসালো লিলি। 'কেঁদে কি হবে।'

'জানি কেঁদে কিছু হবে না।' মরিয়ম ধীরে ধীরে বললো, 'জীবনটা আমার এমন হলো কেন লিলি? এমনটি হোক, তাতো আমি চাই নি কোনদিন।'

'নিজ হাতে তুমি নিজের সুখ নষ্ট করেছো ম্যারি।' কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো লিলি।

মরিয়ম নীরবে মাটির দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'গত দু'দিন সে বাসায় আসে নি।' ওর কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি আর হতাশা।

লিলি ওর মুখের দিকে চেয়ে শুধালো 'একেবারে আসে নি?'

মরিয়ম সংক্ষেপে বললো 'না।'

স্টোভের ওপর থেকে কেটলি নামিয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিলো লিলি। তারপর তাকের ওপর থেকে দুটো চায়ের পেয়ালা আর চিনির কৌটোটা মেঝেতে নাবিয়ে রাখলো সে।

মরিয়ম বললো, 'আমি চা খাবো না লিলি।'

লিলি অবাক হয়ে শুধালো, 'কেন?'

খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলো মরিয়ম। তারপর ম্লান গলায় বললো, 'আজ দু'দিন সে বাসায় আসে নি। তুমি কি ভাবছো এ দু'দিন কিছু মুখে দিতে পেরেছি আমি?' বলতে গিয়ে কান্নায় গলাটা ভেঙ্গে এলো তার।

লিলি কি বলে ওকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেলো না। পাশে এসে বসে বিব্রত গলায় বললো, 'ওর জন্যে নিজেকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছো কেন ম্যারি?'

মরিয়ম কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে লিলির কোলে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলো। জড়ানো স্বরে বললো, 'আমি কি পাপ করেছিলাম বলতে পারো লিলি? বলতে পারো আমার কপালটা এমন হলো কেন?'

কেটলিটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। ওর কারো চা খাওয়া হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসায় ফিরার কিছুক্ষণ পরেই, দোরগোড়ায় মনসুরের পায়ের শব্দে চমকে উঠলো মরিয়ম। আনন্দ ও আতঙ্ক দুটোই এসে এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো তাকে। ওকে দেখে মনসুর বিস্ময়ের ভান করলো। 'তুমি এখনো আছো?' অদ্ভুত ভাবে ভ্রূজোড়া বাঁকালো সে।

'না থাকলেই কি তুমি খুশি হতে?' গলাটা কাঁপছিলো মরিয়মের। ঘরের মাঝখানে টিপয়টার চারপাশে সাজানো সোফার উপর বসে অকম্পিত স্বরে মনসুর জবাব দিলো, 'এ সহজ কথাটা কি আর বোঝ না তুমি?'

ওর প্রতিটি কথা তীরের ফলার মত এসে বিঁধলো তার বুকে। ওর মুখের উপর থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো মরিয়ম। যে মুখে অত বড় কথা উচ্চারণ করেছে মনসুর, সে মুখের দিকে একটিবারও আর ফিরে তাকাবে না সে। তবু তাকাতে হলো।

তবু ওর পাশে এসে দাঁড়ালো মরিয়ম। হাঁটু গেড়ে বসে আশ্চর্য কোমল গলায় শুধালো 'আমি চলে গেলে সত্যি খুশি হবে তুমি?' মনসুর উঠে দাঁড়িয়ে অন্য সোফায় গিয়ে বসলো। তারপর জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বিকৃত কণ্ঠে বললো, 'সত্যি তোমার লজ্জা শরম বলতে কিছু নেই?'

অকস্মাৎ কোন জবাব দিতে পারলো না মরিয়ম। সারা মুখ আরো ম্লান হয়ে এলো তার। নীরবে, মেঝেতে বিছানা কার্পেটের ওপর হিজিবিজি কাটতে কাটতে অবশেষে আস্তে করে বললো, 'তাহলে তাই হবে, তুমি যা চাও তাই করবো আমি।'

ওর কথাগুলো মনসুর শুনতে পেলো কিনা বোঝা গেলো না।

ক'দিন ধরে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

মাঝে মাঝে একটু থামে, হয়তো ঘণ্টাখানেকের জন্যে, তারপর আবার আকাশ কালো করে নেমে আসে ঝপ ঝপ শব্দে।

একটানা বৃষ্টি হলে ফাটলগুলো চুইয়ে ঘরে টপটপ পানি পড়ে। এ ঘরে সে ঘরে হেঁটে সালেহা বিবি দেখছিলেন কোথায় পানি পড়ছে। সেখানে একটি করে মাটির পাত্র বসিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি। হাসিনা বললো, 'বাড়িওয়ালাকে ডেকে ঘরটা মেরামত করে দিতে বলো না কেন?'

সালেহা বিবি বললেন, 'তোর দুলাভাই বলেছে এ মাসের মধ্যে একটা বাড়ি দেখে নিয়ে যাবে আমাদের। তাই তোর বাবা আর মেরামতের জন্যে গা লাগান নি।'

হাসিনা বললো, কবে যে এ বাড়ি থেকে যাবো, একটু ছাতেও উঠতে পারি নে।'

সালেহা বিবি পানি পড়ার জায়গাগুলো লক্ষ্য করতে করতে বললো, 'মাহমুদটার জন্যে, নইলে এতদিনে তোর দুলাভাই এখান থেকে নিয়ে যেতো আমাদের।'

হাসিন ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'ভাইয়াটা যে কি।'

কথাটা কানে গেলে নিশ্চয় একটা কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিতো মাহমুদ। এমনিতে কম হৈ চৈ করে নি সে। মাকে ডেকে নিয়ে বলেছে, 'দেখো মা, তোমার জামাইকে বড় বেশি কৃপা দেখাতে নিষেধ করো। আমরা গরিব হতে পারি, কৃপার পাত্র নই। এ পাড়ার আরো পাঁচশো পরিবার এমনি ভাঙ্গাচোরা বাড়িতে থাকে। তোমার জামাই পারবে তাদের সবার জন্য নতুন বাড়ির বন্দোবস্ত করে দিতে? আমাদের ওপর অত বদান্যতা কেন? মেয়ে বিয়ে দিয়েছ বলে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখ মাহমুদ, সব কাজে তোর এই বেয়াড়াপনা ভালো লাগে না আমার, বুঝলি?' তীব্র গলায় ওকে আক্রমণ করেছে মা, 'এক পয়সার মুরোদ নেই, মুখে শুধু বড় বড় কথা।'

আরো অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি করেছে ওরা। কিন্তু এ ধরনের তর্কের সহজে মীমাংসা হয় না। হয়ও নি।

মাহমুদের ঘরে পানি পড়ছিলো। ওর বইপত্রগুলো আর বিছানাটা এক পাশে টেনে রেখে যেখানে যেখানে পানি পড়ছিলো সেখানে একটা করে মাটির পাত্র বসিয়ে দিলেন সালেহা বিবি। একরাশ সুরকির গুঁড়ো ঝরে পড়লো ওর সামনে। সালেহা বিবি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কোত্থেকে পড়লো। তারপর চিন্তিত মুখে চলে গেলেন সেখান থেকে। সারা সকাল বৃষ্টি হলো। সারা দুপুর।

বিকেলের দিকে মেঘ সরে গিয়ে আকাশে সূর্য উঁকি দিলো। সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়লো দিগন্তে।

তসলিম এসেছিলো। তাকে নিয়ে পা টিপে টিপে ছাতে ওঠে হাসিনা। আকাশের ছবি নেবে।

তসলিমা বললো, 'তোমার ক্যামেরা কেনার কি হলো?'

হাসিনা বললো, 'দুলাভাই বলছিলেন বাজারে এখন ভালো ক্যামেরা নেই, এলে কিনে দেবেন উনি।'

'কিনে দেবেন না ছাই' ছাতে এসে তসলিম বললো, 'বাজারে কত ক্যামেরা, আমাকে টাকা দিয়ে দাও না, আমি কিনে দেবো।'

হাসিনা বললো, 'আচ্ছা'।

তসলিম গিয়ে ছাতের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো। হাসিনা চাপা গলায় চিৎকার করে উঠলো, 'ওখানে দাঁড়াবেন না, ভেঙ্গে পড়বে। এ পাশটায় আসুন।'

কার্নিশের পাশে এসে বসলো ওরা। ক্যামেরাটা খুলে, কি আকাশের ছবি নিতে হয় ওকে দেখালো তসলিম। আরো কাছে সরে ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলো হাসিনা। লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখতে পেলো আকাশটা আবার মেঘে ছেয়ে আসছে। বাতাসে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটছে তারা।

ক্যামেরা বন্ধ করে তসলিম বললো, 'বৃষ্টি আসতে পারে আবার, নিচে চলো।'

কাঁধে রাখা হাতটায় একটা জোরে চাপ দিয়ে হাসিনা বললো, 'উহ্, এখন আসবে না।'

তসলিম বললো, 'বাজি ধরো, ঠিক আসবে।'

'আসুক, আমি এখন উঠবো না।'

'কেন?'

'আমার বসে থাকতে ভালো লাগছে।'

তসলিম মুখ ফিরিয়ে তাকালো ওর দিকে। হাসিনা ফিক্ করে হাসলো একটু। তারপর আঁচল দিয়ে ঠোঁটজোড়া ঢেকে সে বসে রইলো চুপ-চাপ। বৃষ্টি এলো না। সন্ধ্যা নেমে এলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের অন্ধকার বাইরের পৃথিবী থেকে আড়াল করে নিয়ে গেলো ওদের। তসলিম বললো, 'রাত হয়ে গেছে, নিচে চলো।

'উহ্।' কাঁধের ওপর থেকে হাতটা নামিয়ে নিলো হাসিনা। অন্ধকারে একজোড়া কটাকটা চোখের দিকে নীরবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ দু'হাতে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো তসলিম। হাসিনা কোন বাধা দিলো না, শুধু অস্ফুটস্বরে কি যেন বললো, শোনা গেল না।

'হাসিনা আ'। নিচে থেকে মায়ের গলা ভেসে এলো। একবার। দু'বার তিনবার।

অপূর্ব শিহরনের দু'জনে কাঁপছিলো ওরা। বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে এলো ধীরে ধীরে। ছুটে ছাদ থেকে নেমে এলো হাসিনা।

'মা, মাগো, ওমা, দৌড়ে এসে সালেহা বিবিকে জড়িয়ে ধরলো সে, 'মা, আমায় ডেকেছে মা?'

'ওকি অমন করছিস কেন?'

জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলো হাসিনা। চোখেমুখে আবির ছড়ানো। মাকে ছেড়ে দিয়ে 'দুলু, দুলু-উ-উ। তোমার পুতুলগুলো কোথায়? চলো, দু'জনে খেলবো আমরা। কি খেলবে তুমি, পুতুল, পুতুল?'

'না, তোমার পুতুলের সঙ্গে আমার পুতুলের বিয়ে দেবো আজ।'

দুলু খুশি হলো, আপা আজ তার সঙ্গে পুতুল খেলবে।

কিন্তু খানিকক্ষণ পুতুল নিয়ে বসে আপার আর মন বসলো না। ছুটে সে রান্নাঘরে মায়ের কাছে চলে এলো 'মা, আজ কি পাক করছো মা?'

সালেহা বিবি তরকারিতে লবণ ছিটিয়ে দিয়ে বললো, 'নতুন কিছু না, রোজ যা রান্না হয়, তাই।'

'মা আমি রাঁধবো, তুমি ঘরে যাও।'

তরকারির কড়াই থেকে চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন সালেহা বিবি। রান্না ঘরের ধার যে ঘেঁষে না তার আজ হঠাৎ পাক করার শখ হলো কেন? 'থাক, তোমাকে রাঁধতে হবে না, লেখাপড়া করো গিয়ে যাও।'

'মা, আমি তোমার পাশে বসবো মা।' মায়ের পাশে এসে বসে পড়লো হাসিনা। খানিকক্ষণ পর আবার উসখুস করে উঠে গেলো সেখান থেকে। নিজের ঘরে এসে টেবিলের ওপর থেকে আয়নাটা তুলে নিয়ে বসলো সে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে নিজেকে দেখলো হাসিনা। হেসে দেখলো। মুখখানা গম্ভীর করে দেখলো। কপট রাগ করে, ঠোঁটজোড়া বাঁকিয়ে কারো সঙ্গে যেন কথা বললো সে।

হ্যারিকেনের আলোয় বসে বই-এর ওপর চোখ বুলাচ্ছিলো মাহমুদ।

'ভাইয়া কি করছো?' ওর সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে কি পড়ছে দেখলো হাসিনা, 'ভাইয়া, তুমি একটা বিয়ে করো ভাইয়া, আমাদের বুঝি ভাবী দেখতে ইচ্ছে করে না?'

'কি ব্যাপার, আমার বউ দেখার জন্যে হঠাৎ তোমার মন কেঁদে উঠলো কেন?' বইয়ের পাতার ওপর চোখ রেখে জবাব দিলো মাহমুদ 'যাও, নিজের বিয়ের কথা চিন্তা করো গিয়ে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিনার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। 'ধ্যাৎ, আমি বিয়ে করবো না।' বলে সেখান থেকে পালিয়ে এলো হাসিনা। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পা জোড়া উপরের দিকে তুলে দোলনার মত দোলাল সে। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে চোখ বুজলো। মিটিমিটি হাসলো। চোখের পাতায় একটি মুখ ভাসছে বারবার আর একটি ছবি। বালিশটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো হাসিনা।

সারারাত একটানা বৃষ্টি হলো।

সকালেও।

অপরাহ্নে তখনো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছিলো বাইরে।

হাসমত আলী অফিসে গেছেন। মাহমুদ তার প্রেসে। বৃষ্টির জন্যে, হাসিনা আর খোকন কেউ স্কুলে যায় নি আজ। সালেহা বিবি ভরে যাওয়া মাটির পাত্রগুলো থেকে পানি ফেলে দিয়ে আবার বসিয়ে দিচ্ছিলেন পুরোনো জায়গায়।

টপটপ পানি পড়ছে ফাটলগুলো থেকে চুঁইয়ে। মাঝে মাঝে সুরকির গুঁড়ো, ইটের কণা। দুয়ারে কড়া নাড়ার মৃদু শব্দ হতে, দরজা খুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো হাসিনা 'মা, মাগো, কে এসেছে দেখে যাও, মা।'

একটা চামড়ার সুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো মরিয়ম। জড়িয়ে ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে এলো হাসিনা। দুলু ছুটে এসে আঁচল ধরে দাঁড়ালো তার। মা ডেকে শুধালো, 'কে এসেছেরে হাসি?'

হাসিনা জবাব দিলো, 'আপা এসেছে।' সুটকেসটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিলো হাসিনা।

মরিয়ম দুলুকে কোলে তুলে আদর করলো।

দাদার ঘরে উঁকি মেরে মাহমুদ আছে কিনা দেখলো মরিয়ম।

হাসিনা বললো, 'সেই ভোরে বেরিয়ে গেছে।'

মায়ের খাটের ওপর এসে বসলো মরিয়ম। চারপাশে তাকিয়ে বললো, 'ইস, ভীষণ পানি পড়ছে তো?'

'কিরে, তুই একা এলি, জামাই আসেনি?' কুয়োতলা থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে বললেন সালেহা বিবি। 'জামাই এলো না কেন?'

মরিয়ম ম্লান হয়ে বললো, 'কাজের ভীষণ চাপ।'

খোকন বললো, 'আমার জন্যে টফি আনিস নি আপা!'

'এনেছি।' আশেপাশে তাকিয়ে সুটকেসটা খোঁজ করলো মরিয়ম। হাসিনা বললো, 'ওটা ওঘরে রেখে এসেছি, নিয়ে আসি।'

সুটকেস নিয়ে এলে, খুলে দু'টো টিন বের করলো মরিয়ম। বিস্কিট আর ট্রফি। বিস্কিটের টিনটা মায়ের হাতে দিয়ে সে বললো, 'এটা রেখে দাও মা। নাস্তার সময় দিও।'

মায়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মেয়ের পাশে এসে বসলেন তিনি। টফির টিনটা খুলে খোকন আর দুলুকে কয়েকটা টফি দিলো মরিয়ম। হাসিনাকেও দিলো। সালেহা বিবির হাতে একমুঠো টফি গুঁজে দিতে তিনি হেসে বললেন, 'আমায় কেন?'

মরিয়ম বললো, 'খাও মা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিনা বললো, 'মাকে মিছিমিছি দিচ্ছিস আপা। মা কি খাবে? এই রাক্ষস দু'টোর পেটে যাবে সব।' বলে তর্জনী দিয়ে দুলু আর খোকনকে দেখালো হাসিনা।

খোকন জিভ বের করে ভেংচি কাটলো।

ওকে অনুসরণ করে দুলুও জিভ বের করলো হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে। হাসিনা দাঁত মুখ খিঁচে বললো, 'আবার বের কর না, একেবারে কেটে দেবো।' একটা টফি কাগজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখে দিলেন সালেহা বিবি। বারকয়েক চুষে বললো, 'বেশ মিষ্টিতো। তুই খাচ্ছিস না কেন, একটা খা-না।' মরিয়ম সুটকেসের ডালাটা বন্ধ করলো ধীরে ধীরে। মায়ের অনুরোধ কানে গেলো না ওর।

মুঠোয় ধরে রাখা টফিগুলো আঁচলে বেঁধে রাখলেন সালেহা বিবি। হাসমত আলীকে আজ খাওয়াবেন একটা আর মাহমুদকে।

এতক্ষণে ইতিউতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ভালো করে নজরে পড়ে নি সালেহা বিবির। এবার মেয়ের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'হ্যারে মরিয়ম, তুই অমন শুকিয়ে গেছিস কেন, অসুখ করেছিলো নাকি?'

এই ভয়টাই এতক্ষণ করছিলো মরিয়ম। মায়ের চোখে কিছু এড়াবে না তা জানতো সে। গত এক মাসে শরীরটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারে মরিয়ম। দিনে রাতে অবিচ্ছিন্ন চিন্তার স্রোতে ডুবে থাকলে, আঘাতে আর যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হলে শরীর ভালো থাকার কথা নয়।

ওকে চুপ থাকতে দেখে মা আবার বললো, 'কি হয়েছিলো?'

হাসিনা বললো, 'তাইতো তোকে বড্ড রোগা লাগছে আপা।'

মরিয়ম পরক্ষণে একটা মিথ্যা কথা বললো, 'ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিলো।' ওর মুখখানা কোলে নিয়ে মা বললো, 'বেশ মেয়েতো, অসুখ করেছিলো আমাদের একটু খবর দিতে পারলি না? আমরা কি পর হয়ে গেছি তোর?' হাসিনা বললো, 'খবর পাঠালে আমি দেখতে যেতাম।'

চোখ ফেটে কান্না আসছিলো মরিয়মের। একটু কাঁদতে পারলে বোধ হয় শান্তি পেত সে। কিন্তু কেঁদে সকলকে বিব্রত করতে চায় না মরিয়ম। মায়ের কোল থেকে মাথা তুলে সে বললো, 'কাপড়টা বদলিয়ে নিই মা।'

সাঁঝরাতে আকাশ ফর্সা হয়ে তারা দেখা দিলো। একটা মেঘও আকাশে নেই এখন।

সালেহা বিবি বললো, 'তারা উঠলে কি হবে, এসময়ে আকাশকে একটুকুও বিশ্বাস নেই, দেখবে আবার ঝুপঝুপ করে নেবে আসবে একটু পরে।

হাসমত আলী বললো, 'বাড়িওয়ালার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে মিস্ত্রী পাঠাবে।'

'দু'-একদিনের কথা বলেছে তো, দেখবে দশ দিন লাগবে।' স্বামীর কথার ওপর মন্তব্য করলেন সালেহা বিবি। বলে মরিয়মের দিকে তাকালেন তিনি। সবার চোখ এ মুহূর্তে তার ওপর গিয়ে পড়েছে। কারণ মনসুর বলেছিলো একটা ভালো বাসা দেখে ওদের নিয়ে যাবে। ম্লানমুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো মরিয়ম। বাবা কিংবা মায়ের দিকে তাকাতে ভয় হলো

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর। যদি তারা সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করে। তাহলে এখন কোন জবাব দিতে পারবে না সে। মনসুর যে অনেক বদলে গেছে সে খবর তো কারো জানা নেই।

একটু পরে সেখান থেকে উঠে হাসিনার কামরায় চলে গেলো মরিয়ম। হ্যাঁরে হাসি, তসলিম এসেছিলো না, চলে গেছে?'

কি একটা কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো হাসিনা। ও আসতে কাগজটা লুকিয়ে ফেলে সে বললো, 'হ্যাঁ, চলে গেছে।'

'ওটা কিরে?'

'না কিছু না।' মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বই নিয়ে বসলো হাসিনা।

'ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করো নি? উনি এসেছেন তো।'

'তাই নাকি।' আঁচলটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আবার বেরিয়ে এলো মরিয়ম। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে, নিঃশব্দে সিগারেট টানছিলো মাহমুদ। 'ভাইয়া কেমন আছো?' মরিয়ম এসে বসলো মেঝের উপর।

'মরিয়ম যে।' পা জোড়া নাবিয়ে নিলো মাহমুদ, 'বাবার বাড়ি সফর করতে এসেছো বুঝি।'

মরিয়ম মৃদু গলায় বললো, তুমি তো একটা দিনও গেলে না।'

বার কয়েক ঘনঘন সিগারেটে টান দিলো মাহমুদ। তারপর ছাই ফেলে বললো, 'তুমি জানতে আমি যাবো না, তবু মিছে অভিমান করেছো। ভাবছো আমি বড় নির্দয়। সত্যি আমি তাই। কারো জন্যে আমার কোন অনুভূতি নেই। বাবা, মা, ভাই বোন এই যে, কতগুলো শব্দের সৃষ্টি করেছো তোমরা, একটা অর্থহীন সম্পর্ক গড়ে তুলেছো এর কোন মূল্য আছে? অন্তত আমার কাছে নেই।' সিগারেটে একটা জোরটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো মাহমুদ। তারপর আবার বললো, 'আমি তো দু'টি সম্পর্ক ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব দেখি না। ওই বড় লোকের বাচ্চাগুলো যারা মুরগির মত টাকার ওপর বসে বসে তা দিচ্ছে আর আমরা গরিবের বাচ্চারা যাদের ওরা ছোটলোক বলে। এই দুটো সত্য ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না আমার। তুমি হয়তো মনে বড় আঘাত পাচ্ছো, কিন্তু কি আর বলবো বলো, ওরা হলো আমাদের মা, বাপ আর আমরা ওদের ছা-পোষা, জীব- থাকগে কেমন আছো বলো।' সিগারেটের গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো মাহমুদ।

মরিয়ম আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে বললো, 'ভালো।' ভালো যে থাকবে তা জানতাম।' ছাদের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলে মাহমুদ। 'তোমার মত কপাল ক'জন পেয়ে থাকে। বাড়ি-গাড়ি, অর্থ সবই পেয়েছো তুমি। আর আমাদের অবস্থাটা একবার দেখো, সারাদিন খেটে এসে এমন খাদের মধ্যে শুয়ে আছি। টপটপ করে ঘরের মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে। এটা নিশ্চয়ই আরামদায়ক নয়, কি বলো?' মরিয়মকে কোন কথা না বলতে দেখে মাহমুদ আবার বললো, 'মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো, পুরুষ হয়ে না জন্মে যদি তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে হয়ে জন্মাতাম তাহলে বেশ হতো।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মাহমুদ। মরিয়ম তবু কোন কথা বলছে না দেখে আবার বললো, 'হ্যাঁ, তোমার সেই বান্ধবীটির কি খবর বলতো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়ম মুখ তুলে তাকালো, 'কার কথা বলছো?'

মাহমুদ বললো, 'সেই যে কি নাম যেন যাক-গে; বাদ দাও তার কথা, ওসব জেনে আমার কোন কাজ নেই।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বিড়ি আছে কিনা খুঁজে দেখলো সে।

সালেহা বিবি এসে খাবার জন্য ডেকে গেলেন সকলকে। ওঘর থেকে হাসিনার গলা শোনা গেলো, 'আপা খাবি চল।

মরিয়ম উঠে পড়লো, 'ভাইয়া খাবে না?'

'যাও আসছি' মাহমুদ উঠে বসলো।

রান্না ঘরটা ভিজে থাকায় শোবার ঘরে খাটের পাশে একটা মাদুর বিছিয়ে খাওয়ার আয়োজন করেছেন সালেহা বিবি। অনেকদিন পরে একসঙ্গে খেতে বসলো ওরা। দুলুকে নিয়ে হাসমত আলী বসলেন সবার ডান দিকটায়। তাঁর পাশে বসলো মাহমুদ। তারপর হাসিনা আর মরিয়ম। একেবারে বাঁ পাশটায় খোকন। সালেহা বিবি বসলেন সবার দিকে মুখ করে মাঝখানটায়। নিজে খাবেন এবং সকলকে পরিবেশন করবেন তিনি। অনেকদিন পর এক সঙ্গে খেতে বসে আনন্দের আভা জেড়ে উঠলো সবার চোখে-মুখে। সালেহা বিবি সবচেয়ে খুশি। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ানোর তৃপ্তি ও আনন্দ যে কি পরিমাণ সেটা শুধু মা-ই জানেন। তাঁদের খাওয়ার মাঝখানে আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামলো। বাইরে তাকিয়ে, হাতটা ধুয়ে নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন সালেহা বিবি।

হাসিনা বললো, 'কোথায় যাচ্ছ মা।'

সালেহা বিবি বললেন, 'আবার বৃষ্টি এলো, মাটির ভাণ্ডগুলো জায়গা মত আছে কিনা দেখে আসি, নইলে সব ভিজে যাবে।'

মরিয়ম বললো, 'খেয়ে নাও মা. এই তো বৃষ্টি এলো, অত তাড়াতাড়ি ভিজবে না।'

মাহমুদ বললো, 'ভিজলে ভিজুক, তোমাকে আবার খাওয়ার মাঝখানে উঠতে বললো কে?'

আবার বসে পড়লেন সালেহা বিবি। কিন্তু বসেও স্বস্তি পেলেন না তিনি, বারবার উপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। কোথায় পানি পড়ছে কে জানে। এক মুখ ভাত চিবোতে মাহমুদ বললো, 'বাবার সেই পুরোনো ছাতাটা আছে তো ঘরে?

সালেহা বিবি জবাব দিলেন, 'আছে, কেন?'

'আমার প্রেসে যেতে হবে।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে?

'হ্যাঁ। আজ রাতে অনেকগুলো প্রুফ দেখতে হবে আমায়, সব জমা হয়ে আছে।' সকলে একবার করে তাকালো মাহমুদের দিকে। তারপর নীরবে খেতে লাগলো।

অনেকদিন পর নিজের সেই পুরোনো বিছানায় শুয়ে আজ কেমন নতুন নতুন ঠেকছিলো মরিয়মের। হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে চুপচাপ উদ্দাম বৃষ্টির রিমঝিম গান শুনছিলো আর ভাবছিলো মনসুরের কথা। লিলি বলে, সে ভুল করেছে। হয়তো তাই। সব কিছু ওকে খুলে না বললেও হতো। তাহলে মনসুর নিশ্চয় এমন ব্যবহার করতো না তার সাথে। যেমন চলছিলো সব কিছু তেমনি চলতো। হাসি আর আনন্দের অফুরন্ত স্রোতে ভাসতো ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জনে। কিন্তু সত্যকে ঢেকে রাখার কি অর্থ হতে পারে। মরিয়ম জাহেদকে ভালোবেসেছিলো। হ্যাঁ, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো। মনসুরকেও সে তেমনি ভালবেসেছে। নিজের সকল সত্তা আর সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আপনার করে নিতে চেয়েছে। দু'টোই সত্য। মরিয়ম বুঝতে পারে না এ সত্যের সহজ স্বীকৃতিতে ভুল কোথায়। সেকি মিথ্যের মুখোশ পরলে মনসুর সন্তুষ্ট হতো? দু'বার কি মানুষ প্রেমে পড়তে পারে না? মনসুর কেন এমন হয়ে গেলো? হাসিভরা জীবনের মাঝখানে অশ্রু কেন এলো? ভাবতে গিয়ে দু'চোখ সজল হয়ে এলো মরিয়মের। ফাটল বেয়ে টপটপ পানি ঝরে পড়ছে নিচে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে এক সময় সে মনে মনে ঠিক করলো ফিরে গিয়ে মনসুরকে তার এই যন্ত্রণার কথা খুলে বলবে মরিয়ম। করজোড়ে তার কাছে পুরোনো দিনগুলো আবার ভিক্ষে চাইবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো সে। জানালা গলিয়ে আসা বাতাসে চুলগুলো উড়ছে ওর। এতক্ষণে মরিয়ম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

মেঝেতে বিছানো মাদুরটার ওপর বালিশটা বুকের নিচে দিয়ে উপুড় হয়ে পা জোড়া ছড়িয়ে দিয়েছে হাসিনা দরজার দিকে। সামনে একটা সাদা কাগজ আর কলম। হ্যারিকেনের আলোটা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে অদূরে চৌকির ওপরে শোয়া মরিয়মের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করলো হাসিনা। তসলিমের চিঠি। বিকেল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত তিন চার বার চিঠিখানা আগাগোড়া পড়েছে। তবু উত্তর দেবার আগে আরেকবার পড়ে নিলো সে। তারপর অতি যত্নসহকারে গোটা গোটা করে লিখলো হাসিনা-প্রিয়-লিখেই কেটে দিলো। কি সম্বোধন করা যেতে পারে? সে লিখেছে 'হাসি' সম্বোধন করে। বারকয়েক কাটা ছেঁড়ার পর হাসিনা লিখলো–

'তসলিম,

তুমি আমাকে অনেক অনেক ভালবাস, আমাকে ছাড়া বাঁচবে না লিখেছ। আমারও তাই মনে হয়। সেদিন বিকেল থেকে কিছু ভাল লাগছে না আমার। তোমাকে সব সময় দেখতে ইচ্ছে করে। আমার হাতের লেখা ভীষণ খারাপ। আর তোমার মত সুন্দর করে গুছিয়ে আমি লিখতে পারি না। বাবা মা কেউ-এ ব্যাপারটা জানে না। সত্যি তোমার জন্য মনটা আমার সব সময় খারাপ হয়ে থাকে। তুমি আমাকে ভালবাস, কিন্তু আমি দেখতে ভীষণ বিশ্রী। তুমি কত সুন্দর!'

এখানে এসে চোখজোড়া ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো হাসিনার। অসমাপ্ত চিঠিটা খাতার মধ্যে লুকিয়ে সেটা বালিশের তলায় রেখে দিলো সে।

হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে ঘুমের সমুদ্রে তলিয়ে গেলো হাসিনা। ঠোঁটের কোণে শুধু ছড়িয়ে রইলো এক টুকরো প্রশান্ত হাসি।

এক ঘরে বাতি নিভে গেলেও ওঘরে আলো জ্বলছিলো। হাসমত আলী আর সালেহা বিবি তখনও জেগে। টিমটিমে হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে গেলেন সালেহা বিবি। নতুন কোথাও পানি পড়ছে কিনা। দরজাটা বন্ধ না খোলা দেখে গেলেন। হাসিনার গায়ের কাপড়টা উঠে গিয়েছিলো, উপুড় হয়ে সেটা নামিয়ে দিলেন তিনি। তারপর নিজের কামরায় ফিরে এসে হ্যারিকেনটা রাখলেন মেঝের উপর। 'ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?' শোবার আয়োজন করতে করতে শুধোলেন হাসমত আলী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যা।' কুয়োতলার দিকটার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খাটের ওপর এসে বসলেন সালেহা বিবি।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে রিমঝিম। একটানা বর্ষণ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস দেয়ালের গায়ে লেগে করুণ বিলাপে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, পৃথিবীর চোখে অশ্রু ঝরছে, বিষন্ন ব্যথার চাপে?

'বাতিটা নিভিয়ে দাও। শুয়ে পড়লেন হাসমত আলী।

হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিতে অন্ধকার গ্রাস করে নিলো ঘরটা। কোথায় একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো টিকটিক শব্দে। দু'হাতে নিজের জায়গাটা হাতড়ে নিয়ে কাত হলেন সালেহা বিবি। মাঝখানে দুলু আর খোকন।

দু'পাশে ওরা দু'জন হাসমত আলী আর সালেহা বিবি।

খানিকক্ষণ পর সালেহা বিবি ডাকলেন, 'শুনছো?'

'উ।' সারা দিলেন হাসমত আলী।

'ঘুমুচ্ছো নাকি?'

'না।'

'কাল মরিয়মকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবো?'

'কোনটা?'

'মনসুর যে বলেছিলো একটা নতুন বাসায় নিয়ে যাবে আমাদের।'

'মাহমুদের সঙ্গে আলোচনা করো।'

বাইরে বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্য চলছে। ভেতরে টপটপ বৃষ্টি পড়ছে ফাটলগুলো বেয়ে। মাঝে মাঝে ভেজা সুরকির গুঁড়ো।

'শুনছো?' আবার সালেহা বিবির গলা।

'কি?'

'এ বাড়িতে থাকা আর ঠিক হবে না। আমার ভীষণ ভয় করে।'

হাসমত আলীর কাছ থেকে এবার কোন উত্তর পেলেন না সালেহা বিবি। মৃদু নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে তাঁর। একটু পরে তিনিও তন্দ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

এখন সকলে গভীর ঘুমে অচেতন।

তখনো বৃষ্টি থামে নি। ইলশেগুঁড়ির মত ঝরছে।

প্রেসের কাজ শেষ করে, দু'চোখ ঘুম নিয়ে, ভোর হবার কিছু আগে বাসার পথে ফিরে এল মাহমুদ।

গলির মাথায় তিন-চারখানা ফায়ার বিগ্রেডের লাল গাড়ি দাঁড়ানো। গলির ভেতরে আবছা অন্ধকারে লোকজন ভিড় করে আছে। ওকে দেখে চিনতে পেরে অনেকে অবাক চোখে তাকালো। দু-একজন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি বাইরে ছিলেন নাকি?'

'কোথায় ছিলেন আপনি?'

'কোত্থেকে এসেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে বুড়োরা ওকে ঘিরে দাঁড়ালো। দু'পাশের জীর্ণ দালান ভাঙ্গা জানালাগুলো দিয়ে বাড়ির ঝি-বউ-এর- উঁকি মেরে দেখলো ওকে।

প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো মাহমুদ। গলিতে এত ভিড় কেন, ফায়ার বিগ্রেডের লোকগুলোই বা এত ছুটোছুটি করছে কেন?

'আহা বেচারা।' কে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জানালার ওপাশ থেকে। 'কেউ কি বেঁচে নেই?'

সমস্ত দেহটা অজানা শঙ্কায় শিরশির করে উঠলো মাহমুদের। মনে হলো হাত-পাগুলো সব ভেঙ্গে আসছে তার। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও পাচ্ছে না সে। তবু দু'হাতে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেলো মাহমুদ। সকলে নীরবে পথ ছেড়ে দিলো তাকে। সবাই ভেবেছিলো বাসার সামনে এসে একটা তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়বে সে। কিন্তু সে আর্তনাদ করলো না, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনের ভগ্ন স্তূপটার দিকে নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মাহমুদ। বাতি হাতে ফায়ার বিগ্রেডের লোক ছুটোছুটি করছে। উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে ওরা।

পেছনের বাড়ির সরু বারান্দাটার ওপর থপ করে বসে পড়লো মাহমুদ।

মনে হলো এ মুহূর্তে অনুভূতিগুলো তার মরে গেছে। সে যেন এক শূন্যতায় ডুবে গিয়ে, ফাঁপা বেলুনের মত বাতাসে দুলছে। না, মাথাটা ঘুরছে ওর। দেহটা টলছে। কিন্তু, হৃদয়ে কোন জ্বালা নেই।

ধীরে ধীরে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

মাহমুদ তেমনি বসে।

একটা কথাও এতক্ষণে বলে নি সে। কি বলবে?

পাড়ার লোকেরা আলাপ করছিলো নিজেদের মধ্যে। মাঝরাতে একটা ভয়ংকর শব্দে জেগে উঠে হকচকিয়ে গিয়েছিলো সকলে। এমন ভয়াবহ শব্দ কোথা থেকে এলো? পরে তারা একে একে দেখতে পেলো হাসমত আলীর বাড়িটা ধ্বসে পড়েছে। ঘর ছেড়ে সকলে ছুটে বেরিয়ে এলো। কিন্তু অন্ধকারে ভাঙ্গা ইটের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নজরে এলো না কারো।

ইটের স্তূপ সরিয়ে একটা মৃতদেহ বের করে, স্ট্রেচারে তুলে এনে ওর সামনে মুহূর্ত কয়েকের জন্যে দাঁড়ালো ফায়ার বিগ্রেডের চারজন লোক। এক নজর তাকিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে চোখজোড়া অন্যদিকে সরিয়ে নিলো মাহমুদ। মাথাটা থেঁতলে গেছে মরিয়মের। কি কদাকার লাগছে এখন তাকে। মারা গেছে সে। কেন মরলো? কেনই বা সে গতকাল আসতে গিয়েছিলো এখানে। না এলে সে নিশ্চয় মরতো না। ওদের বাড়ি নিশ্চয় ধ্বসে পড়বে না এভাবে। তাহলে, মৃত্যুই কি তাকে টেনে এনেছিলো এখানে? হাসিনার মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হলো একটু পরে। গলাটা ভেঙ্গে গেছে তার। ঝুলে আছে দেহ থেকে; মাহমুদের মনে হলো ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি লেগে আছে। মেয়েটা কি হাসতে হাসতে মারা গেছে? ও বয়সে যদি মারা যেতে হলো তবে সে জন্মেছিলো কেন? আর এখন সে কোথায় আছে? মৃত্যুর পর কোথায় যায় মানুষ? কাল রাতে তাদের সকলকে দেখেছে মাহমুদ। হাসছিলো। কথা বলছিলো। হেঁটে বেড়াচ্ছিলো এ ঘর থেকে সে ঘরে। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা কোথায়? তাদের দেহগুলো এখনো দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু তারা নেই। কেন এমন হলো?

চারপাশে লোকজনের কোলাহল বেড়েছে এখন।

মানুষের ভিড়। ছেলে বুড়ো জোয়ান মরদ গিজগিজ করছে এসে।

মাহমুদ উদাস দৃষ্টি মেলে তাকালো সবার দিকে। খবর পেয়ে থানা থেকে একদল পুলিশও এসেছে।

দুলুর মৃতদেহটা স্ট্রেচারে করে সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। মাথার মগজগুলো সব বেরিয়ে গেছে ওর। সারাদেহ রক্তে চবচব করছে।

'আহা, বাচ্চাটা-।' কে যেন আফসোস করছিলো।

'বাচ্চা নয়, কুত্তার বাচ্চা। নইলে অমন করে মরতে হলো কেন?' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে উঠলো মাহমুদ। পরক্ষণে ওর মনে হলো, তাই তো সেও মারা যেতে পারতো। রাতে বাসায় থাকলে সেও মরতো আর এমনি স্ট্রেচারে করে মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়া হতো তার।

তারপর কবর দেয়া হতো আজিমপুরা গোরস্থানে। তারপর কি হতো?

কোথায় থাকতো, কোথায় যেত মাহমুদ? ভাবতে গিয়ে তার মনে হলো দেহের লোমগুলো সব খাড়া হয়ে গেছে। ঘাম দিচ্ছে সারা গায়ে।

'হাসমত আলী সাহেবের বড় ছেলে আপনি, তাই না?' সামনে একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে।

'কেন, কি চাই আপনার?' অদ্ভুত গলায় জবাব দিলো মাহমুদ।

'যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে একটা রিপোর্ট নিতে হবে।'

'কি করবেন রিপোর্ট নিয়ে?' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো মাহমুদ। 'পারবেন আজরাইলকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসে ঝোলাতে? পারবেন ওই-ওই বড়লোকের বাচ্চাগুলোকে শূলে চড়াতে? কি করবেন আপনারা রিপোর্ট নিয়ে?'

পুলিশ অফিসার হকচকিয়ে গেলেন।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বললো, 'পুলিশ লাইনের লোকগুলোর মাথায় কি গোবর পোরা থাকে নাকি মশাই? এ সময়ে তাকে জ্বালাতে গেছেন কেন? আর সময় নেই?

অল্প ক'টা কথা বলে রীতিমত হাঁপাচ্ছিলো মাহমুদ। দু'হাতে কপালটা চেপে ধরে চুপচাপ বসে রইলো সে। সারা দেহ বেয়ে ঘাম ঝরছে তার।

বিকেলে আজিমপুর গোরস্থানে কবরস্থ করা হলো মৃতদেহগুলোকে। খবর পেয়ে মনসুর এসেছিলো। বোবা হয়ে গেছে সে। সব কিছু কেমন আকস্মিক আর অস্বাভাবিক মনে হলো তার।

এতক্ষণে মাহমুদের সঙ্গে একটা কথাও হয়নি তার। দু'জনে নির্বাক। গোরস্থান থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপা গলায় বললো, 'কোথায় যাবেন এখন, ভাইজান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদ নীরবে পথ চলতে লাগলো।

পেছন থেকে এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরলো মনসুর। ঢোক গিলে বললো, 'আমার ওখানে চলুন ভাইজান।'

এতক্ষণে ওর দিকে তাকালো মাহমুদ। একটা অর্থহীন দৃষ্টি তুলে দেখলো তাকে। তারপর ধীরে ধীরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে সামনে এগিয়ে গেলো সে।

মনসুর কাতর গলায় বললো, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

মাহমুদের কানে কথাটা এলো কিনা বোঝা গেল না। আগের মত পথ চলতে লাগলো সে। পুরো সন্ধেটা পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দিলো মাহমুদ। সেও মরতে পারতো, কিন্তু বেঁচে গেছে; অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে সে। কাল যারা ছিল আজ তারা নেই। নেই একথা ভাবতে গিয়ে বিশ্বাস হলো না তার। মনে হলো তারা বেঁচে আছে। তাদের কথাবার্তা সব শুনতে পাচ্ছে সে। দেখতে পাচ্ছে তাদের। কিন্তু তারা নেই। এ জীবনে দ্বিতীয়বার আর সেই রক্ত-মাংসের দেহগুলোকে দেখতে পাবে না মাহমুদ। তারা গেছে। চিরতরে ছেড়ে গেছে এই পৃথিবীর মায়া। সারা দেহটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে এলো। মাথার শিরাগুলো বুঝি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

বিশ্রামাগারের দোরগোড়ায় পা রাখতে, কেরোসিন কাঠের কাউন্টারের ওপাশ থেকে খোদাবক্স ঝুঁকে পড়ে তাকালো ও দিকে।

খবরটা ইতিমধ্যে কানে এসেছে তার। কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়ালো খোদবক্স। আস্তে ওর পিঠের ওপর একখানা হাত রেখে মৃদু গলায় বললো, 'আমি সব শুনেছি মাহমুদ সাহেব। কি আর করবেন, সব খোদার ইচ্ছা।'

মাহমুদ তার লাল টকটকে একজোড়া চোখ মেলে তাকালো ওর দিকে। তারপর অকস্মাৎ দু'হাতে ওর গলাটা টিপে ধরে চিৎকার করে উঠলো সে, 'সব খোদার ইচ্ছা, শালা জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি। গলাটা টিপে এখনি মেরে ফেলবো তোমায়, দেখি কোন্ খোদা বাঁচাতে আসে, শয়তানের বাচ্চা কোথাকার।'

তীব্র আর্তনাদ করে ছিটকে পিছিয়ে গেল খোদাবক্স। রেস্তোঁরায় আর যারা ছিলো তারা সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

টলতে টলতে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো মাহমুদ।

আরো অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো সে।

মাঝ রাতে প্রেসে এসে লম্বা হয়ে বেঞ্চটার ওপর শুয়ে পড়লো মাহমুদ। ম্যানেজার তাকে দেখে কি যেন জিজ্ঞেস করলো। কিছু কানে গেলো না ওর। লাল চোখজোড়া মেলে একবার তাকিয়ে আবার চোখ মুদলো সে। ম্যানেজার উঠে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখলো ওকে, তারপর গায়ে হাত লাগতে আঁতকে উঠলো। পরপর চারটে দিন জ্বরে অচৈতন্য হয়ে রইলো মাহমুদ।

প্রলাপ বকলো।

ঘুমোল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার প্রলাপ বকলো।

চতুর্থ দিনের মাথায় জ্ঞান ফিরে আসতে চোখ খুলে মাহমুদ দেখলো একটা পরিচিত মুখ ঝুঁকে পড়ে দেখছে তাকে। প্রথমে মনে হলো মরিয়ম। তারপর মনে হলো হাসিনা। অবশেষে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, লিলি। লিলি দাঁড়িয়ে।

'আমি কোথায় আছি এখন?' কাতর গলায় প্রশ্ন করলো মাহমুদ। সারা মুখে বিস্ময়।

লিলি মাথার কাছ থেকে পাশে এসে বসলো তার। বললো, 'কেমন লাগছে এখন আপনার?'

'আমার কি হয়েছে? কোথায় আছি আমি? মা, ওরা কোথায়?' একসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন করলো মাহমুদ। বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটে নি তার।

লিলি মুখখানা সরিয়ে নিলো অন্য দিকে।

ধীরে ধীরে সব কিছু মনে পড়লো মাহমুদের। মা, বাবা, মরিয়ম, হাসিনা, দুলু, খোকন, একে একে সবার কথা মনে পড়লো তার। মৃতদেহগুলো ভেসে উঠলো চোখের উপর। তাইতো, তারা সকলে মারা গেছে। আজিমপুর গোরস্থানে কবর দেয়া হয়েছে তাদের। কেন এমন হলো? কেন তারা মারা গেল? সারা বুক যন্ত্রণায় ফেটে পড়তে চাইলো তার। বোবা দৃষ্টি মেলে অসহায়ভাবে সে তাকালো লিলির দিকে।

লিলি ঝুঁকে পড়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কেমল লাগছে এখন আপনার? চারদিন ধরে অচৈতন্য হয়ে আছেন। মনসুর সাহেবসহ কত জায়গায় খুঁজেছি আপনাকে, শেষে প্রেসে গিয়ে দেখলাম জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছেন। এখন কেমন লাগছে আপনার?'

একে একে বিশ্রামাগারে যাওয়া আর প্রেসে এসে বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ার ছবিটা ভেসে উঠলো চোখে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মৃতদেহগুলো আবার দেখা দিলো চোখে। বুকটা শূন্যতায় হু হু করে উঠলো। হঠাৎ বালিশে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠলো মাহমুদ। এই প্রথম চোখ ফেটে কান্না এলো তার। বেদনা জড়িত গলায় সে বললো, 'কেন এমন হলো বলতে পারেন, কেন এমন হলো? আমার যে কেউ রইলো না আর, কেউ না, আমি কেমন করে বাঁচবো।'

ধীরে ধীরে মুখখানা ওর মাথার ওপর নাবিয়ে আনলো লিলি। দু'চোখে অশ্রু ঝরছে তার। কান্নাভরা গলায় সে কানে কানে বললো, 'আমি আছি, আমি যে তোমার, ওগো বিশ্বাস করো। আমি আছি, ওগো একবার মুখখানা তুলে তাকাও আমার দিকে, একবার চেয়ে দেখো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

সকালের ডাকে আসা চিঠিখানা বারকয়েক নেড়েচেড়ে দেখলো লিলি।

আঁকাবাঁকা অক্ষরে মাহমুদের নাম আর ঠিকানা লেখা। অপরিচিত হস্তাক্ষর।

দুপুরে সে বাসায় এলে লিলি বললো, 'তোমার চিঠি এসেছে একখানা। টেবিলের ওপর রাখা আছে।'

খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়লো মাহমুদ।

শাহাদাত লিখেছে ভৈরব থেকে।

'মাহমুদ।

অনেক দিন তোমার কোন খোঁজ-খবর পাই নি। জানি না কেমন আছো। আজ বড় বিপদে পড়ে চিঠি লিখছি তোমাকে। জানি এ বিপদ থেকে তুমি কেন কেউ উদ্ধার করতে পারবে না আমায়। তবু মানসিক অশান্তির চরম মুহূর্তে নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করার মতো তুমি ছাড়া আর কাউকে পেলাম না। তাই লিখছি।

আমেনার যক্ষ্মা হয়েছে।

ঢাকা থাকতেই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছিলো। এখন বোধ হয় তার শেষ দিন ঘনিয়ে এলো।

তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছো, এতদিন পরে এ খবরটা তোমাকে জানাতে গেলাম কেন। আসলে আমিও এ ব্যাপারে প্রায় অজ্ঞ ছিলাম। আমাকে সে কিছুতেই জানতে দেয় নি। মাঝে মাঝে লক্ষ করতাম, একটানা অনেকক্ষণ ধরে খক্‌খক্ করে কাশতো সে। বড় বেশি কাশতো। কখনো কখনো তার কাপড়ে রক্তের ছিঁটেফোটা দাগ দেখে প্রশ্ন করেছি। কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। আবার, একদিন রাতে অকস্মাৎ রক্তবমি করতে করতে মূর্ছা গেল সে। ডাক্তার ডাকলাম। রোগী দেখে তিনি ভীষণ গালাগাল দিলেন আমায়। বললো, তক্ষুনি ঢাকায় নিয়ে যেতে।

কিন্তু, আমেনা কিছুতে রাজী হলো না।

তার স্বভাব তোমার অজানা নয়।

একদিন ভাইদের অমতে সে বিয়ে করেছিলো আমায়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো মাথা উঁচিয়ে। সেসব কথা তুমি জানো। ভাইদের কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিলো তাকে। আজ তাঁদের সামনে তিল তিল করে মরতে সে রাজী নয়। টাকা-পয়সার জন্যে হাত পাতবে এ কথা কল্পনাও করতে পারে না সে।

এদিকে আয় বড় কমে গেছে। দোকানের অবস্থা খুব ভালো নয়। লোকের হাতে টাকা নেই, চাহিদা থাকলেও জিনিসপত্র কিনবে কি দিয়ে? জীবনে কিছুই করতে পারলাম না মাহমুদ।

আমেনার জন্যও যে এ মুহূর্তে কিছু করতে পারবো , ভরসা হয় না । সারাটা জীবন ও শুধু আমাকে দিয়ে গেলো। ওকে আমি কিছু দিতে পারলাম না। দোয়া করো, ওর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও যেন কবরে যেতে পারি। এ দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় কোন চাওয়া কিংবা পাওয়া আর নেই আমার। ছেলে-মেয়েগুলোর জন্য মাঝে মাঝে ভাবনা হয়। খোদা দিয়েছেন, খোদাই চালিয়ে নেবেন ওদের। এতক্ষণ শুধু নিজের কথা লিখলাম, কিছু মনো করো না।

তোমাদের দিনকাল কেমন চলছে জানিও। লিলি কেমন আছে? মিতাকে আমার চুম্বন দিয়ো।

তোমার শাহাদাত।'

চিঠিখানা একবার পড়ে শেষ করে আবার পড়লো মাহমুদ। তারপর চোয়ালে হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে বসে কিছু ভাবলো সে। মিতাকে কোলে নিয়ে লিলি এসে দাঁড়ালো পাশে। মৃদু গলায় শুধালো 'কার চিঠি ওটা?'

মাহমুদ বললো, 'শাহাদাত লিখেছে।'

লিলি জানতে চাইলো, 'ওরা ভালোতো?'

মাহমুদ চিঠিখানা এগিয়ে দিলো ওর দিকে।

লিলির পড়া শেষ হলে মাহমুদ আস্তে করে বললো, 'আমাকে এক্ষণি আবার বেরুতে হচ্ছে লিলি।'

'এই বেলায় কোথায় যাবে?' লিলি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

মাহমুদ ধীর গলায় বললো, 'আমেনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে একখানা টেলিগ্রাম করবো ভাবছি।'

লিলির মুখখানা অকস্মাৎ ম্লান হয়ে গেলো। ইতস্তত করে সে বললো, 'এখানে আনবে?'

মাহমুদ লক্ষ করলো লিলি ভয় পেয়েছে। একটা যক্ষ্মা রোগীকে বাসায় আনা হবে, বিশেষ করে যে ঘরে একটি বাচ্চা মেয়ে রয়েছে সেখানে, ভাবতে আতঙ্ক বোধ করছে লিলি।

ওর খুব কাছে এগিয়ে এসে শান্ত গলায় বললো, 'আমার যদি কোন কঠিন অসুখ হয় তাহলে কি আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে পারবে লিলি? তবে ওর জন্যে তুমি ভয় করছো কেন?

লিলি গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো, 'ওটা যা ছোঁয়াচে রোগ-না, ওকে এখানে আনতে পারবে না তুমি।' মিতাকে বুকের মধ্যে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলো সে।

'দেখো তোমাদের এ স্বভাবটা আমার একেবারে পছন্দ হয় না, সহসা রেগে উঠলো মাহমুদ 'সব সময় নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো তোমরা।' লিলির চোখে-মুখে কোন ভাবান্তর হলো না। মিতাকে কোলে নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে।

মাহমুদ নীরব।

পায়ের মন্দে লিলি ফিরে তাকিয়ে দেখলো বাইরে বেরিয়ে গেল মাহমুদ। রাস্তায় নেমে, কাছের পোস্টাফিস থেকে শাহাদাতকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে এলো মাহমুদ। এসে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়লো সে।

লিলি এখনও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হাতের নখ খুঁটছে। মিতাকে সে একটু আগে শুইয়ে দিয়েছে তার দোলনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈষৎ তন্দ্রায় চোখজোড়া জড়িয়ে আসছিলো মাহমুদের। লিলির ডাকে চোখ মেলে তাকালো সে।

লিলি কোমল কণ্ঠে ডাকলো, 'শুনছো?'

মাহমুদ আস্তে শুধালো 'কি?'

'আমি বলছিলাম কি, টেলিগ্রাম করে কি হবে', ওর কাছে এসে বসলো লিলি, 'তারচে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো ওকে।'

লিলির কণ্ঠস্বরটা এখন সহানুভূতির সুরে ভরা।

মাহমুদ দু'হাতে ওকে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু স্বরে বললো, 'আমি জানতাম লিলি, তুমি ওকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না।'

লিলি সলজ্জ হেসে ঘুমন্ত তার দিকে তাকালো এক পলক, কিছু বললো না। কাল মিতার জন্মদিন।

রাতে শুয়ে শুয়ে সে ব্যাপারে আলোচনা করেছে ওরা।

মাহমুদ বলেছে 'বেশি লোককে ডাকা চলবে না, ওতে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়।'

ওর বাহুর উপর মাথা রেখে লিলি শুধিয়েছে, 'তুমি কাকে বলতে চাও?'

মাহমুদ মৃদু স্বরে বলেছে, 'রফিককে বলবো, আর বলবো নঈমকে।'

'আমি মনসুরকে বলে দিয়েছে, বউকে সঙ্গে নিয়ে সে আসবে।' লিলি আস্তে করে বলেছে, 'তসলিমকেও খবর দিয়েছি।'

মাহমুদ সংক্ষেপে বলেছে, 'ঠিক আছে।'

তারপর ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা।

ভোরে উঠে হাতমুখ ধুয়ে চা-নাস্তার পরে মাহমুদ যখন বেরুতে যাবে তখন লিলি স্মরণ করিয়ে দিলো, 'যাদের বলার আছে এই বেলা বলে এসো। আর শোন, ভৈরব কবে যাচ্ছে তুমি?'

যাওয়ার পথে থামলো মাহমুদ। থেমে বললো, 'দেখি, কাল কিংবা পরশু যাবো। আমেনা যখন মেয়ে নিশ্চয় আসতে চাইবে না, টেলিগ্রামটা পেয়েছে কিনা কে জানে।' কাটা কাটা কথাগুলো বলে রাস্তায় নেমে এলো সে।

জিন্নাহ্ এভিন্যুতে নতুন অফিস করেছে রফিক।

এখন আর অন্যের অধীনে কাজ করছে না, সে নিজস্ব কোম্পানি খুলেছে একটা। স্বাধীন ব্যবসা। বড় বড় কন্‌ট্রাক্ট পাচ্ছে আজকাল। রাস্তা মেরামত, বাড়ি ঘর তৈরি কিংবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ইট, চুন, সুরকি ও লোহা-লক্কর সরবরাহের কন্‌ট্রাক্ট। প্রেস হয়ে যখন রফিকের অফিসে এসে পৌঁছলো মাহমুদ, তখন বেশ বেলা হয়েছে। বাইরের ঘরে কয়েকজন কর্মচারী নীরবে কাজ করছে। তাদের একপাশে নঈমকে দেখতে পেলো মাহমুদ। মস্ত বড় একটা খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন হিসেব করছে। ওর দিকে চোখ পড়তে ইশারায় কাছে ডাকলো, 'মাহমুদ যে, কি মনে করে?'

মাহমুদ বললো, 'কাল মিতার জন্মদিন, তাই তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এলাম। রফিক আছে কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আছে।' পর্দা ঝুলানো চেম্বারটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নঈম বললো, 'একটু আগে এসেছে। যাওনা, দেখা করো গিয়ে। এই শোন-।'

হঠাৎ কি মনে হতে ওকে আবার কাছে ডাকলো নঈম, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, ভীষণ সিরিয়াস কথা, বসো বলছি, মাহমুদ বসলো।'

সামনে খোলা খাতাটা বন্ধ করে এক পাশে ঠেলে রেখে দিলো নঈম।

চার পাশে তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় ধীরে ধীরে বললো, 'রফিক একটা মেয়েকে ভালবাসতো মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, মাহমুদ মাথা দুলিয়ে সায় দিলো?'

'সে মেয়েটা এখনো তাকে ভালোবাসে।'

'হুঁ।'

'আজ ক'দিন ধরে রফিক কি বলছে জানো?'

'না।'

'বলছে।' বলতে গিয়ে বার কয়েক নড়েচড়ে বসলো নঈম। 'বলছে মেয়েটাকে নাকি আমাকে বিয়ে করতে হবে।'

'সেকি?' মাহমুদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। 'তুমি করতে যাবে কেন?'

'দেখতো মজা?' ঠোঁটের ফাঁকে মিটিমিটি হাসলো নঈম। এককালে ভালবাসতো রফিক একথা ঠিক, এখন সেসব কোথায় উবে গেছে। কিন্তু মেয়েটা ভীষণ হ্যাংলা, কিছুতে ওর পিছু ছাড়বে না। এখন হয়েছে কি'-বলতে গিয়ে আরো সামনে ঝুঁকে এলো সে, চাপা গলায় বললো, 'মেয়েটা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে। এবোরসন করার জন্য চাপ দিয়েছিলো রফিক। কিন্তু মেয়েটা কিছুতে রাজী হচ্ছে না। মাঝখান থেকে বড় বিপদে পড়ে গেছে রফিক। তাই আজ কদিন ধরে সে আমায় ধরে বসেছে। বলছে আমার বেতন আরো বাড়িয়ে দেবে আর বিয়ের খরচ-পত্র সব নিজে বহন করবে।' নঈম হাসলো।

মাহমুদ নীরব। সারা দেহ পাথর হয়ে গেছে।

ওকে চুপ থাকতে দেখে নঈম আবার বললো, 'বন্ধু হিসেবে ওর এ দুঃসময়ে ওকে বাঁচানো উচিত সেকথা আমি বুঝি কিন্তু-।' কিছু বলতে গিয়ে ইতস্তত করছিলো নঈম। সহসা উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ।

'ওকি চললে কোথায়? বসো'। নঈম অবাক চোখে তাকালো ওর দিকে। মাহমুদ মৃদু গলায় বললো, 'কাজ আছে, চলি এখন।'

'রফিকের সঙ্গে দেখা করবে না?'

'না।'

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে আসছিলো মাহমুদ। পেছনে রফিকের উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালো সে। 'আরে মাহমুদ যে, ওকি, এসে চুপি চুপি আবার চলে যাচ্ছো?' মাহমুদকে পেয়ে অধীনস্থ কর্মচারীদের উপস্থিতি যেন ভুলে গেছে সে। এগিয়ে এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরে বললো, 'এসো তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার, চেম্বারে এসো।' মাহমুদ বললো, 'না, আমার কাজ আছে যাই এখন।'

'কাজ কাজ আর কাজ। কাজ কি শুধু তোমার একলার। আমি বেকার নই। আমারও কাজ আছে। এসো, একটু বসে যাবে।' মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে চেম্বারে ফিরে আসার পথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়চোখে একবার নঈমের দিকে তাকালো রফিক। লম্বা খাতাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগসহকারে হিসেব মিলাচ্ছে সে।

সোনালি রঙের কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে দু'ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিলো রফিক, আরেকটা সিগারেট মাহমুদকে দিলো, তারপর বললো, 'তোমরা আসো না। এলে কত ভাল লাগে সে আর কি বলবো। এইতো সারাদিন ব্যস্ত থাকি। যখর একটু অবকাশ পাই তখন তোমাদের কাছে পাই নে। কেমন আছো বলো। বউ আর মেয়ে ভালো আছে তো?' কলিং বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলো, দু'কাপ চা আনার ফরমায়েশ দিলো। তারপর আবার বলতে লাগলো 'খোদাবক্সের দোকানে আজকাল যাও না? আমিও যাই না অনেকদিন হলো। সেদিন পাশ দিয়ে আসছিলাম। দেখলাম বেশ চলছে ওর রেস্তোঁরা। আজকাল রেকর্ডে সারাদিন ধরে হিন্দি গান বাজায় সে। দেয়ালে অনেকগুলো ফিল্মস্টারের ছবি ঝুঁলিয়ে রেখেছে, তাই না?' একটানা কথা বলে গেলেও মাহমুদ লক্ষ করলো অবচেতন মনে কি যেন ভাবছে রফিক।

চা খেয়ে নিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালো সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'নইমের আমি একটা বিয়ে দিতে চাই, দিন দিন ও বড় খেয়ালি হয়ে যাচ্ছে, ওর সংসারী হওয়া উচিত।' আড়চোখে একবার মাহমুদের দিকে তাকালো সে। মাহমুদ বললো, 'তুমি নিজে কি চিরকুমার থাকবে নাকি?'

'না, না, মোটেই না।' সামনে এগিয়ে টেবিলের ওপর দু'হাতের কনুই রেখে পরক্ষণে জবাব দিলো, তবে হ্যাঁ; আপাতত ও ধরনের কোন প্ল্যান নেই আমার। সময় কোথায় বল, সময় থাকলে তবু চিন্তা করা যেতো।' মাহমুদ মৃদু হাসলো।

রফিক ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহসা বললো, 'নঈমকে তুমি একটু বোঝাতে পারো? তোমার কথা সে নিশ্চয় শুনবে। ওর জন্যে ভালো একটি মেয়ে ঠিক করেছি আমি। কিন্তু, ও রাজী হচ্ছে না। বললাম, সব খরচ আমার তবু-।'

আরো কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলো সে, মাহমুদ মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো, 'ওর জন্যে অত মাথা ঘামিয়ে মূল্যবান নষ্ট করা কি উচিত?' বলে উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ।

'চলি আজ।'

'আরে শোন, দাঁড়াও।' রফিক পেছনে থেকে ডাকলো। 'কি জন্যে এসেছিলে কিছু বললে না তো?'

'এমনি।' বলে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে এলো সে। পাখার নিচে বসেও এতক্ষণে রীতিমত ঘেমে উঠেছে মাহমুদ।

মিতার জন্মদিনে বড় রকমের কোন আয়োজন করে নি ওরা। কিছু প্যাস্ট্রি, ডালমুট আর কলা। এক কাপ করে চা সকলের জন্যে। বিকেলে আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে এলো।

মনসুর আর সেলিনা। তসলিম আর নঈম। ছোট ঘরে বেশি লোককে বসাবার জায়গা নেই। তাই অনেককে বলতে পারেনি ওরা। তবু ছোটখাট আয়োজনটা বেশ জমে উঠলো অনেকক্ষণ।

মিতাকে আগের থেকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলো লিলি। কোলে নিয়ে সবাই আদর করলো তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলিনা বললো, 'দেখতে ঠিক মায়ের মত হয়েছে।'

মনসুর বললো, 'রঙটা পেয়েছে বাবার।'

লিলি বললো 'মেয়ে হয়ে বিপদ হলো, ছেলে হলে তোমাদের জামাই বানাতাম।'

সেলিনা বললো, 'আমার কিন্তু ছেলে হবে, দেখো লিলি আপা।'

মনসুর বললো, 'আমি কিন্তু মেয়ে চাই।'

সেলিনা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'তুমি চাইলেই হলো নাকি?'

'হয়েছে মান-অভিমানের পালাটা তোমরা বাসায় গিয়ে করো।' লিলি হেসে বললো।

'এখন সবাই মিলে মিতার স্বাস্থ্য পান করবে এসো।'

মেয়েকে মাহমুদের কোলে বাড়িয়ে দিয়ে, খাবারগুলো এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখলো লিলি।

সবার অনুরোধে নঈম একটা গান শোনালো ওদের।

তারপর খাওয়ার পালা।

প্যাস্ট্রি। ডালমুট। কলা। সবশেষে চা।

তসলিমের দিকে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিয়ে লিলি মৃদু হেসে বললো, তুমি একা এলে, রানুকে আনলে না যে?'

তসলিম লজ্জা পেয়ে বললো, 'আসার কথা ছিলো। কিন্তু বাসা থেকে বেরুতে পারেনি ও।'

লিলি মুখ টিপে আবার হাসলো 'ওর বাবা-মা বুঝি ওকে কড়া নজরে রেখেছে আজকাল?'

তসলিম দ্রুত ঘাড় নাড়িয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

মনসুর চায়ের কাপে চুকুম দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বিয়ের দিন তারিখ কি এখনো ঠিক হয় নি?'

'না, এখনো কথাবার্তা চলছে।' মৃদু জবাব দিলো তসলিম। লিলি আবার ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'বেচারা বড় অস্থির হয়ে পড়েছে।' তসলিম লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে বললো, 'হুঁ তোমাকে বলেছে আর কি। শুধু শুধু বাজে কথা বলো।'

চা-নাস্তা শেষ হলে আরো অনেকক্ষণ গল্প করলো ওরা। সিমেনা নিয়ে আলোচনা করলো। পত্র-পত্রিকা আর রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হলো। তারপর একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলো সবাই।

মিতাকে কোলে নিয়ে আদর করছিলো মাহমুদ। লিলি বললো 'তোমার কি হয়েছে বলতো, সবাই বললো, তুমি একটা কথাও বললে না?' মাহমুদ হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, তুমি তো জানো লিলি, অতিরিক্ত হুল্লোড় ভালো লাগে না আমার।'

'তাই বলে বুঝি একটা কথাও বলতে হবে না? কপট অভিমান করে লিলি বললো, 'ওরা কি মনে করলো বল তো?'

'কেন, তুমিতো কথা বলেছো সবার সাথে।' মাহমুদ জবাব দিলো মৃদু গলায়।

মিতা ঘুমিয়ে পড়েছে কোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিলি বিছানায় নিয়ে শোয়াল তাকে। কপালে একটু চুমু খেয়ে আদর করলো। গায়ের কাপড়টা মিতার আস্তে করে টেনে দিলো সে।

টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে সার সার বই।

লিলি কাছে এসে বললো, 'কি খুঁজছো?'

মাহমুদ বললো, 'আমার সেই খাতাটা সেই লাল কভার দেয়া।'

লিলি বললো, 'তুমি বসো, আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

মিতার পাশে এসে বসলো মাহমুদ। লিলি বইগুলো উল্টে পাল্টে খোঁজ করছিলো খাতাটা। হঠাৎ একটা বই থেকে কি যেন পড়ে গেলো মাটিতে। উপুড় হয়ে ওটা হাতে তুলে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো লিলি।

মাহমুদ বললো, 'কি ওটা?' বলতে বলতে লিলির পেছনে এসে দাঁড়ালো সে। লিলির হাতে একখানা ফটো। গ্রুপ ফটো। হাসমত আলী, মাহমুদ, সালেহা বিবি, মরিয়ম, হাসিনা সকলে আছে। তসলিম তুলেছিলো ওটা। আজও মনে আছে মাহমুদের।

ফটোর দিকে চেয়ে মৃদু গলায় লিলি জিজ্ঞেস করলো, 'ক'বছর হলো?' মাহমুদ ওর কাঁধের ওপর হাত জোড়া রেখে বললো, 'পাঁচ বছর।'

'পাঁচটা বছর চলে গেছে, তাই না?' লিলির দৃষ্টি তখনো হাতে ধরে রাখা ফটোটার উপর। ধীরে ধীরে মাহমুদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর মুখে চোখ তুলে তাকালো লিলি। চোখজোড়া পানিতে টলমল করছে ওর। দু'জনে নীরব। মাহমুদের গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো লিলি। বুকটা অস্বাভাবিক কাঁপছে ওর। অসহায়ের মত কাঁপছে।

ওর ঘনকালো চুলগুলোর ভেতর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে মাহমুদ মৃদু গলায় বললো, 'কেন কাঁদছো লিলি। জীবনটা কি কারো অপেক্ষায় বসে থাকে? আমাদেরও একদিন মরতে হবে। তখনো পৃথিবী এমনি চলবে। তার চলা বন্ধ হবে না কোনদিন। যে শক্তি জীবনকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে তার কি কোন শেষ আছে লিলি?'

—০—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~